
পার্বণী

আনন্দ

বার্ষিকী ১৩৯৪

[অষ্টাদশ বর্ষ]

সম্পাদকমণ্ডলী

লীলা মজুমদার　ধীরেন্দ্রলাল ধর

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য　দেবকুমার বসু

সলিল লাহিড়ী

শিশু সাহিত্য পরিষদ

১৬ টাউনসেণ্ড রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৫

মূল পরিবেশক

মডেল পাবলিশিং হাউস

প্রকাশক : সলিল লাহিড়ী
সম্পাদক : শিশু-সাহিত্য-পরিষদ
১৬ টাউনসেণ্ড রোড, কলকাতা—৭০০ ০২৫

প্রচ্ছদ : রফিকুন নবী (বাংলাদেশ)

প্রকাশ : ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭

মূল পরিবেশক : মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

অলংকরণ : ধীরেন বল, অশোক ধর, শৈল চক্রবর্তী, দিলীপ দাস, সুবোধ দাসগুপ্ত, পার্থ দাস, স্বপন দেবনাথ

মুদ্রক : জি. সী. শীল
ইম্প্রেশন প্রবলেম
২৭এ তারক চ্যাটার্জী লেন কলকাতা—৭০০ ০০৫

মূল্য : **আঠাশ টাকা** (২৮·০০)

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

জীবনী-ভ্রমণ-কাহিনী-প্রবন্ধ :

কবিতা :

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা



রাখীসঙ্গীত

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
[illegible] পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক [illegible] হে ভগবান —
বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
[illegible] পূর্ণ হউক হে ভগবান —
বাঙালীর [illegible] বাঙালীর [illegible] আশা,
বাঙালীর [illegible] বাঙালীর [illegible] ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান —
(বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ)
[illegible] বাঙালীর ঘরে [illegible] যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।



বনবাসী সবাই

লীলা মজুমদার

এক সময় পাহাড়ের চূড়ো থেকে পায়ের কাছের সমতল, সমস্তটা ঘন বনে ঢাকা ছিল। সে বন একেবারে তিয়াসা নদীর ধারের কাছাকাছি এসে থেমে যেত ; তারপর অনেকটা ঘাস জমি, তারপর বালি আর বড় বড় পাথর, তারপর তিয়াসা নদী কুলকুল করে পাথর এর গা ছুঁয়ে বয়ে যেত ! শীত গ্রীষ্মে ঐ পাথরে পা রেখে নদী পার হওয়া যেত। কিন্তু বর্ষায় পাহাড়ের ওপরে বৃষ্টি পড়ত আর নদীর জল ফুলে ফেঁপে শত শত সাপের মতো মাথা তুলে ফুঁসতে ফুঁসতে গর্জাতে গর্জাতে ছুটে চলত। দাদুর কাছে বড়কু আর ছোটনা গল্প শুনেছে একবার নাকি কোথাকার জমিদারের বুনো হাতি ধরার খেদার আনাড়ি লোকরা, পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখেও নতুন ধরা হাতির পালকে নদী পার করিয়ে মহালে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই গুমগুম করে একশো ঘোড়ার পায়ের শব্দ তুলে জলের তোড় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল !

এককেটা হাতির দুপাশে দুটো লোক। এমনি করে একটার পিছনে একটা করে দশটা হাতি তখন মাঝ নদীতে। গুমগুম শব্দ শুনেই হাতির দড়িদড়া ছেড়ে দিয়ে লোক-গুলো পড়িমরি করে কয়েক লাফে তীরে পেঁছে ভিনগাঁয়ের দিকে দৌড় দিয়েছে। আর কি তারা খেদামুখো হয় ! হাতিগুলো আগেরটার সঙ্গে পরেরটা মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। তারা সে দড়ি ছিঁড়ে পালাবার আগেই গর্জাতে গর্জাতে বান এসে তাদের ওপর আছড়ে পড়ল। তারপর কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে বাঁকের কাছে এসে পেঁছবার

সঙ্গে সঙ্গে জলের তাণ্ডবও কমে গেল, তার ওপর সেখানে বড় বড় পাথরে হাতি বাঁধা দড়িও আটকে গেল। এইসব পাহাড়ে নদীর বান এই রকম হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। নাকানি চোবানি খেয়ে কিছুক্ষণ হাতিরা পাথরের ওপর পড়ে রইল। তারপর আবার উঠে গলায় ছেঁড়া দড়ি ঝেড়ে ফেলে বনের জানোয়ার বনে পালাল। খেদার লোক যখন খোঁজ নিতে এল তখন দড়িগুলোও কে কুড়িয়ে নিয়ে গেছে।

এ গল্প বুড়ো দাদুর কাছে বারবার শুনেও ওদের আশ মেটে না। বনে এখন আর হাতি নেই, নেকড়ে বাঘ নেই, ভালুক নেই। পাহাড়ের মাথা বরাবর ট্রাক যাবার রাস্তা হচ্ছে, কত যে গাঁয়ে আগাছা গজানো বুড়ো বুড়ো গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে তার ঠিক নেই। বড়কুর ইস্কুলের মাস্টার মশাই বলেছেন সরকারের হুকুমে একটা গাছ কাটলে তার বদলে দুটো ভালো জাতের গাছের চারা পুঁতে দিতে হবে। তাই শুনে বুড়ো-দাদু বললেন, 'গাছ কেটে ফেললে বিষ্টি পড়া কমে যায়। দেশে আকাল আসে। পাহাড়ের গায়ে গাছের শিকড় তাকে মাটিতে এঁটে রাখে। কেটে ফেললে তাই ধ্বস নামে। তাতে ছোটনার কি ভয়! 'ওরা যে গাছ কেটে রাস্তা বানাচ্ছে, শেষটা আমাদের গাঁ সুদ্ধ ধ্বসে নিচে পড়ে যাবে না তো?' 'না রে না, আমাদের গাঁয়ের তলায় পাথুরে জমি, তার উপর মাটি, সেই মাটিতে ফলের গাছ, শাক-সব্জি করি, ইঁকড়ার বেড়া বানাই, মাটি এঁটে থাকে। কিন্তু সে ঘন বন আর পাহাড়তলিতেও নেই। ইজারদাররা কাঠের ব্যবসা করে, ঘন বনে তাদের নিত্য আসা যাওয়া। যে গাছের গায়ে দাগ দিয়ে যায়, সেই গাছ কেটে ফেলা হয়। তাদের সঙ্গে শিকারীরাও আসে। বাঘ ভালুক হাতি সে বন ছেড়ে পালায়। অনেক গুলি খেয়ে মরে। এখানে এখন আর বড় জানোয়ার নেই। মানুষের গন্ধ পেয়ে আগের থেকেই সব সরে পড়েছে। মানুষদের কেউ ভালোবাসে না। সব চেয়ে লোভী সব চেয়ে অবিশ্বাসী জন্তু হল মানুষ।

ছোটনা তো অবাক! 'এ্যাঁ! মানুষরাও জন্তু নাকি?' 'জন্তুই তো। সবচেয়ে বদ জন্তু। আর সবচেয়ে চালাক।' ছোটনার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ইস! সবচেয়ে খারাপ! অথচ দাদুকে, মা-কে, পিসিকে, এমন কি বাবা যখন আসে তখন তাকেও তো দেখে বেশ ভালোই মনে হয়। বড়কু ইস্কুল থেকে ফিরলে কথাটা তাকে বলা দরকার বলে মনে হল। সে কিন্তু বেশি অবাক হল না। বলল, 'এ আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। পিসিকে দেখিস নি ছোট্ট ছোট্ট কাদা চিংড়িগুলোকে জ্যান্ত সেদ্ধ করে তবে ছাড়ায়। আর সেই মুরগি চোর বেচারা পালিয়ে আমাদের গুদোমে লুকিয়ে ছিল, তাকে কিছুতেই থাকতে দিল না। পয়সা দিয়ে ভাগাল। ছিঃ। মা-ও কিছু বলল না।'

ছোটনা বলল, 'মা যে বলল চোরদের সঙ্গে বাঁকা ছুরি থাকে। ওদের চটাতে নেই।' বড়কু বলল, 'এক-চোখ-কাণা শেয়ালদের তো ছোরা থাকে না, কই তাকেও তো রাখতে দিল না। চল, ঘুড়ি ওড়াই।'

বড়কু যে ইস্কুলে পড়ে সেটা বেশ দূরে। বন পার হয়ে, তিয়াসা নদীর সাঁকোর ওপর দিয়ে আরো খানিকটা বনপথ দিয়ে গিয়ে তবে বড়গাঁ। বড়গাঁয়ের ইস্কুলের খুব নাম ডাক। রোজ দিব্যি বড়কু একা আসে যায়। এ বনে কোনো হিংস্র জন্তু থাকে না, খালি খরগোশ, কাঠবেড়লী আর গোসাপ। তবে কিছুদিন ছেকে রাস্তা তৈরীর হট্টগোলে ঘাবড়ে গিয়ে বাঁদর, ভাম, খট্টাস, বনবেড়াল, বেজি, নেউল, সাপ, ভোঁদর, পাখিজুখি, এমন কি অনেক মৌমাছি, বোলতা, প্রজাপতি এই পাহাড়তলীর বনে নেমে এসেছে। বড়কু একটা বটগাছের ফাটলে মস্ত মৌচাক দেখেছে। কিন্তু কাউকে বলেনি। এসব বনে আজকাল ইজারাদারদের আসা বন্ধ। বুড়োদাদ্দু এখানে চৌকি দিতেন, তাই বড়কুদের আসাতে কেউ কিছু বলে না। এমন কি কাশবত্তামামুর বৌ ওদের বাতাসা খেতে দেয়। বনই ওদেরো ঘরবাড়ি।



কিন্তু পরদিনই সন্ধ্যা হয় হয়, তখনো বড়কু ফিরল না। সূর্য ডুবলে পিসি আর মা মহাকান্নাকাটি লাগিয়ে দিল। বুড়োদাদ্দু ভারি বিরক্ত, 'না এলে আমি কি করতে পারি বল? জানই তো আমার কেঠো পা-টা ঢালুপথে নামতে গেলেই খট্ করে খুলে যায়, আমি তো আর যেতে পারছি না।'

ছোটনার সাত বছর বয়স, আসছে বছর সেও ইস্কুলে ভরতি হবে। সে বলল, 'বুড়ো-দাদ্দু, দাদা না ফিরলে কিন্তু তুমি মরে গেলে তোমার বন্দুকটা আমি নেব।'

এ-কথা যেই না বলা, বুড়োদাদ্দু ঠাস্ করে ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'যা না, তাকে খুঁজে নিয়ে আয়, তারপর দেখা যাবে কার কত সাহস। হুঁ! ওনার বন্দুক চাই!' আরেকটা চড় তুলতেই ছোটনা পাহাড়তলীর পথ দিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুট!

সূর্য ডোবার আগেই আকাশে গোল চাঁদ উঠে পড়েছিল। চারদিক ফুটফুট করছে। ভয় করবে কেন? দুই ভাই কতবার এই বনে ঘুরেছে। গাছের তলা থেকে পালকের মতো ছত্রাক্ তুলেছে। প্রত্যেকটা গাছ ওদের চেনা বন্ধু। খালি এখন এক একটা জায়গা একটু কেমন ছায়া ছায়া। বুকটা অল্প অল্প ঢিপ ঢিপ করছে। ছায়াগুলো নড়ে উঠছে। অমনি চোখে পড়ে গেল বড়কু-ছোটনার পুরনো বন্ধু দাড়িওয়ালা বুড়ো

ঝাউগাছগুলো পাতা নেড়ে ওকে যেন সাহস দিচ্ছে। ওর গোড়ায় কোটরে আগে দু-ভাই একসঙ্গে ঢুকে বসত। আজকাল খালি একজনের জায়গা হয়। কোটরের মাথায় কাঠবেড়ালীরা থাকে এখন তাদের জেগে থাকার কথা নয়। ওরা মাথার ওপর দিয়ে লোমশ ল্যাজ জড়িয়ে গুটিশুটি হয়ে ঘুমোয়। আজ কিন্তু ব্যস্তসমস্ত হয়ে জলের ওপর বেরিয়ে এসে চিক্ চিক্ চিকির চিক্ করে কি যেন যলতে চাইছে। ওরাও ওদের বন্ধু।

ছোটনা চাঁদের আলোয় চারদিকে দেখতে লাগল। গাছের পেছনে ঘাসজমি, তারপর একটা শুকনো নালা। তারপর আবার আবার বড় বড় গাছ। বর্ষাকালে নালা দিয়ে কলকল করে পাহাড় থেকে জল নেমে আসে। এখন বর্ষা কেটে গেছে, আর কিছুদিন পরেই পুজো। পিসি গুড় নারকোল দিয়ে নাড়ু বানিয়ে রাখছে। মা চিড়ে কুটছে, মোয়া হবে। তবু এখনো নালার কাছের মাটিটা একটু ভিজে মতো। তারি এক পাড়ি থেকে খানিকটা খসে নালার পড়ে গেছে। আর সেইখানে একটা ধাড়ি ছুঁচো পিচ্-পিচ্ শব্দ করে ছুটোছুটি করছে। ছোটনাকে দেখেই ছুটোছুটি বন্ধ করে পাড়ে ভাঙার জায়গায় ওর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সামনের দুটো খুদে থাবা তুলে দাঁত খিঁচোল! ছোটনা তো অবাক! আরেকটু কাছে গিয়েই ব্যাপার দেখে তার চক্ষু স্থির! পাড়ি ভাঙাতে ওর বাসারো সামনের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার সামনে দেয়াল ঠেসে ও কে পড়ে আছে, গর্তের মুখের অর্ধেকটা বন্ধ করে? বড়কু না?

দেখে ছোটনার হাত-পা ঠাণ্ডা। হুড়মুড় করে নেমে পড়ে বড়কুর ঘাড় ধরে ঝাঁকিয়ে বলল, 'ও দাদা! মরে যাস্ না। আমি বন্দুক চাই না।' যেন অনেকদূর থেকে বড়কু বলল, 'উঁ? কে মরে গেছে? ঝাঁকাস্ না, লাদা। ঠ্যাং মচকে কিম্বা ভেঙে গেছে।'

ছোটনা রেগে বলল, 'ছুঁচোর গর্তের মুখ বন্ধ করেছিস্ কেন? ও যে ঢুকতে পারছে না।'

ততক্ষণে বড়কুর মাথাও পরিস্কার হয়ে গেছে, সে ঘষতে ঘষতে একটু সরে যেতেই সাঁই করে ছুঁচোটা ভিতরে ঢুকে গেল। তাই দেখে ওদের বেজায় হাসি পেল। তা না হয় হল, কিন্তু বড়কুর পায়ের কব্জি তো ফুলে ঢোল, তাকে বাড়ি নিয়ে যাবে কি করে? এক যদি কাণ্ডামামুকে পাওয়া যায়। বড়কু বলল, 'ওর বাড়ি তো এখান থেকে ৫ মিনিটের হাঁটা পথ। যা গিয়ে ডেকে আন্।' 'তোমাকে যদি কিছুতে কামড়ায়?' 'কিসে? ছুঁচোতে?' শেষ পর্যন্ত যেতে হল না, কাণ্ডামামুর গলা শোনা গেল। খুড়ো দাদুর কাছে খবর পেয়ে, একটা লোক নিয়ে খুঁজতে বেরিয়েছে। এরপর চারজন একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে গেল। ছুঁচোরা বাসার মুখ দিয়ে চরতে বেরোচ্ছে। সামনে মোটা সোটা ল্যাজ কামড়ে ২নং, তারপর ৩নং, তারপর ৪নং। ৫নং সবচেয়ে রোগা ছোট্ট, একটা পা খোঁড়া। সে মায়ের কাছে তাড়া খেয়ে যার কাছে যায়, সে-ই

তাকে পেছনের পা দিয়ে ঠেলে দেয়। সবার শেষে ধাড়ি ছুঁচো ৪ নং এর ল্যাজ কামড়ে যেই রওনা দিয়েছে, ৫ নং তার কাছে যেতেই লাথি খেয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে ছোটনার সামনে এসে পড়ল। ছোটনা তাকে টপ করে তুলে নিয়ে, গায়ে ঘষে আদর করে পকেটে ভরে নিল। তখন ছুঁচোর বাচ্চা নাকি ওর গাল চেটে দিয়েছিল।

এর পর বাড়ি ফেরা, ছুঁচো নিয়ে ছোটনা আগে তারপর ষণ্ডা মার্কণ্ড মামু বড়কুকে কাঁধে ফেলে। মামু বলল 'হাড় ভাঙেনি, পা মচকেছে।' তবু বড়কুকে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে বড় গাঁয়ে পাঠিয়ে দিল। ছোটনা একবার মাথা ঘুরিয়ে বলল, 'পিসি যদি বেচারিকে ফেলে দিতে চায়?' মামু বলল, 'তাহলে তুমি আর বেচারি আমার বাড়িতে থাকবে। বলেনি কিছু পিসি। তোমরা যদি ওদিকে কখনো যাও, দেখবে পিসি নিজের হাতে বেচারিকে দুধ চিড়ে খাওয়াচ্ছে। প্রথম প্রথম বেচারি বুড়োদাদুর এক পাটি ছেঁড়া বুটের মধ্যে ঢুকে ঘুমোত। আলোতে ওদের কষ্ট হয়। রাতে দেয়াল ঘেরা উঠোনে ঘুর ঘুর করত। পরে সেখানে নিজেই দিব্যি একটা গর্ত খুঁড়ে নিয়েছিল। তাই দেখে বুড়োদাদু বলেছিল 'তা তো হল। এর পর কি হয় কে জানে।' বেচারি এখন এই মোটা সোটা বড় সড় হয়েছে, আবার যা পায় তাই খেয়ে ফেলে'



সে তো মানুষ না

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জানো না তোমরা কিচ্ছুই তার,
অথচ বাজিয়ে শিঙে
বলছ, সে গায় ধ্রুপদ ধামার,
বাড়ি তার লামডিঙে।
রেলভাড়া পেলে সব কাজ ফেলে
সে নাকি আসতে রাজি,
শোনো তবে ভালমানুষের ছেলে
সবই তার চালবাজি।
সে তো মানুষ না, চারপেয়ে প্রাণী,
গান সে থোড়াই জানে।
তবে কেন তাকে করো টানাটানি
তোমাদের ফাংশানে ?
টাকাকড়ি ঢেলে আনাচ্ছ যাকে,
আসল নয় সে, ভুয়া ;
লামডিঙে নয়, বনগাঁয়ে থাকে,
ডাকে হুক্কাহুয়া।

কলকাঠি-মাহাত্ম্য

আশাপূর্ণা দেবী



হ্যাঁ এমন একটা কাল গেছে যখন 'হাতেলেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা' বার করতে পেরেই জীবন ধন্য হয়েছে। উঃ কী যে উৎসাহ, কী উত্তেজনা। রাতে ঘুম নেই পরিকল্পনার ভাবনার দাপটে।

চার বন্ধুর মধ্যে যার হাতের লেখা ভাল আসল দায়িত্ব তার ওপরই। উত্তেজনা আর অস্বস্তি তারই বেশী ছিল হাতের লেখাটা স্বভাবতঃই ভালছিল। তার সঙ্গে 'চেষ্টা' আর প্রশংসালাভের বাসনা মিশে গিয়ে অক্ষর স্রেফ 'মুক্তাক্ষর' হয়ে উঠেছিল হীরকের।

তার ওপর ভার পড়েছিল পত্রিকা অলঙ্করণের? কবিতায় পোক্ত ছিল অতনু, আর প্রবন্ধ খবর ইত্যাদিতে কুশলের। গল্প? সে চারজনেই লিখেছে। তবে হীরকেরই উৎরোতো ভাল।

ওঃ। সে একটা 'দিন' গেছে! বন্ধুজনের তো বটেই আত্মীয় জনেরাও (অবশ্য বাছা জনেদেরই দেখিয়েছে। সেজ জ্যাঠামশাইকে কিম্বা নকুল পিসেমশাইতো আর দেখাতে যাবে না তাদের অবদান।) যে দেখেছে, ধন্যি ধন্যি করেছে।

ছবির জন্য ভাল কাগজ কালি রং পেনতুলি ইত্যাদির জন্য খরচাই কি কম করেছে বেচারা নাবালক চারটে? নিজেদের যৎকামান্য জমানো রেস্ত টেস্ত সবই তাদের ওই সাধের 'চতুর্ভুজ' পত্রিকার খাতে।

'চতুর্ভুজ' নাম করণ হয়েছিল কেন? কেন আর? ওই চার বন্ধুর চারটি ডান হাত ভেবে।

হীরকের বৌদি অবশ্য প্রথমে হেসে বলেছিল, চারজনের তো আটটা হাত, তাহলে অষ্ট-ভুজ নাম রাখা উচিত।

হীরক রেগে উত্তর দিয়েছে, লেখা, আঁকা, সম্পাদনা এসব কে আবার দু হাত দিয়ে করে? সবই তো একটা হাতের কাজ ডানহাতের। না কী বল?

বৌদিকে মেনে নিতে হয়েছিল যুক্তিটা।

কিন্তু এ সব তো অতীতের কথা। যখন ওরা ক্লাশ সেভেন এইট এ পড়তো। সে এখন এই কলেজে ঢুকে এসে কি আর 'হাতের লেখা পত্রিকার' মত ছেলেমানুষীতে মন ওঠে? একসময় আস্ত একখানা ক্যাড্‌বেরি হাতে পেলে যে উল্লাসটা হতো, তেমনটি কি আর হবে?

এখন আপ্রাণ সাধনা নিজ নিজ রচিত সাহিত্য ছাপানো। সেই হাতে লেখা পত্রিকা থেকে যার হাতে খড়ি। সাহিত্য চর্চা চলছে তখন থেকেই বিশেষ করে হীরকের। বস্তা বস্তা লেখা জমে উঠেছে হীরকের বাড়ির একটা বাতিল দেরাজের মধ্যে।

আগে দেরাজটার মধ্যে বাড়ির যত শাল র‍্যাপার তোলা থাকতো। গড্‌রেজের আলমারি কেনার পর ওটাকে হতাদরে সিঁড়ির ঘরের কোনে রাখা হওয়ায় জিনিসটা সম্পূর্ণ হীরকের এক্তারে চলে এসেছিল। অতএব সেই বিশাল গহ্বর দেরাজটি ভরেই চলেছে।

কিন্তু হায়! জমেই চলেছে, কেউই তাক বেরিয়ে পড়ে সাহিত্যের আসর জমাতে পেরে উঠছে না। আজকালকার পত্র পত্রিকা সম্পাদকরা যেমন হৃদয়হীন, তেমনি চক্ষুলজ্জা-হীন। একবার পড়ে পর্যন্ত দেখতে চায় না।

অতনুতো মনের ঘেন্নায় কবিতা লেখা ছেড়েই দিয়েছে। অন্ততঃ কবিতা নিয়ে সম্পাদকদের দরবারে আর্জি করতে যায় না। নচিকেতার তো ছবি আঁকার নেশা সেই চতুর্ভুজের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্ত। তবে পত্রিকার সংখ্যাগুলি তার কাছেই রেখে দিয়েছে, মাঝে মাঝে খুলে দেখে। এখনো ভাল লাগে। আবার কেমন যেন মন কেমন কেমনও করে। বড় সুন্দর ছিল তখন দিনগুলো।

যাইহোক-হীরকই এখন রণক্ষেত্রে লড়ে যাচ্ছে। যেখানে যত পত্রিকা আছে তাদের ঠিকানায় (ডাকটিকিট সঙ্গে দিয়ে) পাঠিয়ে চলেছে। দুঃখের বিষয় ডাকটিকিট দেওয়া সত্ত্বেও কেউ ফেরৎ দেয় না।

বন্ধুরাই মাঝে মাঝেই কফি হাউসে এসে আড্ডা দেয়! কুশল বলে, স্ট্যাম্পগুলো আত্মস্মাৎ করে।

তবে অন্যেরা বলে তা নয়, খামটাই খুলে দেখে না। কাজেই জানতে পারে না ভেতরে কী আছে। সোজা ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করে।

তবে এখন একটাই সুবিধে, বার বার হাতে লিখে কপি করতে হয় না। 'জেরক্স' করে নেবার ব্যবস্থা অলিতে গলিতে। আহা! তাদের চতুর্ভুজের আমলেও এতটা চালু হয়নি জেরক্স ব্যবস্থা। হলে চারখানা থাকতে পারতো। তবে কিনা তখন পয়সাই বা কোথায়? স্কুলের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে পালা পার্বনে কিছু পেলে টেলে তাই দিয়েই তো কাজ।

অথচ কেউই এমন কিছু গরীবের ছেলে নয়। তখন রীতিই ওইরকম ছিল।

এখন তেমন টানাটানি নেই। কলেজে উঠেপর্যন্ত ভাল হাত খরচ পায়। তা হীরকের প্রায় সবটাকাই যায় ওই জেরক্সে আর ডাকটিকিটে।

হীরকের মনে বদ্ধমূল ধারণা একবার যদি পড়ে দেখে কাগজের এডিটাররা তাহলে মোহিত না হয়ে যায় না। কাজেই ছাপা হওয়া অবধারিত।
অবশেষে একদিন 'চতুর্মুখ বৈঠকে ঠিক হলো ওসব পাঠানো ফাটানো কোনে কাজের কথা নয়। নিজে হাতে করে চড়াও হতে হবে সম্পাদকের দপ্তরে আর জোরগলায় দাবি করতে হবে 'একবার পড়েই দেখুন স্যার।'
কুশলই বলল, মিনমিনিনি প্যানপ্যানানি—হাত কচলানি এসবে কোনো কাজ হয় না। এ যুগ জোরের যুগ ; দাবির যুগ! সোজা গিয়ে উঠে যাবি—
হীরক বুকে সাহস আনল।

বেছে বেছে তিনটে ভাল গল্প সঙ্গে নিল। একটা ভাল কভারের মধ্যে ভরে। নিজেও পরে নিল বেশ ভাল একটা প্যান্ট শার্ট। তার দিদিমা বলতেন, 'আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী।' কথাটা ঠিক। হীরককে দেখেই যাতে একটি ঝকঝকে হীরের মতই মনে হয়। সেটা করা দরকার।
কিন্তু এত সবের পরও ঠিক যাব যাব সময় হঠাৎ কেমন একটা নার্ভাসনেস এসে গেল। দিদিমা আরো কথা বলতেন, 'একা না ভ্যাকা। নতুন কোথাও কোনো বিশেষ কাজে যেতে হলে একা যেতে নেই। সঙ্গী নিতে হয়।
বন্ধুরা বলেছিল, জয় যাত্রায় যাও হে—
কিন্তু হীরক বলে উঠল, না ভাই, একজন কেউ আমার সঙ্গে চল।
আরে সেকী? দেহরক্ষী নিয়ে? মার খাবার ভয় পাচ্ছিস না কী?
না না দুজন থাকা ভাল।

কুশল বলল, মনে করবে তুই তেমন স্মার্ট নয়! একা ভয় পাস।
—তাহলে তোদের কেউ নিজের কোনো 'লেখা' নিয়ে চল। মনে করবে দুজনে একই উদ্দেশ্যে এসেছে। অথবা এমন ভাবও দেখাতে পারিস যেন কেউ কাউকে চিনিস না। দৈবাৎ একই সঙ্গে গিয়ে পড়েছিস। কার সঙ্গে কী ব্যবহার করে দেখগে।
দি আইডিয়া। তাহলে কে যাচ্ছিস?
নচিকেতা আর কুশলের যাবার উপায় নেই ওরা আর এখন কেউ লেখে না। পুরণো যা কিছু আছে। এখন নিশ্চয়ই পড়লে হাসি পায়। অতএব অতনু। কবিতালেখা কেউ একেবারে ছেড়ে দিতে পারে না। মাঝে মধ্যে নিশ্চয়ই হঠাৎ কাব্যি চেগে ওঠে। অতএব অতনু।

ছাড়ান কাটান হল না।
অতনু বলল, বোস তাহলে চট করে জামাটা পরে আসি।
ওর বাড়ি কাছেই।
ঠিক। ঠিক। আর গোটা কতক কবিতাও নিল সঙ্গে।
কোথায় যাওয়া হবে?

আজ তা 'দশানন' অফিসে যাওয়া যাক। জ্যাস্ত ফিরলে আগামীকাল 'সিন্ধুগর্জন' অফিসে যাওয়া যাবে।

'কলরব' অফিসের ঠিকানা জানতো, কিন্তু লোকেশানটা ঠিক জানত না। একটু জিগ্যেস করতে করতে গিয়ে পড়ল। উত্তর কলকাতার একটি ঘিঞ্জিগলির মধ্যে পশুর বৃষ্টির জমে থাকা জল কাদা ডিঙিয়ে।

'কলরবের' এত রমরমা এত বোলবোলাও, এত কাটতি, আর তার অফিসের এই ছিরি! যাব। কী আর করব। ঠাকুর্দার আমলের প্রেসবাড়ি। প্রেসটাই প্রধান।

গলি তবে ভেতরে গেটওলা ভালবাড়ি।

গেটের সামনে দুজনে একটু দাঁড়িয়ে ইতঃস্তত করছে। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে একটা লোক উঠে এল খৈনি টিপতে টিপতে টিপতে!

ক্যা!

আমরা—ইয়ে—'কলরব' অফিস তো এখানেই?

হ্যাঁ। কিসকো মাংতা?

ইয়ে—এডিটর সাহেবকে।

এডিটর সাহিব? হা ওহা। এ মুলুকে কোই সাহিব টাহিব নেই হ্যায়। লেকিন এডিটরবাবু মানে—সম্পাদকবাবু হ্যায়।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। দুজনে চাঁদ পাওয়া গলায় বলে ওঠে ওনাকেই চাই। থোড়া কাজ হ্যায়।

কৌনকাম?

অতনু তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, বহুৎ জরুরি কাম হ্যায়।

আইয়ে।

দুরু দুরু বুক। ভীরু ভীরু চোখ, কাঁপা কাঁপা পা।

চারখানা পা করিডোর পার হয়ে দেখতে পেল প্রায় ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একটা কেঠো সাইন বোর্ডের ওপর নাদার ওপর কালো হরফে লেখা সম্পাদকের দপ্তর।

বিশাল বপু এক ভদ্রলোক তক্তপোষের ওপর বসে দরদর করে ঘামছেন এবং হাতপাখা নাড়ছেন।

দেখে এদের হঠাৎ পুকুরের মধ্যে গা ডুবিয়ে বসা মোষের চেহারা মনে পড়ে গেল।

রাস্তায় খেয়াল করার কথা নয় তখন খেয়াল হল হীরক অতনুর। লোড শেডিং চলছে।

ভদ্রলোকের খালি গা। বুকের ওপর একগোছা ঘামে ভেজা পৈতে।

ইনিই কি সম্পাদক না কী?

অসম্ভব।

দশানন সম্পাদকের নামতো স্বর্ণকমল মুখোপাধ্যায় ।
তাহলে ? যতই কানা ছেলে আর পদ্মলোচনের প্রবাদ জানা থাক, তবু—
সহ সম্পাদকের নাম জানা আছে, গোবর্ধন পাড়ুই ।
ইনিই নিশ্চয় সেই 'সহ' ।
হীরক বলে উঠল এডিটর কোন ঘরে বসেন ?
ভদ্রলোক হঠাৎ দাঁত খিঁচিয়ে বলে ওঠে, মানে ? নেমপ্লেট দেখে ঢোকেন নি ?···তার মানে ইনিই স্বর্ণকোমল ।'
ইস । ইয়ে । না মানে চোখে পড়েনি ।
বলল হীরক ।
হায় স্মার্টনেস ।
ভদ্রলোক জোরে জোরে পাখা নাড়তে নাড়তে বললেন, আগে চোখের ডাক্তারের কাছে যান । 'যান' কেন ? এতটুকু পোলাপান, তুমিই বলি । যাও চোখ দেখিয়ে এসো আগে ।
হীরক বলল, খুব ভুল হয়ে গেছে । মাপ করবেন । চোখ আমাদের ঠিকই আছে ।
মনে মনে বলল, তোমার মা বাপ যে ছেলের নাম করণের সময় এমন একখানি রামধাক্কা মার্কা ইয়ার্কি করে রেখেছেন তা কে জানতো ?
স্বর্ণকমল পাখার বাঁট দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বললেন, আমার উদ্দেশ্যে ?
আজ্ঞে দশাননের জন্যে কিছু লেখা এনেছিলাম—
কলরবের জন্যে ? 'দপ্তর' থেকে চিঠি গিয়েছিল লেখা চেয়ে ?
আজ্ঞে না । আমরা তো নতুন ।
নতুন । অ । তা দরজার বাইরে যে বেতের ঝুড়িটা বসানো আছে, তার মধ্যে রেখে যান ।
দরজার পাশে ! বেতের ঝুড়িতে !
হ্যাঁ । ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট একখানা ওখানেই বসিয়ে রাখা থাকে ।

যতই হোক কলেজের ছাত্র ।
রাগে অপমানে মুখ লাল হয়ে ওঠে দুই বন্ধুর । দুজনে দুজনের অচেনা এ আই-ডিয়ার কথা মনেও থাকে না ।
কেউ ওদের বসতে বলেনি, দাঁড়িয়েই ছিল । অতএব 'উঠেপড়ার' প্রশ্ন এল না । দুজনেই বলল, আচ্ছা নমস্কার ।
আর কী আশ্চর্য ! ঠিক এই মহা মুহূর্তে পাখাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে শুরু করে দিল ।
তার মানে কারেন্ট এসে গেল ।
আঃ । বাঁচা গেল । তোমাদের পয় আছে দেখছি ।

স্বর্ণকমল সঙ্গে সঙ্গে পাশে জড়ো করে রাখা ছাড়া গেঞ্জিটা দিয়ে খ্যাস খ্যাস করে গাটা মুছে নিয়ে সেটাই আবার গায়ে পরে নিলেন।

হীরক বলে উঠল, শেষ পর্যন্ত ওই বেতের ঝুড়ির মাল কী হয়?

কী হয়? ওই দুটো 'শিশি বোতল কাগজ' এর সঙ্গে মান্থলি ব্যবস্থা আছে, এসে ওজন করে নিয়ে যায়।

শিশি বোতলওয়ালা! জানেন ওই সবের মধ্যে কতজনের কত ডাক টিকিট দেওয়া থাকে।

থাকলে থাকে। উপায় কী। সব খুলে দেখতে, ডাক টিকিট বাঁচাতে হলে আরও দুটো লোক রাখতে হবে। তার মানে লাভের গুড় পিপড়েয় খাবে।

স্বর্ণকমল আবার পাখাটা তুলে নিয়ে গেঞ্জির গলার পিছনে বানান করে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলেন, তাছাড়া আমাদের তো একটা বিবেক আছে? লেখা ছাপলাম না ডাকটিকিটটা নিয়ে নিলাম। এটা উচিত নয়।

ওঃ। বিবেক। তা' ওগুলো তো নিয়ে নেবার জন্যে নয়। 'অমনোনীত' রচনা ফেরৎ দেবার জন্যে।

দেখহে বাপু, নেহাৎ তোমাদের 'পয়ে' কারেন্টটা এসে গেল বলেই এতক্ষণ সময় নষ্ট করছি। তো শোনো বলি—দেখো এত লেখক গজাতে শুরু করেছে যে মনে হচ্ছে এরপর আর দেশে পাঠক বলে আর কেউ থাকবে না। শুধু লেখকই থাকবে।

অতনু বলে ওঠে, কেন? যারা লেখক তারা পাঠক হতে পারে না। তারাই অন্যের লেখা পড়বে?

পড়বে? হ্যা হ্যা হ্যা। এই বুদ্ধি! বলি ময়রায় সন্দেশ খায়? গোয়ালারা দুধ খায়? কাক কাকের মাংস?

হীরক ভুঁড়ি নাচানো হাসির দিকে তাকিয়ে ভাবে, অথচ দশানন এর নাম ডাক। দেশ বিদেশে যায়। শারদীয় সংখ্যা বেরোনো মাত্র উপে যায়। বাজারে পড়তে পায় না। কী করে হয়?

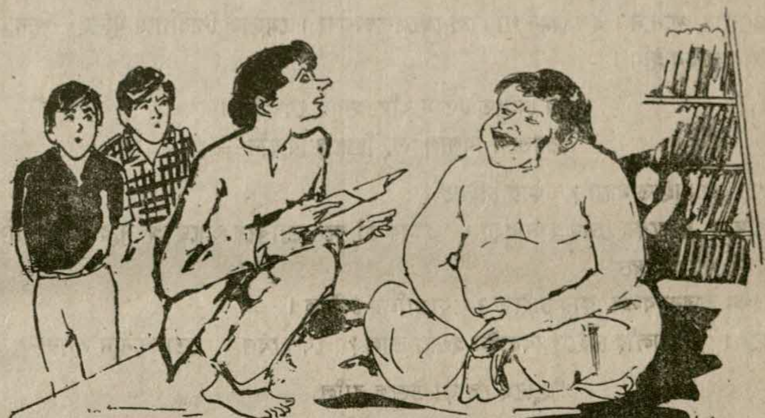
তা যে করেই হোক, হয়। আর তাইতেই না এখানে প্রথম আসা। 'দশাননে' একটা লেখা বেরিয়েছে শুনলে অন্য কাগজ একটু নড়ে চড়ে বসবে। কিন্তু এত অপমানেব পর আর থাকা যায় না। বলে ওঠে, আচ্ছা আসি। আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম। দুজনেই হাত জোড় করল।

আর স্বর্ণকমল সঙ্গে সঙ্গে হাতের পাখাখানা পাশে ফেলে রেখে বলে উঠলেন, আরে বাস! পোলাপানদের মেজাজ দেখছি বড় গরম। বসো। বসো! তো নতুন লেখকদের লেখা দৈনিক এক বস্তা করে জমে কিনা। তাই এই ব্যবস্থা।

অতনু বলে উঠল, জমিয়ে তোলা হয় বলেই জমে। পড়ে দেখলে হয়তো এতো জমতো না।

অ, তার মানে ছাপা হতো? সে যোগত্য থাকে?

আমি তো তাই মনে করি।
হীরকও এসময় ফস করে বলে উঠল, সব লেখকই তো এক সময় 'নতুন লেখক' থাকেন। যদি ছাপা না হয় তাহলে 'পুরণো' হবে কী করে?
হ। কথাটায় যুক্তি আছে। তো বলছ যে একবার পড়ে দেখা দরকার?
অতনু জোর দিয়ে বলে হ্যাঁ। নিশ্চয় দরকার। জানেন তো বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' কোনো কোনো সম্পাদক না পড়েই ফেরৎ দিয়েছিলেন। অথচ—
তাই বুঝি? দিয়েছিল বুঝি? কোন কাগজের সম্পাদক দিয়েছিল?
সে শুনে লাভ কী? ঘটনাটা সবাই জানে, আপনি জানেন না?



স্বর্ণকমল হঠাৎ গুম হয়ে গেলেন। সবাই জানে, আর তিনি জানেন না। আর সেটা ধরা পড়ল এই দুটো অর্বাচীনের কাছে।
আচ্ছা ঠিক আছে!
হটাৎ সামনের টেবিল থেকে দুটো টেলিফোনের মধ্যে একটা টেলিফোনের ডায়াল করেই রিসিভারটা তুলে নিয়েই বলে উঠলেন, কে? গোবর্ধন। হ্যাঁ। একবার আমার ঘরে চলে এসো। দুটো লেখা পড়তে হবে।···হ্যাঁ—হ্যাঁ। আনকোরা।
মানে এঘর ওঘর টেলিফোন।
একটু পরেই একজন না তরুণ না প্রৌঢ় লোক এসে ঘরে ঢুকল। ফর্সা ধবধবে রং, লম্বা পাতলা চেহারা, পরিষ্কার মুখ কালো চকচকে চুল।·· তার মানে নামকরণ একটা প্রহসন।
স্বর্ণকমল বললেন, এই যে এঁরা। এঁদের লেখা পড়াতে চান। বোসো। ওহো তোমরাও যে দাঁড়িয়ে, বোসো।

টেবিলের এধানে টানা লম্বা একটা বেঞ্চ পাতা, তাতেই বসল গোবর্ধন। অতএব এরাও বসল।

গোবর্ধনের গলাও চেহারার মতই ধারালো।

কী আছে? পদ্য?

হীরক তাড়াতাড়ি বলল এর পদ্য, আমার গল্প।

আহা—আগে পদ্যটাই হয়ে যাক। কই? দেখি।

অতনু ফস করে একটা খোলা কাগজ বার করে দিল কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে।

গোবর্ধন চশমাটা না ফিট করে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরল।

একটু পড়লো। ভুরুটা একটু কোঁচকালো। তারপর হে হে করে হেসে উঠে বলল, ও স্যার, শুনুন। ইস এমন না হলে ছেলে-ছোকরা। মেজাজ টগবগিয়ে ফুটছে—শুনুন কী বলছেন ইনি।

এর চাইতে হতাম যদি আরব বেদুইন।
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন—

তো এর চাইতে মানে? কার চাইতে?

এদিকে হীরকের চোখ ছানাবড়া। হীরক হাঁ করে তাকিয়ে আছে অতনুর মধুর হাসি মাখা মুখের দিকে।

এখন অতনু বলল, কার চাইতে? বাঙালির চাইতে।

হুঃ। বাঙালীর চাইতে বেদুইন হওয়া ভাল? বেশ বেশ। তো শুনুন স্যার—

"ছুটছে ঘোড়া উড়ছে বালি
জীবন স্রোত আকাশে ঢালি
সকল দেহে বহ্নি জ্বালি চলেছি নিশিদিন।"

গোবর্ধন প্রায় লাফিয়ে উঠল, ওরে সর্বনাশ! 'সকল দেহে বহ্নি জ্বালি'—ও কর্তা, এ কবির ধারে কাছে আসাও তো বিপদ। আবার অন্যের গায়েও না আগুন ধরে যায়। কী বলুন, চলবে?

আরে দূর…দূর…

রাম কহো। এরেও আবার কবি বলতে হবে? না বাপু, চলবে না। অচল—অচল!

গোবর্ধন মুচকি হেসে বলে, তো গল্পর নমুনাটিও একটু শুনে নেবেন নাকি? সেটা বুঝি এই এনার? কই দেখি।

হীরক বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, থাক। দরকার নেই। আচ্ছা, তবে একটা কথা স্বীকার করে যাই, এনার কবিতাটি এনার নিজস্ব নয়, টুকে এনেছেন।

আবার সে বিদ্যেও চালানো হয়? তা এমন আগুন জ্বালানো কবিতে আবার কোন মহাপ্রভুর? কোথা থেকে টোকা হয়েছে?

অতনু চোস্ত গলায় বলে, রবীন্দ্র রচনাবলী' থেকে। কবিতাটা রবীনাথেরই লেখা কিনা।
আঁ। আঁ। আঁ।
গোবর্ধন বেঞ্চি থেকে উঠতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে রয়ে যায়। আর স্বর্ণকমল রোদ লাগা কমলের মত নেতিয়ে তাকিয়ায় গড়িয়ে শুয়ে পড়েন।
হীরক কষ্টে হাসি চাপে।
আর অতনু? অতনু এই শোচনীয় অবস্থায় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মারে।
প্যাণ্টের খালি পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে রিভলভার নাড়াচাড়ার ভঙ্গীতে হাতটা একটু নেড়ে নিয়ে বলে, আর একটা কথাও কবুল করে যাই। এই এতক্ষণকার সব কথোপকথন পুরোটা টেপ হয়ে গেছে।
তা—তা—তার মানে?
মানে সঙ্গে সে ব্যবস্থা ছিল। এখন বুঝুন।
গো—বো—র্ধন!
স্যার!
বুঝতে পারছো?
পারছি। ব্ল্যাকমেল।
অ্যাই চোপ! ভদ্র সন্তানদের সম্পর্কে যা-তা কথা? আটকে যেন এনাদের।
আটকে?
বাঃ, তা আটকাতে হবে না? শরববৎ আসবে না? চা আসবে না? রাজভোগ? কড়াপাক? খাস্তা নিমকি?
আর তারপর হীরকের তিনটে গল্পই তক্ষুণি নগদ দাম দিয়ে কিনে নিতে হবে না?···
সে তো হলোই। তাছাড়া অতনুর কবিতার খাতাকে আগাম বুক করাও হয়ে গেল।
তারপর?
তারপর কবি অতনু বোস আর সাহিত্যিক হীরক রায়ের জমজমাটি রমরমা। প্রতিমাসে 'দশাননে' তাঁদের লেখা দেখা যাচ্ছে। আবার তার সঙ্গে দারুণ দারুণ প্রশংসা যুক্ত সমালোচনা, এবং মাসে মাসে 'চিঠিপত্র বিভাগে' পাঠক পাঠিকাদের আবেদন···তাঁদের লেখা আরো বেশী করে ছাপা হলে ভাল হয়।
তাছাড়া শুধুই তো 'দশাননে' নয়, দশদিক থেকেই যে চাহিদা। হীরক রায়ের অতনু বোসের লেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা।
তবে সাপ্লাই দিতে অসুবিধে নেই। দেরাজ ভর্তি এবং খাতার বস্তা ভর্তি তো মজুৎ আছে। শুধু কি তাই? সেই একদার 'চতুর্ভুজ?' সেও তো এখন তার অলঙ্করণ সমেত 'দশাননের' 'কচি-কাঁচাদের আসরে' ছাপা হয়ে চলেছে।
অসুবিধে কিছু নেই। যথাযথ রেখেই 'জেরক্স' করে নিয়ে নিয়ে—
ওরা কী তখন স্বপ্নেও ভেবেছিল একদিন খাতা থেকে বেরিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে।···কলকাঠির মাহত্ম্যে কী না হয়!



ক্রিং-ক্রিং···ক্রিং-ক্রিং···ক্রিং-ক্রিং···

বীরেশবাবু বিরক্ত হয়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার দিকে দেখলেন। টেলিফোনের পাশেই ঘড়ি, তাতে বারোটা বাজে। রাত বারোটা। বীরেশবাবু সবে হাতের বইটা বন্ধ করে ঘরের বাতিটা নেবাতে যাচ্ছিলেন। এদিকে টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। বীরেশবাবু রিসিভারটা তুলে নিলেন।

'হ্যালো—'

'ফোর সিক্স ফাইভ ওয়ান সেভেন সিক্স?'

'ইয়েস—'

'বীরেশবাবু আছেন? বীরেশ চন্দ্র নিয়োগী?'

'কথা বলছি।'

'ও। নমস্কার।'

'নমস্কার।'

'এত রাত্রে ফোন করছি বলে কিছু মনে করবেন না।'

'ঠিক আছে। কী ব্যাপার?'

'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

'আপনি কে বলছেন জানতে পারি কি ?'

'আমার নাম গণপতি সোম।'

বীরেশবাবুর বিরক্তিটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, 'কিন্তু এখন ত কথা বলার সময় হবে না। আমি শুতে যাচ্ছিলাম। আর, তাছাড়া আপনাকে ত চিনিও না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনার পেশা ডাক্তারি। তিন মাস হল এই বাড়িতে এসেছেন। আগের বাড়িতে আগুন লেগে প্রচুর ক্ষতি হয়। তাই আপনাকে এখানে উঠে আসতে হয়। আপনার স্ত্রী গত হয়েছেন আজ এগার বছর হল। আপনার বয়স পঞ্চান্ন। আপনার একটি ছেলে আছে—ইঞ্জিনীয়ার—সে ভূপালে থাকে। কেমন, ঠিক বলিনি ?'

বীরেশবাবু যারপরনাই বিস্মিত হলেন। বললেন, 'আপনি এত কথা জানলেন কি করে ?'

'ধরে নিন এটা আমার একটা বিশেষ ক্ষমতা। এখন বলুন আপনি আমার কথাগুলো শুনতে চান কিনা।'

'বেশি সময় লাগবে না ত ?'

'না। অবিশ্যি কথার পর যদি কথোপকথন চলে তাহলে কিছুটা সময় লাগতে পারে।'

'ঠিক আছে। বলুন।'

'আজ থেকে সাত বছর আগের কথা বলছি। আমার পেশা ছিল ওকালতি। আপনি সেই সময় মুক্তরামবাবু স্ট্রীটে থাকতেন, তাই নয় কি ?'

'ঠিকই বলেছেন।'

'আপনার ছেলের নাম অরূপ।'

'হ্যাঁ।'

'সে তখন সিটি কলেজে পড়ত।'

'হ্যাঁ।'

'এটাও আপনি জানেন কিনা দেখুন—আপনার ছেলের একটি বন্ধু ছিল, নাম শ্রীপতি।'

'তা হতে পারে। ছেলের বন্ধুদের খবর আমি সব সময় রাখতাম না।'

'এই শ্রীপতি ছিল আমার মেজো ছেলে। খুব ভালো ছেলে ছিল—যেমন পড়াশুনায়, তেমনি স্বভাব-চরিত্রে। তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আপনার ছেলে অরূপ। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ছেলে কুসঙ্গে পড়ে। তার ফলে ক্রমে তার মধ্যে অনেক বদ অভ্যাস দেখা দেয়। অরূপ অনেক চেষ্টা করেছিল তাকে বুঝিয়ে বলে এই কুসঙ্গ ত্যাগ করাবে, কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি। অথচ শ্রীপতির উপর থেকে অরূপের টান যায়নি। অরূপ বদ্ধপরিকর ছিল যে শ্রীপতিকে আবার সৎপথে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু তার চেষ্টা বৃথা হয়। এসব কি আপনার জানা ?'

'অরূপের এই বন্ধুকে আমি দেখেছি, কিন্তু সে যে কুসঙ্গে পড়েছিল সেটা জানতাম না।'

'এবার একটা দুর্ঘটনার কথা বলি। আমার ছেলেকে জুয়ার নেশায় ধরে। সে রেসের মাঠে যেতে শুরু করে। তার ফলে তার অনেক হার হয়, এবং বিস্তর দেনা হয়ে যায়। তখন সে অরূপের কাছে হাত পাতে। বলে তাকে উদ্ধার না করলে আত্মহত্যা ছাড়া তার আর গতি নেই। অরূপ তাকে সাহায্য করে কীভাবে সেটা আপনি জানেন কি?'

'এখন বুঝতে পারছি।'

'কী বুঝছেন?'

'আমার বাড়িতে সিন্দুকে একটা অতি মূল্যবান জিনিস ছিল। এটা আমার ঠাকুরদার সম্পত্তি। একটা হীরের আংটি।'

'হ্যাঁ। আপনার ঠাকুরদাদা ছিলেন চণ্ডীপুর স্টেটের রাজার গৃহচিকিৎসক। রাজাকে একবার দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন বলে রাজা খুশি হয়ে তাঁকে এই আংটিটি দেন। ঠিক বলিনি?'

'ঠিক।'

'এই আংটিটি সিন্দুক থেকে বার করে আপনার ছেলে আমার ছেলেকে দিয়ে দেয়।'

'আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা এই আংটি অন্তর্ধান রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারিনি। পুলিশও পারেনি।'

'পারবে কি করে? আপনার ছেলে এত ভালো, তাকে আপনারা সন্দেহ করবেন কি করে?'

'তাত বটেই।'

'সেই আংটি কিন্তু আমার ছেলের কাছেই থেকে যায়। আংটিটা তার এত ভালো লাগে যে সেটা সে হাতছাড়া করতে চায় না। শেষটায় আমি ছেলের অবস্থা জানতে পেরে মহাজনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তার দেনা শোধের ব্যবস্থা করি।'

'সেই আংটি কি এখনো আপনার ছেলের কাছেই আছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেটা সে আপনাকে ফেরত দিতে চায়। তার আংটির সখ মিটে গেছে। আংটি ফেরত দিয়ে সে কলঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। তাছাড়া আপনার ছেলের মনেও একটা গ্লানি রয়েছে, সেটাও দূর করা দরকার।'

'আপনার ছেলে কি আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?'

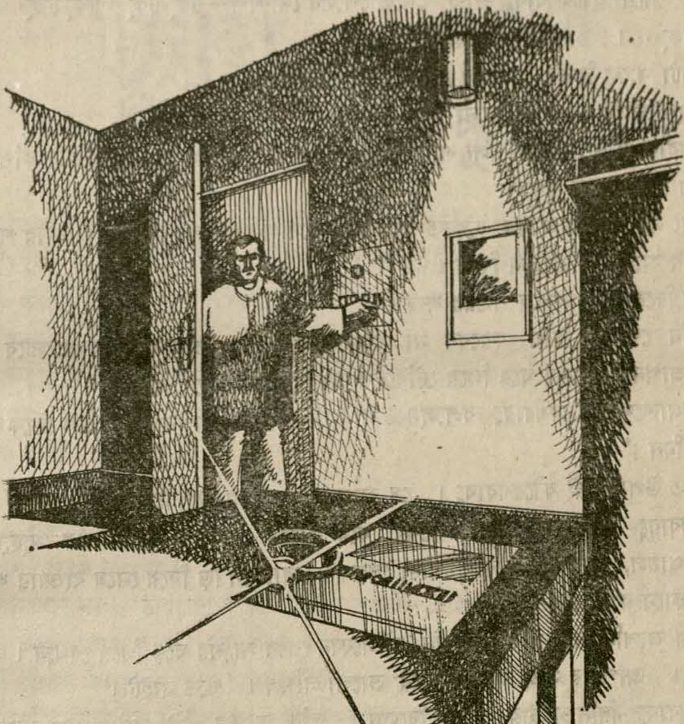
'হ্যাঁ—এবং এখনই। সে রওনা হয়ে গেছে। এতক্ষণে সে প্রায় আপনার বাড়ি পেঁছে গেছে।'

'তার নাম যেন কী বললেন?'

'শ্রীপতি।'

'আর আপনার নাম গণপতি?'

'হ্যাঁ।'
'আপনাদের নাম কি সম্প্রতি খবরের কাগজে বেরিয়েছে ?'
'তা বেরিয়েছে।'
'দাঁড়ান, মনে করতে দিন।'
'করুন। সময় নিন।'



বীরেশবাবুর একটু ভাবতেই মনে পড়ল। বললেন, 'মনে পড়ছে। কালকের কাগজেই বেরিয়েছে আপনাদের নাম। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে একটা গাড়ি আর লরিতে সংঘর্ষের ফলে গাড়ির তিনজন যাত্রী তৎক্ষণাৎ মারা যান। তার মধ্যে একজন গাড়ির চালক, আর দুজন বাপ ও ছেলে—নাম গণপতি সোম আর শ্রীপতি সোম।'
'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমিই সেই গণপতি সোম।'
'আ-আপনি··· তার মানে···'

'তার মানে আপনি যা ভাবছেন তাই।'

'কিন্তু এ যে অসম্ভব!'

'কেন অসম্ভব হবে? দেখুন ত আপনি কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কিনা।'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি।'

'কী শব্দ?'

'কে যেন আমার নীচের দরজায় ঠোকা মারছে।'

নিস্তব্ধ রাত্রে বীরেশবাবু স্পষ্ট শুনতে পেলেন সে শব্দ—টক্-টক্…টক্-টক্… টক্-টক্-টক্…। তারপর টেলিফোনে শুনলেন—

'দরজাটা খুলে দিন। আমার ছেলে অপেক্ষা করছে।'

'না না—আমি দরজা খুলব না।'

বীরেশবাবু বুঝলেন তাঁর গলা শুকিয়ে আসছে। তাঁর ডান হাতে রিসিভারটা কাঁপছে। আবার টেলিফোনে কথা—

'দরজা না খুললেও সে ঢুকতে পারবে। সে ক্ষমতা তার আছে। এবার শুনুন ত কোন আওয়াজ পাচ্ছেন কিনা।'

'সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে পায়ের শব্দ।'

'আপনি কোনো চিন্তা করবেন না বীরেশবাবু। সে আপনাকে বিরক্ত করবে না। শুধু আপনার পাশের ঘরে গিয়ে টেবিলের উপর রেখে আসবে আংটিটা।'

চরম আতঙ্কে বীরেশবাবু বললেন, 'না না—আপনি আপনার ছেলেকে ডেকে নিন, ডেকে নিন!'

'তার ত উপায় নেই বীরেশবাবু। সে আপনার দোতলায় পেঁছে গেছে।'

বীরেশবাবু স্পষ্ট শুনলেন পাশের ঘরে পায়ের শব্দ। শব্দটা এক মুহূর্তের জন্য থামল, তারপর আবার শোনা গেল। এবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার শব্দ। টেলিফোনে কথা এল—

'এবারে আপনি নিশ্চিন্ত। আপনি টেলিফোন রেখে পাশের ঘরে গিয়ে দেখুন। আমি আসি। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভালো লাগল। গুড নাইট।'

বীরেশবাবু রিসিভারটার রেখে দিলেন। তাঁর কপাল এই পৌষ মাসেও ঘর্মাক্ত। কিছুক্ষণ বিছানায় চুপ করে বসে থেকে তিনি উঠলেন। অতি সন্তর্পণে এগিয়ে গিয়ে পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকে বাতিটা জ্বালালেন।

হ্যাঁ, সত্যিই পড়ে আছে টেবিলের উপর। এই অল্প আলোতেও ঝলমল করছে তার দ্যুতি—সাত বছর পরে ফিরে পাওয়া তাঁর ঠাকুরদাদার হীরের আংটি।

———

অলৌকিক ছুরি



পূর্ণেন্দু পত্রী

গরম তেলে পাঁচ ফোড়নের মত বিড়বিড়িয়ে উঠলেন একদিন শঙ্কুর মা।

—হ্যাঁরে, সামনে পরীক্ষা। অথচ হোহো টোটো করে দিন কাটাচ্ছিস। গত বছর ফেল করতে করতে পার পেয়ে গেছিস কোনো রকমে। এবারে কী ফেল না করে ছাড়বি না।

—বাঃ রে, কেউ আবার ইচ্ছে করে ফেল করে নাকি ?

—তাহলে মন দিয়ে পড়াশোনা আর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর যেন পাশটা করতে পারি।

—ঠাকুর কে ?

—ঠাকুর মানে ভগবান। তাঁর কাছে এক মনে চাইলে মানুষ যা চায় সব পায়।

—তুমি পেয়েছ কখনো।

—কেন পাব না। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলাম হে ঠাকুর, তিন তিনটে মেয়ে দিলে। এবার একটা কোল আলো করা ছেলে দাও। তারপরই তো তুই হলি।

শঙ্কু মায়ের কথাটা মাথায় নিয়ে সেদিন সন্ধ্যে থেকেই বসে যায় বইপত্র নিয়ে পড়তে। কিন্তু বেশিক্ষণ পড়তে পারে না। অল্প স্বল্প পড়ার পরেই ঘুমে ঢুলে পড়ে মাথাটা। সামনে হ্যারিকেন। একবার তো হ্যারিকেনের উপরই উপুড় হয়ে যায় মাথাটা। আর একটু হলে পুড়ে যেত মুখটা। ঘুম পাওয়ার কারণ ছিল অবশ্য। ফুটবল খেলেছে সারা বিকেল, স্কুলের মাঠে। খেলার ধকলেই শরীরে ক্লান্তি।

শঙ্কুর মা খানিকটা খুশি হয়েছিলেন ছেলের পড়তে বসা দেখে। এখন ঘুমে ঢলে-ঢলে পড়া দেখে আবার বিরক্ত।

—এই তোর পড়া হচ্ছে। বইয়ে-মুখে হতে না হতেই ঘুম ?

শঙ্কু ধড়ফড়িয়ে আবার পড়া শুরু করে। কিন্তু পারে না। ঘুম তাকে যেন কুমীরের হাঁ দিয়ে গিলে ফেলে। শঙ্কুর মা রেগে বলেন—

—যা, আর পড়তে হবে না আজ। আজকের মত ছুটি দিলাম। কাল যেন এ ন না হয়। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়। ভোর ভোর উঠে পড়তে বসবি।

খেয়ে-দেয়ে শুকু তার শোবার ঘরে শুতে গিয়ে তখুনি শুয়ে পড়ে না। আলো-নেভানো ঘরে বিছানায় বসে দুহাত জড়ো করে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে যায় এক মনে।

—হে ঠাকুর, রঘুর ছুরি আছে, ভাকুর ছুরি আছে, দামুর ছুরি আছে, মিলনের ছুরি আছে, মধু—হীরু—শানু—বকু সকলের ছুরি আছে, আমার নেই। বাবাকে বললেও কিনে দেয় না। ছোট ছেলেদের নাকি ছুরি রাখতে নেই। তুমি আমাকে একটা ছুরি দেবে ঠাকুর? আমি ছুরি দিয়ে কাউকে মারবো না। তবে যদি অন্যায় ঘটে, তাহলেই ব্যবহার করবো শুধু। বাকি সময় পেনসিল কাটবো, কাগজ কাটবো, পেয়ারা কাটবো, আমলকি কাটবো আর গুলতি বানাবো।

পরের দিন সকাল। শুকু চলেছে স্কুলে। রোজ যে রাস্তা দিয়ে যায় আজ সে রাস্তায় গেল না।

কাল খেলার সময় তুমুল ঝগড়া হয়ে গেছে ভাকুর সঙ্গে। হ্যাণ্ডবল করেও স্বীকার করতে চায় নি। তাই নিয়ে চেঁচামেচি। মারামারি হওয়ার মত। ভাকু রেগে গিয়ে পকেট থেকে ছুরিও বের করেছিল প্রতিপক্ষদের মারবে বলে। শেষ পর্যন্ত রক্তারক্তি হয় নি। রোজ যাওয়ার রাস্তা দিয়ে গেলে যেতে হবে ভাকুর বাড়ির সামনে দিয়ে। তখন হয়তো দেখা হয়ে যেতে পারে ভাকুর সঙ্গে। শুকুর দল ঠিক করেছে ভাকুকে বয়কট করবে পুরোপুরি। কথা বলবে না। খেলতে ডাকবে না। মিশবে না। সেইজন্যে অন্য রাস্তা।

কামারশালার কাছে বিরাট তেঁতুলগাছ। তলাটা ছায়ায় কালো। শুকু কামারশালার কাছাকাছি পেঁছবার মুখে দেখতে পেল তেঁতুলগাছের তলায় একটা কাঁচা তেঁতুল খসে পড়ে আছে। অবাক হল সে। এখন তো তেঁতুল ফলার সময় নয়। অথচ সোনার মত চকচক করছে একটা লম্বা কাঁচা তেঁতুল। তেঁতুলটা তুলবে বলেই সে এগিয়ে চলল গাছটার দিকে। পড়ে-থাকা তেঁতুলটা তুলতে গিয়ে চমকে উঠল সে। বিস্ময়ে চোখ দুটো কোঠর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসে বুঝি। কী দেখছে সে? একী সত্যি? সোনার বাঁটওলা একটা লম্বা ছুরি তার সামনে। তাহলে কী সত্যিই ঠাকুর প্রার্থনা মঞ্জুর করল তার? ছুরিটা তুলে নিয়ে বইয়ের ব্যাগে ভরে নিয়ে স্কুলের দিকে হাঁটা দিল যখন, তার বুকের মধ্যে গাজনের বাজনা।

স্কুলের ছুটির পর আবার খেলার শুরু। ভাকুকে বাদ দিয়েই দল তৈরি। খেলা শুরু হবে হবে। লাটু মুখে হুইসেল নিয়ে রেফারি হয়ে রেডি। এমন সময় ভাকু তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লাটুর সামনে এসে দাঁড়াল।

—ভাকুকে বাদ দিয়ে খেলা চলবে না।

লাটু মুখ থেকে হুইসেল নামিয়ে গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে—নিতে পারি ও যদি কালকের ঘটনার জন্যে ক্ষমা চায়।

—ক্ষমা চাইবে কেন? দোষ করলে তো ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন। ও কী দোষ করেছে শুনি। হ্যাণ্ডবল করে নি, তবুও জোর করে হ্যাণ্ডবল করেছে বলে তাকে মারতে আসতে বরং দোষ হয়েছে তোদের।

—আমি রেফারি। কে হ্যাণ্ডবল করেছে, না করেছে সেটার বিচার করব আমি। বাইরের লোকের তা বিচার করার রাইট নেই।

—এর ফল কিন্তু ভালো হবে না বলছি?



—কি হবে? তোরা কি দল বেঁধে মারামারি করতে এসেছিস নাকি?

—মারামারি করতে আসি নি। তবে ভাকুকে গায়ের জোরে বাদ দিয়ে খেলা শুরু করলে বাধ্য হয়েই মারামারি করতে হবে।

—তাই নাকি? এ্যাই কে আছিস আমার হকি স্টিকটা নিয়ে আয় তো।

—হকি স্টিক দিয়ে আমাদের পেটাবে? সে সুযোগ পাবে কি?

তখুনি যেন হিন্দী সিনেমার একফালি দৃশ্য। ভাকু আর তার পাঁচ বন্ধু গোল হয়ে ঘিরে ফেলল লাটুকে। প্রত্যেকের হাতেই খোলা ছুরি। লাটুর মত ডাকাবুকো ছেলেও ভয় পেয়ে ভ্যাবাচেকা। মাঠের খেলোয়াড়রা ভয়ে জড়োসড়ো। কি হয়! কি হয়!

শুকু গোলকিপার। ইঁটের গোলপোষ্ট। সেই জমানো ইঁটের কাছে একদিকে তার

স্কুলের ব্যাগ। হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় আজকেই কুড়িয়ে পাওয়া সোনালী বাঁটের ছুরিটার কথা। সে দ্রুত তার ব্যাগ থেকে ছুরিটা বের করে দৌড়ে যায় মাঠের মাঝখানে। ছুরিটা ছুঁড়ে দেয় লাটুর হাতে। লাটু ক্রিকেটের ক্যাচ ধরার মত লুফে নেয় ছুরিটা। আর কোথায় কি একটা চাপ দিয়ে টিপতেই ছুরির বাঁটের ভিতর থেকে সড়াৎ বেরিয়ে এল একটা লম্বা ফলা। ছুরির ফলার মতই আকৃতিতে। কিন্তু আগুনের মত টকটকে লাল। যেন আগুন দিয়ে তৈরি। ওরকম ছুরি শঙ্কু তো শঙ্কু, শঙ্কুদের গ্রামেরও কেউ কোনদিন দেখেনি। তাকালেই মনে হয় কামারশালার গরম লোহার পাত। ঐ ছুরি দেখামাত্রই ভাকুর দলের দে দৌড়, দে দৌড় চম্পট।

লাটু শঙ্কুর দিকে তাকিয়ে বললে—ওঃ, তোর উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেলাম। ভাগ্যিস সময় মত ছুঁড়ে দিয়েছিলি ছুরিটা। কিন্তু এ ছুরি তুই পেলি কোথায়? তোর তো ছুরি ছিল না কোনদিন।

শুধু মিথ্যে করে বললে—

—বাবা এনে দিয়েছেন কলকাতা থেকে।

—কলকাতা থেকে? কলকাতায় এরকম ছুরি পাওয়া যায় শুনি নি তো কখনো?

সেই সময় এগারো এগারো বাইশজন খেলোয়াড় লাটুকে ঘিরে। কেউ কেউ বায়না ধরলে তারা আবার দেখবে ছুরির আগুনে ফলাটা। দূরে ছিল বলে অনেকে দেখতে পায় নি। লাটু ছুরিটার বোতাম টেপে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে লম্বা ফলা। কিন্তু সে ফলা লাল নয় আদৌ। সাধারণ ছুরির ফলা যেমন হয় তেমনিই। লাটুর চোখ উঠে যায় কপালে।

—এ কী রে! এ যে দেখি অলৌকিক ছুরি! একটু আগে গনগনে আগুন দেখলাম। কোথায় গেল সে আগুন?

শঙ্কুও অবাক। অবাক হলেও সে বুঝতে পারছে কারণটা। ঠাকুরের দেওয়া ছুরি তো। তাই হয়তো এরকম। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়ার কথা কাউকে বলে না। বললে সকলেই তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে পেয়ে যাবে এই রকম সব ছুরি।

বাড়িতে ফিরে ছুরির কথা কাউকে বলে না শঙ্কু। নিজে ভয়ে ভয়ে হাত দেয় না ছুরিতে। লুকিয়ে রাখে বইয়ের পিছনে। যদিও মাঝে মাঝেই প্রবল ইচ্ছে করে ছুরিটা হাতে নিয়ে বোতাম টিপে দেখতে। যদি আবার বেরিয়ে আসে আগুনের ফলা।

তিন চার মাস পরের কথা।

ডাকাত পড়ল শঙ্কুদের পাশের বাড়িতে। প্রথমে বোমার আওয়াজ পর পর কয়েকটা। বোমা ফাটিয়ে পাড়াপড়শীকে ভয় দেখানো। যাতে কেউ না এগিয়ে আসে লাঠি-সোটা নিয়ে। বোমার শব্দেই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় শঙ্কুদের বাড়ির সকলের। সেদিন রবিবার। শঙ্কুর বাবাও বাড়িতে। শঙ্কুর মা অন্ধকারে হ্যারিকেন জ্বালতে চাইলে শঙ্কুর বাবা বারণ করে।

—আলো জ্বালতে হবে না। আজকালকার ডাকাতরা ফেরোসাস। আমরা আলো জ্বেলেছি দেখে হয়তো আমাদের উপরেই হামলা করবে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ শঙ্কুদের বাড়ির উঠোনের দিকটা আলোয় আলো। তারপরে আবার অন্ধকার। বারণ করা সত্ত্বেও আলো জ্বালানো হয়েছে দেখে শঙ্কুর বাবার বিকট চিৎকার। শঙ্কুর মা বলেন—

—কই আমি তো জ্বালাই নি কিছু। শঙ্কু জ্বালালো নাকি?

শঙ্কুর শোবার ঘরে গিয়ে দেখা গেল শঙ্কু নেই। শঙ্কুর বাবা মা কাঠ। তাহলে আলো জ্বালিয়ে ডাকাতদেরই কেউ এসে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল নাকি শঙ্কুকে? কান্নায় ফেটে পড়ার মত অবস্থা। তবুও ডাকাতদের ভয়ে কাঁদতে পারেন না কেউ। শোকার্ত হয়েও অন্ধকার বিছানায় বসে থাকেন চুপচাপ আর চোখের জল ফেলেন নীরবে। তাঁদের কান্না শুনে শঙ্কুর বোন কাঁদে। বাড়ির ঝি-চাকর সকলেই ফোঁসফোঁস। একটু পরেই হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে বিকট চিৎকার। শঙ্কুর বাবা মা শিউরে ওঠেন। বোধহয় পাশের বাড়ির লোকজনদের খুন করছে ডাকাতরা। আরও একটু পরে বিকট চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হাঁক-ডাক। এমন কি কেউ যেন গলা ছেড়ে ডাকছে শঙ্কুর বাবাকে। শঙ্কুদের অন্য পাশের বাড়ির ভূষণবাবু যে। বাইরে এসে শঙ্কুর বাবা দেখতে পান পাশের বাড়ির ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আলো। আর বাড়ির লোকজন দৌড়-ঝাঁপ করছে উপরে নীচে। সাহস পেয়ে শঙ্কুর বাবা বাড়ি থেকে বেরোন শঙ্কুর মা-এর জ্বেলে-দেওয়া হ্যারিকেন হাতে। ক্রমে অন্যান্য আরো সব পাড়াপড়শীরাও দল বেঁধে ডাকাত-পড়া বাড়ির দিকে। বাড়ির উঠোনে গ্রামের মানুষ জমা হয়ে দেখল যমদূতের মত তিনটে ডাকাত আধমরার মত শুয়ে আছে একতলার বারান্দায়। তাদের মাথায় লাল ফেটি আর হাতের খড়্গ ছড়িয়ে পড়ে আছে এখানে সেখানে। বাড়ির কর্তা বংশীবাবু ও বড় ছেলে মাখন সকলের সামনে এসে দাঁড়ালে লোকের মুখে উৎকণ্ঠ জিজ্ঞাসা—

—কি করে ধরা পড়ল এরা?

—কিছুই বুঝলাম না। আমাদের তো আটকে রেখে দিয়েছিল ঘরে। ভিতরে আটকে থেকেও যেটুকু বুঝতে পেরেছি, কোথা থেকে প্রচণ্ড একটা আলো এসে ঢুকল আমাদের বাড়িতে। তারপরেই ডাকাতদের ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার। আর কে যেন এসে খুলে দিল আমাদের দরজা। আমরা বাইরে বেরিয়ে আর দেখতে পেলাম না সে আলো।

এই সময় ভিড়ের ভিতর থেকে সামনে এগিয়ে এল লাটু। সে বললে—

—আমি জানি কি ঘটেছে ঘটনাটা।

—তুই কি করে জানবি। তুই কি তখন ছিলি এখানে?

—না থাকলেও বুঝতে পারছি সবটা। ডাকাতদের কাৎ করেছে শঙ্কু।

—শঙ্কু? ঐটুকু ছেলে শঙ্কু কি করে কাৎ করবে এই রকম ষণ্ডামার্কা তিনজনকে। কিন্তু শুধু তো তিনজনই আসে নি। বাকি সাকরেদ পালিয়েছে ডাক ছেড়ে। তবে এই তিনজন যে আসল সেটা বোঝা যাচ্ছে বেশ।

সকলের চেয়ে অবাক হয় শঙ্কুর বাবা।

—বল কি? শঙ্কুতো পয়লা নম্বরের ভিতু। এত ভিতু যে অনেকবার চেয়েছে, তবুও ওকে একটা ছুরি পর্যন্ত কিনে দিই নি কখনো। পাছে ভয় পেয়ে নিজেই না কেটে বসে নিজের হাত পা।

লাটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—

—আপনি কিনে দেন নি ছুরিটা? তাহলে ঐ অলৌকিক ছুরিটা পেল কোথায়?

—ছুরি? অলৌকিক ছুরি? আমি কিনে দিয়েছি? কি বলছ তুমি?

—আজ্ঞে নগেন কাকা, ঠিক বলছি আমি। এই ডাকাতরা যে কাৎ হয়েছে সেটা শঙ্কুর অলৌকিক ছুরিতেই। ছুরিটার মজা হল, এমনি সময় খুললে ফলাটা দেখা যাবে সাধারণ। কিন্তু কোনো অন্যায়ের প্রতিবিধানে খুললে তার ফলা থেকে আগুন ঠিকরোয়।

—তাই নাকি? পৃথিবীতে আছে নাকি এরকম ছুরি? থাকেও যদি, শঙ্কু পেল কোথায়? ডাকাত-পড়া বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরেই শঙ্কুর ডাক। শঙ্কু উঠে আসে তার বিছানা থেকে।

—পাশের বাড়ির ডাকাতদের কাৎ করেছিস নাকি তুই?

শঙ্কু চুপ করে থাকে। শঙ্কুর মা আঁতকে ওঠেন।

—ওমা সেকি কথা! ও কি করে ডাকাত পাকড়াবে? হ্যাঁরে তোর বাবা যা বলছে সত্যি?

শঙ্কু মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানায়।

—সে কি রে, কি করে?

শঙ্কু তার অলৌকিক ছুরির কথা স্বীকার করে।

—কোথায় পেলি তুই অমন ছুরি?

—তুমি বলেছিলে ঠাকুরের কাছে এক মনে প্রার্থনা করলে সব কিছু পাওয়া যায়। আমি প্রার্থনা করেছিলাম। পরের দিনই কামারশালার কাছে তেঁতুলতলার ছায়ায় কুড়িয়ে পাই এটা। তবে কাউকে বলবে না কিন্তু প্রার্থনার কথাটা। তাহলে সকলেই প্রার্থনা করবে।

—আচ্ছা, তা না হয় করবো না। কিন্তু এবার তুই প্রার্থনা কর যেন ঠাকুর পড়াশোনায় মতি দেয় তোর।

শঙ্কু চলে যাচ্ছিল তার শোবার ঘরে। মা ডাকল।

—হ্যাঁরে, ছুরিটা দেখতে কেমন দেখাবি না আমাদের একবার।

—আনছি।

শঙ্কু চলে গেলে শঙ্কুর মা তার বাবাকে বলে—

—ঐ তখন যে আলো জ্বালালে বলে চিৎকার করে উঠলে তুমি, তখন তাহলে শঙ্কুর ঐ ছুরি থেকেই জ্বলে উঠেছিল আলোটা।

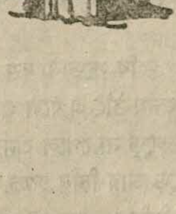
শঙ্কুর বাবা গম্ভীর মুখে বলেন—

—সেটা বুঝতে এতক্ষণ সময় লাগল তোমার?

গল্পটা এখানেই শেষ। তবে এর একটা পুনশ্চ আছে। আসলে বাকি রয়ে গেছে দুটো কথা।

এক, ডাকাত ধরার ব্যাপারে শঙ্কুর দুঃসাহসিকতা আর তার অলৌকিক ছুরির ঘটনা মুখে মুখে রটতে রটতে ছড়িয়ে পড়েছে সারা তল্লাটে। সে এখন তল্লাটের হীরো। রোগা পটকা শঙ্কু এখন বীরত্বের প্রতীক।

দুই, শঙ্কু ছুরি পেল। ছুরি তাকে বিখ্যাত করল। কিন্তু সে ছুরি কোনদিন নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারল না বলে তার মনের মধ্যে চাপ বেঁধে রইল আগেকার সেই ছুরি না-থাকার দুঃখ। অমন অলৌকিক ছুরি থাকা সত্ত্বেও এখনো কাগজ কাটতে, পেয়ারা কাটতে ছুরি চাইতে হয় সকলের কাছে।





গৌড়েশ্বরের গৌড়-বিজয়

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য

আমার গল্পের নায়ক গৌড়েশ্বর। না না, প্রাচীন গৌড় রাজ্য—যা থেকে গোটা বাংলা দেশটাকেই বলা হত গৌড়বঙ্গ, তার সঙ্গে আমাদের গৌড়েশ্বরের কোন সম্পর্ক নেই! সে গৌড়ের রাজাটাজা কেউ নয়, তার আসল নাম মধুকর গৌড়েশ্বর, বাবার নাম সুধাকর গৌড়েশ্বর। অর্থাৎ গৌড়েশ্বরটা তার পদবী। এ রকম অদ্ভুত পদবী কেন হল তা তাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, কারণ ওই পদবীর ইতিহাস মধুকরও জানে না, তার বাবাও জানেন না।

মধুকর ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাসে পড়ত। তখন থেকেই আমরা ওকে মধুকর না বলে গৌড়েশ্বর নামেই ডাকতাম, ফলে শেষ পর্যন্ত ঐ নামটাই বহাল হয়ে যায়।

ঐ নামের একটা কারণও ছিল। কবি সত্যেন দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'তাতারসির গান' কবিতায় লিখেছিলেন—"গুড়ের জনম ঠাঁই এ বলে জগৎ এরে গৌড় বলে।" মধুকর গুড় খেতে খুব ভালোবাসত। গুড় না পেলে অনায়াসে মুঠো মুঠো চিনিও খেয়ে ফেলত। আর, কে না জানে, গুড় আর চিনি হচ্ছে স্বগোত্র! আখের রস থেকেই হয় আখি গুড় আর তাই থেকেই হয় চিনি। কাজেই মধুকরের চাইতে গৌড়েশ্বর নামটাই ওকে মানাত ভালো।

তা যাক, তখন কি আমরা জানতাম পরবর্তী জীবনে ও একটা জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী হবে ? পুরো দশ বছর আমেরিকায় কাটিয়ে নিজের বিষয়ে ধুরন্ধর হয়ে ফিরবে ? যে বিষয়ে নিয়ে গৌড়েশ্বর গবেষণা করেছিল সেটার মধ্যেও একটা নূতনত্ব ছিল। সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্ররা যে সব বিষয় নিয়ে গবেষণা করে ও তার দিকে যায় নি। ওর বিষয় ছিল কীটতত্ত্ব অর্থাৎ পোকামাকড়দের বিজ্ঞান। ইংরেজীতে ওরই নাম এন্‌টমোলজি। তা এনটমোলজিস্ট হিসেবে খুব নাম করেছে ও।

আমেরিকায় পড়বার সময় ওর এক বন্ধু জুটেছিল—তার নাম ডগলাস। অবশ্য পুরো নাম ওটা নয় ; ঐ নামের সঙ্গে আগে পিছে আরও কিছু শব্দ ছিল হয় তো, কিন্তু ডগলাস নামেই ছিল ওর পরিচয়। ডগলাস ছিল এক ধনকুবেরের ছেলে। জাতে আমেরিকান হলেও ওদের বিরাট ভূসম্পত্তি—যাকে জমিদারীও বলা চলে,—ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জেরই কাছাকাছি একটা দ্বীপে—যার নাম গৌড় আইল্যান্ড। নামটা কি করে গৌড় হল কে জানে, তবে সেখানে ছিল ওদের বিরাট আখের চাষ। বিরাট বলে বিরাট ?—কয়েক হাজার একর। ঐ আখ থেকে যে চিনি বেরুত তার দাম যে কত লক্ষ ডলার তা হিসেব করতে হলে কম্প্যুটর লাগবে, কাগজে কলমে হিসেব করতে গেলে হিমসিম খেয়ে যেতে হবে।

দেশে ফিরে এল গৌড়েশ্বর। আর পাঁচটা বিদেশে যাওয়া ছাত্রের মত টাকার লোভে ওদেশেই রয়ে গেল না। আয়ত্ত করা জ্ঞান যদি নিজের দেশের কাজে না লাগে তবে তা শিখে লাভ কি ?—এই ছিল ওর মত। ফলে মাত্র অল্প টাকার বিনিময়ে সে এখানকারই একটা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এণ্টমোলজির অধ্যাপকের পদে যোগ দিল।

যোগ দিল বটে তবে ওদেশের সঙ্গে যে ওর যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল তা বললে ভুল হবে। সময়ে অসময়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নানা সমস্যা মেটাতে ওর ডাক পড়ত এখানে সেখানে। ও যেতেও, টাকার জন্য যত না, তার চেয়ে কাজের আনন্দের জন্য। কোনও একটা সমস্যার মীমাংসা করতে হলে ও তো এক পায়ে খাড়া।

এই রকমই একটা সমস্যা মীমাংসার ডাক পড়ল সেবার। ডাক এল ওরই সেই আমেরিকার বন্ধু ডগলাসের কাছ থেকে।

ডগলাসদের সেই গৌড় আইল্যান্ড বা গৌড় দ্বীপে হাজার হাজার একর জুড়ে আখের চাষের কথা তো আগেই বলেছি। হঠাৎ নাকি সেখানে দেখা দিয়েছে এক অদ্ভুত পোকা। ছোট্ট ছোট্ট সাদা সাদা পোকা, লম্বায় বড় জোর এক ইঞ্চি হবে, মাথার দিকটা একটু বাদামী। এই পোকার দল এসে ঢুকে পড়েছে আগের ভিতর। কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে আখের সব রস। শুধু তাই নয়, আখের ভিতর ঢুকে গিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধছে—সেখানেই হচ্ছে ওদের বাচ্চা-কাচ্চা। আর বাচ্চাগুলোও তেমনি, দু-তিন দিনের মধ্যেই বেড়ে, সাবালক হয়ে, শুরু করে দিচ্ছে রস খাওয়ার কাজ। আর সংখ্যার দিক দিয়ে ? লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি পোকা। জন্মাচ্ছে রক্তবীজের মত। কার সাধ্য

তাদের হাত থেকে আখ গাছগুলোকে রক্ষা করে ? দশটা মারলে এগিয়ে আসে একশটা, একশটা মারলে এগিয়ে আসে হাজারটা।

ডগলাস নানা ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিল এত দিন। প্রথমটা ঐ পোকা মারার জন্য আখের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল বিষাক্ত অষুধ। তাতে কিছু পোকা মরলেও আখ-গুলোও সঙ্গে সঙ্গে এত বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছিল যে তার রস খাওয়া মানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করা।

ওষুধে কাজ হবে না বুঝে ওরা তখন পোকাগুলোকে লোহার শলা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করে এনে আগুনে পুড়িয়ে দিতে লাগল। কিন্তু তাতে কি ঐ কোটি কোটি পোকা মারা সম্ভব ? কয়েক মাস পরে দেখা গেল পোকা হয়তো মরেছে কয়েক লাখ, কিন্তু ইতি মধ্যে নতুন করে দেখা দিয়েছে কয়েক কোটি নতুন পোকা।—নতুন শয়তানের দল।

উপায়ান্তর না দেখে ডগলাস শেষ পর্যন্ত ডাক দিয়েছে অগতির গতি তার হারানো বন্ধু গৌড়েশ্বরকে। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও যেমন গভীর, তার ওপর ওর আস্থাও তেমনি অগাধ।

প্লেন ভেসে চলেছে প্রশান্ত মহাসগরের বুকের ওপর দিয়ে! চার্টার করা ছোট্ট প্লেন, কেন না এসব ছোটখাট দ্বীপে কোনও এয়ার সার্ভিস নেই, নেই কোনও রানওয়ে। তবে সমুদ্রের ধারে বালির আস্তর ছড়িয়ে আছে বেশ শক্ত জমাট হয়ে। ধীরে ধীরে তার ওপর ছোটখাট প্লেন নামানো কঠিন নয়। অবশ্য হাওয়াই দ্বীপে নেমে এটুকু পথ জাহাজে করেও আসা যায় কিন্তু ডগলাস অতটা সময় নষ্ট করতে রাজী নয়।

যথা সময়ে গৌড় আইল্যাণ্ডে নেমে পড়ল গৌড়েশ্বর। দেখে সে তো অবাক। যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু আখের ক্ষেত। মাইলের পর মাইল জীপে করে এগিয়েও ঐ একই দৃশ্য। কিন্তু আখগাছগুলো কোনটাই সতেজ নেই। দেখেই বোঝা যায় বেশ উঁচু জাতের আখগাছ। কিন্তু কারা যেন তাদের ভিতর থেকে সমস্ত রস উজার করে শুষে নিয়েছে।

গৌড়েশ্বর এক জায়গায় জীপ থামিয়ে আখগাছগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। ডগলাস সঙ্গেই ছিল, সে দেখিয়ে দিল—'ঐ দেখ সাদা শয়তানগুলো বেরিয়ে পড়েছে।' গৌড়েশ্বর দেখল সাদা সাদা ছোট ছোট কতকগুলি পোকা, মাথায় বাদমী টুপি পরা যেন! সে সন্তর্পণে তার পোকা ধরা যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকটা পোকা তুলে নিল। তারপর একটা ছুঁচলো ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখতে লাগল আখগুলো। এঃ, এ যে ভিতরেও কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা!

"চল এবার তোমাদের চিনির ফ্যাক্টরীটা দেখে আসি।"—বলল গৌড়েশ্বর।

"কি আর দেখবে ? বড় বড় যন্ত্রপাতি আর অঢেল সরঞ্জাম। কিন্তু সব অকেজো হয়ে পড়ে আছে।"

"তা থাক, ফ্যাক্টরী যখন তখন সঙ্গে একটা ছোট খাট ল্যাবরেটরীও আছে নিশ্চয়ই ?"

"ছোটখাট কেন, বেশ বড়সড়ই। বেশ কিছু দক্ষ অ্যানালিস্টও আছে, কিন্তু এখন সবাই বসে, কাজ নেই কারও।"

"তা না থাক, আমিই একটু কাজ করব। একটা ভালো মাইক্রস্কোপ আছে নিশ্চয়ই? আর কিছু কিছু কেমিক্যাল্স্—আমরা যাকে বলি রি-এজেন্টস্—তাও নিশ্চয়ই আছে? অবশ্য আমার ঐ বড় কাঠের বাক্সের মধ্যেও কিছু আছে। ওটা আমার সব সময়কার সঙ্গী।"

ল্যাবরেটরীতে ঢুকে গৌড়েশ্বর বেশ কয়েক ঘণ্টা কাজ করল। তারপর বলল, "এখানে আখগাছ ছাড়া আর কোনও গাছ নেই?"

"উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। আর তা ছাড়া কাছাকাছি দ্বীপ বলতে তো সেই মুরিভুলা। মুরিভুলায় বেশ ঘন একটা জঙ্গল আছে। সেখানে নানান রকমের গাছ পেতে পার।"

গৌড়েশ্বর বলল, "চল, একবার দেখে আসি। কতদূর এখান থেকে?"

"তা প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার তো হবেই।"

মুরিভুলায় নেমে গৌড়েশ্বর সারা জঙ্গল ঝেঁটিয়ে বেড়াতে লাগল। আখ ছাড়া আর কোন গাছে ঐ সাদা পোকা আছে কিনা দেখতে। সারাদিন ধরে চলল অন্বেষণ। না সব বৃথা।

পড়ন্ত রোদে যখন তারা বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসছে তখন গৌড়েশ্বরের নজরে পড়ল কয়েকটা সাগু জাতীয় গাছ। দেখতে অনেকটা পাম্ গাছের মত। "চল, ঐ গুলো একবার দেখে আসি। মনে হচ্ছে এ জায়গায় কিছু পাওয়া যাবে না। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক।"

আবার চলল সেই রকম পরীক্ষা। সেই লম্বা ছুঁচলো ছুরি বিঁধিয়ে। এক জায়গায় মনে হল গাছের গায়ে বেশ কিছু বড় বড় ফুটো। গৌড়েশ্বর এতক্ষণ যেন কতকটা দায় সারা ভাবে কাজ করছিল, এবার যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। হ্যাঁ, ঐ তো এ গাছের মধ্যেও তো এসে বাসা বেঁধেছে সেই শয়তান পোকা! কিন্তু সংখ্যায় এখনও অতটা বাড়তে পারেনি।

গৌড়েশ্বর একটা ফুটো বেশ বড় করে ছুরি দিয়ে চেঁছে ফেলল। আরে, শুধু পোকাই নয়, এখানে পোকার গায়ে কতকগুলি কালো কালো মাছির মত কি এসে বসেছে! কি করছে মাছিগুলো? পোকা ধরে খাচ্ছে না তো! আর খাবেই বা কি করে? পোকার চাইতে ওরা তো অনেক ছোট। বরঞ্চ পোকাগুলিই ওদের ধরে খেতে পারে।

ফুটোর মধ্যে তীব্র টর্চের আলো ফেলল গৌড়েশ্বর। তারপর চমকে উঠে বলল, "কি করছে ওরা? পোকার ওপর চড়ে বসেছে মনে হচ্ছে। দেখি দেখি ঐ বড় লেন্সটা?"

খানিকক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করে গৌড়েশ্বরের বিস্ময়টা যেন আরও একটু বেড়ে গেল। "আরে, ওরা দেখছি ঐ পোকার ওপরই ডিম পাড়ছে।" তার পর

চিমটে দিয়ে মাছি সমেত একটা সাদা পোকা টেনে বার করল সে। মাছিটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল, কিন্তু পোকাটার পিঠের ওপর তার কালচে ডিমটা স্পষ্ট দেখা গেল।

গৌড়েশ্বর বলল, "হুঁ!"

মুরি ভুলায় ঐ সাগুজাতীয় গাছ সামান্য কয়েকটাই দেখা গেল। বোধ হয় কেউ শখ করে লাগিয়েছিল, তারই কিছু কিছু পড়ে আছে। গৌড়েশ্বর বলল, "এতো হবেনা। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে এই গাছের প্ল্যাণ্টেশন আছে? তুই তো বোটানীর ছাত্র। এসব অঞ্চলে নিশ্চয়ই তোর অনেক ঘোরাফেরা আছে। এখানে বসে হবে না, চল রেস্ট হাউসে, বসে আলোচনা করা যাবে।"

রেস্ট হাউসে এসে খাওয়া-দাওয়ার পর গৌড়েশ্বর ডগলাসকে ছেড়ে দিল, বলল, "যা বিছানায় শুয়ে ভাবতে শুরু কর। যদি মনে করতে পারিস তা হলে হয়তো তোদের আখেরও একটা হিল্লে হয়ে যেতে পারে।"

এবার চিন্তা করার পালা ডগলাসের। এ গাছগুলোর নাম তার মনে পড়েছে। স্থানীয় লোকেরা একে বলে স্যাগোডিটা-পাম। এই গাছ থেকে একরকম শ্বেতসার জাতীয় জিনিস পাওয়া যায় যা থেকে নানা শর্করা জাতের পদার্থ তৈরি করা যায়—গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ফ্রুকটোজ ইত্যাদি। কোথায় যেন এর প্ল্যানটেশান অর্থাৎ চাষও দেখেছে, ঠিক মনে করতে পারছে না।

ভাবতে ভাবতে—চিন্তা করতে করতে সারারাত তার ঘুমই হ'ল না। ভোরের দিকে, চোখে সামান্য একটু তন্দ্রা এল আর তখনই মনে পড়ল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এরকম গাছের চাষ সে দেখেছে সুদূর মেক্সিকোর কাছে একটা দ্বীপে। দ্বীপটার নামই তো সাগোডিটা। এখান থেকে বহুদূর। কিন্তু সমস্ত দ্বীপটা সাগোটিভা পামে ভরা।

সেই অবস্থাতেই সে ছুটে গেল গৌড়েশ্বরের দরজায়। ঠক্ ঠক্ আওয়াজ শুনে গৌড়েশ্বর বলল, কে?"

"আমি ডগলাস। খবর আছে,"

ডগলাসের কাছে খবর শুনে গৌড়েশ্বর বললে, "আমি সময় নষ্ট করবো না। এখুনি আমাদের যেতে হবে সেই স্যাগোডিটায়। তুই তৈরি হয়ে নে।'

প্লেন আবার ছুটল নীল আকাশ কেটে। অনেকটা পথ। পেঁছিতে পেঁছিতে প্লেনেও তিন ঘণ্টার ওপর লেগে গেল।

ডগলাস বলল, "এখানকার এই প্লানটেশনের মালিক অ্যাণ্টনির সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। চল্ তার কাছে আগে যাই? সে বোধ হয় এখন এখানেই থাকে।"

দুজনে অ্যাণ্টনির কাছে হাজির হ'ল। গৌড়েশ্বর নাম শুনে অ্যাণ্টনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, "আরে, আপনি তো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্টমোলজিস্ট! আপনার কোন কাজে আসতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করব আমি।"

গৌড়েশ্বর তাদের আসবার কারণ জানলে। স্যাগোডিটার সাগু জাতীয় পাম্ গাছে—যে মাছিগুলো সাদা পোকার গায়ে ডিম পাড়ে তাদেরই খোঁজে এসেছে সে। "কিন্তু ওগুলো তো খুব স্বল্পায়ু। এক একটা মাছি বড় জোর ২।৩ ঘণ্টার বেশি বাঁচে না। কি করবেন আপনি ঐ মাছি নিয়ে ?

"মাছগুলি ডিম পাড়ে সাদা পোকার ওপর। তার মানে ডিম ফুটলে পরে ঐ সাদা পোকার শরীর থেকে রস শুষে নিয়েই পুষ্ট হয়। অর্থাৎ এক কথায় এই মাছির বাচ্চাগুলোই হচ্ছে ঐ সাদা পোকার যম। নইলে পোকাদের খাবার জন্য নিশ্চয় মা মাছি তাদের ওপর ডিম পেড়ে দেয় না। আপনাদের এখানে যে সব পাম্ জাতীয় গাছ দেখেছি সবই তো বেশ পুষ্ট, এখানে কি সাদা পোকার অত্যাচার নেই ?"

"নেই আবার। এক এক সময় ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে সমস্ত প্ল্যাণ্টেশন ছেয়ে ফেলে। তবে তার জন্য আমরা ভাবি না, ঐ মাছিরাই এসে ওদের শেষ করে দেয়।—হাসতে হাসতে বলল অ্যাণ্টনি। "ঐ মাছিও এখানে প্রচুর জন্মায়।

সেদিন সারারাত গৌড়েশ্বর ঘুমোতো পারল না। থেকে থেকে উঠে ঘরের মধ্য পায়চারি করতে লাগল। ঐ মাছি তাকে সংগ্রহ করতেই হবে। একটা না, দু'টা নয়—হাজার হাজার, দরকার হলে লক্ষ লক্ষ মাছি চাই। কি করে ঐ মাছির বংশ বৃদ্ধি করা যায় তাও তাকে খুঁজে বার করতে হবে এবং এখানে বসেই।

অবশ্য এ কাজে কি করে করতে হয় বিশিষ্ট কীটতত্ত্ববিদ্ গৌড়শ্বরের তা অজানা নয়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই মাছিগুলি এত অল্প সময় বেঁচে থাকে যে এখান থেকে গৌড় দ্বীপ পর্যন্ত নিয়ে যাবার আগেই তো সব পট্ পট্ করে মরে যাবে !

হঠাৎ তার মনে পড়ল তাদের স্কুলের স্পোর্টসএর কথা। ঐ স্পোর্টস-এ রিলে রেসে ও নিজে কতবার এই রিলে রেসে দৌড়েছে নিশান হাতে নিয়ে। চারজন করে দৌড়াতে থাকে এক-এক দলে। সবাইকে সবটা দৌড়াতে হত না। একজন একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত দৌড়ে নিশানটা তার দলের দ্বিতীয় দৌড়বাজের হাতে গুঁজে দেয়। সে তখন ঐ নিশান নিয়ে ছুটতে ছুটতে অন্য দৌড়বাজকে দেয়, সে আবার অমনি ভাবে দেয় চতুর্থ বা শেষ দৌড়বাজের হাতে। সেই দৌড় শেষ করে। এখানেও যদি ঐ রিলে রেসের মত ব্যবস্থা করতে পারে তাহলেই তো কাজ হাসিল হতে পারে। অর্থাৎ মাছি ডিম পাড়বার পর সেই ডিম থেকে যে মাছির বাচ্চা বেরোবে সে যদি আবার অন্য একটা পোকার গায়ে বসে ডিম পাড়ে তাহলে তা থেকে যে নতুন মাছির বাচ্চা বেরুবে সে আবার গিয়ে নতুন কোন পোকার ওপর ডিম পাড়তে পারবে। সুবিধামত জায়গা পেলে রিলে রেসের মত চার দফারও দরকার হবে না। ২।৩ বার হলেই যথেষ্ট।

অ্যাণ্টনি এ অঞ্চলের নাড়ী-নক্ষত্র অনেক ভালো জানে ডগলাসের চাইতে। ভোর হতেই গৌড়েশ্বর চলে গেল তার কাছে। অ্যাণ্টনি একটু ভেবে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, গৌড়দ্বীপ

স্যাগোডিটার মাঝামাঝি মুরিভলার মত আরও কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ আছে সেখানে ঐ সাগুজাতীয় গাছের সঙ্গে আখ গাছও আছে প্রচুর। সে শুনেছে ঐ সব আখগাছেও সম্প্রতি ঐ সাদা পোকার উপদ্রব বেড়েছে, কিন্তু স্যাগোডিটার মাছিরা এবং তাদের সন্তান সন্ততি এসে তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছে। কোথায় কোথায় সে সব দ্বীপ আছে তাও সে ম্যাপ খুলে দেখিয়ে দিল।

গৌড়েশ্বর আর দেরী করল না। ডগলাসকে নিয়ে সেদিনই রওনা হয়ে গেল সেই সব দ্বীপের উদ্দেশ্যে। সংগ্রহ করল প্রচুর মাছির ডিম ঐ সাদা পোকাদের গা থেকেই, তার পর কালচার করে সেই মাছির ডিম থেকে নতুন মাছি প্রচুর পরিমানে সংগ্রহ করে চলে এল গৌড় দ্বীপে—শেষ দ্বীপ থেকে যেখানে যেতে লাগে ঘণ্টা খানেকের মত।

ব্যস্, তার পর? ঝাঁকে ঝাঁকে মাছিরা গিয়ে ঢুকে পড়ল ডগলাসের আখের ক্ষেতে। দেখতে দেখতে তারা নির্মূল করে দিল সাদা পোকাদের। রক্ষা পেল ডগলাসের আখের চাষ।

বছর খানেক পরের কথা। হঠাৎ এক টেলিগ্রাম এল গৌড়েশ্বরের কাছে, পাঠিয়েছে, ডগলাস! লিখেছে—"আর একবার ঘুরে যা আমাদের গৌড় দ্বীপে। দেখে যা আখের ক্ষেত আবার কেমন রসে টইটুম্বুর হয়ে হাসছে। কবে আসতে পারবি জানলে অ্যান্টনিকেও ডাকব।"



গুড়কো ভূত

অমিতাভ চৌধুরী

আমার মেজ পিসিমার বাড়িতে একবার ভূতের উপদ্রব হয়েছিল। ঠিক ভূত নয়, শিবের চেলা নন্দী-ভৃঙ্গীর উৎপাত। এই উৎপাতে সারা গাঁ যেমন ভীত, তেমনি বিস্মিত।

ছেলেবেলার কথা বলছি। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘটনা। আমি তখন আছি মামাবাড়িতে। গ্রামের নাম শ্রীগৌরী। ওখানকার ইস্কুলে পড়ি। আমার মামাবাড়ির ঠিক পিছনটাতে ফার্লংখানেক দূরে মেজ পিসিমার বাড়ি। পিসিমা সাদা-সিধে ভালো মানুষ। দেব-দেবী ভূত-প্রেত সাধু সন্ন্যাসীতে অগাধ বিশ্বাস। পিসেমশাই আরও ভালো মানুষ। গ্রামের পাঠশালার গরীব মাস্টার। মাস মাইনে বারো টাকা। ছোট্ট বাড়ি অল্প জমি সামান্য চাকরি নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে দিন চলে।

তাঁদের একমাত্র ছেলে বেণুলাল—আমার রাঙাদা।

রাঙাদা বয়সে আমার চেয়ে আড়াই বছরের বড়। পড়াশোনার নাম নেই, টো টো করে ঘুরে বেড়ান, গুলতি দিয়ে পাখি মারেন, অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প বলেন এবং চক-খড়ি দিয়ে বাড়ির যত্রতত্র ছবি আঁকেন।

ছোট্ট একতলা বাড়ি। টিনের চাল, একটি ঘরকেই দরমার বেড়া দিয়ে তিন ঘর। সামনে

দুটি ঘরের একটিতে রাঙাদা, অন্যটিতে পিসিমা-পিসেমশাই এবং পেছনের তিনদিক খোলা টানা লম্বা ঘরে রান্নাবান্না। রান্নাঘর দরমার বেড়া দিয়ে আলাদা করা। বাড়ির পেছনে গাছপালা আগাছার জঙ্গল। ছোট্ট একটা মজাপুকুরও সেই জঙ্গলের গায়ে।

টানাটানির সংসার, কিন্তু এক ছেলে বলে রাঙাদার আদরের শেষ নেই। তার আবদারেরও শেষ নেই। 'অমুকটা চাই' বলামাত্র এনে দিতে হবে। বেচারা পিসেমশাই। যে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সেখানে আদুরে ছেলের আবদার মেটাতে গিয়ে তিনি জেরবার।

মেজ পিসিমার বাড়িতে হঠাৎ হাজির হলেন এক সন্ন্যাসী। গায়ে লাল কাপড়, মাথায় জটা, হাতে ত্রিশূল। সাক্ষাৎ শিব। পিসিমা তো তাই ভেবে বসলেন। সাধুবাবা বললেন, এইমাত্র কৈলাস থেকে তিনি আসছেন। একটু আশ্রয় দরকার। এই গ্রামে পাপ ঢুকেছে। পাপ তাড়াতে কিছুদিন থাকতে হবে।

পিসিমা তো বিশ্বাস করার জন্যে বরাবরই প্রস্তুত। লম্বা প্রণাম ঠুকে সাধুবাবাকে আশ্রয় দিলেন। তাঁকে শাক ভাত ডাল খাইয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন।

সাধুবাবা ওই বাড়িতে থেকে গেলেন। খানদান, মাঝে মাঝে 'দেহি ভবতি ভিক্ষাং' বলে গাঁয়ে ঘোরেন এবং কেউ কটু কথা বললে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করেন। গাঁয়ের অবিশ্বাসীরা সন্দেহের চোখে তাকায়, ভাবে কোন ফেরারী আসামী নয়তো? সাধু সেজে গা ঢাকা দিয়ে আছে? আর বিশ্বাসীরা তো শিবজ্ঞানে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করতে লাগলো।

সাধুবাবার কাছে আমিও যাই। তিনি আমাদের প্রায়ই কৈলাসের কথা শোনান। তোফা জায়গা। ওয়েদার ভাল, খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট নেই। নেহাৎ এক কঠিন প্রয়োজনে তাঁকে কৈলাস ছেড়ে আসতে হল। পিসিমার ভাইপো বলে আমাকে অধিক স্নেহ করেন, বলেন, কিছু ভাবিস না, তোর হবে। আমার কী যে হবে আমি নিজেই জানি না। তবে সাধুবাবাকে পুরো অবিশ্বাসও করি না। বলা যায় না, হয়ত শিবই। নইলে সেদিন রূপসী গাছের তলা থেকে সাপ ধরে আনলেন কী করে?

সাধুবাবা মেজ পিসিমার বাড়িতে থেকে গেলেন। তাঁর আনা ভিক্ষের চাল সংসারে লাগে। তিনি নানা রকম গল্প শোনান এবং মাঝে মাঝে 'বোম বোম' বলে কৈলাসের স্মৃতি রোমন্থন করেন। সাধুবাবা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, একদিন তিনি আমাকে কৈলাস দেখিয়ে আনবেন।

আমার সোনামামা থাকতেন বাইরে। সেবার পুজোর সময় বাড়িতে এসে সাধুবাবার খবর পেলেন। তিনি দেখেই বললেন, ভণ্ড প্রতারক। সাধুবাবাকে একদিন বাড়িতে ডেকে এনে বেশ দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। আমি তো ভয়ে মরি, যদি শাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন সোনামামাকে।

সাধুবাবা কিছু মনে করেন না, স্মিত হেসে চলে যান। সোনামামাও ভস্ম হন না।

বিশ্বাস-অবিশ্বাস মিলিয়ে সাধ্বাবা গ্রামে থেকে গেলেন। আর আমার মেজ পিসিমা ও পিসেমশাই শিবঠাকুরের দয়ায় অচিরে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের অপেক্ষায় থাকেন। আগের জন্মে কী কী অপরাধের জন্যে তাঁদের এই আর্থিক দ্দর্শা, একথা সাধ্বাবা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আশ্বাস দেন, এত বছর এত দণ্ড এত পল পেরিয়ে গেলে সব দ্ঃখমোচন হয়ে যাবে।

ইস্কুল ফেরৎ আমি মাঝে মাঝে সাধ্বাবার কাছে যাই। আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেন, আমি যেন শাপভ্রষ্ট দেবশিশ্। সাধ্বাবা কথা বলতে বলতে কী যেন বিড়বিড় করেন। পিসিমা বলেন, মা দ্র্গার সঙ্গে কথা বলছেন। হতেও পারে। প্রলাপেই সংলাপ।

রাঙাদার দ্ষ্টুমিতে গ্রামের লোকজনেরা তিতিবিরক্ত হলেও সাধ্বাবা ক্ষমাশীল। বলেন, ওটা হন্মান ছিল ত্রেতায্গে। বাঁদরামি করলেও ভক্ত মান্ষ। একথায় আমারও বিশ্বাস হয়েছিল। কেননা, দেখতাম রাঙাদা হন্মানের ছবি খ্ব ভালো আঁকতে পারেন।

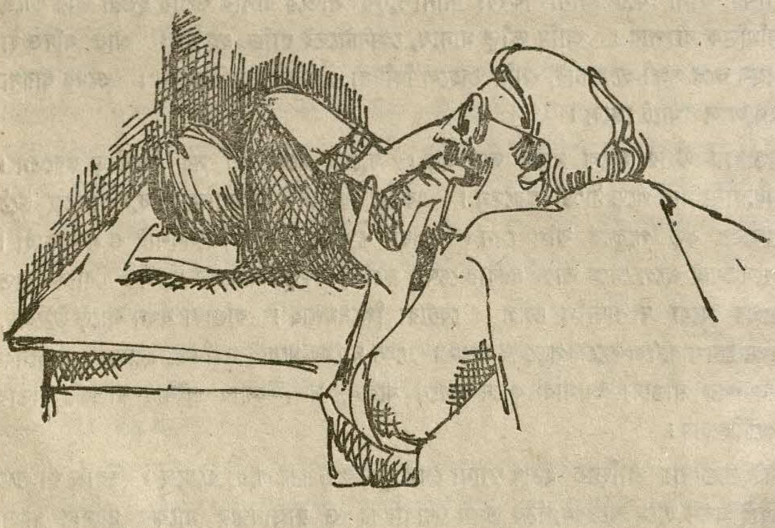
রাঙাদা আমায় খ্ব ভালোবাসেন। অনেক সময় আমাকে তাঁর দ্ঃসাহসী অভিযানের সঙ্গী করতে চান। অন্যের নৌকো নিয়ে নদী পাড়ি কিংবা আমগাছের ডগায় উঠে পাখির ছানা ধরে আনা কিংবা পানাপ্কুর সাঁতরে এপার ওপার হওয়া তার কাছে নৈমিত্তিক ব্যাপার। আমি ভীতু মান্ষ, কোনটাতেই রাজি হই না। আর যদিও বা সাহস করে সঙ্গী হতে চাই, জানি তাহলে দিদিমা ও সোনামামা বকবেন। ওদের ধারণা বেণ্লাল বখাটে ছেলে।

রাঙাদার উপর মাঝে মাঝে ভড় হত। ঘ্মের মধ্যে কী সব বিড়বিড় করতেন। সাধ্বাবা মন্ত্র পড়ে ঠাণ্ডা করতেন। একবার রাঙাদা মাঝরাত্তিরে ঘ্ম থেকে উঠে সামনের বড় প্কুরে ঝাঁপ দেন। পেছন পেছন ছোটেন পিসেমশাই ও সাধ্বাবা। পিসেমশাই জলে নেমে তাকে ধরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু পারবেন কেন। বাকি রাত জলের মধ্যে দাপাদাপি চলল। বেচারা পিসেমশাই! রাঙাদা যখন পাড়ে উঠলেন, তখন চোখ ব্ঁজে শ্য়ে পড়লেন ঘাটে। যেন ঘ্মের মধ্যেই সবকিছ্ হয়েছে। অনেক দিন পর রাঙাদা আমার কানে কানে বলেন, মজা করার জন্যেই রাতভর সাঁতার কেটেছিলেন।

সেই রাঙাদার বাড়িতে হঠাৎ শোনা গেল ভূতের উপদ্রব শ্র্ হয়েছে। রোজ রাত্তিরে সবাই যখন ঘ্মে অচেতন, ঠিক তখন শোবারঘর ও রান্নাঘরের মাঝের দরমার দরজা ধাক্কা দিয়ে খোলার চেষ্টা হয়। এপাশের লম্বা বাঁশের হ্ড়কো নড়তে থাকে এবং প্রবল হাতে হ্ড়কো চেপে না ধরলে ভ্ত হ্ড়ম্ড় করে শোবার ঘরে ঢ্কে যেতে পারে। ওই লম্বা বাঁশের হ্ড়কো এমনিতেই নড়বড়ে। চোর আটকাবার জন্যে নয়, শেয়াল কুকুর যাতে ঢ্কতে না পারে তার জন্যেই।

সারা গ্রামে আতঙ্ক। এমনিতে ভূত-প্রেতেরা সব গ্রামের রাস্তাতেই ঘুরে বেড়ায়। বেহ্মদত্যি বেলগাছের ডালে বসে থাকে, শাঁকচুন্নি বোয়ালমাছ ভাজা খাওয়ার জন্যে লম্বা হাত বাড়ায়, পেত্নী বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভয় দেখায়। অন্ধকার, ঝোপঝাড়, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, হুতোম প্যাঁচার ডানা ঝটপটানি—সব মিলিয়ে সব রাত্রেই এক ভৌতিক পরিবেশ। তার মধ্যে দু'-চারজন ভূতের ভূত-প্রেতে বিশ্বাসী পিসিমার বাড়িতে প্রবেশ বিচিত্র নয়।

গ্রামের লোকেদের আলোচনার প্রধান বিষয় হয়ে গেল ওই ভূতের উপদ্রব। হাটে মাঠে বাজারে পুকুর ঘাটে রেল স্টেশনে আরও রঙ চড়িয়ে ও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওই ভূতের কাহিনী বলা হতে লাগল। মেজ পিসিমা কিঞ্চিৎ ভীত, তবে তাঁর ভরসা সাধুবাবা। শ্মশানচারী শিব যখন বাড়িতে, তখন দু-চারটে ভূতের উপদ্রব তো হবেই। ভূতের হাত থেকে বাঁচাবেনও সাধুবাবা। সুতরাং ভয় কিসের। বেচারা ভালো মানুষ পিসেমশাই, তারই হয়েছে মুশকিল। রোজ মাঝরাত্তিরে ওই হুড়কো ধরে তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একদিকে ভূত, অন্যদিকে পিসেমশাই। সাধুবাবা অবশ্য বলেন, নন্দী ভৃঙ্গী বড় জ্বালাচ্ছে। কৈলাসে নিয়ে যাবার জন্যে রাত্তিরে এসে হামলা করছে। আরে বাবা, বললেই তো যাওয়া যায় না। কাজ ফুরোক তবে তো—বোম্ বোম্।



সরল বিশ্বাসী পিসিমা এসব কথা শুনে আরও নির্ভয় হয়ে গেলেন। স্বামী পুত্র সাধুবাবা ও নন্দী ভৃঙ্গীর হামলা নিয়ে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে লাগলেন।

গ্রামের লোকদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। রোজ রাত্রে পালা করে অনেকে ওই বাড়িতে আসতে লাগলেন স্বচক্ষে ভূতের হুড়কো টানার ঘটনাটা দেখার জন্যে। প্রথমে

একটু একটু নড়ে। শব্দ পাওয়া মাত্র ছুটে গিয়ে হুড়কো ধরে ফেলতে হয়। তারপর চলে লড়াই। খুব জোরে ধরে রাখতে না পারলে কেলেংকারি। ভূত দরজা খুলে ঘরে ঢুকে পড়বে। যেন ভূতেরা অন্য কোন রাস্তা দিয়ে বা দেয়াল ফুঁড়ে আসতে পারে না।

এসব ব্যাপারে নির্বিকার কেবল রাঙাদা। ভূত টুত নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। যখন পাশের ঘরে তুলকালাম কাণ্ড চলছে, তখন তিনি গভীর ঘুমে! পিসিমা বলেন, 'আমার বেনুলাল বড় ঘুম কাতুরে। ভূত দূরের কথা, বাড়িতে ডাকাত পড়লেও তার ঘুম ভাঙে না।'

হবেও বা। রাঙাদা যে রকম অদ্ভুত লোক, কোন কিছু কেয়ার না করে ঘুমিয়ে থাকতেই পারে।

তবে আর একটা ব্যাপারে সবাই ভূতের আগমন সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হয়ে গেল। যখন হুড়কো নড়ে না, তখন বাড়ির টিনের চালে দুম দাম ঢিল পড়ে। এ'ও যে রাগী ভূতের বা শিবকে কৈলাসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নন্দীভৃঙ্গীর কাণ্ড, তাতে কোন সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা শোন সামনের একফালি বারান্দায়। তিনি সব শুনে মুচকি মুচকি হাসেন এবং হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার পাড়েন—'বোম্ বোম্।' বাড়ির চারদিকের গাঢ় অন্ধকার, পেছনের বাঁশগাছের ক্যাচ ক্যাচ, এবং তারই মাঝখানে বোম-বোম আওয়াজ—সব মিলিয়ে গা-ছমছম ব্যাপার। এমন অবস্থায় ভূত প্রেত আসতেই পারে।

এক রাত্তিরে সাহস সঞ্চয় করে আমিও হাজির হলাম ভূতের আসরে। আমার তখন বয়সই বা কত আট নয়, সব কিছু বিশ্বাস করার সময়। শুধু ভয়, যদি সত্যি সত্যি ভূত ঘরে ঢুকে পড়ে? পরক্ষণে ভরসা পাই সাধুবাবাকে দেখে। তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু বিহিত করবেন।

আমি প্রথমে বললাম, রাঙাদার বিছানায় থাকব। রাঙাদা বললেন, 'না না, তুই যা, অন্য ঘরে। এখানে আমার অসুবিধে হবে।

আমার একটু খটকা লাগল, রাঙাদা ভূতের ব্যাপারে এতো নিরুত্তাপ কেন? কিন্তু সবাই ভূতের নড়াচড়া গতিবিধি নিয়ে এতো ব্যস্ত যে রাঙাদাকে নিয়ে তত মাথা ঘামান না।

আমি যেদিন গেলাম, সেদিন একটু বাড়াবাড়ি হল। আমার মতো আরও কয়েকজন গ্রামবাসী ছিলেন ঘরে। সেদিনও হুড়কো নড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই ছুটে গেলেন। কিন্তু এমন বাড়াবাড়ি যে পিসেমশাই আচমকা মাটিতে পড়ে গেলেন। পিসিমা সাধু-বাবাকে হাঁক পেড়ে ডাকলেন। সাধুবাবা তাঁর বিছানা ছাড়লেন না। গাঁয়েরই আর একজন ছুটে গিয়ে হুড়কো ধরলেন। ভাগ্যিস ধরলেন, নইলে ভূত দেখে মূর্চ্ছা যেতাম।

এই ভাবে চলছে। সাধুবাবা ভূত হুড়কো টানাটানি নিয়ে গ্রামের মানুষ মেতে

রইলেন। মেজ পিসিমার বাড়িতে এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নেওয়া হল। সবাই যে-যার কাজে ব্যস্ত থাকে। শুধু রাঙাদা যেন গম্ভীর। দিনের বেলা ভূত নিয়ে নানা রকম কথা তিনিও বলেন, কিন্তু রাত্রে চুপচাপ। পিসেমশাই হুড়কো ধরার জন্যে তাকে ডেকেও ভূতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারেন নি। মেজ পিসিমা অবাধ্য আদুরে ছেলের ঘুম ভাঙাতে নারাজ। সব ঝক্কি পোয়াতে হচ্ছে পিসেমশাইকে।

ভূতের খবর রটে গেল গ্রামের বাইরেও। অবশ্যই পল্লবিত হয়ে। সেই খবর শুনে শিলচর থেকে একদিন আমার বড়কাকাবাবু এসে হাজির। আমার বড়কাকাবাবু মানে রাঙাদার মামাবাবু। তিনি পিসিমা পিসেমশাইয়ের কাছে সব কথা শুনে গুম মেরে রইলেন। প্রথমেই পিসিমাকে বললেন, 'বুঝলে দিদি, যত গণ্ডগোলের মূল তোমাদের ওই সাধুবাবা। ওকে বাড়ি থেকে তাড়াও, নইলে উপদ্রব কমবে না।'

পিসিমা জিব কেটে বলেন, 'ওরে ভূপেন্দ্র, এমন কথা বলিস না। বাবা সাক্ষাৎ শিব।'

বড়কাকাবাবু ঃ 'শিব তো এ বাড়ি কেন? ওকে শ্মশানে পাঠিয়ে দাও।'

পিসিমা ঃ শ্মশানে তো যেতেই পারেন, কিন্তু আমার কত সৌভাগ্য বল দিকিনি, তিনি আমার বাড়িতে অন্নগ্রহণ করছেন।

বড়কাকাবাবু ঃ নিজের অন্ন জোটে না, আবার অন্যকে অন্নদান! হুঃ। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি কোন দিনই হবে না।

রাত্রে বড়কাকাবাবুর উপস্থিতিতে আবার ভূতের আবির্ভাব হলো। সেই হুড়কো নড়া পিসেমশাইয়ের ছুটে গিয়ে ধস্তাধস্তি, নিস্তব্ধতার মাঝখানে সাধুবাবার 'বোম বোম' চিৎকার। বড়কাকাবাবু সব ভালো করে দেখলেন। তিনি বরাবরি সাহসী মানুষ, ভূতপ্রেতকে মনে করেন বুজরুকি। তিনি হুড়কো খুলে নিজে যেতে চাইলেন রান্না-ঘরের দিকে। কিন্তু পিসিমার মিনতিতে নিরস্ত হলেন।

বড়কাকাবাবু দেখলেন সবাই ব্যতিব্যস্ত, কেবল তাঁর ভাগনে শ্রীমান বেনুলাল কোন কথাটি না বলে নিজের ঘরে শুয়ে আছে। তিনি 'বেনু বেনু' ডাকলেন, কিন্তু পিসিমা বললেন, ওকে ডাকিস না, বড় ঘুমকাতুরে। আর ভূতের ভয় ভীষণ। কেন মিছিমিছি বেচারাকে কষ্ট দেওয়া।

বড়কাকাবাবু কী একটা যেন আন্দাজ করলেন, পরের রাত্তিরে তিনি বললেন, বেনুর সঙ্গে এক বিছানায় আমি শোব। রাঙাদা খুব আপত্তি করলেন, কিন্তু বড় কাকাবাবুর তিন ধমকে রাজি হতে হল।

দু'জনে একসঙ্গে শুলেন, তবু যে কে সেই। আবার একই ভাবে হুড়কোর জাড়াজড়ি। তবে সেই রাত্তিরে টিনের চালে ঢিল পড়লো না।

বড় কাকাবাবু একটু চিন্তিত হলেন। তাহলে। ব্যাপারটা কী? তাঁর সন্দেহ কি ঠিক

নয় ? সাধুবাবার ওপর কড়া নজর রাখলেন এবং রান্নাঘর, দরমার বেড়া, হুড়কো, রাঙাদার ঘর, তার ঘরের বেড়া ভালোভাবে পরীক্ষা করলেন। পিসিমা এসব দেখে একটু বিরক্ত হলেন কিন্তু ছোটভাইকে বড়া করে কিছু বলতেও পারলেন না।

ওদিকে বড়কাকাবাবু রাঙাদাকে বললেন, চল আমার সঙ্গে শিলচরে। কয়েকদিন থেকে আসবি।

রাঙাদা কিছুতেই রাজি না। বলেন, 'অনেক কাজ আছে মামাবাবু, পরে যাবে 'খন।

বড় কাকাবাবু আর কিছু বললেন না, শুধু রাত্রে রাঙাদার সঙ্গে এক বিছানাতেই শুতে গেলেন। আগের দিনের চেয়ে একটু তফাৎ করলেন। রাঙাদাকে অন্যপাশে দিয়ে নিজে শুলেন দরজার বেড়ার দিকটায়। তক্তপোষটা বেড়ার গা ঘেসেই। ওপাশে রান্না-ঘর এবং হাত তিন চার দূরে অন্য শোবার ঘরে যাওয়ার জন্যে রান্নাঘরের সেই দরজা।

বড় কাকাবাবু লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঠার বসে রইলেন বিছানায়। কড়া নজর রাঙাদার দিকে। মাঝরাত্তির আসে। ও ঘরে পিসিমা পিসেমশাই ও গাঁয়ের দু'চার জন লোক বসে। কিন্তু কি আশ্চর্য, হুড়কো নড়ল না। আরও অপেক্ষা। তবু নড়াচড়া নেই। সবাই কেমন যেন হতাশ হয়ে গেলেন। একটু বাদে গাঁয়ের লোকেরা চলে গেলেন যে যার বাড়ি। পিসিমা পিসেমশাই বসে রইলেন হুড়কোর দিকে তাকিয়ে। যদি নড়ে।

নড়লো না। এবং রাতও পুইয়ে আকাশ ফর্সা হলো। বড় কাকাবাবু রাঙাদার কান ধরে টেনে এনে হাজির করলেন পিসিমা পিসেমশাইয়ের কাছে, তারপর দুই গালে বড় দুই চড়।

সবাই হতভম্ব। রাঙাদা ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলেন। বড় কাকাবাবু তাঁকে তখনও ধমকে চলেছেন।

আরও অবাক কাণ্ড। পিসিমা পিসেমশাইকে রান্নাঘরে নিয়ে দেখালেন, হুড়কোর সঙ্গে বাঁধা একটা শক্ত কালো গুলি সুতো। সেই সুতো দরমার বেড়ার ফাঁক দিয়ে রাঙাদার বিছানার পাশে এক খুঁটিতে বাঁধা।

বড়কাকাবাবু বললেন, 'এবার বুঝলে তো দিদি, ভূতটা কে। তোমার গুণধর পুত্র। আমি তো বলি, সারা বাড়ি তোলপাড় আর বেনু কী করে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। তোমরা যখন ভূতের অপেক্ষায় বসে থাকো, তখন সে শুয়ে শুয়ে ওই কালো সুতো ধরে টান মারে। মারলেই হুড়কো নড়ে। বুড়ো বাপ ওর গায়ের জোরের সঙ্গে পারবেন কেন ? তোমরা তো বিশ্বেস করার জন্যে বসেই আছ, আর ওই পাজিটা শুয়ে শুয়ে তোমাদের নাকাল করছে। আর তোমরা যখন হুড়কো টানাটানিতে ব্যস্ত তখন একবার অন্ধকারে বাইরে গিয়ে টিনের চালে ঢিল মেরে আবার এসে শুয়ে পড়ে এবং আবার ওর সুতোর কেরদানি দেখায়। দেখো, আজ রাত থেকে আর কিছু হবে না। এই দেখো সেই সুতো। যত বদ বুদ্ধি সব মাথায়। কোথায় গেল সেই হতভাগা।

হতভাগা ততক্ষণে বাড়িতে নেই। ছুটে বাইরে। বড় কাকাবাবু সকালের ট্রেনেই

শিলচর ফিরে গেলেন। রাঙাদা হেলতে দুলতে তারপর বাড়ি এলেন। মুখের ভাবখানা এমনই যেন কিছুই হয়নি।

তবে সত্যি সত্যি সেদিন রাত থেকে মেজ পিসিমার বাড়িতে ভূতের উপদ্রব থেমে গেলো। মেজ পিসিমা বললেন, ভূপেন্দ্র বললো বটে, সুতোটাও দেখালো, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, আমার বেনুলাল এই সব করেছে।

সাধুবাবা বললেন, অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কথায় বিশ্বেস রাখতে নেই। নন্দীভৃঙ্গীই এসেছিল। না, আর এখানে নয়, কালই কৈলাসে ফিরে যেতে হবে দেখছি।

কোন কথা বললেন না শুধু পিসেমশাই। বহুদিন পর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতেও পারলেন।

———

ভূতের গল্প

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

ডাঙ্গাল পাড়ার মস্ত ওঝা শিবু গুনীন
শোনাচ্ছিল ভূতের গল্প, সন্ধ্যেবেলায়, এই তো সেদিন।
বলছিল সে, কোন ভূতেরা ছিঁচকে এবং ভীষণ পাজি,
মামদো কখন কোথায় চালায় মামদোবাজি,
বদরাগী কোন ভূতের মাথায় গাট্টা মারলে ভীষণ জোরে
ঝড় বয়ে যায় বটের মাথায়, তেঁতুলগাছে কাঁপন ধরে,
কোন বেঁটে ভূত এঁটো কুড়োয়, কোন ঢ্যাঙা ভূত হাড় হাভাতে,
জ্যোৎস্না দেখে কারা হঠাৎ আঁতকে ওঠে মধ্যরাতে,
কাঁদুনে ভূত কেন কাঁদে গাছের ছায়ায় নাকী সুরে,
ঘুর্ণী ভূতের নাচ দেখা যায় কখন কোথায় দিন দুপুরে,
সাহেব ভূতের কেমন করে বন্ধ হল গট গটানি,
সেকথা আর বলে কী লাভ ? হালে সে যে পায় না পানি।
শুনছিল খুব ঠাণ্ডা মাথায় পাড়ার ক'জন দাওয়ায় বসে।
শিবুর গল্প শেষ হল যেই, উঠল তারা অট্টহেসে,
'কী শোনালেন গুনীনমশাই, মিথ্যে কথা, আরে ছি ছি,
এমন একটা কাজের সন্ধ্যা নষ্ট হল মিছিমিছি।
এই যে দেখুন, আমরা কেমন মুণ্ডুটাকে ঘুরিয়ে রেখে
হাঁটতে এবং দেখতে পারি সামনে এবং পেছন থেকে।'
সত্যি ভূতের কাণ্ড এবং মুণ্ডু দেখে, কথা শুনে,
জ্ঞান হারাল শিবু গুনীন গোঁ গোঁ করে পরক্ষণে।

একশ টাকার রহস্য

নলিনী দাশ



আনন্দ মেলার খাবারের দোকানের হিসাব মেলাতে গিয়ে দেখা গেল যে একশ' টাকা কম। বারবার ক্যাশমেমো মিলিয়ে, টাকা গুণে আর যোগ করেও সেই একশ টাকার হিসাব কিছুতেই মিলল না। দ্বাদশ আর একাদশ শ্রেণীর মেয়েরা একসঙ্গে মিলে আনন্দ মেলার সব কাজ করলেও খাবারের স্টলের দায়িত্ব ছিল দ্বাদশ শ্রেণীর চারটি মেয়ের। তাদের ক্লাস টিচার ভারতীদি খুব রাগ করতে লাগলেন।

আনন্দমেলা কমিটির সেক্রেটারি শর্মিলা উপস্থিত ছিল না। মেলা চলার সময়ে হঠাৎ খবর এসেছিল যে তার ছোটভাই পার্থ ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। শর্মিলার বাবা-মা উদ্বিগ্ন হয়ে তখনই তাকে নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন।

ভারতীদি বলছিলেন, 'তোমরা এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন জানলে আমি টাকার ভার টিচারদের দিতাম। যদিও এ স্কুলের ট্র্যাডিশন তা নয়?' মুখ গোমড়া করে মঞ্জুলা বলল, 'শর্মিলা ফিরে আসুক না দিদি, তারপরে হিসাব পরীক্ষা করা যাবে।'

ভারতীদি আরো চটে গেলেন। 'শর্মিলার ওপরে তো খাবারের দোকানের ভার ছিল না। হিসাব এখনই পাকা হতে পারত। তোমাদের যখন দায়িত্ব ছিল, তোমরাই স্থির

কর কিভাবে এখন হিসাব মেলাবে!' রেগে মেগে ভরতীদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দুঃখে, অপমানে দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়ে চারটির মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

ক্ষোভে ফেটে পড়ল অনিন্দিতা, 'দিদির কথা শুনলে? আমরা কি চোর?'

রেগে অণিমা বলল 'টাকা কম পড়লে সেটা আমাদের দোষ হবে?'

জয়তী বলল, 'মাথা গরম করিস না। দোকানের ভার যখন আমাদের, হিসাব মেলাবার দায়িত্ব ত আমাদের হবেই।' 'তাই বলে টাকা কম পড়ার দায়িত্বও কি আমাদের ঘাড়ে চাপবে?' 'চাপবে বৈকি' উত্তর দিল জয়তী, 'আমাদেরই অসাবধানতায়'—মঞ্জুলা তার কথা শেষ হবার আগেই বলল, 'মোটেই না অসাবধান হইনি। অনিমা অনিন্দিতা তুই আর আমি ক্যাশে বসেছি, ক্যাশ মেমো মিলিয়ে টাকা ফেরত দিয়েছি। বড় নোট পেলে ত তখনই সেটা তুলে রেখেছি'—

'তুলবার সময় নোট ক্যাশ বাক্সের খাঁজে আটকে যায় নি ত?'

'আমরা কতবার ক্যাশ বাক্স ঝেড়ে ঝুড়ে খুঁজলাম না। ভারতীদি অত বড় টর্চ জ্বেলে কোনে কোণে দেখলেন। সেখানে টাকা থাকলে ত দেখতেই পেতাম।'

'একটা নোট উড়ে মাটিতে পড়ে যায় নি ত?'

'সমস্ত ঘর পঞ্চাশবার ঝাঁট দিয়ে দেখার পরও এ প্রশ্ন করিস কি করে?' হাঁড়িমুখে বলল অনিমা।

জয়তী আবার বলল, 'ভাল করে ভেবে দেখ, আমরা সময়েই টাকা আগলে বসে থেকেছি ত? কখনও উঠে গেলে সেই ফাঁকে কোনো ক্রেতা হাত বাড়িয়ে একটা নোট তুলে নিয়েও থাকতে পারে। যা সাংঘাতিক ভিড় হয়েছিল।'

'না গো না!' বলল অনিন্দিতা, সব সময়েই আমরা দুজন অন্ততঃ বসে থেকেছি। ক্লাস ইলেভেনের মৃন্ময়ী আর অর্চনাও ধারে কাছে থেকেছে—ওরা খবার প্যাক করছিল, মাঝে মাঝে ক্যাশ মেমো কাটছিল'—

'তাছাড়া ভারতীদি যে রকম ব্যূহ রচনা করে দিয়েছিলেন, কোনো ক্রেতা টাকা নিতে চাইলে তাকে সেই গল্পের শাঁকচুন্নি-বৌয়ের মতন লম্বা হাত বের করতে হত।' সবাই হেসে উঠল এক কথায়।

'হাসি ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ভেবে দেখ টাকাটা কোথায় গিয়ে থাকতে পারে।'

'দিদি তো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন যে কেবল মাত্র আমাদের চারজনেরই টাকা সরাবার সুযোগ ছিল'—

'না না, দিদি সেকথা বলেন নি। তিনি বলেছেন যে দায়িত্ব আমাদের ছিল।' উত্তর দিল জয়তী।

'সে কথা মনে রেখেই বা আমরা কি করতে পারি?' বলল অনিন্দিতা।

'আমি কেবল ভাবছি, এ কথা যখন সবাই জানবে, তখন কি হবে!' বলল অনিমা। মঞ্জুলা যোগ দিল, 'তখন সমস্ত স্কুলের সামনে আমরা চোর হয়ে যাব।'

মেয়েদের আলোচনায় বাধা দিয়ে ভারতীদি আবার ঘরে ঢ়ুকলেন বললেন, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। সমস্ত বিভাগ, হিসাব মিলিয়ে টাকা জমা দিয়ে দিয়েছে। তোমরাও এখন টাকা জমা দিয়ে বাড়ি যাও। পরে হিসাবের ব্যবস্থা যা-হোক করা যাবে!'
মন খারাপ করে মেয়েরা নিঃশব্দে তাঁর কথামতন কাজ করল। এবার ভারতীদি নরম স্বরে বললেন, হেডমিস্ট্রেস বলে দিলেন এই টাকা কম পড়ার কথা যেন মোটেই আলোচনা করা না হয়। তোমরা এই চারজনে জানো, আর যেন পাঁচ কান না হয়!
এই কথায় মেয়েরা মনে কিছুটা স্বস্তি পেল।

* * *

দক্ষিণ কলকাতার নাম করা স্কুল আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। এই স্কুলে পড়াশুনা যেমন ভাল হয়, প্রতি বছর মাধ্যমিক আর উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েরা স্কলারশীপ পায়, তেমনি খেলা-ধুলা, নাচ-গান-অভিনয়, ছবি আঁকা আর হাতের কাজও খুব ভাল হয়, মেয়েরা অনেক প্রতিযোগিতায় জিতে পুরস্কার নিয়ে আসে। স্কুলের নিজস্ব প্রতিযোগিতা আর পুরস্কারও আছে অনেকগুলি।
এহ স্কুলের একটা বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন ক্লাব আর বিভাগ। নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ এই চারটি ক্লাসের মেয়েরা চাঁদা দিয়ে এইসব ক্লাবের সভ্য হতে পারে। টেনিস ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, সাহিত্য-বিভাগ, সঙ্গীত-বিভাগ আর কলা বিভাগের মেম্বার হলে মেয়েরা উচ্চমানের ক্রিকেট-টেনিস খেলতে শিখতে পারে, গান-বাজনা শিল্পকলা আর সাহিত্য-চর্চার সুযোগ পায়। প্রায় প্রত্যেকটি মেয়ে কোনো না কোনো ক্লাবের মেম্বার হয়, অনেকেই একাধিক বিভাগে যোগ দেয়।

আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হল বার্ষিক আনন্দমেলা। প্রতি বছরের প্রথমে, মেয়েরা নতুন ক্লাসে ওঠার ঠিক পরেই চার-পাঁচদিন ধরে এই উৎসব আর মেলা হয়। টিকিট বিক্রি করে রোজ নাচ, গান, নাটক আর ফিল্ম শো দেখানো হয়। 'লাকি ডীল', 'ম্যাজিক-শো', মেয়েদের যোগ-ব্যায়াম আর জিমনাস্টিক, আরো কত কি হয়, মেয়েদের সেলাই আর হাতের কাজ বিক্রি হয়। সবচেয়ে জনপ্রিয় হল খাবারের দোকান। স্কুলেই তৈরি কখানো হয় লুচি, আলুর দম, ঘুগনি, ফুলুরি, চপ-কাটলেট, রকমারি মিষ্টি আর কেক। বিক্রি করতে করতে মেয়েরা হিমসিম খেয়ে যায়। অনেক লাভ হয়। আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের 'ট্র্যাডিশান' হল টিচাররা আড়ালে থেকে সাহায্য করেন, কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কাজ চালায় দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েরা। পরীক্ষা দিয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যাবার আগে এটাই তাদের সবচেয়ে বড় 'পরীক্ষা'। সবচেয়ে আনন্দের কাজও বটে।
আনন্দমেলা শেষ হবার পরে স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্মের ধারাবাহিকতা ফিরে আসতে দিনকতক সময় লাগে। সকলেরই নতুন ক্লাস, নতুন বই। তাছাড়া এই সময় বিভিন্ন ক্লাবের নতুন মেম্বার নেওয়া হয়, ক্লাবের পরিচালন-সমিতি নির্বাচন করা হয়।

তাই আনন্দমেলা শেষ হয়ে যাবার পরেও কয়েকদিন স্কুলে একটা উৎসবের আর কর্ম-তৎপরতার আবহাওয়া লেগে থাকে।

* * *

আনন্দমেলা শেষ হবার দুদিন পরেকার কথা। এখনও পুরো দমে ক্লাস শুরু হয় নি। রোজই দু-তিন ঘণ্টা আগে ছুটি হয়ে যাচ্ছে। তারপর বড় মেয়েদের কমনরুমে বসে বিভিন্ন ক্লাবের সেক্রেটারিরা নতুন মেম্বারদের ফর্ম দিচ্ছে, পুরোন মেম্বারদের চাঁদা জমা নিচ্ছে। কোন বিভাগে কতজন যোগ দিল তাই নিয়ে একটা অঘোষিত প্রতিযোগিতাও চলছে। সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা যাচ্ছে নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে। কারণ এই বছরই তারা প্রথম এইসব ক্লাবে যোগ দেবার সুযোগ পাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক



ক্লাবের মেম্বার হচ্ছে।

আনন্দমেলা শেষ হবার পরে শর্মিলা আর স্কুলে আসতে পারে নি। তার ভাইয়ের বেশ গুরুতর চোট লেগেছিল। এখনও নার্সিংহোম থেকে ছাড়া পায় নি। সুমনা, মৈত্রেয়ী, বীণা, জয়তী, অনিমা প্রমুখ দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েরা যে যার কাজ করতে বসেছে।

একাদশ শ্রেণীর মৃণ্ময়ী এসে তাদের বলল, 'আমি সাহিত্য, আর কলা-বিভাগের মেম্বার হতে চাই। কি করতে হবে? কার কাছে যাব?'

সুমনা বিস্মিত হয়ে বলল, 'তুমি ত একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। এতদিন কোনো বিভাগেই যোগ দাও নি?'

লাজুক মেয়ে মৃণ্ময়ী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'না…মানে…ইচ্ছে ছিল…কিন্তু আগে সুযোগ পাই নি।'

সাহিত্য বিভাগের সেক্রেটারি শর্মিলার অনুপস্থিতিতে সহ সম্পাদিকা জয়তী মৃণ্ময়ীকে

একখানা ফর্ম দিল, কলা বিভাগের সেক্রেটারি মৈত্রেয়ী দিল তার বিভাগের ফর্ম। বলল, 'বাড়ি গিয়ে ফর্মগুলো ভাল করে পড়ে দেখ। কাল-পরশু সুবিধা মতন এসে টাকাটা জমা দিয়ে যেও।

কেমন যেন ব্যস্ত হয়ে মৃন্ময়ী বলল, 'না—না, নিয়মকানুন সবই আমি ভাল করে জানি। আমি এখনই টাকা জমা দিয়ে মেম্বার হয়ে যেতে চাই।'

'মেম্বার ত আর এখনই হতে পারবে না', বলল বীণা, 'আগামী অধিবেশনে নতুন মেম্বারদের তালিকা তৈরি হবে।'

'তা হোক। আমি কিন্তু এখনই ফর্ম ভর্তি করে টাকাটা জমা দিয়ে যেতে চাই।' জবাব দিল মৃন্ময়ী।

অত তাড়া কিসের ভাই ?' ঠাট্টার সুরে বলল সুমনা। 'ক্লাবগুলো ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না।'

অনেক জোড়া চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি তার ওপর পড়াতে আরো অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে মৃন্ময়ী বলল, 'তা নয়...মানে টাকাটা পাছে অন্য কাজে খরচ করে ফেলি...তাই' — নিজের কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সে চুপ করে গেল। নীরবে ফর্ম দুটো ভর্তি করে টাকা সহ জমা দিল, জয়তী আর মৈত্রেয়ীর কাছে রসিদ পাবামাত্র তেমনি নীরবে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে সুমনা বলল, 'কাণ্ড দেখলে মেয়েটার! হন্তদন্ত হয়ে এমনভাবে পালাল যেন ওকে পেয়াদায় তাড়া করছে।'

গম্ভীরভাবে অনিমা বলল, 'তারা করেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে করতে পারে।'

'সে আবার কেমন রহস্যময় কথা ?' প্রশ্ন করল বীণা, কিন্তু অনিমা তার কথার কোনো উত্তর দিল না।

পরদিন সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে মৃন্ময়ী আবার এসে বলল, 'আমাকে সঙ্গীত-বিভাগের ফর্মও একখানা দাও।'

আগের দিনের মতই সে তাড়াতাড়ি ফর্ম ভর্তি করে, টাকা জমা দিয়ে, রসিদ নিয়েই চলে গেল। অনিমার ভাষায় 'পালিয়ে গেল।' অনিন্দিতা অনিমাকে জনান্তিকে বলল, 'রীতিমতন সন্দেহজনক।' তার কথা অনেকেই শুনতে পেল কিন্তু অনিমার মৃদু উত্তর শোনা গেল না।

হেডমিসট্রেস মিস রায় যদিও খাবারের দোকানের টাকা হারানোর কথা আলোচনা করতে নিষেধ করেছিলেন, তবু দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েরা চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে কথা-বার্তা বলেছিল। অন্যান্য ক্লাসের মেয়েরা চলে যেতেই পর বিভিন্ন ক্লাবের সেক্রেটারিরা যখন টাকার হিসাব মিলিয়ে রাখছিল, মঞ্জুলা বলে উঠল 'আমরা চারজন কি বিনা দোষে চোর হয়েই থাকব, আসল চোরকে ধরবার চেষ্টাও করব না ?'

'কি সব বাজে বকছিস ?' বলল সুমনা, 'কে আবার তোদের চোর বলছে।'

'মুখের ওপর না বললেও মনে মনে সন্দেহ করছে ত,' বলল অনিমা।

জয়তী বলল, 'আমাদের চারজনের ওপর খাবারের দোকানের ভার ছিল তাই দিদিরা মনে করছেন যে আমাদেরই অসাবধানতার টাকা হারিয়েছে।'

'কেবল চারজন—চারজন বলছিস কেন? আরো দুজন ছিল না সঙ্গে?'

অনিমার কথার উত্তরে জয়তী বলল, 'তাদের ওপর ত ভার ছিল না।'

খুব সুবিধা! সুযোগ আছে দায়িত্ব নেই। দু একটা নোট হাতিয়ে নেওয়া যায়।'

'আমাদের চোখ এড়িয়ে হাতিয়ে নেবে কি করে শুনি?' জয়তীর কথার উত্তরে 'এ-কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকলেই নিতে পারবে,' বলল অনিন্দিতা।

জয়তী এবার রেগে গেল। 'বিনা প্রমাণে কারো নামে এরকম অপবাদ দেওয়া তোদের খুব অন্যায়।'

'কে বললে বিনা প্রমাণে বলছি? গত দুদিনের ঘটনাই সব প্রমাণ করছে' বলল অনিমা। মঞ্জুলা যোগ দিল, 'তোরা চোখ খুলেও দেখছিস না কিছু!' সুমনা, মৈত্রেয়ী, বীণা সবাই ততক্ষণে কৌতুহলী হয়ে উঠেছে।

'কি বলতে চাচ্ছিস? কিসের থেকে কি প্রমাণ হচ্ছে খুলেই বল না।'

আমি ক্লাস ইলেভেনের মৃন্ময়ীদের হাঁড়ির খবর জানি। মানে, ওদের হাঁড়ি প্রায় চড়ে না সে খবর জানি'—তার কথায় বাধা দিয়ে সুমনা বলল 'ছি-ছি, চুপ কর! ওরা যে গরীব সে আমরা সবাই জানি।'

'গরীব হওয়াটা ত দোষের নয়,' বলল অনিন্দিতা। 'কিন্তু এত যে গরীব সে হঠাৎ ক্লাবে যোগ দিতে চাইছে কেন?'

অণিমা যোগ দিল, 'আবার একসঙ্গে তিন-তিনটে বিভাগে যোগ দিল! অত টাকা কোথায় পেল শুনি?'

মৈত্রেয়ী বলল, 'মৃণ্ময়ীদের বাড়ির অবস্থা খারাপ বুঝি? আজ সকালে অফিসে গিয়ে দেখলাম সে স্কুলের 'কল্যাণ তহবিলে' পঁচিশ টাকা জমা দিচ্ছে।'

অনিমা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কত টাকা বললি? পঁচিশ টাকা! তবেই দেখ, একেবারে ঠিক ঠিক হিসাব মিলে গেল।'

'তার মানে?' বীণার প্রশ্নের উত্তরে অনিন্দিতা আরও বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলল, 'গতকাল সাহিত্য আর কলা বিভাগে পঁচিশ টাকা করে দিয়েছে আজ দিয়েছে কল্যাণ তহবিলে পঁচিশ, সঙ্গীত বিভাগে পঁচিশ—তার মানে পুরোপুরি একশ! এই একশ টাকাই ত চুরি হয়েছিল।'

বীণা বলল, 'তার মানে হঠাৎ লোভে পরে টাকাটা চুরি করে ফেলেছিল? তারপর অনুতাপ হয়েছে তাই স্কুলেরই নানা কাজে টাকাটা দিয়েছে।'

অনিমা বলল, 'অনুতাপ হবার পাত্রীই নয়। নিজে সাহিত্য সঙ্গীত কলা বিভাগের সুযোগ সুবিধা নেবে সেটা বুঝি স্কুলের কাজ হল ?'

'অমন মেয়েকে কোনো ক্লাবেই নেওয়া উচিত না', বলল মঞ্জুলা, 'তোরা যারা বিভিন্ন কমিটিতে আছিস, অধিবেশনে বলিস যে কোথায় টাকা পেয়েছে তার বিশ্বাসযোগ্য কৈফিয়ৎ না দিলে ওকে যেন না নেওয়া হয়।'

আরো এক কাঠি বাড়িয়ে অনিন্দিতা বলল, 'অমন মেয়েকে স্কুলেই রাখা উচিত নয়। চল না আমরা এখনই গিয়ে মিস রায়কে সব কথা জানিয়ে দিই।'

জয়তী আর সুমনা মেয়েদের উত্তেজিত হতে নিষেধ করল। প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া এতবড় একটা নালিশ কখনই মিস রায় শুনবেন না। এই নিয়ে মেয়েদের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি শুরু হয়ে গেল। অবশেষে স্থির হল যে শর্মিলা স্কুলে ফিরলে তার সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করা হবে।

আনন্দমেলা শেষ হবার পাঁচদিন পরে শর্মিলা প্রথম স্কুলে এল পার্থ একটু ভাল আছে, ডাক্তার বলেছেন যে আর ভয়ের কারণ নেই। তাও শর্মিলা ক্লাসে যোগ দিতে পারে নি। বিকেলের দিকে এসে মিস রায় আর ভারতীদির সঙ্গে দেখা করে তারপর কমনরুমে এসে ঢুকল। মেয়েরা শর্মিলাকে দেখে প্রথমেই পার্থর কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করল। তারপরই সবাই মিলে একসঙ্গে হাঁউমাউ করে তাদের বক্তব্য জানাল। মিস রায়ের কাছে নালিশ করার কথা বলল। শুনে শর্মিলা তো হতবাক! 'সে কি কথা! একটি মেয়ে এতদিন কোনো ক্লাবের মেম্বার হয় নি, এখন হল, তাইতেই তোরা ধরে নিলি যে মেয়েটি চোর! এই স্বাধীন ভারতে তোদের সুবিচার!'

শর্মিলার কথায় দমে না গিয়ে অনিমাও জোরের সঙ্গে বলল, 'তুই ত জানিস না ওদের বাড়ির আর্থিক অবস্থা কত খারাপ। হঠাৎ সে ঝপ করে এতগুলো ক্লাবের মেম্বার হয়ে যাবার টাকা পেল কোথায় ?'

'কোথায় টাকা পেয়েছে না জেনে তার নামে এরকম একটা জঘন্য অপবাদ দিতে তোদের লজ্জা করছে না ?'

'খুব তো মৃন্ময়ীর হয়ে ওকালতি করছিস !' বলল অনিন্দিতা, 'সে যদি না চুরি করে থাকে তাহলে টাকাটা কে নিল ?'

শর্মিলা গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'সে চোরকে আমি ধরে ফেলেছি।'

ঘরের মধ্যে যেন একটা বাজ পড়ল। কিছুক্ষণ নীরবতার পরে সব মেয়েরা একসঙ্গে কলরব করে উঠল, 'চোর ধরেছিস ? কে সে চোর ? কেমন করে ধরলি ? পুলিসে দিয়েছিস ? হেডমিসট্রেসের কাছে সব কথা খুলে বলেছিস্ ?'

নিজের দুই কানে হাত চাপা দিয়ে শর্মিলা হাসতে হাসতে বলল, 'উঃ, কানে তালা লেগে গেল! আস্তে বল। একে একে বল! চোর ধরেছি, কিন্তু পুলিশে দিতে পারি নি। অবশ্যই হেডমিসট্রেসকে জানিয়েছি। চোর হচ্ছেন স্বয়ং আমার বাবা আর মা এবং

তাঁদের সাহায্য করেছিস তোরা সবাই—সুতরাং তোদেরও কিছুটা শাস্তি পাওনা ছিল'—
মেয়েরা সমস্বরে আপত্তি জানাল, 'হতেই পারে না, অসম্ভব !'
'সম্ভব শুধু নয়, সত্যিই হয়েছিল তাই। খাবারের স্টলে এসেই মা কুড়ি টাকার মাংসের চপ আর কুড়ি টাকার পান্তুয়া চেয়েছিলেন—মনে আছে ?'
'মনে আছে বৈকি, আমরা ত তখনই তা দিয়েছিলাম।'
'দিয়েছিলি ঠিকই, কিন্তু তার দাম নিয়েছিলি কি ?'
মেয়েরা এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর ভেবে পেল না।
শর্মিলা আবার বলল, 'মৃন্ময়ী একটা ছোট হাঁড়িতে পান্তুয়া আর বাক্সে চপ সাজিয়ে দিল। তোরা ক্যাশমেমো কেটে দিলি, বাবাকে একশ টাকার নোট বের করতে দেখে ষাট টাকা ফেরত দিলি। ঠিক তখনই পার্থর একসিডেন্টের খবর পেয়ে বাবার নোট তাঁর হাতেই থেকে গেল। মাও বাকি টাকা, ক্যাশমেমো আর খাবার হাতে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। তোরা একজনও খেয়াল করলি না।—নিজেদের মধ্যে পার্থর কথাই আলোচনা করতে লাগলি।'
অবাক হয়ে জয়তী বলল, 'সত্যি ? সত্যি আমরা তাই করলাম ?' সকলের মধ্যেই তখন আপসোস, আহা ! একথা আগে জানলে এত অশান্তি হত না, মিছিমিছি একটা নির্দোষ মেয়েকে সন্দেহ করা হত না !
শর্মিলা আবার বলল, 'পার্থর জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত বাবা-মা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। সে একটু ভাল হতেই মার সব কথা খেয়াল হল, তাড়াতাড়ি আমাকে স্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। তাই বলে আমি ওদের একেবারে রেহাই দিই নি। সেই হারানো একশ টাকার ওপর আরো একশ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছি। তাছাড়া পার্থ সম্পূর্ণ সুস্থ হবার পর মা আমাদের সবাইকে খাইয়ে দেবেন কথা দিয়েছেন।' শর্মিলার কথায় মেয়েরা সোল্লাসে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল।
দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়েরা উত্তেজনায় এমনই চেঁচামেচি করছিল যে একাদশ শ্রেণীর অনেকগুলি মেয়ে কৌতূহলী হয়ে এসে ঘরের দরজার সামনে ভিড় করেছিল। এককোণে মৃন্ময়ীকে দেখে শর্মিলা তার হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এল, 'মেয়েরা, দেখ সবাই, একটি উদীয়মান সাহিত্যিকের সঙ্গে আমি তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি !'
যতই মৃন্ময়ী লজ্জা পেয়ে পালাতে চায়, শর্মিলা তাকে শুধুই শক্ত করে ধরে আর সবাই জিগ্যেস করে, 'সত্যি নাকি ? কি ব্যাপার ? খুলে বল, আমরা শুনি'—
শর্মিলা তার ব্যাগ থেকে একটা নামকরা কিশোর-পত্রিকা আর কয়েকটা খবরের কাগজের সাহিত্য সমালোচনার পৃষ্ঠা বের করল।
'কয়েক মাস ধরে শ্রীমতী লিখছেন, আমরা কিছুই জানতে পারি নি। এইসব কাগজে লিখছে যে একটি অনন্যসাধারণ লেখিকা আত্মপ্রকাশ করছেন। তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।'

সবাই যত অভিনন্দন জানায়, মৃন্ময়ী ততই সঙ্কুচিত হয়ে বলতে থাকে 'না—না, ওসব বাড়িয়ে বলা'…

শর্মিলা আবার জিগ্যেস করল, 'ওরা নাকি তোমাকে চাকরি দেবে?'

মৃন্ময়ী উত্তর দিল, 'চাকরি নয়, নিয়মিত প্রতিমাসে লিখতে বলেছে'—

'তার জন্য পারিশ্রমিক দেবে না কিছু?' আবার প্রশ্ন করল শর্মিলা।

একটু লাজুক হাসি হেসে, মৃদুস্বরে মৃন্ময়ী উত্তর দিল, 'প্রথম সংখ্যার লেখাটার জন্য দুশ' টাকা সেদিন পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই ত এতদিন পরে সাহিত্য বিভাগের মেম্বার হতে পারলাম…আমার কতদিনের শখ।'

দ্বাদশ শ্রেণীর মেয়ের লজ্জিত হতবাক।

প্রতিমাকে, মাকে

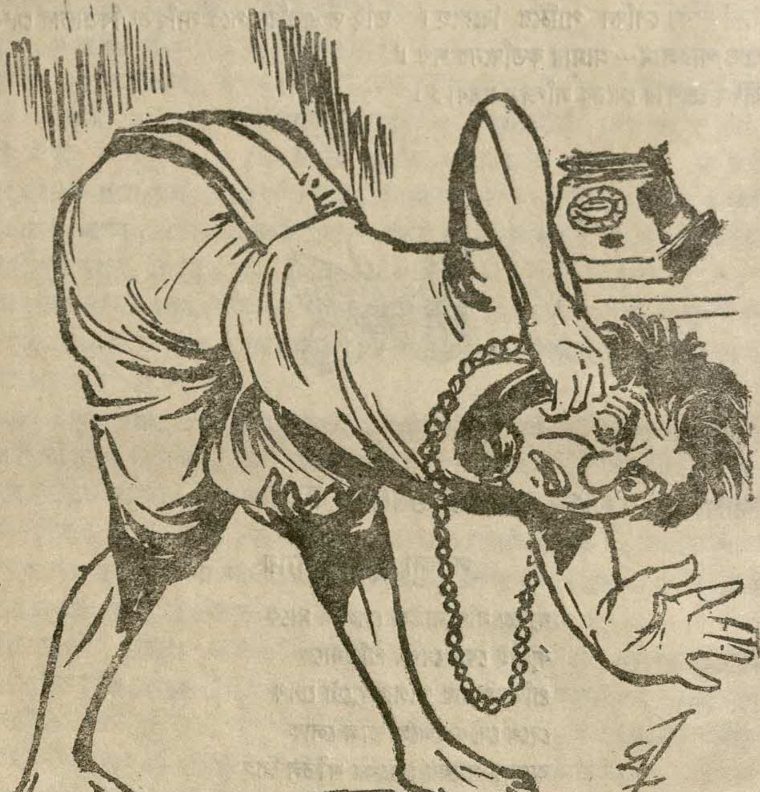
সাধনা মুখোপাধ্যায়

খুঁজে যদি নাইবা পেলাম মাকে
বৃথাই কেন দেখব প্রতিমাকে
প্রতিমা তার ডাগর দুটো চোখ
দেখে দেখে বলছে ভাল লোক
আমার মায়ের চোখের শীতল স্নেহ
বুলিয়ে দিলে জুড়িয়ে যেত দেহ
যদি না পাই দেখব কেন চেয়ে
দেবী যতই হাসুন না রূপ পেয়ে
মাটির মধ্যে মাকে পেলেই তবে
সেজে গুজে যাব যে উৎসবে
মা প্রতিমা এক যদি হন্ ওরে
চলুক পুজো সারা বছর ধরে।

বেহারী

ধীরেন বল

লম্বা পুজোর ছুটি পেয়ে ছোড়দা গেলো দেশের বাড়ী,
ফিরে এলো সঙ্গে নিয়ে নতু নচাকর—নাম বেহারী।



—জানিস সুধা, বেহারীটা ভীষণ রকম কাজের ছেলে—
উন্নতি ঠিক করবে দেখিস একটুখানিক সুযোগ পেলে।
পাড়া-গেঁয়ে, কিন্তু গবেট ভাবিসনেকো বেহারীকে,
বুদ্ধি তুখোড়, ঝোঁক আছে খুব নিতি নতুন শেখার দিকে।

সাহেব বাড়ীর কায়দা-কানুন শেখাই যদি দু-চার দিনে
বেয়ারা কী বেহারী আর পারবি নাকো উঠতে চিনে।
সত্যি কথাই! বাজার করা, জুতো বুরুশ, জামা ঝাড়া,
ইস্তিরী-পাট নিখুঁত অমন হয় না বেহারীকে ছাড়া।
রেডিও বা টেপ বাজানো ফেললো শিখে সব বেহারী,
ক্যামেরাতে ছবি তোলে, টিভি চালায় ইচ্ছে ভারী!
ইচ্ছে ভারী মোটর চালায়, ঘুর ঘুর তাই রোজ গ্যারেজে,
চেহারাতে বুঝবি না তো, ছাই চাপা ঠিক আগুন এ-যে!
বাবা খুশী, আমরা খুশী, এবং খুশী ছোড়দা আরো
অজ পাড়াগাঁ'র জংলী বলে আর কি তাকে ভাবতে পারো?
ইস্কুলে মোর ছুটি সেদিন, ছোড়দা বসে পাশের ঘরে
ভীষণ মনোযোগের সাথে পাশের পড়া তৈরী করে।
কিড়িং কিড়িং—ও-ঘরে ওই টেলিফোনের বেলটা বাজে,
বেহারীটা ওদিকেতেই ব্যস্ত তখন কী এক কাজে,
উঠতে যাবো, আগ বাড়িয়ে দৌড়ে গেলো ও-ই সেদিকে—
তাজ্জব তো! এই ক'দিনে ফোন ধরাও ফেললো শিখে!
ছোড়দাদেরই কলেজের কেউ, অথবা কেউ বাবার চেনা,
মঞ্জুমাসী না যদি হয়, ঠিক তবে ও বন্ধু হেনা।
দু চার মিনিট নেই তো সাড়া, রং নম্বর হয়তো হবে,
নয়তো লাইন কেটেই গেছে, ব্যাপারটা কি দেখতে হবে!
—ও আবার কি, ও বেহারী? ফোনটা নিয়ে কেমন যেন
ঘাড় বেঁকিয়ে হুমড়ি খেয়ে দাঁড়িয়ে আছো অমন কেন?
বেহারী কয়, হেলো হেলো—বলছে খালি বারে বারে,
হেলেইছি তো, আরো হেলবো? আরো হেলতে কেউ কি পারে?



ম্যাঁও

কুমারেশ ঘোষ

সেদিন আমাদের ক্লাবে সানি আর মণির তর্ক লেগে গেল।

সানি বললো, দ্যাখ, কোনো কিছু শিখলেই হয় না, সেই সঙ্গে সেটা প্রয়োগ করতেও শিখতে হয়।

মণি বললো, কিন্তু তার আগে সেটা শিখতে হবে তো? না শিখলে প্রয়োগ করবি কি করে? শেখাটাই বড় কথা।

সানির কথা এবং প্রয়োগটাও কাজে লাগানো দরকার! ধরো চিকিৎসে বিদ্যে শিখলে, অথচ কাজে লাগাতে পারলে না কোথাও! কি লাভ হলো শিখে। তুই তো বলেচিস, বি-কমে তখন ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখেছিলি, পরে ফ্রান্সে গিয়ে সে ভাষা কাজে লাগাতে পারলি নে, ইসারায় কাজ সারতে হয়েছিল, তাতে তোর ঐ ভাষা শেখাটাই বাজে হলো—

এমন সময় আমাদের নন্তেদার হঠাৎ প্রবেশ এবং যথারীতি চৌকিতে জোড়াসন হয়ে বসে প্রশ্ন: কী ব্যাপার? এত গণ্ডগোল কেন?

আমি বললাম, ভীষণ সমস্যা। কোনটা বড়? শিক্ষা না প্রয়োগ!

নন্তেদা পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে জোরসে দু নাকে টেনে নিয়ে বললো, তবে শোন।

আমি বললাম, তার আগে শুনি, তুমি নস্যি ধরলে কবে ?

—রিসেনটলি। এক মাড়োয়ারি বন্ধু এই নেশা ধরিয়েচেন। রাজস্থানী সেনটেড নস্যি! পার্কে সকালে বেড়াবার বন্ধু। কোটিপতি। এখন আমার নস্যি সাপ্লায়ার!

সানি বললো, থাক ওকথা। তুমি বলো, কোনটা বড়। শিক্ষা না প্রয়োগ ?

নন্তেদা বললো হেসে, আমি কিসসু বলবো না, একটা গল্প শুধু—

—তাই বলো। মণি বললো।

নন্তেদা শুরু করলো—

দ্যাখ রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে। তোরা পড়েচিস নিশ্চয়ই—খাঁচার পাখী ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখী ছিল বনে। একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে, কি ছিল বিধাতার মনে॥ তেমনি একদা এক বাঙ্গালী চোরের সঙ্গে এক বিহারী চোরের আলাপ হলো এক জেলে—এই ছিল বিধাতার মনে!

আমি হেসে বললাম, তবে কবিতা, ঠিক কথায় প্যারডি করে বলি—বাঙ্গালী চোর ছিল নগর কলকাতায়, বেহারী চোর ছিল পাটনায়। একদা জেল বাসে দেখাটি হলো দোঁহে—চুরি হওয়া দুই ঘটনায়।

—বাবা!—নন্তেদা আমার পিঠে চাপড় মেরে বললো, গুড্ গুড্ ভেরি গুড্! আজ থেকে তুই এই ক্লাবের সভাকবি

সানি-মণি দুজনেই বাধা দিলো—বেলাইনে চলে যাচ্চো নন্তেদা। এটা সম্বর্ধনা সভা নয়। তারপর কি হলো বল—

মনে মনে বুঝলাম, ওরা দুজনেই আমার প্রশংসায় খুশি নয়, তাদের মধ্যে কে প্রশংসা পাবে নন্তেদার তাই নিয়ে চিন্তা!

নন্তেদা বললো, জেলের মধ্যে দুই বি আর বা চোরের হলো মনের মিলন। বিহারী চোর বললো, ওস্তাদ তোম কলকাত্তাকো আদমী হো। তোম্ মেরা গুরু। বাতলাও চোরিকা কায়দা।

বাঙ্গালী চোর বললো বাংলায় শোন তবে। আমি একটা গৃহস্থের বাড়িতে গেছি চুরি করতে। খুব সাবধানেই গেছি। কিন্তু অন্ধকারে পায়ের কাছে একটা কাঁসার গেলাস ছিল, ঠেকতেই উল্টে গিয়ে ঠং করে একটা শব্দ হলো। গিন্নী শব্দ শুনে চেঁচিয়ে উঠলো কে? আমি তখনি আড়ালে সরে গিয়ে মুখে শব্দ করলাম, ম্যাও! আমি যেন বেড়াল। গিন্নী ভাবলে, বেড়াল গেলাস ফেলেচে। তাই আবার পাশ ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমিও কাজ সেরে দিব্যি বেরিয়ে এলাম।

শুনে বেহারী চোর বললো, বাহবা-বাহবা ওস্তাদ! তোমকো বহুৎ বুদ্ধি হো। তোমকো ই শিকশা হাম কামমে লাগায়গা।

মণি বললো, তারপর কি হলো ?

নন্তেদা বললো কেন, এত তাড়া কিসের? তারা মেয়াদ মত জেল খাটবে, তবে তো ?

সানি বললো, তা একদিন তো ছাড়া পেলো তারা।

—হ্যাঁ, পেলো।—নন্তেদা বললো, এবং যে-যার জায়গায় চলে গিয়ে যে-যার কাজ শুরু করলো আবার।…এই যেমন বিহারী-চোরটা তার নতুন গুরু বাঙ্গালী-চোরটার কাছে নতুন শিক্ষা পেয়ে পাটনাতেই একটা বাড়িতে চুরি করতে গেল। আর প্রায়ই একই রকম কাণ্ড! অন্ধকার ঘরে মেঝেয় একটা পেতলের থালায় পা লাগতেই ছিটকে গেল সেটা। শব্দে ঘুম ভেঙে গেল বাড়ির গিন্নীর। চেঁচিয়ে উঠলো, কৌন হ্যায়? বিহারী চোরটা তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে গিয়ে বললো, বিল্লী হ্যায়।

বিল্লী হ্যায়! অথচ মানুষের গলা। গিন্নী তাড়াতাড়ি কর্তাকে ঠেলে তুললো। তারপর দুজনে চোরকে ধরে ফেললো। তাদের চিৎকারে আরো লোক জড়ো হয়ে গেল এবং আচ্ছামত ঠ্যাঙ্গানি।

বলেই উঠে দাঁড়ালো নন্তেদা, তোদের তর্কের এই হচ্ছে উত্তর। চলি—

সানি আর মণি দুজনেই হ্যাণ্ডশেক করলো। ঠিক আমরা দুজনেই, ফিফটি-ফিফটি।

বাঘ ভালুকের গান

রাখাল বিশ্বাস

বাঘ ভালুকের ডাক শুনেছি নদীর ধারে
ডাক না কিসের ঝগড়াঝাটি বারে বারে
বুক কাঁপানো জঙ্গলা বাতাস পথটি ঘিরে
থমকে থাকে জ্যোৎস্না দিয়ে যায় না ফিরে
ফিরবে কোথায় ঠিক জানেনা পাহাড় ঘেঁষা
মুল্লুকে নেই ঘর বাড়ি তার শূন্যে মেশা
জল থৈ থৈ নৌকো চলে দীঘির পাড়ে
বাঘ ভালুকের ডাক শুনিনা সেই কিনারে
ডাকবে কি আর, কেউ কি ডাকে? ভাব জমেছে, খেলা
শুনতে পেলুম গান জুড়েছে এই বেলা, সেই বেলা॥

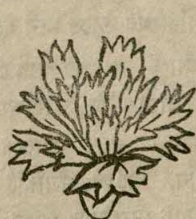
———



বনে এলো বাঘ

সুবোধ দাশগুপ্ত

শহর থেকে বনে এলো বাঘ,
বনের রাজা রাগলো মনে মনে।
তার যারা সব পশু ছিল বনে
বললে সবাই, আইন ভাঙা কেনে ?
চোখ পাকিয়ে রাজা বলেন হেঁকে—
কেমন করে সাহস পেলে ব্যাটা ?
স্বভাবে সে আস্তো একটা ঠ্যাটা !
করছেটা কি শহর থেকে এসে ?
বনের মধ্যে চলতো দেখি গিয়ে
সত্যি সত্যি খুঁজছে না তো কনে !



একটি দুটি, চারটি শালিক



কিন্নর রায়

টালিগঞ্জ ব্রিজের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া রিক্সার ভেতর থেকে বাপটু বেলা তিনটে চারটের মেঘলা পৃথিবী দেখতে পেল।

ব্রিজের নিচে এখন অনেক জল, ঘোলা। ছলছলে। তার ভেতর সাঁতারের ধুম। অথচ এই দিন পনের আগেও, যখন একেবারেই বিষ্টি ছিল না, বাপটু দেখছে ব্রিজের নিচে খালের বুক প্রায় শুকনো খটখটে।

দীনুদা খুব আস্তে প্যাডেল করছে। বেশ গায়ের জোর দিয়ে। পোলের চড়াই বেয়ে বেয়ে উঠতে হচ্ছে এখন। আজ শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল বাপটুর। এখন কটা দিন একটু নিশ্চিন্ত। উল্টো দিকে অনেকগুলো বাস লরি, অটো রিকশা, মিনি বাস। বাপটুর পাশে পাশে খুব ধীরে উঠে আসছিল একটা ছোট ম্যাটাডোর ভ্যান। তার ওপর জনা চার/পাঁচ মানুষকে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখতে পেল বাপটু। একেবারে ভিজে সপসপে, বিষ্টিতে। মাথায় গামছা! জামা ভিজে সেঁটে গেছে গায়ে।

দুহাত দিয়ে ছপ ছপ করে জল থাবড়াচ্ছে। বড় বড় অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে মাছের ছোট পোনা। পুকুর বদল হচ্ছে। বাপটুর রিক্সা ব্রিজের চড়াই, জ্যাম ঠেলে ঠেলে একটু একটু করে মহাবীরতলার দিকে এগোচ্ছে। পাশে পাশে সেই মাছের হাঁড়িঅলা টেম্পো। মিনিবাস। খুব আস্তে, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।

ক'দিন হলো বিষ্টি নেমেছে আকাশ কালো করে। তেমন গা-পোড়ানো গরম আর নেই। আকাশে এখনও যেমন ভারি ভারি মেঘ তাতে মনে হচ্ছে এক্ষুনি ভেঙে পড়বে বিষ্টি।

ভিড় ঠেলতে ঠেলতে মহাবীর তলা। তারপর আর তেমন জ্যাম নেই। কেবল মহাবীর তলায় বড় নর্দমার জন্যে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, তার জন্যে একটু জল আর কাদা। গাড়ি, মানুষ চলতে সামান্য অসুবিধে। ওটুকু পেরিয়ে যেতে পারলেই আবার অনেকটাই ফাঁকা। ভাটিখানা, কলাবাগান, খাটাল, সিরিটি শ্মশান আর সিরিটি মোড়। দিন দুই আগেও মোড়ে সাইকেল সারাই দোকানের পাশে, শহিদ বেদীর গায়ে একটা রথ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে বাপটু। ফাঁকা রাস্তার গায়ে রথের মাসিবাড়ি।

উল্টোরথ মিটে যাওয়ার পর সেই জায়গা ফাঁকা। রিক্সা বাঁক নিয়ে মোড় পেরিয়ে যেতে

যেতেই বাপটু দেখতে পেল গোটা আকাশটা চারপাশে বিষ্টি হয়ে ভেঙে পড়ছে। আকাশ সাদা করা বিষ্টি।

এই বিষ্টির মধ্যেও জল-কাদা গর্ত বাঁচিয়ে খুব ধীরে প্যাডেল করছে দীনুদা। রিক্সার সামনের ঢাকনা পেরিয়ে বিষ্টির ছাট বাপটুকে ভিজিয়ে দিচ্ছে। দীনুদার মাথায় ছোট্ট শাদা একটুকরো প্লাস্টিক। শাদা বিষ্টি, শাদা প্লাস্টিক, ঘোলাটে মতো আকাশ সবই যেন একই রঙে কেউ এঁকে রেখেছে।

বাড়ি পেঁছিতে পেঁছিতেই অনেকটা ভিজে গেল বাপটু।

গেলটুকাকু এই বিষ্টিতে ছাদের অ্যানটেনায় বসিয়ে দিয়ে এসেছে মেঘদূতকে। আকাশ-জলে ভিজতে ভিজতে মেঘদূতের গলা খুশির গান। লম্বা ডানা ঝাপটে ঝাপটে বিষ্টি বরণ করছে মেঘদূত।

কি ভেবে ওকে অ্যানটেনা থেকে নামিয়ে এনে ছাদের কার্নিশে বসালো গেলটুকাকু। তারপর একই সঙ্গে দুজনে ভিজতে লাগল!

ঠামুইকে খুঁজতে খুঁজতে ছাদের সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত এসে এমন ছবি দেখে বাপটুর দাঁড়িয়ে পড়া। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আর লেখার বোর্ড পেন রেখেই খিদে। খিদে। খোঁজ ঠামুইয়ের খোঁজ।

খালি গায়ে শুধু পাজামা পরা গেলটুকাকু আর তার পোষা বাজপাখি মেঘদূত— দুজনেই একসঙ্গে দোতলার ছাদে ভিজছে। খুশিতে মাঝে মাঝে ঠোঁট বাড়িয়ে গেলটুকাকুর জুলপি চুলকে দিচ্ছে মেঘদূত। গেলটুকাকু নিশ্চয়ই আজ কলেজ যায় নি। সিঁড়ির মেঘলা মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মেঘদূতের আদর দেখতে দেখতে হঠাৎ মায়ের জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল বাপটুর। আর তখনই বাপটু শুনতে পেল মালতীপিসি তার নাম ধরে খুব জোরে জোরে ডাকছে।

ঠামুইয়ের তৈরি করা বেশি ঘি আর কাজু কিশমিশ দেয়া হালুয়া আর মালতীপিসির ভাজা গরম গরম লুচি খেতে খেতে বাপটু শুনতে পেল ঠামুই বুকনদাদের বাড়ি গেছে। গ্যাসের নীলচে আঁচে মালতীদির মুখের এক পাশটা দেখা যাচ্ছিল রান্নাঘরের ভেতর থেকে। সেখানে এখন ভুমের পাতলা মতো আলো।

খাওয়ার ঘরে টেবিলে লুচির ফুলকো ভাঙতে ভাঙতে বাপটু মনে হলো এখনই ছুটে চলে যায় ঠামুইয়ের কাছে। স্কুল থেকে ফিরে ঠামুইয়ের সঙ্গে দেখা না হলে মনটা যে কিরকম করে ওঠে। আর এক ছুটে ঠামুইকে জড়িয়ে ধরলেই মাথা থেকে উঠে আসা জবাকুসুমের গন্ধ।

আকাশ চিরে কোথায় যেন বাজ পড়ল। তার নীলচে মতো আলো ঢুকে পড়ল বাপটুদের রান্নাঘরেও। সেই আলোয় মালতীপিসির মুখটা পুরোপুরি দেখতে পেল বাপটু। একটু পরেই ঘড় ঘড় ঘড়াম শব্দে বাজের আওয়াজ চারপাশের পৃথিবীকে ছিঁড়ে ফেলল।

ভিজে ভূত গেলটুকাকু আর মেবদ্ত সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে একতলায়। শিস দিয়ে দিয়ে গেলটুকাকু গাইছে—'উই আর ইন দ্য সেম বোট ব্রাদার।'

মালতিপিসি চা—। বলতে বলতে ভিজে পা-জামার শব্দ তুলে বাড়ির ভেতর কোন অন্ধকারে যেন মিশে গেল গেলটুকাকু।

বিষ্টি কমে গেছে। এখনও দ্ব এক ফোঁটা। আকাশে লেগে আছে সন্ধ্যে নামার আগের ফিকে আলোটুকু।

কাউকে কিচ্ছুটি না বলে গেট খুলে বাপটু এক ছুটে রাস্তায়। বেরিয়ে যাওয়ার আগে তার মাথার ওপর ক'দিন আগে ছেঁটে নিয়ে যাওয়া নিমগাছ থেকে একটা হলুদ ফল কখন যে দ্ব ফোঁটা জলের সঙ্গে টুপ করে খসে পড়ল, বাপটু টেরও পেল না। কাদা জল মাড়িয়ে খালি পায়েই বুকনদাদের বাড়ি।

লোহার রেলিংয়ের গেট ঠেলে ঢোকার মুখে যে ঝাড়ালো সবুজ আমগাছ, তার নিচে, চারপাশে বেশ ভিড়। সেখানে ঠাম্মই, বুকনদার ঠাম্মই, বুকনদাদের কাজের লোক ঝর্ণাদি, বুকনদাদের পোষা হুলো গদাইলস্কর, বকুনদার ছোট ভাই টুকন—সকলেই হাজির।

সবুজ সবুজ অন্ধকারের ভেতর আমগাছের ডালে বসা দুটো শালিক পরিত্রাহি চাঁচাচ্ছে। গদাই লস্কর সেদিকে মুখ তুলে গম্ভীর সুরে মেঁয়াও ডেকে গোঁফ নাচাচ্ছে। আর ঠাম্মই, বুকনদার ঠাম্মই—সকলেই বেশ উত্তেজনার ভেতর। শাদার ওপর নীল ফুল তোলা ফ্রক পরা ঝর্ণাদির কালো একজোড়া পা এই অন্ধকারে প্রায় মিশে গেছে। শুধু ওর ঝকঝকে দাঁত হাসছে দেখা যাচ্ছে।

শালিকের একজোড়া বাচ্চার ওড়ন-পর্ব চলছে ক'দিন ধরেই। আর উড়তে গিয়ে হাওয়ায় না ভাসতে পেরে অপলকা ডানা নিয়ে ওরা প্রায়ই মুখ গুঁজরে পড়ছে মাটিতে। ফলে শালিক-মা আর বাবার জোর গলায় চ্যাঁচামেচি। গদাইলস্কর তালে আছে বাচ্চা শালিক দিয়ে টিফিন সারবার। তাই প্রায় সব সময়েই এখন আমগাছের নিচে ওত পেতে।

সকাল থেকে বার দুই পড়ে যাওয়া বাচ্চাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেট বলের মতো ছুঁড়ে দিয়েছে ঝর্ণাদি। আর তারা কেমন দিব্যি গেঁথে গেছে ডালপালা, পাতার সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা-র চ্যাচামেচি, কান্নাকাটি শেষ।

এবারও এই শেষবেলায় দুটো বাচ্চার একটা মাটিতে। বোধহয় ঝড়-বিষ্টির টানেই। গদাইলস্কর আর ঝর্ণাদি একই সঙ্গে দৌড়ে এলো। আর এবারও জিতে গেল ঝর্ণাদি। তারপর পা দুটো একটু ফাঁক করে কোমরের ওপর একটা ছোট্ট ঢেউ তুলে শালিক বাচ্চাটাকে দিব্যি গাছের ডালে ফেরত পাঠিয়ে দিল। তার দুপাটি শাদা দাঁতই শুধু মুছে আসা আলোর ভেতর দেখতে পাচ্ছিল বাপটু।

কালচে খয়েরি পাখনা আর চোখের পাশে হলদে মতো বর্ডার টানা মা-বাবা বাচ্চা পেয়ে এবারও খুশিতে কিচকিচ, কুচকুচ, ক্যাচ ক্যাচ করে উঠল। গদাইলস্কর সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তির

হাই তুলল একটা। অন্ধকারেও তার সরু ঝকঝকে দাঁত দেখতে পেল বাপটু, সঙ্গে সঙ্গে বুকের তলায় শিরশির।

ছোট্ট জিভ বের করে গদাইলস্কর দুবার ঠোঁট আর গোঁফ চেটে নিয়ে আবার মাটিতে বুক-পেট ঠেকিয়ে, সামনের দু-পা মেলে বসল।

শালিক-মা, বাবা খুব ডাকছে। বাচ্চা দুটোও।

অন্ধকার গাছতলা এবার ফাঁকা হয়ে গেল।

ঠামুইয়ের হাত ধরে বাপটু এবার বাড়ি ফিরে যাবে। সেই গন্ধ তেলের চেনা ঘ্রাণ উঠে আসছে ঠামুইয়ের গা থেকে।

নিজের মায়ের জন্যে মন খারাপ করতে করতে বাপটুর শালিক ছানা হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

হাইড্রোকার্বন

গোপাল লাহিড়ী

সোনামন সোনামন
চল সুন্দরবন
জল আছে ডাঙা আছে
আছে মধু চন্দন
গাছে গাছে পাখী আছে
বনবিবি বাদাবন
দিনে রাতে শুনি শুধু
মরণের সবেমণ
তবু করি খোঁড়াখুঁড়ি
ঘটে যদি অঘটন
জানি আছে নিশ্চয়
হাইড্রোকার্বন

বাবুয়া

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়



বাবুয়া বাঁদর খেলা দেখায়। বাঁদরটা দেখতে পুঁচকে কিন্তু পুঁচকে হলে কি হবে, বেশ বয়স হয়েছে। বাবুয়া ওর নাম রেখেছে বুড়ি। এই বুড়ি, বাবুয়া তোর খেলা দেখতে চায়, খেলা দেখা। ডুগডুগি বাজাতে শুরু করে বাবুয়া আর অমনি নানা অঙ্গ-ভঙ্গি করে বুড়ি খেলা দেখায়। যারা খেলা দেখে তারা হাততালি না দিয়ে পারে না।

বুড়ি বাবুয়াকে খুব ভালবাসে। দুজনে হরিহর আত্মা। যেদিন বেশি পয়সা রোজগার হয় না, সেদিন বুড়ির মনটাও বেজার হয়ে থাকে। খাবার জন্য বাবুয়ার কাছে খুব একটা পীড়াপীড়ি করে না। কিন্তু যেদিন থলি ভর্তি পয়সা হয়, সেদিন বুড়িকে আর পায় কে! বায়না ধরে,এটা খাব, সেটা খাব! বাবুয়া ওকে কলা কিনে খাওয়ায়, বাদাম কিনে খাওয়ায়। বুড়ি যা খেতে চায় তাই খাওয়ায়।

এই ভাবেই তাদের দিন চলে যাচ্ছিল। এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, সেখান থেকে আর এক গ্রামে ঘুরে ঘুরে, এই ভাবেই। ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওরা অচেনা একটা গ্রামের কাছে এসেছে, ভীষণ বৃষ্টি নেমে গেল। বৃষ্টি নামলে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় ওদের। বৃষ্টির মধ্যে তো আর লোক জড় করে খেলা দেখান যায় না, পয়সাও রোজগার হয় না।

বাবুয়া বলল, বুড়ি, দেখলি তো আমাদের কপাল, বৃষ্টি নেমে গেল।

বুড়ি আর কি করে, হাত পা নেড়ে বোঝাল, বৃষ্টিতে ভেজার চেয়ে আগে চল তো কোথাও আশ্রয় নেই। বলতে বলতে বুড়ি বাবুয়ার কাঁধে চেপে বসল।

বাবুয়ার পিঠে ঝোলা, কাঁধে বুড়ি। ওই অবস্থাতেই ছুটতে ছুটতে একটা ভাঙা পুরোন মন্দির দেখে তার মধ্যে ওরা সেঁধিয়ে বসল।

মন্দিরটার এপাশে ওপাশে অনেকগুলি বড় বড় গাছ। বেশ ঝাপড়ানো গাছ। ধারে কাছে কোন বাড়িঘর নেই। বাবুয়া এপাশ ওপাশ ভাল করে দেখে নিল, আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ ভীষণ কালী মুখ করে রেখেছে। না জানি সারা রাত ধরে বৃষ্টি হয়। কেন যে এই গ্রামের দিকে এলাম, মনে মনে ভাবতে থাকে বাবুয়া।

আর ঠিক এই সময় বুড়ি হঠাৎ বাবুয়ার কাপড় ধরে টানতে থাকে। কিছু একটা যেন হয়েছে।

—কি হয়েছে রে বুড়ি ?

বুড়ি তার পেটে চাপড় মেরে দেখায়, খিদে পেয়েছে।

—খিদে তো আমারও পেয়েছে, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যে বেরুব কি করে। তাছাড়া জায়গাটা আমাদের চেনা নয়, ধারে কাছে দোকান টোকান তো দূরের কথা একটা বাড়িও দেখা যাচ্ছে।

বুড়ি নাছোড়বান্দা। বাবুয়ার কাপড় ধরে টানতে টানতে দরজার কাছে নিয়ে আসে। তারপর আঙুল তুলে একটা গাছের দিকে দেখায়।

তাই তো, বাবুয়া অবাক হয়ে যায়, একটা গাছে মেলাই পেয়ারা পেকে আছে।

খুব লোভ হয় বাবুয়ার। কিন্তু পরের গাছে উঠে পেয়ারা পেড়ে খাওয়াটা কি উচিত হবে। যার গাছ সে যদি দেখে, লাঠি পেটা করবে।

বাবুয়া বলল, না রে বুড়ি, ওগাছ থেকে পেয়ারা খাওয়া উচিৎ হবে না।

বুড়ি ভীষণ রেগে গেল, ভাবখানা এরকম, যেন খিদে পেয়েছে, খেতে দোষ কি!

বাবুয়া বলল, তুই তো বাঁদর, তুই বুঝবি না দোষ কি। মানুষদের নানা রকম নিয়ম কানুন আছে। যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না মানুষ।

বুড়ি গ্রাহ্য করল না বাবুয়াকে। এক লাফে বৃষ্টির মধ্যে নেমেই গাছে উঠে পড়ল। চিবিয়ে চিবিয়ে বেশ কয়েকটা পেয়ারা খেয়ে কয়েকটা মন্দিরের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল।

ভয়ে বাবুয়ার মুখ শুকিয়ে এল। কিন্তু কপাল ভালো একটা লোককেও ধারে কাছে দেখা গেল না।

ওদিকে বুড়ি ততক্ষণে পেট বোঝাই করে খেয়ে গাছ থেকে লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে এল। তারপর বাবুয়ার জন্য মাটিতে ফেলা পেয়ারাগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে সব মন্দিরের মধ্যে নিয়ে এল।

বাবুয়া আর কি করে, একে একে পেয়ারাগুলি খেয়ে পেট ভরিয়ে নিল। তারপর দুজনে মন্দিরের ভেতরেই চুপটি করে শুয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে বিকেল ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামল, সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত। মন্দিরের ভেতরে তখন ভীষণ অন্ধকার। কিন্তু বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে তো পড়ছেই।

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙে গেল বাবুয়ার। তাকিয়ে দেখে মন্দিরের ভেতরে জল ঢুকছে।

কি ব্যাপার, এত জল আসছে কোথা থেকে, বন্যা নাকি! ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল ওর। ততক্ষণে বুড়িও লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। বাবুয়া দরজার কাছে এসে দেখে বাইরে জল ছাড়া আর কিছুই নেই। সামনের গাছগুলোর অর্ধেকটা জলে ডুবে গেছে। মাটির চিহ্ন কোথাও নেই।

—কি হবে রে বুড়ি, বান ডেকেছে যে।

বুড়ির মুখও শুকিয়ে এসেছে বোঝা যায়। জল যদি আরো বাড়ে তাহলে তো এই মন্দিরের মধ্যেও থাকা যাবে না। কি হবে তাহলে?

ভগবানের নাম নিতে থাকে বাবুয়া। আর জলের দিকে তাকায়, ঢেউ খেলতে শুরু করেছে জলে। এক একটা ঢেউ আসে আর জলের মাত্রাও বাড়ে।

বাবুয়া লক্ষ্য করল ওর কোমর অবধি জল হয়ে গেছে। নাহ্ এবার বাঁচার রাস্তা দেখতে হয়। কিন্তু কিভাবে বাঁচা যাবে জল থেকে। এই বুড়ি কি করবি রে?

বুড়ি জলের ভয়ে বাবুয়ার কাঁধে চড়ে বসেছিল। শক্ত করে বাবুয়ার মাথাটা ধরে রেখেছিল।

আবার একটা ঢেউ এলো। এবার প্রায় বুক অবধি জল হয়ে গেল। নাহ্ এবার সাঁতার কাটা ছাড়া উপায় নেই। সাঁতরে কোন একটা গাছে উঠতে না পারলে আর রক্ষা নেই।

এই বুড়ি তুই আমার পিঠে আয়, আমি সাঁতার কাটব!

বলতে বলতে বাবুয়া জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর ঠিক তক্ষুণি বুড়ি তড়াক করে একটা লাফ দিয়ে মন্দিরের একেবারে চুড়োয় গিয়ে উঠে বসল।

বাবুয়া ভাসতে শুরু করল জলে। কিন্তু এ জলে কি সাঁতার কাটা যায়, উলটো পাল্টা ঢেউ। অনেক কষ্টে হ্যাঁচর প্যাঁচর করে বাবুয়া একটা গাছ ধরল। তারপর গাছ বেয়ে বেয়ে বেশ খানিকটা উপরে উঠে বসল।

চিৎকার করে বুড়িকে বলল, বুড়ি সাবধানে থাকিস, পড়ে যাস না যেন।

বুড়িও মন্দিরের চুড়ো থেকে কিঁচির মিচির করে জবাব দিল, অর্থাৎ যেন বলল, তুমি সাবধানে থেক গো। আমার জন্য ভেবো না।

সারাটা দিন প্রায় ওই ভাবেই বসে বসে কাটিয়ে দিল ওরা। বিকেলের দিকে একটা রিলিফের নৌকো দেখা যেতেই বাবুয়া চিৎকার করে উঠল—বাঁচাও, বাঁচাও।

রিলিফের নৌকো এগিয়ে এসে বাবুয়াকে গাছ থেকে নামিয়ে নৌকায় তুলল। বাবুয়া বলল, মন্দিরের চুড়োয় ওই দেখ বুড়ি বসে আছে, ওকে নামাও।

সবাই তাকিয়ে দেখে একটা বাঁদর। হো হো করে হেসে উঠল সবাই।

বাবুয়ার কথায় কান না দিয়ে নৌকো ছেড়ে দিল ওরা। বাবুয়া চিৎকার করে উঠল, বুড়িকে বাঁচাও, বুড়িকে বাঁচাও।

কিন্তু কে শোনে সে কথা। ওরা গ্রাহ্যই করল না বাবুয়াকে।

আর ঠিক এই সময়, সবাই অবাক, বুড়ি তিন লাফে একেবারে নৌকোয়। তারপর আর এক লাফে একেবারে বাবুয়ার বুকে। বাবুয়ার গলা জড়িয়ে ধরে চিঁচিঁ করে কাঁদতে লাগল বুড়ি।

বাবুয়ার চোখ দিয়েও ঝরঝর করে জল গড়াতে লাগল।

———



আমার নাম শিবদাস চৌধুরী, কিন্তু শিবু নামটাই আমার ভাল লাগে।

আমরা থাকি মফঃস্বলে, সহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ট্রেনে করে একবার বাবার সঙ্গে সহরে গেছিলাম।

আমার এখানে অনেক বন্ধু। স্কুলে পড়লে বন্ধুত হবেই। সবারই হয়। এদের মধ্যে চরণের সঙ্গে আমার ভাব খুব। সে বড় মজার মজার কথা বলে আর হাসে আবার ছুটতে ছুটতে লাফ দেয়। ওদের বাড়ি আমাদের বাড়ির কাছে, কিন্তু খুব কাছে নয়। আমাদের বাড়ির পেছনে আমবাগান তারপর কত কি গাছপালা। তার মধ্যে একটা বুড়ো তেঁতুল গাছ আছে। আমাদের ক্লাশের এক সহরের ছেলে সে নাকি আগে তেঁতুল গাছ দেখেনি। সেই তেঁতুল গাছের পর একটা বাঁশঝাড়। সেখান থেকে সন্ধ্যেবেলা শিয়ালের ডাক শোনা যায়। বাঁশবাগানের পরে আছে আবার পুকুর। সেই পুকুরের পাড় দিয়ে ঘুরে ঘুরে উঁচুনীচু রাস্তা পেরিয়ে গেলে তবে চরণদের বাড়ি। ওরা সকলে ছোট জাত বলে অনেকে মেশেনা ওদের সঙ্গে। ওর মাঝে একবার জিগ্যেস করতে সে বলল, আমরা ত গরীব মানুষ বাবু। দেখছ না আমাদের বাড়ির চেহারা? মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। একটা দরজা—তোমাদের বাড়ি কতো ভাল।

তা হোক চরণকে আমার ভাল লাগে। ছোট জাত, বড় জাত আমি অত বুঝি না।

ওদের বাড়ি গেলে চরণের মা কত যত্ন করে আমায় মুড়ি খেতে দিয়েছিল। আমি অবশ্য সব খাইনি।

আমার মা একদিন বললেন, তা তুই ওদের বাড়ি যাস কেন? তোর স্কুলের ছেলেরা নিন্দে করে না?

হ্যাঁ, শান্তনু প্রায়ই যা-তা বলে। তা আমি যাব না কেন? চরণও ত স্কুলে পড়ে, আর সে যে আমার বন্ধু। কত খেলি আমরা। জানো মা, চরণের জামা আর প্যাণ্ট একদম বাজে। একটু আধটু ছেঁড়া, তার ওপর ময়লা। কেন ও যে পরিষ্কার ভাল পোশাক পরে না জানি না। সব্বাই ত পরে।

মা বললেন তুই ত বলছিস, ওরা কিনবে কি করে বলত। অত পয়সা কি আছে ওদের? ওদের বেশি চাষের জমিও নেই আর ওর বাবা ত কাজ করে রং কলে। কত আর মাইনে পায়। যাও—এখন এসব কথা থাক। থার্ড মাষ্টারের হোমটাস্কগুলো করে ফেল গিয়ে।

একদিন গেছি চরণদের বাড়িতে। বাড়ির বাইরে একটা গাছের দিকে আমার চোখ পড়ল। দেখি বড় বড় পাতা কিন্তু ফুলগুলো সাদা সাদা কী সুন্দর।



চরণ, এটা কাদের গাছ রে?

আমাদের।

কি গাছ এটা?

তাও জান না? একে বলে চালতা গাছ। চালতা জানিস?

জানি।

তোমার মত খোকাকে নিয়ে কে কি করবে? চালতা ফুল দেখিস নি? একটা গল্প শুনবি? একদিন একটা পাকা পেয়ারায় কামড় দিয়েছি অমনি একটা পোকা বেরিয়ে পড়ল। সে বলল কি জানিস? এটা মশাই আমার বাড়ি, আমি থাকি এখানে। এটা খাচ্ছো কেন?

কি বললি তুই? বলে উঠি আমি।

বললুম, বেশ করব, খাবো—পোকাটার কি সাহস রে, বলল, খবরদার খাবে না। তোমার বাড়ি যদি আমি খাই তখন কি হবে?

হা-হা-হা। আমি হেসে ফেললুম। বললুম, চরণ তোর যত উদ্ভুট্টি গল্প। শোন, আমায় একটা ফুল পেড়ে দিবি কি না তাই বল।

চরণ বলল আর গাছ যদি বলে, অ্যাই, আমার ফুল তুমি ছিঁড়ছ কেন হে? তখন কি হবে? আমি খুব হাসতে লাগলুম। চরণ বলল, দাঁড়া। ঐ গাছে ওঠা শক্ত, একটা মই নিয়ে আসি।

তারপর সে মই নিয়ে এল কোত্থেকে আর তর তর করে উঠে গিয়ে একটা ফুল ছিঁড়ে আনল। আমি খুশী হয়েছি দেখে ওর কী আনন্দ।

বাড়িতে এসে ফুলটা মাকে দেখালুম।

মা বললেন, কি ফুল বলত, চালতা ফুল না?

আমি মিটি মিটি হাসতে লাগলুম।

ঠিক এমনি সময়ে 'শিবু' বলে বাইরে থেকে কে যেন হাঁক দিল। আবার একটা ডাক এল 'শিবু বাড়ি আছিস নাকি?'

এবার বুঝতে পারলুম এ শান্তনুর গলা। ছুট্টে গিয়ে দেখি তাই। শান্তনুও আমদের ক্লাশের ছেলে।

কি রে? তুই?

এলুম তোদের বাড়ি। তুই ত অনেকবার আসতে বলিচিস—বলতে লাগল শান্তনু, কি জানিস, তোদের এদিকের রাস্তাটা ভীষণ খারাপ। আমি তাপসদের বাড়ি গেছিলাম একটা বই আনতে—

তা বেশ করিচিস, আয় ভেতরে আয়।

বাড়ির ভেতরে গিয়ে বললুম, মা, এই দেখ কে এসেছে। এর নাম শান্তনু—আমরা একসঙ্গে পড়ি।



মা দেখলেন সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে, গায়ে বেশ দামী জামা। পায়ে সুন্দর জুতো।

এসো বাবা এসো। ভেতরে এসে বোস।

ঘরে ঢুকে শান্তনু সব কিছু দেখছে নাক সিঁটকে। এইটুকু টেবিলে পড়িস বুঝি! তোদের জানালাগুলোয় পর্দা নেই কেন রে? ঘরের মোঝাটাও যেন কে খুবলে দিয়েছে। কি করে থাকিস এই বাড়িতে?

ওর কথাগুলো শুনে আমার গা জ্বালা করছিল কিন্তু কিছু বললুম না। ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি ত খুব সুন্দর বাড়ি। দেয়ালগুলো ফিকে গোলাপী রং করা, প্রকাণ্ড টেবিল, জানালায় রঙিন পর্দা ঝুলছে আর মেজেটায় যেন ফুল ফুটে আছে। দুটো চাকর কেবল ঝাড়পোঁচ করছে। শুনেছি ওর বাবার নাকি চা বাগান আছে। ওরা বড় লোক। একটা গাড়িও আছে।

হঠাৎ মা বলে উঠলেন এসো বাবা, শান্তনু, তোমার জন্যে একটু খাবার করিচি খাবে এসো। শিবুও আয়। দুজনে বসে খেয়ে তারপরে খেলাধুলো করবে। তোমাদের জন্যে মোহনভোগ করিচি। এইখানে রাখলুম। আর গোটা কয় টাটকা নারকেল নাড়ু আছে।

আমি শান্তনুকে ডাকলুম। তুই এই চেয়ারটায় বোস।
শান্তনু বসল না। বলল, ঐ চেয়ারে আবার বসে নাকি মানুষ—হাতলটা ভাঙ্গা—
মা এসে আবার বললেন, কি বাবা, বোসো, একটু খাও—
শান্তনু বলল, কি জানেন, আমার খিদে নেই, আর সকালে স্যান্ডউইচ দুটো খেয়ে বেরিয়েছি কিনা। তাছাড়া আমি হালুয়া খাই না।
আমি একটু মুখে দিয়ে উঠে পড়লুম। ওকে বললুম। আমাদের বাড়ির পিছনে চ, তোকে ফজলি আম গাছ দেখাব।
ও বলল, ভারি ত ফজলি। ও আর দেখে কি হবে? আমাদের ল্যাংড়ার চারায় এবার আম হয়েছে, দেখাব তোকে। তার পাশেই আছে ডালিম আর সফেদা গাছ। এবার তুই গেলে দেখাব। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে রে শিবু, চললুম গাড়িটা আছে আবার ঐ বড় রাস্তায়।
উঠোন দিয়ে যাবার সময় শান্তনু আমার অনেক-যত্ন-করে-ফোটানো মস্ত বড় গাঁদা ফুলটা পট করে ছিঁড়ে নিয়ে বলল, এই উঠোনে আমাদের মালি থাকলে গোলাপের আর হলি-হকের বেড করত।
আমি গেলুম ওকে গাড়িতে তুলে দিতে, সেই বড় রাস্তায় সেটা দাঁড়িয়েছিল। ও উঠে দরজা বন্ধ করল, ড্রাইভার চালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতে স্টার্ট হচ্ছে না। সে বলল, একটু ঠেলতে হবে পেছন থেকে। কে ঠেলবে? এই তের বছর বয়সের আমি ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণী নেই সেখানে।
তুই পারবি ঠেলতে? বলে উঠল শান্তনু।
কেন পারব না? আমি কি ফুটবল খেলি না? আমার গায়ে কি জোর নেই? কি ভাবিস তুই?
দুহাতের আস্তিন গুটিয়ে আমি লেগে গেলুম ঠেলতে। সমস্ত জোর দিয়েও নড়াতে পারলুম না। ড্রাইভার বলল, আরো একটু জোরে ঠেল ভাই। শান্তনু নামল না।
এমন সময় একজন চেনা লোককে দেখতে পাওয়া গেল। আমি ছুটে গিয়ে তাকে বললুম, গোষ্টদা এই গাড়িটা একটু ঠেলে দেবে?
দুজনে প্রাণপণে ঠেলতে ঠেলতে হঠাৎ গাড়িটা স্টার্ট নিল। তারপর হুশ করে এমন জোরে ছুট দিল যে আমি সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম মাটিতে।
নাকটায় ভীষণ লাগল। আর দাঁতে লেগে ঠোঁটটা কেটে গিয়ে রক্তারক্তি। গোষ্টদা আমাকে বাড়িতে পেঁৗছে দিয়ে গেল।
মা আমায় ঐ অবস্থায় দেখে প্রায় কেঁদে ফেলেন আর কি। তারপর ঠাণ্ডা জল দিতে দিতে হাজার প্রশ্ন। কি করে পড়লি? কোথায় ধাক্কা লাগল? ইত্যাদি।
কাকা ছুটে এসে সকলকে আশ্বস্ত করে বললেন, বৌদি, অত চেঁচামেচি করে না। এমন কিছু হয়নি। ঠোঁটটা কেটে গেছে। ও দুচার দিনেই ঠিক হয়ে যাবে।

তখন আরো কে কে এসেছিল আমার মনে নেই। তবে বুঝতে পারলুম আমাকে ধরে ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলে। রাত্রে একটু জ্বর হল।
কাটা ঠোঁট সেরে যেতে সত্যিই তিন চারদিন লাগল কিন্তু ঠোঁটের ফোলা আর যায় না। ক'দিন স্কুল যাওয়া বন্ধ। আর স্কুলে না যেতেই চরণ এল দেখতে। আমায় দেখে আর সমস্ত শুনে তার চোখ ছলছল করছিল। সে বিছানার পাশে চুপ করে বসে থাকত। মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। মা খাওয়াতে এলে কিছুতে খাব না জেদ চাপল আমার। তখন চরণ বললে, আচ্ছা তোকে একটা ভাল গল্প বলছি। সুরসার গল্প জানিস?
কার গল্প?
সুরসার, সুরসা এক রাক্ষসী ছিল না? আরে এত রামায়ণের গল্প।
বল।
হ্যাঁ, হনুমান ত লংকায় যাবে বলে লাফ মেরেছে। অত বড় সমুদ্র পেরিয়ে যেতে হবে ত। নীচে জল থৈ থৈ করছে আর শূন্য দিয়ে যাচ্ছে হনুমান। এমন সময়—নে সাবুটা নে। সুরসা রাক্ষসী সুমুদ্দুর থেকে উঠে বিরাট হাঁ করে আছে। হনুমানকে ধরা যায় এমন ভাবে। হনু বলল, সরো, আমি যাবো। সুরসা বলল, যা না, আমার এই হাঁয়ের মধ্যে চলে যা। হনুমান কি করে? সে ভাবছে এত কষ্ট করে কি ওর পেটে যাবো! সে ত পাখির মত ডানা চালিয়ে উঠতে নামতে পারে না। সে তার লেজখানা বাঁকাতে লাগল, আর আরও ওপরে উঠে গেল—কি ব্যাপার দেখলি? খেয়েছিস ত—রামায়ণের এই খানটা সবচেয়ে ভাল না রে? মা বললেন, এই তো লক্ষ্মী ছেলে, ভাগ্যিস চরণ গল্প বলল, তাই খেয়ে নিয়েছে।
সেরে উঠে আয়নায় বার বার নিজের মুখটা দেখলুম। ঠোঁটটা স্বাভাবিক হয়ে গেছে কিন্তু যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে ঠোঁটে কি হল? আমাদের এখানে খবরের কাগজ নেই কিন্তু কোনো খবর চাপা থাকে না। শান্তনু নাকি বলেছে, শিবু গাড়ি ঠেলতেই জানে না। শান্তনু কিন্তু একদিনও আমায় দেখতে আসে নি।
স্কুলে যাই, ছেলেরা অনেকেই ব্যাপারটা জেনে গেছে। কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে।
চরণ একদিন বলল, শিবু একদিন আমাদের বাড়ি আসবি, তোকে একটা জিনিস খাওয়াব।
কি জিনিস রে?
উঁহুঁ, এখন বলব না।
একদিন সত্যি যেতে হল। চরণ ডেকে নিয়ে গেল বাগানের মধ্যে দিয়ে ঝোপঝাপ পেরিয়ে এক বদখৎ জংলা জায়গায়। বললুম, কোথায় যাচ্ছিস রে?
—তুই এইখানে দাঁড়া, আমি গাছে উঠছি।
—কি গাছ রে ওটা?

—বল না। একে বলে গাব গাছ। বইয়ে লেখে তমাল।
—গাছটা কী কালো রে। ডালপালাগুলোও কালো ভূতের মত যেন। পাতাগুলো কিন্তু সবুজ আর তার ফাঁকে ফাঁকে সোনালি ফল দেখা যাচ্ছে।
চরণ গাছে উঠল। ওপর থেকে একটা ফল আমার কাছে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, খেয়ে দেখ।
খেলুম, এমন কিছু অমৃতের স্বাদ নেই তাতে, তবে বেশ মিষ্টি রসালো। বীচিগুলো বড় বড় চুষে খেতে হয়। গোটা দুই খেয়েছি এমন সময় ধপাস করে একটা শব্দ হল, দেখি চরণ পড়ে গেছে।
কি হল রে?
নামতে গিয়ে পড়ে গেলুম, উহ্ যা পিঁপড়ে না—
আমি ভাবছি, ও তো হনুমানের মত সব গাছে ওঠে আর নামে, পড়ল কি করে?
ওকে তুলে ধরে ধরে নিয়ে এলাম একটা ফাঁকা জায়গায়। হাঁটতে গিয়ে খোঁড়াচ্ছে। বসতে দেখি পায়ে একটা লোহার কাঁটা ফুটে আছে। আমি সেটা বার করে দিলুম। একটু রক্ত বেরুল।
আমার কাঁধে ভর দিয়ে ও বাড়িতে এল। ওর মা বলল, শুয়ে পড়, ওখানটা চুন দিয়ে দিই।
পর পর কদিন চরণ আর স্কুলে আসে না।
চারদিন পরে একদিন ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি জ্বরে ওর গা পুড়ে যাচ্ছে। প্রায় অচৈতন্য। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওর মা বলল, চরণের অসুখ সারে নাই গো বাবু।
সাতদিন কেটে গেল।
আমার একটা দম দেওয়া রঙচঙে গাড়ি ছিল, সেটা হাতে নিয়ে ওকে দেখতে গেলুম। কিন্তু কে নেবে? চরণ সেই রকমই অসুস্থ অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে। মুখে কথা নেই, সেই হাসি নেই।
পরদিনও স্কুলে গেল না।
তারপরদিনও নয়। আমি ভাবছিলুম আর ক'দিন পরে ও নিশ্চয়ই স্কুলে যাবে।
কিন্তু সাতদিন হয়ে গেল। আমি আর থাকতে না পেরে একবার গেলাম। দেখলুম ভীষণ রোগা হয়ে গেছে। একটা কমলালেবু দিয়ে এলুম।...তারপর আরও কদিন কেটে গেল।
বাবা একদিন সন্ধেবেলা বাড়িতে এসেই মাকে বললেন, একটা খারাপ খবর শুনলুম যে গো।
কি?
আমিও ছুটে এসেছি তখন।
চরণটা মারা গেছে গো। ওর বাবার সঙ্গে দেখা হল তার মুখেই শুনলুম।

মা বললেন, সে কি গো ? আহা ।

আমি যেন ভয় পেয়ে বলে উঠলুম, অ্যাঁ, চরণ মরে গেল ! আর সে আসবে না ! আর কোনদিন দেখা হবে না তার সঙ্গে ?

রাতে শুয়ে মাকে বললুম, মা চরণ কেন মারা গেলো গো ?

মা বললেন, চরণের পায়ে কি যেন ফুটেছিল তাতে সেপটিক হয়ে গিছল—

—সেপটিক কি ?

—সে তুমি বুঝবে না !

—কেন বুঝবো না, তুমি বুঝিয়ে বলো না—চিৎকার করে বলে উঠলুম ।

তাই শুনে বাবা ছুটে এলেন, বললেন, আমি বুঝিয়ে বলছি । শোনো, ওটাকে বলে টিটেনাস । রাস্তায় পড়ে থাকা মরচে ধরা পুরনো লোহা বা টিন যদি আমাদের পায়ে বা গায়ে বিঁধে যায় তাহলে এই টিটেনাস হয়, বুঝলে ?

কেন, ওষুধ দিলে সারে না ? আমার ঠোঁট কাটা সেরে গেল কি করে ?

মা বললেন, ভগবান রক্ষা করেছেন ।

আমি রাগ করে বললুম, ভগবানের কথা বলো না । চরণের বুঝি ভগবান নেই ? শুনেছি সব অসুখের ওষুধ আছে এ অসুখে ওষুধ নেই কেন, তাই বল ।

বাবা বললেন, ওরে ওটা ভারী সাংঘাতিক অসুখ । সঙ্গে সঙ্গে যদি ইনজেকশান পড়ত তাহলে এই ঘটনা ঘটত না ।

ওরা ডাক্তার ডাকল না কেন ? বলে উঠলুম আমি ।

ওদের কি অত পয়সা আছে ? সঙ্গে সঙ্গে অ্যাণ্টিটিটেনাস ইনজেকশান পড়া উচিত ছিল । তাহলে ঐ বিষ সারা দেহ বিষিয়ে দিতে পারত না । যারা গরীব তারা এই ভাবেই ত মরে—

অসহায়ের মত বললাম, ওরা বুঝি বড্ড গরীব ?

মা বললেন, তাও বুঝিস না তুই ! দেখিস না ওর মায়ের গায়ে একটা জামা নেই, ঘরে আসবাব-পত্র কিছু নেই—

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি ত । আমাদের মত একটা জিনিসও নেই ওদের ঘরে, শুধু হাঁড়িকুঁড়ি আর রং-চটা কলাই-এর থালা—

মা বললেন, নাও, রাত হয়েছে, চোখটি বুজে ঘুমিয়ে পড়, কেমন ? কাল আবার ইস্কুল আছে ।

আমি চোখ বুজলুম । কিন্তু মনটা বুঝল না । মনে মনে কেবলই বলতে লাগলুম, ওরা গরীব । ওরা গরীব—তাই চরণ মরে গেল । ওরা গরীব তাই ওদের অসুখের ওষুধ নেই, ডাক্তার নেই, ভগবান নেই—আমি বড় হয়ে ডাক্তার হবো—চরণদের ডাক্তার, তাহলে আর ওদের মরতে হবে না ।…আমি বড় ডাক্তার হব, শুধু চরণদের ডাক্তার……ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না ।

———

হিমালয়ের পিট-ভাইপার

সঙ্কর্ষণ রায়



গেণেখার ক্যাম্পে ক্ষেত্রপাল সিংকে দেখে ধ্রুব আচার্য এবং আমি দুজনেই খুব অবাক হলাম। ক্ষেত্রপাল জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাপ নিয়ে কারবার করছে। ভুটান হিমালয়ের প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচু এই গ্রামটিতে তার কি কাজ ভেবে পেলাম না। হিমালয়ের এই বরফ-ঠাণ্ডা উঁচু জায়গাটিতে আর যাই থাক সাপ নেই।

'এখানে কি করছ তুমি?' ক্ষেত্রপালের মুখের ওপরে তীক্ষ্ন দৃষ্টি হেনে আমি প্রশ্ন করি!

'আমার যা করার তাই-করছি।' মৃদু হেসে জবাব দিলো ক্ষেত্রপাল, 'খুব বিষাক্ত সাপ আছে এখানে, এখানকার একটা সাপের বিষের থলি দশটি কেউটে সাপের বিষ বহন করছে। একটি সাপ ধরতে পারলে তার থলি নিংড়ে দশ হাজার টাকার বিষ বের করতে পারব।'

'হিমালয়ের এই, উঁচু বরফ-ঠাণ্ডা শীতের রাজ্যে সাপ! অসম্ভব!'

'অসম্ভব নয়, আছে। ওই ক্যাম্পের কাছেই আছে। ওর গায়ের গন্ধ আমার নাকে আসছে। তার গোপন আস্তানা থেকে সে বেরোলেই তাকে ধরব।'

'এ্যাবসার্ড!' ধ্রুব আচার্য বললে, 'কারণ এখানে সাপ থাকতেই পারে না এবং তাকে

ধরার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সাপ ধরার অছিলায় এখানে থাকবার মতলব যদি এ'টে থাক, তা তোমাকে বর্জন করতে হ'বে। কারণ আমার এই ক্যাম্পে এই সুইস কটেজ ছাড়া আর কোন তাঁবু নেই। তাতে রায়সাহেব ও আমি দুজনে আছি, তৃতীয় কারুর স্থান হবে না তার মধ্যে।'

'স্থান আমি চাই না।' ক্ষেত্রপাল বললে, 'থিম্পুর হোটেলে আছি, ম্যাটাডোর ভ্যানে করে এসেছি এখানে, দরকার হলে ভ্যানের মধ্যেই রাত কাটাব। আমার জন্যে ভাবতে হবে না আপনাদের, আপনারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাবুন। কারণ এ সাপ আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বার চেয়ে কম বিষাক্ত নয়।'

বলে ক্যাম্পের পাশে থিম্পু চু নদীর ধারে পীচের (peach) ঝোপের দিকে চলে গেল ক্ষেত্রপাল।

তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থেকে ধ্রুব বললে, 'পাগল আর কাকে বলে! চলুন রায়সাহেব, তাঁবুর মধ্যে যাই। ভীমবাহাদুর এতক্ষণে নিশ্চয়ই চা তৈরী করে ফেলেছে।'

গেণেখাতে সীসা-দস্তার গুপ্ত ভান্ডারের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে বলে সমীক্ষার আয়োজন চলছে। এখানে ক্যাম্প করে ধ্রুব ড্রিলিং করার ব্যবস্থা করছে। তার কাজের তদারক করার জন্য আমি এসেছি সামচি থেকে। তার অনুরোধ দিন কয়েক এখানে থেকে তাকে সঙ্গ দেব।

থিম্পু-চু নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়েছে ধ্রুব। তখন মে মাস হলেও প্রচণ্ড শীত। সর্বদাই হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বাতাস যেন বরফের ছুরি, সর্বাঙ্গে প্রতিনিয়ত আঘাত হেনেই যাচ্ছে। তাঁবুর মধ্যে ঢুকে চা খেতে খেতে ধ্রুব বললে, 'বাইরে কাজ আমাদের, কিন্তু সব সময় ভেতরেই বসে বা শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।'

'আজকে ঠাণ্ডাটা একটু বেশি বলেই বোধ হচ্ছে। আমি বললাম, বিকেল ও সন্ধ্যাটা তাঁবুর মধ্যেই আজ কাটিয়ে দেওয়া যাক।'

ধ্রুব বললে, 'রাতের খাওয়াটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেললে হয় না!'

'হ্যাঁ হয়। কিন্তু ভীম বাহাদুর মাংস রান্না করবে বলছিল। হাশিমারা থেকে বিশ্বাস-বাবু মাংস আনবেন শুনেছি···'

'তা হ'লে তো রান্নার দেরি আছে। কিন্তু আমার যে ঠাণ্ডা সইছে না।'

'আমারও না,' বলে আমি আমার স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়ি।

'মহাজনঃ যেন গতঃ স পন্হা,' বলে ধ্রুবও ঢুকে পড়ে তার স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে।

আমরা স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকতেই তাঁবুর মধ্যে ঢুকল ভীমবাহাদুর। সে বললে, 'এখানকার গুম্ফার লামা এসেছেন, তিনি আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'বলো কি!' বলে ধ্রুব স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম করে।

'কোন দরকার নেই।' গেণেখার লামা তাঁবুর মধ্যে ঢুকে প'ড়ে বললেন, 'খোলস

ছাড়তে হবে না, ওর মধ্যে শুয়ে শুয়েই শুনুন আমার কথা। আজ রাতের মত আমি আপনাদের ক্যাম্পের পাহারাওয়ালার সঙ্গে পাহারাওয়ালার কাজ করতে চাই।'

'কেন?' ধ্রুব প্রশ্ন করে।

'কেন তা' যথা সময়ে বুঝতে পারবেন।'

'কিন্তু আমাদের ক্যাম্পে অতিরিক্ত কোন তাঁবু নেই। যেখানে আপনাকে থাকতে দিতে পারি।'

'থাকার কোন জায়গা আমার চাই না, কারণ আমি ঘুরে ঘুরে পাহারা দেব…'

লামা তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলে পর ধ্রুব বললে, 'লামার মতলবটা কি বোঝা গেল না। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে রাত জেগে বাইরে ঘুরে ঘুরে কিসের জন্য পাহারা দেবেন?'

'বুঝে কাজ নেই।' আমি বললাম, 'এই ঠাণ্ডার মধ্যে স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরোনোর কোন চেষ্টা কোরো না।'

স্লীপিং ব্যাগের মধ্যে আচ্ছাদিত অবস্থাতেই আমরা আমাদের রাতের খাওয়া সারি। তারপর স্লীপিং ব্যাগের ওপরে লেপ টেনে শুয়ে পড়ি।

শুয়ে ধ্রুব ঘুমিয়ে পড়লেও আমার চোখে ঘুম নেই। এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে লামা ও আমাদের ক্যাম্পের পাহারাওয়ালা ক্যাম্পের চারপাশে টহল দিচ্ছে। তাদের ভারী বুটের শব্দ আমার কানে আসে। লামা কিসের জন্য পাহারা দিচ্ছেন? হঠাৎ আমার ক্ষেত্রপালের কথা মনে হ'ল। সাপ ধরার জন্য নিকটেই আছে সে ওৎ পেতে। লামাও কি একই উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছেন?

হিমালয়ের এই উচ্চতায় বরফ-ঠাণ্ডা আবহাওয়ার মধ্যে কি সাপ থাকতে পারে? জনৈক পর্যটকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে 'পিট-ভাইপার (pit viper) নামক এক জাতের সাপের উল্লেখ পেয়েছিলাম। এ কি তাই? চাক্ষুষ না দেখা পর্যন্ত বোঝা যাবে না তার স্বরূপ। তাকে চোখে দেখা যাবে বলে অবশ্য মনে হচ্ছে না। ক্ষেত্রপাল ও লামা ওৎ পেতে আছে অতএব দেখা দেবার আগেই ধরা পড়ে যাবে সে।

হঠাৎ আমার মনে হল, তাঁবুর মধ্যে কেউ যেন ঢুকে পড়েছে। কোন শব্দ নেই, তবু তার নড়াচড়া টের পাই। কয়েক মুহূর্ত বাদে আমার মনে হল যেন সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে।

চোখ মেলে তাকানো মাত্র আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে যায়। একটা মিশ-কালো সাত-আট ফুট লম্বা সাপ তার লেজের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় জ্বল জ্বল করছে পান্নার বিন্দুর মত উজ্জ্বল সবুজ তার চোখ দুটি।

আমি বুঝতে পারি যে আমার চোখ মেলে তাকানো সাপটিকে উত্তেজিত করে তুলেছে। আমাকে ছোবল মারার জন্য যেন ফণা তুলে দাঁড়ায়। কি করে

তাকে নিবৃত্ত করব আমি ভেবে পাই না। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সাপটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্রমশঃ আমার চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসে।

'ভয় নেই রায়সাহেব, আমি আছি।' অস্পষ্ট স্বর। ক্ষেত্রপাল সিংয়ের কণ্ঠস্বর বলে মনে হল। বোধ হয় সে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

'আমিও আছি স্যার।' ক্ষেত্রপালের গলার স্বরকে ছাপিয়ে যায় লামার ভারি গলার আওয়াজ।

তারপর লণ্ঠনটি উল্টে গিয়ে নিভে যায়, পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে যায় তাঁবুর ভেতরটা। এর পরে শুরু হ'ল হুটোপুটি ও ধস্তাধস্তি। ক্ষেত্রপাল সিংয়ের মৃদু আর্তনাদ কানে এল। অবশেষে লামা বললেন, 'এখন আপনারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারেন, আপদ বিদেয় হয়েছে...'

'আপদ' সাপ নয়, ক্ষেত্রপাল সিং।'

পরদিন সকালে আমাদের সঙ্গে চা খেতে খেতে লামা বললেন, 'সাপটাকে ক্ষেত্রপালের খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে তাকে বিদায় করে দিয়েছি। আর কখনোই সে একে ধরে নিয়ে যেতে পারবে না।'

ধ্রুব বলল, 'হিংস্র বিষাক্ত ভাইপার-শ্রেণীর সাপকে বাঁচিয়ে রেখে মানুষের কোন উপকার হবে মিষ্টার লামা ?'

'আর সব প্রাণীর মত সাপকেও আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই।' লামা গম্ভীর গলায় বললেন, 'তাছাড়া ভুটানী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, সর্পনাশ মানে শস্যনাশ। অর্থাৎ সাপ মারলে শস্যের হানি হবে। দেশের ফসল বাঁচাবার জন্য সাপকে বাঁচাতে হবে।'

দাদুর চিঠি

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

একটা চিঠি লিখবো আমি
দাদুর কাছে রোজ,
কোথায় যেন থাকেন দাদু—
কেউ রাখেনা খোঁজ।
ঠিকানাটা কেউ জানে না
কেবল আমি জানি,
ইচ্ছা করে দৌড়ে তাঁকে
এইখানেতে আনি।
রেল লাইনের ওই ও-ধারে
সেই যে বাড়ী ঘর
শিশির ভেজা ঘাসের পাতা
কাঁপছে থরোথর—
গাঁদা ফুলের সারি গুলো
খিল্ খিলিয়ে হাসে,
দাদুর বাড়ী তারই কাছে
"অস্তরাগ" এর পাশে।
দাদুর বাড়ী খুঁজে খুঁজে
যেই মেনেছি হার
ওমনি যেন দেখতে পেলাম
আকাশ অন্ধকার।
তার ভেতরে তারাগুলো
জ্বলছে মিটি মিটি
তাদের কাছেই পাঠিয়ে দেবো
ছোট্ট আমার চিঠি।
শুকতারা আর স্বাতী তারা
প'ড়বে চিঠি খানা
নাম না-জানা তারার মালা
সবাই দেবে হানা।

লিখতে আমি শিখিনি-তো
কি হয়েছে তাতে
অ আ ক খ লিখতে পারি
আমার নিজের হাতে।
দিনের বেলার মজার খেলায়
চড়াই পাখীর দল
আমার চিঠি ঠোঁটে তুলে
ক'রছে কোলাহল।
রঙ্ মাখা ওই প্রজাপতি—
মৌ-বনেতে মৌ
তার পাশে ওই কলার বনে
গণেশ দাদার বৌ
সবাই মিলে দেখবে চিঠি
মিঠে হাসি হেসে
চশমা চোখে পড়বে দাদু
স্বপ্নে আমার এসে।

———



লড়াই যখন চলছে

শ্রী ধীরেন্দ্রলাল ধর

॥ এক ॥

চন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে পথটা নেমে এসেছে সীতাকুণ্ড গ্রামে, তারপর ছড়িয়ে গেছে আরও কয়েকখানি গ্রামে। পাহাড় থেকে বনভুমিও নেমে এসেছে পথের দুপাশ দিয়ে। বনভূমি যত সমতলে এসেছে ততো ঘন হয়েছে। এই বনভুমির শেষে গ্রামের প্রান্তে একটা বড় নিমগাছের নীচে একটা ঝোপড়ি। সেদিন সন্ধ্যার পর সেই ঝোপড়ির মুখে এক বৃদ্ধ ফকির তিনখানা ইঁটের একটা উনুনের উপর এক হাঁড়ি ভাত ফুটাচ্ছিল। পাশে বন থেকে কুড়িয়ে আনা এক গাদা শুকনো গাছের ডালপালা। আরেক পাশে একখানা কলাপাতা, এক বদ্‌না জল আর কচুপাতার উপর নুন আর পাটালি গুড়। ভাতটা ফুটে গেলেই কলাপাতায় ঢেলে নিয়ে সে খেতে সুরু করবে।

উনুনের আগুনেই যেটুকু আলো হয়েছে, বাকী চারিপাশেই অন্ধকার। ফকির বাঁ হাতে উনুনে কাঠ ঠেলছে, আর ডান হাতে ফটিকের মালা নিয়ে জপ করছে।

এক সময় ভাত ফুটলো। ফকির কলাপাতায় হাঁড়ীটা উপুড় করে দিল। সামান্য ফেন আশপাশ দিয়ে গড়িয়ে গেল। কিছুটা গরমভাব কাটতেই ফকির বদ্‌নার জলে হাত ধুয়ে খেতে সুরু করে। এক এক গ্রাস ভাত আর একটু একটু নুন।

কয়েক গ্রাস খেয়েছে এমন সময় পায়ের শব্দ কানে এলো। ফকির পথের পানে তাকালো কিন্তু অন্ধকারে কিছুই ঠাহর পেলে না।

শব্দ ক্রমেই কাছে এলো। তারপরেই সামনে দেখা দিল একটি মানুষ, ব্যাকুল স্বরে বললো—ফকির সাহেব, খাঁন ফৌজ তাড়া করেছে, ধরলেই খুন করে ফেলবে। লুকুতে হবে, কোথায় যাই ?

ফকির ভাল করে করে তাকালো, কুড়ি-বাইশ বছরের জোয়ান ছোকরা ভয়ে কাঁপছে। বললো—এখানে কোথায় লুকুবে ? আমার তো এই ঝোপড়ি।

ওরা তো আমাকে দেখতে পেলেই মেরে ফেলবে।

—ভাবনার কথা! ফকির ক্ষণেক কি যেন ভাবলো, তারপর বললো—গাছে উঠতে পারবে ?

—পারবো।

—তাহলে এই নিমগাছটার উপর উঠে পড়ো, একেবারে মগডালে উঠে গিয়ে ঘন পাতার আড়ালে চুপ করে বসে থাকবে। উঠে পড়ো—

ফকির ভাত শেষ করেছে এমন সময় দুজন বন্দুকধারী সিপাই এসে মুখের উপর টর্চের আলো ফেললো—এই! এখানে কি করছিস ?

—দুটো ভাত ফুটিয়ে খেলাম বাবা।

—এই জংগলে ভাত ফুটিয়ে খাচ্ছিস ?

—এইখানেই থাকি বাবা, আমি ফকির মানুষ, এই ঝোপড়ির মধ্যে বসে বসে আল্লার নাম করি, ভিক্ষে-সিক্ষে করি, দিন কেটে যায়।

—এখনি একটা লোক এইদিকে পালিয়ে গেল, কোথায় গেল দেখেছিস ?

—এদিকে তো কেউ আসেনি সাহেব। আমি তো এখানে ভাত ফোটালাম, খেলাম, কাউকে তো দেখিনি।

—মিছে কথা বলছিস, এক গুলিতে তোকে এখনি খতম করে দেব।

—ফকির মানুষ, আল্লার নাম করি, মিছে কথা বলি না, বাবা। খতম করতে হয় করো—

সঙ্গী সিপাইটি বললো—চলো চলো, এগিয়ে চলো, এর সঙ্গে বাজে বকে লাভ নেই।

সিপাই দুজন সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

ফকির বদ্‌নার জল গলায় ঢাললো।

তারপর ফকির জপের মালা নিয়ে বসলো। ক্রমে উনুনের আগুন নিভে এলো। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। চারিপাশের অন্ধকারে বনভূমি গাছপালার একটা ঝিরঝির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। এবার ফকির বললো—এবার গাছ থেকে নেমে আয়।

ছোকরা নেমে এলো।

ফকির বললো—এখন কোথায় যাবি ?

—যাবো নতুন ডাঙ্গার কাছারীতে।
—সে তো দু ক্রোশ পথ।
—যেতে হবে। কাজের ভার নিয়েছি, কাজটা করতে হবে।
—সেখানে কি কাজ? এই রাত দুপুরে কাছারীতে কোন কাজ হবে?
—চিঠি আছে, ছোটবাবুকে দিতে হবে।
—চিঠি? কার চিঠি?
—ক্যাপটেন ওসমান সাহেবের।
—মুক্তি ফৌজের ক্যাপটেন ওসমান সাহেব চিঠি দিয়েছে নতুনডাঙ্গার ছোটবাবুকে?
—তবে যে শুনি ছোটবাবুরা মুক্তি ফৌজের শত্রু।
—সে কথা আমি বলতে পারবো না। আমার উপর যে কাজের ভার পড়েছে, সে কাজটা করে দিলেই আমার ছুটি।
—চিঠিখানা তো একবার দেখতে হয়।
—ওসমান সাহেবের চিঠি তুমি দেখবে?
—দুজন তো দুপক্ষের পাণ্ডা, তাদের মধ্যে চিঠি চালাচালি হচ্ছে কিসের একবার জানতে হবে না? দেখি চিঠিখানা?
—ওসমান সাহেবের চিঠি তোমায় দোব কেন?
—কি চিঠি আমায় দেখতে হবে।
—না, সে আমি দোব না।
—আমাকে না দিয়ে তুই যাবি কোথা? তুই আমার হাত ছাড়িয়ে পালাতে পারবি?
ফকির ছোকরার একখানা হাত চেপে ধরলো। ছোকরা এক ঝটকায় হাত ছাড়াতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল, পাকা-দাড়ী বুড়ো ফকিরের হাতের মুঠি বজ্রের মতো কঠিন, সে হাত ছাড়ানো সোজা নয়।
ফকির বললো—নে, এবার চিঠি বের কর।
—হাত ছাড়ো।
—না, আগে চিঠি বের কর।
—কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না।
—যা হচ্ছে তা আমি বুঝবো। চিঠি দে—
ছোকরা জামার আস্তিনের মধ্যে একটা চোরা পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করলো।
ফকির কাগজখানা হাতে নিয়ে বললো—দাঁড়া আগে চিঠিখানা পড়ি—
নিভন্ত চুলিতে একখানা কাঠ আগিয়ে দিয়ে, ফকির বললো—মুড়ি-টুড়ি কিছু খাবি?
—দাও।
ফকির ঝোপড়ির ভিতর থেকে একটা ছোট চুপড়িতে মুড়ি এনে ছোকরাকে দিলে বলল

—শুধু মুড়িই খা, পাটালি বাতাসা কিছুই নেই। ততক্ষণে কাঠখানা জ্বলুক, আমি চিঠিখানা পড়ে নিই।

খানিকক্ষণ ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাঠখানা একসময় জ্বলে উঠলো। ফকির এবার চিঠিখানা সেই আলোয় পড়লো। দু ছত্র মাত্র লেখা ঃ

"ছোট সাহেব, কাপড়-চোপড়ের বড় অভাব। হাফ প্যাণ্ট পাঁচটা আমার এই লোকের হাতে দিয়ে দেবেন—ওসমান।"

'—হাফ প্যাণ্ট ?'—ফকির সাহেব বলে উঠলো"—পিস্তল পাঁচটা পিস্তল। লীগের পার্টি ফৌজকে পিস্তল দিচ্ছে। নতুন গাঁয়ের বাবুরা তাহলে দুদিকই বজায় রেখে চলেছে। খুব বুদ্ধিমান তো। এবার গিয়ে ভাল করে আলাপ করতে হবে, আমিও যাবো তোর সঙ্গে।"

॥ দুই ॥

দুজনে শেষ রাত্রে রওনা হয়েছিল। সূর্য ওঠার একটু পরেই এসে পড়লো নতুন ডাঙ্গার খালের ধারে। খালের উপর একটা বাঁশের সাঁকো। দুজনে সাঁকোর উপর দিয়ে সবে ওপারে গিয়ে নেমেছে, এমন সময় বন্দুকের আওয়াজ পেল। মনে হলো পাশ দিয়ে একটা গুলি ছুটে গেল। পিছন পানে তাকিয়ে দেখে অল্প দূরে দুজন ফৌজী সিপাই বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ফকির বললো—দাঁড়িও না, সামনের গাছগুলোর আড়াল দিয়ে দৌড়াও।

পথে নেমে গিয়ে দুজনে পথের পাশে গাছের আড়ালে সরে গেল। সেখানে আগাছা আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ঢোকা যায় না। ভালভাবে চলতেও সুবিধা হয় না। তবে পিছনের সিপাইরা আর গুলি চালালো না। পিছনেও ধাওয়া করলো না, এইটাই সুবিধা।

খালের ধার থেকেই গ্রাম শুরু। কয়েকটা বাড়ী পার হয়েই জমিদারে কাছারী ও বসত বাড়ী।

জমিদার ফজলুর রহমন সাহেব ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিল, ছোকরা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলো বললো—সেলাম সাহেব, চিঠি আছে।

—কে তুমি ? কার চিঠি ?

--আমার নাম হাবুল, চিঠি দিয়েছে ক্যাপটেন ওসমান। বলেছে ছোটসাহেব খলিলুর সাহেবকে চিঠি দিতে।

—অতো হাঁপাচ্ছিস কেন, বোস।

—খালের ধারে সিপাইরা গুলি চালাচ্ছিল তাই দৌড়েছি, কাল রাতে সিপাইরা তাড়া করেছিল গাছে উঠে বসেছিলাম। এক ফকিরের জন্য রক্ষা পেয়ে গেছি, ফকিরও সঙ্গে এসেছে, ভিতরে ডাকবো ?

—ডাকনা।

হাবুল ফকিরকে ঘরের মধ্যে ডাকলো।

কর্তা এবার হাঁক দিলে—খলিলকে খবর দে, লোক এসেছে।

ছোট ভাই খলিলুর এসে পড়লো। হাবুল বললো-আপনিই তো ছোট সাহেব খলিলুর রহমান? আমি আসছি ক্যাপটেন ওসমানের কাছ থেকে আপনার নামে চিঠি আছে।

হাবুল জামার আস্তিন থেকে চিঠিখানা বের করে খলিলুরে হাতে দিল। চিঠিখানা পড়ে খলিলুর বললো—ওদিকে হাংগামা হচ্ছে বলে শুনলাম। এলি কেমন করে?

হাবুল বললো—খুব হাংগামা। রাতে গাছে উঠে বসেছিলাম। এই ফকির সাহেব আমাকে রক্ষে করেছে। এই সকালেও পুলের ধারে গুলি চালিয়েছিল।

—জিনিস নিয়ে ফিরবি কি করে?

—রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে যেতে হবে।

—দুজনেই এক সঙ্গে যাবি তো?

—ফকির সাহেব আমার সঙ্গে ফিরবে কি না জানি না।

ফকির বললো—আমাকে ফিরতে হবে। ঝোপড়িতে দু হাড়ী মুড়ি আছে ওই পথে কে কখন কি অবস্থায় এসে পড়ে কিছু ঠিক নেই তো। আমার ওখানে থাকা দরকার।

খলিলুর বললো—বেশ, তাহলে খেয়ে-দেয়ে এখন ঘুমিয়ে নাও, সারা রাত তো আবার হাঁটাহাঁটি আছে।

খালিলুর একজন চাকরকে ডেকে দুজনের স্নান ও খাবার কথা বলে দিল। চাকর দুজনকে ডেকে নিয়ে গেল ভিতরে।

এবার ফজলুর জিজ্ঞাসা করলো—কি চিঠিরে?

খলিলুর চিঠিখানা হাতে দিলে।

ফজলুর পড়ে বললো—হাফ-প্যাণ্ট মানে তো পিস্তল? আর ফুলপ্যাণ্ট মানে বন্দুক? তা কটা হাফ-প্যাণ্ট রেখে গেছে তোর কাছে?

—পাঁচটা। সঙ্গে কার্তুজও আছে।

—পাঁচটাই দিয়ে দিবি?

—ওদের মাল ওদেরকে দিতেই হবে।

—গোটা দুই রেখে দেওয়া যায় না?

—না। মুস্কিল বেধে যাবে। তাছাড়া আমাদের তো দুটো বন্দুকই রয়েছে।

—নিজের জন্য বলিনি। মেজর খাঁনের জন্য বলছিলাম। ওকে দুটো পিস্তল নজরাণা দিলে আমাদের প্রতিপত্তি বাড়তো।

—সে ওই দুটো পিস্তল কেন? পাঁচটাই মেজরকে পাইয়ে দেওয়া যায়। ছোকরা তো ওই পথেই ফিরবে, মেজরকে জানালেই পথে ধরে কেড়ে নেবে।

—তাহলে ছেলেটাও খুন হয়ে যাবে, আমি সেটা চাই না।

—তাহলে নিজেদেরকেই ঝুঁকি নিতে হয়। রাতের অন্ধকারে একটা চোট দিয়ে ঝোলাটা কেড়ে নিতে হয়।
—তুই কাকে পাঠাবি ?
—এখনকার দিনে এসব কাজে সাক্ষী রাখা চলে না। যা করতে হবে নিজেকেই করতে হবে। তবে এ একটা খুব কঠিন কাজ নয়।
—তা যদি পারিস তো খুবই ভাল। আমাদেরকে তো এখন দুদিকই বজায় রেখে চলতে হবে। যে পক্ষই জিতুক আমাদের জমিদারী যেন থাকে।
—এই জমিদারীর জন্যই তো এতো ঝামেলা, না হলে কবে কলকাতায় চলে যেতাম।

॥ তিন ॥

রাত প্রথম প্রহর অতীত প্রায়। সারা গ্রাম স্তব্ধ। ঝিঁঝিপোকার ডাক ছাড়া কিছুই শোনা যায় না। মাঝে মাঝে প্যাঁচার কর্কশ ডাক সেই স্তব্ধতা সচকিত করে তুলছে। কাছারী বাড়ীর ফটক সন্ধ্যার পরেই বন্ধ হয়েছে। এবার সেই ফটক খুললো, দুজন মানুষ পথে নামলো। ফটক বন্ধ হলো।
মানুষ দুটি আমাদের পরিচিত, ফকির ও হাবুল। হাবুলের কাঁধে একটা ঝোলা। ফকিরের হাতে একটা সড়কি। দুজনে নীরবে পথ চলতে সুরু করলো। চাঁদ উঠেছে, অন্ধকার ঘন হতে পারেনি, পথ চলায় কিছুটা সুবিধা আছে। তাছাড়া কিছুদিন ধরে এমনি রাতের অন্ধকারে পথ চলতেই এরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।
বাঁশের সাঁকো পার হয়ে ওরা খালের ওপারে গিয়ে পড়লো। তারপর দুপাশের ধান ক্ষেত পার হয়ে বনভুমি সুরু হয়েছে।
বনভূমির মুখেই সহসা গাছের আড়াল থেকে জনাপাঁচেক লোক বেরিয়ে এলো, হাঁক দিল—কে যায় ?
—আমরা ফকির বাবা।
—রাত দুপুরে ফকিরি করতে বেরিয়েছ ?
তারা এগিয়ে এসে এদের দুজনকে ঘিরে ধরলো।
একজন চকিতে হাবুলের কাঁধের ঝোলাটা কেড়ে নিলো। বললে—কি আছে এতে ?
ঝোলার মধ্যে হাত দিয়ে একবার দেখে নিল, তারপর বললো—ঠিক আছে যা—
তারা যে পাকিস্থানী ফৌজ নয় তা তাদের সাজপোশাক দেখেই মনে হলো।
ফকির বললো—ওসব কমরেড ওসমান সাহেবের মাল।
—আমরাই কমরেড ওসমান, যা—
লোকগুলি ত্বরিত পদে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিল।
খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হাবুল বললে—এখন তাহলে কি করবে ? ওসমানকে তো একটা খবর দিতে হবে।

ফকির বললো—খালি হাতে ওসমানকে খবর দিয়ে কি লাভ আছে। তার চেয়ে চল জমিদার বাড়ীতে ফিরে যাই। ফটকের সামনে দাঁড়াইগে ওরা ফিরলেই ধরতে হবে।

—ওরা জমিদারবাড়ীতে ফিরবে?

—হ্যাঁ। যে লোকটা তোমার ঝোলা কেড়ে নিলে তাকে আমি চাঁদের আলোয় দেখেছি। সে ছোটবাবু খলিলুর। ওরা পিস্তলগুলো কেড়ে নিতেই এসেছিল। ওরা এখন কাছারীতে ফিরবে বলে মনে হয়।

—ওরা তো আমাদেরই লোক, তাহলে ওগুলো কেড়ে নিল কেন?

—যাতে তোমরা ওগুলো না পাও।

—তাহলে ওগুলো ওরা কি করবে?

—তোমাদের হাতে না দিয়ে অপর পক্ষকে দেবে।

—খান ফৌজদের দেবে?

—তাই তো মনে হয়।

—তাহলে ওরা আমাদের শত্রুপক্ষ?

—ওসমানের মানুষ চিনতে ভুল হয়েছে। জমিদারের স্বার্থ জমিদারী রক্ষা করা, তোমরা তো জমিদারীর বিরোধী।

—তা আমরা কাছারীতে ফিরে গিয়ে এখন কি করবো? ওরা তো পাঁচজন, আমরা দুজন, পারবো কেন?

—হাতাহাতি লড়াই নয়, এখন আমাদের অন্য কথা ভারতে হবে। চল—

দুজনে আবার ফিরে চললো কাছারী বাড়ীতে।

খালের কাছাকাছি আসতেই ফকির হাবুলের হাত ধরে পথের উপর বসে পড়লো। হাবুলও বসলো। চাঁদের আলোয় দেখা গেল পাঁচটি লোক একে একে বাঁশের পুল পার হচ্ছে।

ফকির বললো—দেখলে? ছোটবাবু আর তার পাইক পেয়াদা।

মানুষগুলি সাঁকো পার হয়ে গেল।

হাবুল বললো—আমরা এখন কাছারীতে ফিরে গিয়ে কি করবো?

ফকির বললে—খানিক ভাবতে হবে, পিস্তলগুলো উদ্ধার করতে হবে। চল—

দুজনে কাছারী বাড়ীর পাশে একটা বড় অশথ গাছের নীচে এসে বসলো। রাত বাড়তে লাগলো।

॥ চার ॥

রাত গভীর হলো। হাবলু বললো—বলুন কি করবেন, আমার তো বসে বসে ঘুম পাচ্ছে।

ফকির বললো—ওই মাল নিয়ে ছোট কর্তা যদি আবার বেরোয় তাই অপেক্ষা করছি। পথেই ধরবো।

—এই রাত দুপুরে ওই মাল নিয়ে সে কোথায় যাবে ?

—খান ফৌজের ক্যাম্পে। ক্যাপটেনকে ওগুলো দিয়ে খাতির জমাবে, সে তো ওই পক্ষের লোক।

—তবে ওসমান ওর কাছে ওগুলো রেখেছিল কেন ?

—ওসমান মানুষ চেনে না, ভুল করেছে। জমিদার কখনও সাধারণ প্রজার দলে থাকে না, সে সব সময় রাজার পক্ষেই থাকে।

—দেশের মানুষের উপর এতো অত্যাচার দেখছে তবু—

—জমিদারের কাছে এসব কিছু নয়! জমিদার নিজেরা কি কম অত্যাচার করে ? আমি আজ ফকির হয়েছি কেন জানিস ? আমি এই ফজলুরের প্রজা, খালের ধারে বকুলতলায় আমার ঘর ছিল, দশবিঘা ধান জমি ছিল, একবছর ফসল হয়নি, খাজনা বাকি পড়েছিল, তাই ওরা আমাকে কয়েদ করেছিল। আমার জমি কেড়ে নিয়েছিল। কথায় কথায় প্রজাদের ধরে এনে বেত মারতো। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। ষাট বছরের বুড়ো কালু চাচাকে বেত মেরেছিল। চাচা পনেরো দিন বিছানা থেকে উঠতে পারেনি, আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম। সেইজন্য ছোটকর্তা আমার ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাতেই আমার বউ আর ছেলে পুড়ে মরে। তখন দেশ ছেড়ে চলে যাই। এখন সেই প্রতিশোধ নেবার জন্য ফকির সেজে ফিরে এসেছি। এই বড়কর্তা আর ছোটকর্তাকে আমি খুব ভালভাবে জানি। এরা কখনও মুক্তি ফৌজে সামিল হতে পারে না। জমিদার ও প্রজা কখনও এক দলের মানুষ হতে পারে না।

—ছোটকর্তা যদি এখন না বেরোয় তাহলে আমরা কি সারারাত এই গাছতলায় বসে থাকবো ?

—পথে পথে ব্যাপারটা মেটাতে পারলেই ভালো হতো, নাহলে তুই কি ঘরে গিয়ে মেটাতে চাস ?

—কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

—তুই কি অধৈর্য হয়ে পড়ছিস, তাই বলছি, পাঁচিল টপ্‌কে ভিতরে ঢুকতে পারবি ? আমার সঙ্গে দোতলায় যেতে হবে ছোটবাবুর ঘরে।

—সেখানে কি হবে ?

—তোর ঝোলাটা নিয়ে আসতে হবে। পাঁচটা পিস্তল আর পাঁচশো গুলি ছেড়ে দিয়ে যাবো ?

—দোতলায় তো শোবার ঘর, ছোটকর্তা তো জেগে আছে, উপরে আলো জ্বলছে দেখছি।

—তাতে কি, মুখোমুখি ফয়সালা করতে হবে।

—শুধু হাতে ফয়সালা ?

—শুধু হাতে নয়, যন্তর দোব—

ফকির ঝোলার ভেতর থেকে দুখানা ঝকঝকে ছোরা বের করলো। বললো—একখানা তোর, একখানা আমার।

হাবুল বললো—হাতে যন্তর থাকলে আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। যাই হোক না কেন, একটাকে মেরে তো মরবো।

—তবে চল্ ওদিকে পাঁচিলের পাশে একটা গাছ আছে, ওটায় উঠে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়বো।

দুজনে একটা বড় গাছের দিকে অগ্রসর হলো। পাঁচিলের পাশেই একটা বড় অশথ গাছ, তার অনেকগুলো ডাল বাগানের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। ফকির গাছে উঠে একটা ডাল ধরে বাগানের মধ্যে নেমে পড়লো।

হাবুল তাকে অনুসরণ করলো।

। পাঁচ ।

বড় ঘর। দরজার কাছ থেকে খানিকটা তফাতে একদিকে একটি জানালার সামনে একখানি ডেকচেয়ারে বসে খলিলুর চুরুট ফুঁকছিল। বাইরে চন্দ্রালোকিত আকাশ ও অন্ধকার গ্রামের পানে সে তাকিয়েছিল। খালের সাঁকোটা অবধি এখান থেকে নজরে আসে, তবে ভালভাবে কিছু ঠাহর করা যায় না। খলিলুর অন্যমনস্কভাবে বাংলাদেশের বর্তমান সংঘর্ষের কথা ভাবছিল।

নিঃশব্দে পিছনের দরজা দিয়ে দুটি মানুষ কখন যে ঘরে ঢুকেছে সে জানতেও পারেনি, সহসা সামনে ফকিরকে দেখে সে চমকে উঠলো, পাশে হাবুল। বলে উঠলো—তোমরা এখানে?

—চুপ। আর একটা কথা বললেই, গলা কাটবো—ফকিরের হাতে একখানা ঝকঝকে ছোরা দেখা গেল।

—আমায় খুন করতে এসেছ?

—চুপ, আবার কথা?—ফকির ছোরা নিয়ে এলো।

খলিলুর কি করবে ভেবে পেল না।

ঘরের আলনায় গামছা ও লুঙ্গী ঝুলছিল, ফকির বললো—হাবুল, গামছা নাও। মুখ বাঁধো, লুঙ্গি দিয়ে হাত বাঁধো—আমি এদিকে দেখছি, বাধা দিলেই ছুরী চালাবো,—

—ফকির ছোরাখানা গলায় ঠেকালো।

খলিলুর থ' হয়ে গেছে, আর কথা বলতেও ভরসা পাচ্ছে না।

হাবুল গামছা দিয়ে মুখ বাঁধলো, তারপর লুঙ্গী দিয়ে দু হাত বাঁধালো দেহের সঙ্গে। এবার বললো—কোন কথা নয়, এখন আমাদের মাল শুদ্ধ ঝোলাটা ফেরৎ দাও। নইলে

এইখানেই আজ তোমাকে খতম করে যাবো। হাবুল তোমার ছোরাখানাও হাতে নাও। উনিশ-বিশ দেখলেই ছুরি চালাবে, কোন দয়া করবে না।

খলিলুর তখনও বসে আছে।

—কি ওঠো, ঝোলা দাও—ছোরা হাতে নিয়ে ফকির সরে যায় পিঠের দিকে। খলিলুরের ঘাড়ে ছোরাখানা ঠেকালো, বললো—আমরা দাঁড়াবো না।

খলিলুর উঠলো। ফকির তার হাতের বাঁধন খুলে দিলে। খলিলুর গিয়ে ঘরের একপাশে আলমারী খুললো, ভিতর থেকে বের করে নিলে ঝোলাটা। তারপর ঝোলাটা সশব্দে রাখলো মেঝের উপর।

খলিলুরের বউ খাটের উপর শুয়ে ঘুমুচ্ছিল, তার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দুটো লোক আর দুখানা ঝকঝকে ছোরা দেখে সে চমকে উঠলো, তার মুখ থেকে কোন সাড়া বেরুলো না। ফকির ততক্ষণে ঝোলা তুলে নিয়েছে। দেখে নিয়েছে ভিতরে মাল ঠিক আছে কি না, তারপরেই হাবুলকে বললো—আর নয়, চল—

বারান্দা পার হয়ে দুজনে নেমে এলো বাগানে তারপর বাগানের দরজা খুলে পথে।

বাড়ীতে তখন সাড়া পড়ে গেছে। ছোট কর্তা চাকর-দরোয়ানদের ডাকাডাকি করছে।

মিনিট পনেরোর মধ্যে বন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে খলিলুর একাই বেরিয়ে পড়লো গাঁয়ের পথে। জনাকয়েক পাইককে বললো—তোরা পিছনে আয়—

চাঁদের আলোয় গাঁয়ের চেনা পথে ফজলুর ঘোড়া ছুটলো।

॥ ছয় ॥

পিছনে ঘোড়ার পদশব্দ পেয়েই ফকির বললো—হাবুল, সামনের গাছটায় উঠে পড়, ওরা ধরতে আসছে—

সামনেই বড় অশথ গাছ! হাবুল উঠতে শুরু করলো।

হাবুলের পর ফকির।

দুজনে একটা গাছের ডালে উঠে বসেছে, এমন সময় খলিলুর একা ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এসে পড়লো। ঘোড়া থামালো গাছের নীচে। এখান থেকে সামনের সোজা পথ অনেকদূর নজরে আসে। খলিলুর ভাল করে ঠাহর করলো, তারপর জোর গলায় বলে উঠলো—এখানেই কোন গাছে উঠে বসেছে, অনেকগুলো বড় বড় গাছ এখানে। আমিও গাছের ওপরেই গুলি চালিয়ে দুটোকেই খতম করবো।

কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে খলিলুর গাছের মাথার দিকে পরপর দুটো গুলি চালালো। তারপর বন্দুকটায় আবার গুলি ভরছে, সেই ফাঁকে অন্ধকারে ফকির নিঃশব্দে নেমে এসে এক হেঁচকা টানে তাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে এনে ফেললো। বন্দুক ছিটকে গেল হাত থেকে।—বন্দুকটা তুলে নে হাবুল—বলে ফকির খলিলুরকে চেপে ধরলো।

পরক্ষণেই ফকির খলিলুরকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের ওপর বসলো, বললো—এখনি তোমাকে আমি খতম করতে পারি। আমি কে জানো বকুলতলার রহিম, তুমি আমার ঘরে আগুন দিয়েছ, আমার বউ-ছেলেকে পুড়িয়ে মেরেছ, আমার জোত-জমি কেড়ে নিয়ে আমাকে পথে বসিয়েছে, এবার তার শোধ তুলবো।

—তুই রহিম সেখ?

—হ্যাঁ, আজ তোমার সঙ্গে আমার হিসাব নিকেশ।

—তোর ছেলেকে আমি পুড়িয়ে মারিনি। তোর ছেলে বেঁচে আছে।

—আমার ছেলে বেঁচে আছে?

—আছে। তার খবর আমি জানি। তুই আমাকে আগে ছেড়ে দে, আমি বলছি।

—মিছে কথা বলে আমাকে ভোলাতে চাও?

—সত্যি বলছি, আল্লার দিব্যি, তুই আমাকে ছেড়ে দে—

ফকির উঠে পড়লো। খলিলুরও উঠলো।

ফকির বললো—বল, কোথায় আমার ছেলে?

—তোমার ছেলে আছে টাউনের হাসপাতালের কোয়ার্টারে, তুমি কি এখন সেখানে যেতে পারবে?

—হাসপাতালে কোয়ার্টারে কেন?

—তোমার ছেলে আগুনে পুড়ে যায়নি তার মাথায় চোট লেগেছিল। হাসপাতালে দুমাস তার চিকিৎসা হয়েছিল, তারপর তার মা নেই বাপ নেই শুনে সেখানকার এক নার্স তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছে। সেখানেই সে মানুষ হচ্ছে। আমার চিঠি নিয়ে তোমাকে সেখানে যেতে হবে।

—সে চিঠি আমি পাব কি করে?

—আমি লিখে দেবো। আমার বাড়ী এস—

—তোমার বাড়ী? শয়তানের ডেরায় আমি আর যাবো না। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না। তুমি চিঠি পাঠিয়ে দেবে আমার আস্তানায়—আমার ঝোপড়িতে। কালকের মধ্যে আমার চিঠি চাই। আমরা চললাম! হাবুল চল—

—আমার বন্দুকটা?

—ওটা ফেরৎ পাবে না। ওটা মুক্তি ফৌজের কাজে লাগবে।

হাবুল ইতিমধ্যে গাছ থেকে নেমে এসেছিল। তার হাত ধরে ফকির বললো—চলু—

।। সাত ।।

পূবের আকাশ ফরসা হয়েছে এমন সময় ফকির এলো তার আস্তানায়। আস্তানার কাছাকাছিই একটি টিলা। ফকির এসে উঠলো টিলার উপর। চারিপাশে ভালো করে

তাকালো, কোথাও কোন মানুষের চিহ্ন নেই। ফকির টিলা থেকে নেমে বরাবর ঝোপড়িতে এলো। ঝোপড়ির বাঁশের দরজাটা দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। দড়ি খুলে ফকির ভিতরে ঢুকলো। দেয়ালের দিকে একখানা চাটাই গুটানো ছিল, পেতে বললো হাবুল বোস। আমি জল নিয়ে আসি—পিছনে একটা ডোবা আছে।

হাবুল বললো—চল, আমিও যাই, মুখ হাত ধোবো—

দু পা গিয়েই একটা ডোবা। সেই ডোবায় হাত মুখ ধুয়ে দুজন ফিরলো। ঝোপড়ির এক পাশে তিন চারটে হাঁড়ী ছিল। ফকির একটা হাঁড়ী থেকে গামছায় মুড়ি ঢাললো, আর এক হাঁড়ি থেকে বের করলো বাতাসা। দুজনে খেতে বসে গেল।

অনেক হাঁটাহাঁটি হয়েছে। খিদে পেয়েছিল খুব। অল্পক্ষণের মধ্যে মুড়ি বাতাসা শেষ করে ফকির বললো—এবার হাবুল যা, ওসমানের আস্তানায়। আমি ছোটকর্তার পিয়াদার জন্য বসে থাকি। সে চিঠি নিয়ে আসবে—

—হাবুল ঝোলা কাঁধে নিয়ে বেরুলো। তারপরেই ফিরে এসে বললো—ওই তো পিয়াদা আসছে। দেখে যাই তোমায় ছোটকর্তা কি লিখেছে—

দেখতে দেখতে চারজন সড়কিধারী পাইক এসে পড়লো।

ফকির তখন ঝোপড়ি থেকে বেরিয়ে এলো।

দুজন পাইক তখনই দুদিক থেকে তার দুহাত চেপে ধরলো একজন গামছা দিয়ে পিঠের সঙ্গে হাত বেঁধে ফেললে!

আর দুজন তখন হাবুলকেও চেপে ধরে পিঠের সঙ্গে হাত বেঁধে ফেলেছে!

ফকির বললো—ব্যাপার কি?

একজন পাইক বললো—ছোট কর্তা তোমাদের দুজনকে বেঁধে নিয়ে যেতে বলেছে। চল—

একজন পাইক হাবুলের ঝোলাটা তুলে নিলে—এটার মধ্যে কি আছে? ভিতরে হাত দিয়েই বললো—এ যে দেখি পিস্তল আর গুলি!—এই জন্যেই বোধ হয় ছোটকর্তা ধরতে বলেছে—চল চল—

হাবুল কি বলতে যাচ্ছিল, ফকির হাত নেড়ে থামিয়ে দিলে। দুজনে নীরবে পাইকদের সঙ্গে চলতে শুরু করলো।

খলিলুর দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল, এদের দেখে নেমে এলো। পাইকের হাত থেকে পিস্তলের ঝোলাটা নিলে, তারপর বললে—এদের দুজনকেই কাছারীর কয়েদ ঘরে বন্ধ কর।

হাবুল বলে উঠলো—আমাদের তুমি কয়েদ করবে? মনে রেখো আমরা ক্যাপটেন ওসমানের দলের লোক।

খলিলুর সে কথার কোনো জবাব দিলো না। হাতের ইশারায় তাদেরকে নিয়ে যেতে বললো।

—আমার পিস্তলের ঝোলা তোমার হাতে, তুমি আমার লোককে কয়েদ করছ, ব্যাপার কি ?

ক্যাপটেন ওসমান কখন খলিলুরের পিছন দিকে এসে দাঁড়িয়েছে, খলিলুর জানে না, এখন তার গলা শুনে চমকে উঠলো। পিছন ফিরে ওসমানকে একা দেখতে পেয়ে পাইকদের বললো—একেও কয়েদ কর—

—আমাকেও কয়েদ করবে ?

—তোমাদের এই মস্তানি আমি আর সহ্য করবো না। সদরে খাঁন-ফৌজ এসে পড়েছে। এবার তোমাদের সঙ্গে ভালমত বোঝাপাড়া হবে।

পাইকরা ওসমানকেও চেপে ধরলো। তারপর তিনজন বন্দীকে নিয়ে গেল কাছারী বাড়ীর ভিতরে।

দশ মিনিট পরেই হাতে ঝোলাটা নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে খলিলুর বেরিয়ে পড়লো।

বাঁশের পুল পার হয়েই কিছুটা গেলেই গ্রাম। গ্রামের একটা পাকা বাড়ীতে খাঁন ফৌজেরা একটা ঘাঁটি করেছিল, খলিলুর সেখানে পেঁছে পাহারাদার সিপাইকে বললো—মেজরের সঙ্গে দেখা করবো। জরুরী খবর আছে।

খবর পেয়ে মেজর রহিম বেরিয়ে এলো। আগে থেকেই পরিচয় ছিল, বললো—কি খবর ছোটকর্তা ?

—ভাল খবর আছে হুজুর। এই নিন্ মুক্তি ফৌজের পাঁচটা পিস্তল কাল আটক করেছি। আর তিনজন মস্তানকেও কয়েদ করেছি। তাদের মধ্যে এখানকার ক্যাপটেন ওসমানও আছে।

পিস্তল দেখে মেজর রহিম খুশী হলো, বললো—মস্তান তিনটেকে নিয়ে এলে না কেন ?

—আমি আনলে ভাল দেখাবে না। আপনার সিপাইরা গিয়ে নিয়ে আসবে।

—বেশ তাই যাবে। আজই সন্ধ্যার আগে হাটের মাঝে তিনটেকেই ঝুলিয়ে দোব। তুমি হাজির থেকো, বড় কর্তাকেও আসতে বলবে।

খানিক পরে খাঁন-সিপাহীরা তিনজন কয়েদীকে পাক ঘাঁটিতে নিয়ে এলো। গাঁয়ের মানুষ যারা তখনও গাঁয়ে ছিল, তারা দেখলো, ওসমান ও ফকিরকে অনেকেই চিনতো।

॥ আট ॥

গাঁয়ের মাঝেই হাটের মাঠ।

দুপুরের দিকে সেই মাঠে কয়েকটা বাঁশ পোঁতা হলো,। তার উপরে দুটো বাঁশ শক্ত করে বাঁধা হলো। পর পর তিনটে দড়ি ঝোলানো হলো, তিনজনকে পাশাপাশি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

বিকালের দিকে বন্দুকধারী পাক সিপাইরা এসে চারিপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। মেজর রহিম এলো, তারপরেই এলো তিনজন কয়েদী, ওসমান, ফকির আর হাবুল।
বিউগিল বেজে উঠলো।
সিপাহীরা বাঁশের নীচে ঝুলন্ত দড়িগুলোর পাশে এক একজন কয়েদীকে খাঁড়া করলো।
আবার বিউগিল বাজলো।
খানিক তফাতে কিছু কৌতূহলী মানুষ জড়ো হয়েছিল।
এবার কয়েদীর গলায় দড়ির ফাঁস জড়ানো হবে। এমন সময় ওসমান চীৎকার করে উঠলো—ছোট কর্তা মনে রেখো, এই খুনের বদলা তোমায় দিতে হবে!
এক সিপাই ওসমানের গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিলে।
ঠিক সেই সময় পিছনের ভীড়ের মধ্যে থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এলো, তাদের হাতে বোমা। পাক সিপাইদের মাঝে সেই বোমা পড়লো এবং ফাটলো।
পর পর কয়েকটা আওয়াজ, ধোঁয়া, ছুটোছুটি এবং তারপরেই গুলির শব্দ।
মুহূর্ত মধ্যে স্থানটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো।
কয়েক মিনিট শুধু বোমা ফাটার শব্দ। বন্দুকের আওয়াজ তার মধ্যে শোনা গেল না।

আওয়াজ থামলো, বাতাসের ঝাপটায় ধোঁয়া কেটে গেল। দেখা গেল মাঠে একটা মানুষও খাঁড়া নেই, সবাই পড়ে আছে। কে আহত হয়েছে, কে মরেছে বোঝার উপায় নেই। ক'জন পাক ফৌজও বুকের ওপর বন্দুক নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন শুয়ে-পড়া মানুষ উঠে বসলো। পাক-সিপাহী তখনই তাদের গুলি করলো।

এবার চারিপাশ ফাঁকা। কে যেন চীৎকার করে কি একটা আদেশ দিল। বিউগিল বাজলো। পাক-সিপাহীরা লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।
সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকেও বিউগিলের আওয়াজ ভেসে এলো। সবাই পথের দিকে তাকালো।
আওয়াজ দ্রুত কাছে আসতে লাগলো।

দেখা গেল পথের উপর দিয়ে ট্রাক আসছে। পরপর কয়েকখানি। তারপর নজরে এলো ট্রাকের মাথায় তিনরঙা নিশান।
ভারতীয় ফৌজ এসে পড়েছে!

বন্দুক হাতে নিয়ে যেসব পাক ফৌজ শুয়ে পড়েছিল তারা লাফিয়ে উঠে পড়লো, তারপরেই ছুটলো নিজেদের ঘাঁটির দিকে। ভারতীয় সৈনিকেরা তখন ট্রাক থেকে নামতে সুরু করেছে। তারা দেখলো কিন্তু কাউকে তাড়া করলো না, গুলিও চালালো না।

তবে মিনিট দশেকের মধ্যে দেখা গেল ভারতীয় সৈনিকেরা পাক ফৌজের ঘাঁটি ঘেরাও করে ফেলেছে।

॥ নয় ॥

মাঠে যারা বোমা ও গুলিতে আহত হয়েছিল ভারতীয় সিপাইরা তাদেরকে পাঠালো সদর হাসপাতালে।

ফকিরের পেটে গুলি লেগেছিল, ডাক্তার দেখে বললেন—বাঁচবার আশা কম।

ওসমানকে সামনে পেয়ে ফকির বললো—আমার একটা কাজ যে বাকী রয়ে গেল ওসমান। তুমি যেভাবেই হোক ফজলুর আর খলিলুরকে একবার আমার কাছে নিয়ে এসো, মরার আগে হিসাবটা চুকিয়ে দিয়ে যাই।

ফজলুর ও খলিলুর বাড়ীর মধ্যে চুপ করে বসেছিল, ওসমান গিয়ে দুভাইকে বের করে আনলো।

হাসপাতালে খলিলুরকে সামনে পেয়ে ফকির বললো—আমার ছেলে কোথায় এবার বল? আজ আর তোমার রেহাই নেই। যদি বাঁচতে চাও তবে সত্যি কথা বল?

খলিলুর বললো—তোমার ছেলে এখানকার সিস্টার আনওয়ারা খাতুনের কাছে মানুষ হচ্ছে।

নামটা শুনেই হাবুল বললে—সিস্টার আনওয়ারা খাতুন, সে তো আমার মা—

সিস্টার তখন ওয়ার্ডে ঘুরছে, বলতে বলতে সেখানে এসে পড়লো, হাবুলকে দেখেই বললো—হাবুল; তোর কথাই ভাবছি, কদিন কোথায় ছিলি?

খলিলুর এবার কথা বললো—সিস্টার খাতুন। এই কি তোমার সেই বকুলতলার ছেলে?

—কেন?—সিস্টার কঠিন স্বরে বললো—কেন? সে খবরে আজ দরকার কি?

খলিলুর এবার ফকিরের পানে তাকিয়ে বললো—ফকির সাহেব, এই তোমার ছেলে।

—এই হাবুল আমার ছেলে! ফকির হাবুলের একখানি হাত চেপে ধরলো।

—তুমি আমার বাবা?

হাবুল বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ফকিরের মুখের পানে, ফকির তখন উত্তেজনায় কাঁপছে।

ষণ্ডা কাহিনী

অজেয় রায়



আলো দুলে দুলে পড়ছিল—

"কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা—
কেরোসিন বলি উঠে এস মোর দাদা।

চা খেতে খেতে বাপিমামা কান পেতে শুনলেন।

কলকাতার কালিঘাটে সেজদির বাসায় মাঝে মাঝে বাপিমামার আবির্ভাব হয় সন্ধ্যায়, আপিস ফেরত। আর মামা এলেই বোনঝি আলো পুতুল ধরে বসে, 'মামা গপ্পো বল।'

বাপি মামার গল্পের স্টক অফুরন্ত। বলার জন্য মুখিয়েই থাকেন। কিন্তু আজ গল্পের ডাক পড়ে নি। কারণ দিন চারেক আগে বাপিমামার আগমনের পর আলো পুতুল গল্পের জন্য আবদার ধরতেই দিদি অর্থাৎ আলো পুতুলের মা ধমক মেরেছিলেন—

'দশ দিন বাদে হাফইয়ার্লি পরীক্ষা। এখন গল্প শোনা নয়। যাও পড়তে।'

দুই বোন সুড়সুড় করে চলে গিছল।

আজ মামা বাড়ি আসতেই আলো পুতুল করুণ নয়নে একবার মামার পানে তাকিয়ে ফের পড়ার বইয়ে মুখ নামায়।

'ওই কবিতার লাইনকটা কার লেখা জানিস ?'

বাপিমামার গলা শুনে আলো ফিরে দেখে, খবরের কাগজ হাতে দরজা দিয়ে গম্ভীর বদনে ঘরে প্রবেশ করছেন মামা।

'হুঁ জানি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের।' আলোর জবাব।

'কেন পড়ছিস ?'

'ভাব সম্প্রসারণ লিখতে হবে।'

'অর্থ বুঝেছিস লাইনগুলোর ?' মামা সামনে চেয়ার টেনে বসেন।

'হুঁ।'

'কি শুনি ?'
'কেরোসিন শিখা একদিন মাটির প্রদীপের আলোকে ধমক দিয়ে বলেছিল—' আলো ব্যাখ্যা শুরু করে।
'ব্যাস ব্যাস ঠিক আছে। বুঝেচি। ওই কেরোসিন পিদিম চাঁদমামার কাহিনী বাদ দে। আচ্ছা ,যদি অন্য একটা উদাহরণ দিতে বলা হয়, পারবি ? কবিতাটার মর্মার্থ খাটে তেমন কোনও ঘটনা ?'
'মানে ! ইয়ে !'—আলো নাক চুলকোয়, চুল খামচায় কিন্তু উত্তর খুঁজে পায় না।
মামা বললেন, 'পারলিনে তো ? ফেল। তবে ষণ্ডার কেসটা জানলে হয়তো অ্যানসারটা বলতে পারতিস। এমন বোকা বনতিস না।'
'—কে ষন্ডা ?' আলোর প্রশ্ন
'একটি ধর্মের ষাঁড়। অতি বজ্জাত।' মামার জবাব।
গল্পের গন্ধ পেয়ে আলো তড়িঘড়ি বলে ওঠে, 'বল না মামা কি সেটা ? কি হয়েছিল ?'
'হ্যাঁ হ্যাঁ বল না।' যোগ দেয় পুতুল। সে এতক্ষণ শুনছিল একমনে। এবার বেঁষে আসে।
'তা বটে ঘটনাটা জেনে রাখা ভাল। কি না কি প্রশ্ন আসে পরীক্ষায়। প্রিপেয়ার্ড থাকা উচিত।' মাস্টারি চালে মামার ঘোষণা।
সেজদি রান্নাঘরে ব্যস্ত। সেদিকে একবার আড়চোখে দৃষ্টি হেনে নিশ্চিন্ত হয়ে বারকয়েক চোখ পিটপিট করেন বাপিমামা এক চিলতে কৌতুকের আভা ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায় তাঁর মুখে। যেন থমথমে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ ভেদ করে বিজলির ক্ষণিক ঝিলিক। তারপর নিচু গলায় রসিয়ে শুরু করেন।
'জানিস তো গ্র্যান্ড ট্র্যাংক রোড গেছে দুর্গাপুরের এক ধার দিয়ে। জি, টি, রোডের গায়ে তিন রাস্তার মোড়ে একটা বাস-স্টপেজ। নানান দিক থেকে বাস এসে থামে সেখানে। প্রচুর যাত্রী ওঠা নামা করে। স্টপেজটার আশেপাশে বেশ কিছু দোকান পাট। দিনের বেলা ছোটখাট বাজারও বসে জায়গাটায়। আনাজপাতি, মাছ আরও হরেকরকম টুকিটাকি জিনিস বিক্রি করতে লোক বসে রাস্তার ধারে ধারে। ওই অঞ্চলেই বিচরণ করত ষণ্ডা। নামটা ওখানকার লোকেরই দেওয়া। 'বিশাল তার বপু। হাতখানেক লম্বা বাঁকানো শিং। মেটে রং। লালচে চোখ। তিরিক্ষি মেজাজ। দুনিয়ার কাউকে বেটা পরোয়া করত না। কখনো ঢিবির মতন শুয়ে থাকত যেখানে সেখানে মর্জিমাফিক। যে জায়গায় বাজার বসে হয়তো সেখানেই গা এলিয়ে পড়ে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ভয়ে ব্যাপারীরা সেদিন বসল গিয়ে দূরে।'
'কখনো বা রাস্তার ওপরেই শয়ন করত। গাড়িগুলো সন্তর্পণে কাটিয়ে যেত তাকে। হর্ণ বাজালেও ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের মনে জাবর কাটছেন। তবে পিচ রাস্তা ওপর বড় একটা শুতো না। বোধহয় কানের কাছে হর্ণের আওয়াজ তার বিশ্রামে

ব্যাঘাত ঘটাত। আর যেদিন বাস স্টপেজটাকে বিশ্রামস্থল হিসেবে বেছে নিত, সেদিন স্টপেজটাই সরাতে হতো খানিক তফাতে।

কার ভরসা ওর কাছে যায়। কারণ লোকে একটু ঘেঁষে এলেই—ফোঁস্—রাগী নাসিকা গর্জন। বেয়োনেটের মতো শিঙের মৃদু আন্দোলন এবং চাবুকের মতন লেজের ঝাপট।

'কখনো ষণ্ডা গটগটিয়ে হেঁটে বেড়াত।

'বহু যাত্রী বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। ষণ্ডা ভিড় ভেদ করে সিধে এগোয়। কাউকে গ্রাহ্যি নেই। লোকে ছিটকে সরে গিয়ে বাঁচে। ওই লাশের সামান্য ধাক্কা খেলেই যে নির্ঘাৎ হাসপাতালে গমন।

কাছেই মাঠ। সেখানে প্রচুর ঘাস। কিন্তু ঘাস বা ফেলে-দেওয়া তরিতরকারির খোসাও টুকরোয় ষণ্ডার মোটেই মন উঠত না। বেটার নজর হয়ে গিছল উঁচু। ফ্রেস আস্ত ফল-মূল সবজির দিকে তাক করে থাকত।

যেমন ধর, লাল টুকটুকে ফালি ফালি কাটা তরমুজ সাজিয়ে রাখা হয়েছে ডালায়। ষণ্ডা পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে লম্বা জিভে বড় এক ফালি টেনে নিল তার মুখ গহ্বরে।

তখন ব্যাপারীর হায় হায় আর্তনাদ। ষণ্ডা ধীরে সুস্থে আয়েস করে তরমুজ চিবুতে চিবুতে এগোল। ক্ষিপ্ত দোকানী দু-চার ঘা লাঠির ঘাও লাগাল তার পিঠে। হালকা লাঠির ঘা ষণ্ডা কেয়ারই করত না। তবে বেশি বাড়াবাড়ি করলে অর্থাৎ মোটা লাঠি দিয়ে জোরে পিটলে, ফোঁস করে নাক দিয়ে জেট ছেড়ে শিং বাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াত। ব্যাস, আক্রমণকারীর পশ্চাদপসরণ। ষণ্ডা ফের নিশ্চিন্তে এগুতো।

দৈনিক বার দুই ষণ্ডা মাটিতে বসা বাজারের ভিতর দিয়ে বা ফলের দোকানগুলির পাশ দিয়ে রাউণ্ড দিত এবং প্রায় প্রতিবারই কিছু পছন্দ মাফিক টাটকা ফ্রুটস বা ভেজিটেবলস ভোগে লাগাত। ওকে আসতে দেখলেই উঠত সামাল সামাল রব। ফল ও তরি-তরকারির ব্যাপারীরা কেউ ঝাঁড় তুলে পালাত। কেউ বা মাল আগলাত লাঠি হাতে। তবু বেশিরভাগ সময়ই শেষ রক্ষা হতো না। কারোর না কারও গচ্চা যেত ষণ্ডার কৃপায়।

কেবল ছিনতাই করে খাওয়াই নয় বেটার আরও সব দুষ্টু বুদ্ধি ছিল। অযথা শিং নেড়ে ফোঁসফোঁসিয়ে ভয় দেখাত প্রায়ই, রাস্তাঘাটের মানুষজন, কুকুর, গরু ছাগল ইত্যাদিকে। তাড়া লাগিয়ে গাড়িসুদ্ধ জোড়া বলদকে ছুটিয়ে দিত হুড়মুড়িয়ে।'

গল্প থামিয়ে খানিক দম নিলেন বাপি মামা। তারপর বললেন—'ষণ্ডার বৃত্তান্ত তো শুনলি, এবার ক্যাংলার কথা শোন।'

'ক্যাংলা কে?' শ্রোতাদের সমবেত জিজ্ঞাসা।

'একটা রাস্তার নেড়ি কুকুর। টিঙটিঙে রোগা। কালো রং। সদা শঙ্কিত ভাব। সে বেচারিও থাকত ওই বাস স্টপেজের কাছে। ক্যাংলা নামটা আমারই দেওয়া।

ওর ছিল শুধু গলার জোর। চাঁচাছোলা কানে তালা ধরানো গলায় হরদম চেঁচিয়ে যাচ্ছে। কখনো ঢিল বা তাড়া খেয়ে, কখনো অন্য কুকুর বা ভয় জাগানো কিছু দেখে, তবে সবসময়ই সে বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে গলা ছাড়ত।

ক্যাংলার সর্বদাই ছোঁক ছোঁক ভাব। লড়াই করে অন্য কুকুরের খপ্পর থেকে খাবার ছিনিয়ে নেবার সামর্থ ছিল না তার। লুকিয়ে-চুরিয়ে বাজারে বা দোকানের ফেলে দেওয়া খাবার যেটুকু মিলত তাই খেয়ে কোনও রকমে জীবন ধারণ করত।

ষণ্ডার প্রতি অত্যন্ত ভয় এবং ভক্তি ছিল ক্যাংলার। ভাবত বোধহয়, আহা কি তেজ! কি শক্তি। আমারই মতন নিরাশ্রয় জীব। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে পেট চালায়। অথচ কি দাপট।

ক্যাংলা মাঝে লেজ নাড়তে নাড়তে ষণ্ডার কাছে আসত। বলতে পারিস কুর্নিশ দিতে দিতে। কিন্তু ষণ্ডা মোটে পাত্তা দিত না ক্যাংলাকে। ক্যাংলা কাছে এলেই সে ফোঁস করে উঠে শিং নাড়ত। অমনি তড়িৎগতিতে সাত হাত পেছিয়ে যেত ক্যাংলা। তারপর কিছুক্ষণ কেঁউ কেঁউ ডাক ছাড়ত অভিযোগে এবং অভিমানে। ষণ্ডা দৃকপাতই করত না। খানিক বৃথা চেঁচিয়ে ক্যাংলা বিষণ্ণ চিত্তে সরে যেত।

এক শীতের সকাল। রোদের তেজ তখন সবে ফুটছে। ষণ্ডা এবং ক্যাংলা একসঙ্গে হাজির হল বাসস্টপেজে কিছু খাদ্যের সন্ধানে। তারপরই এক দৃশ্য দেখে দুজনেই থ। ওটা কিরে বাবা!

রাস্তায় জলের কলের পাশে দাঁড়িয়েছিল এক হাতি। আর টিনের ড্রাম পেতে কল থেকে ভরছিল একজন লোক। লোকটি ওই হাতির মাহুত।

ষণ্ডা বা ক্যাংলা জন্মে হাতি দেখেনি। এমন বিরাট জীব তাদের কল্পনার বাইরে।

বিস্ফারিত নেত্রে একটুক্ষণ হাতীদর্শন করেই ক্যাংলা দুই লাফে আড়াল নিল ষণ্ডার পেছনে। অতঃপর ডাকতে শুরু করল আতঙ্কে। সরু ভাঙা গলায় নাগাড় চেঁচানি।

আর ষণ্ডা কয়েক পা পেছিয়ে এসে রুদ্ধশ্বাসে দেখছে তো দেখছেই।

ওই কিম্ভুত বিশাল প্রাণীটার পাশ কাটিয়ে তরকারির বাজার বা ফলের দোকানগুলোর দিকে যেতে তার সাহস হচ্ছে না। আবার নিরাপদ দূরত্ব রেখে রাস্তা পেরিয়ে অনেকটা ঘুরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতেও প্রেস্টিজে লাগছে।

হাতিটি নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাচ্ছে এবং কুতকুতে চোখে নজর রাখছে ষণ্ডা ও ক্যাংলাকে। ড্রামটা ভর্তি হতে সে শুঁড় ডুবিয়ে চোঁ চোঁ করে টেনে জল খেতে লাগল।

ষণ্ডা দেখল, না, ওটা তেড়ে এল না। আক্রমণের লক্ষণ নেই। সে এবার কয়েক পা এগোল ভরসা করে। কিঞ্চিৎ হাসি হাসি মুখে। ইচ্ছেটা ভাব জমানোর। এমন এক বিরাট প্রাণীর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো যায় বৈকি। তাতে তার খাতির বাড়বে।

কিন্তু ক্যাংলাটা যে জ্বালিয়ে মারল। আপদটা কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। ষণ্ডা ক্যাংলাকে তাড়াতে একবার জোরে ফোঁস করে শিং নাড়ল ঘাড় ঘুরিয়ে।

ক্যাংলার চিৎকারে হাতিটি বিলক্ষণ বিরক্ত হচ্ছিল। এবার ষণ্ডার ভাবভঙ্গি তার সুবিধের ঠেকল না! সে শুঁড় উঁচিয়ে ষণ্ডা এবং ক্যাংলাকে তাক করে জল ছাড়ল হোস্ পাইপের মতন বিপুল তোড়ে।

জলের প্রথম ঝাপটাতেই ক্যাংলা গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। তারপর তড়াক করে উঠে কেঁউ ডাক ছেড়ে উল্টো দিকে মারল ভোঁ দৌড় পরমুহূর্তেই ভ্যাবাচাকা ষণ্ডা ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে প্রাণপণে অনুসরণ করল ক্যাংলাকে। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে দুজনেই অদৃশ্য হল। হাতি আবার ড্রামে শুঁড় ডোবাল।'

'বাপি ওঘরে কি কচ্ছিস? গপ্প শুনতে ডাকছে বুঝি মেয়েগুলো?' বারান্দায় সেজদির গলা শোনা যায়।

বাপিমামা ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে এগুতে এগুতে জবাব দিলেন, 'নাঃ গপ্পো-টপ্পো নয়। ওদের একটা পড়া বলে দিচ্ছিলুম।'

চিড়িয়াখানার উট

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ধ্যানী দুই চোখে কি যে চিকচিক করে
দূর অতিদূর মরু সাগরের বালি
অলস দুপুরে আজকে মনে কি পড়ে
সাহারার বুকে ঝড় উঠেছিল কালই?
পথ হল শেষ, থেমেছে তোমার চলা
রেলিং ঘেরা এ বাসাটি হয়েছে প্রিয়?
মেলে দিয়ে শুধু লম্বা ঘাড় ও গলা
হয়েছে দারুণ বস্তু দর্শনীয়।
ফেলে এসে দূর পিরামিড অতিকায়
আজকে দেখি ও দুইখানি চোখ ভীত
মরূদ্যানের স্বপ্ন উধাও হায়
ছুটি চঞ্চল মানুষ অপরিচিত।
কাঁটার রক্ত আর কি ক্ষুধায় মেশে?
মরীচিকা হয়ে কাঁপেনিত চোরাবালি
তবুও মেদুর ছবি ভাসে দিনশেষে
সাহারায় আহা ঝড় উঠেছিল কালই।

একটি কচ্ছপ বৎসর, সঙ্গে কিছু মৎস্য



ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

॥ ১ ॥

বিরাট বড়ো পুকুরটাতে
একটা কুঁড়ে কাছিম
বললে, হেথায় দেড়শো-বছর
সুখেই আমি আছিম্ ।
যখন যা পাই, তাই খাই-দাই
গান গাই আর নাচিম্
ইচ্ছে বুকে দুঃখে-সুখে
তিনশো বছর বাঁচিম্ ।

॥ ২ ॥

বিরাট বড়ো পুকুরটাতে
একটা চালাক চিতল
বললে হেসে, এই পুকুরের
জলটা ভীষণ শীতল ।
হেথায় আমি গড়বো দামী
একটা বাড়ি দ্বিতল
ইঁট দিয়ে নয়, চাই শুধু ভাই
দস্তা—লোহা—পিতল ।

॥ ৩ ॥

বিরাট বড়ো পুকুরটাতে
একটা কাহিল কাত্‌লা

বললে, যাবোই মামার বাড়ি
সেই যে নদী—মাত্‌লা।
সেথায় গিয়ে করবো আহার
দুধ-সাবু খুব পাতলা
চেঞ্জে যাবার কায়দা আমার
কেমন হলো, বাত্‌লা।

॥ ৪ ॥

বিরাট বড়ো পুকুরটাতে
একটা সরল সিঙি
ছেলেগুলো তার 'মস্তান' আর
মেয়েগুলো সব ধিঙি।
উঠেই ভোরে বেড়ায় চ'ড়ে
শালুক-পাতার ডিঙি
বললে, পুজোয় 'সিওর' সবাই
যাবোই দার্জিলিঙই।

॥ ৫ ॥

বিরাট বড়ো পুকুরটাতে
একটা ছোট পুঁটি
বললে, আমার দারুণ মজা
পড়লো পুজোর ছুটি।
ইচ্ছে মতন ঘুরবো এবার
সবাই বেঁধেই জুটি
তিরিশটা দিন আনন্দেতেই
কাটবে মোটামুটি।

॥ ৬ ॥

বিরাট বড়ো পুকুরটাতে
একটা বুড়ো বোয়াল
বললে, এটা পুকুর, নাকি
হরি ঘোষের গোয়াল ?
চুপ কর্ সব, ঘুঁষি মেরেই
ভাঙবো তোদের চোয়াল
নইলে কাঁধে চাপিয়ে দেবোই
বিশাল লাঙল-জোয়াল।



মুরারীবাবুর নবজন্ম

শিশির কুমার মজুমদার

ট্রেন থেকে নেমে মুরারীবাবুর মনটা খুশিতে ভরে গেল। ছোট্ট স্টেশন, চারপাশে সবুজের সমারোহ, পাখির গান, ঠাণ্ডা বাতাস, গাছের পাতায় ঝিরঝির গান। সব সেই ছোটবেলায় বাবার কাছে শোনা কথার মত।

গোটা চাকরী জীবনে শহর কলকাতার ইট-কাঠ-লোহা-লক্কড়ের মাঝেই বন্দী হয়ে ছিলেন তিনি। বেশ ভাল কাজই করতেন। তাতে ছুটিতে বেড়াতে যাবার মত রোজগার ছিল ওর। তবে যার কেউ নেই, গোটা বিশ্বসংসারে সবার দায় দায়িত্ব যে তারই একার, তা সামলাতে সামলাতে আর কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। মনে মনে অনেক স্বপ্ন দেখেছেন উনি। পাড়ার লাইব্রেরী থেকে ভ্রমণ-কাহিনী এনে পড়েছেন। মনে মনে বহুবারই ওই দিল্লী-হিল্লী ঘুরে এসেছেন। রিটায়ার করে হঠাৎ দেখলেন অনেকগুলো টাকা এক সঙ্গে হাতে পেয়ে গেছেন উনি।

তিন কুলে কেউ নেই ওর। একান্তই আপন যারা, তাদের সঙ্গে কোন দিনও কোন সম্বন্ধ ছিল না ওর! তারা থাকতেন গ্রামের আদি বাড়িতে। যেখানে ওর বাবার কিছুদিন যাওয়া-আসা ছিল। সেই সুবাদেই গ্রামের গল্প ছেলেবেলায় বাবার কাছে শুনেছেন উনি। কিন্তু ওর বাবার পর আর সেই গ্রামের দেশে কোন দিনও ওর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

শহর কলকাতায় যাদের কাছে থাকতেন এতদিন উনি, তারা কেউই তেমন আপন নয়। ওর চাকরি জীবনে তাদের প্রাপ্তি যোগটা ভালই ছিল তাই মৌখিক খাতির-যত্ন উনি পেতেন ঠিকই, তবে সেটা যে তত আন্তরিক নয়, তা বুঝতেন মুরারীবাবু। তবুও তাদেরই বোঝা এতদিন বয়েছেন উনি।

আজ আর ওর চাকরী নেই। আছে রিটায়ার করার পর পাওয়া টাকাগুলো। তা দিয়ে আর অন্যের বোঝা বওয়ার দায় দায়িত্ব নেওয়া যায় না। তাই ঠিক করলেন, সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে যে দিকে খুশি চলে যাবেন।

তবে তেমন করে নিরুদ্দেশ হবার আগে একবার হাকিমপুরে ঘুরে আসবেন। হাকিম-পুর ওর পূর্বপুরুষের দেশ, জন্মভূমি সেই গ্রাম, যার কতবার কত ভাবেই না বাবার কাছে ছেলেবেলায় শুনেছেন উনি। যার একটা স্পষ্ট মধুর ছবি এই এত দিন পরেও ওর মনের মধ্যে নানান কল্পনার রঙে আঁকা আছে।

ট্রেন থেকে নেমে সেই ছবির সঙ্গে সামনে চোখে দেখা বস্তির দৃশ্যের বেশ কিছুটা মিল খুঁজে পেয়ে খুশিই হলেন মুরারীবাবু।

গেটে টিকিট দিয়ে সুটকেশ বিছানা হাতে নিয়ে স্টেশনের বাইরে বার হয়ে এলেন মুরারী-বাবু। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন সামনেই সাইকেল-রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে। কাছে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, পুবের পাড়ার বনমালী রায় চৌধুরীদের বাড়ি চেন? বনমালী, যাঁর ঠাকুর্দা হাকিম ছিলেন, যার নামেই সে জায়গার নাম হাকিম পাড়া।'

রিক্সাওয়ালা হাত দিয়ে সিটটা ঝেড়ে বলল—'বসুন বাবু। হাকিমবাড়ি এ তল্লাটে কে না চেনে। আপনি আজ্ঞে কলকাতা থেকে আসছেন? কই, সে বাড়িতে তো কারও আসার কথা শুনিনি। বসুন আপনি, আজ্ঞে!'

মুরারীবাবু বুঝলেন তার পোস্ট কার্ডগুলো তাহলে পথে খোয়া গিয়েছে। তা হোক, ও বাড়িই ওর পূর্ব পুরুষদের ভিটে। খোঁজ খবর নিলে দেখা যাবে এখনও ওর ওই সম্পত্তিতে মোটা হিস্যা আছে। জীবনে কোনদিনও উনি ওর দাবী আদায়ের চেষ্টা করেন নি। আজ তাহলে ক'দিন ওখানে গিয়ে থাকার অধিকার অন্তত ওর আছে। আর যারা এখন সম্পত্তির ভোগ-দখল করছেন, তারা কি ওকে দুবেলা দুমুঠো ফুটিয়ে দেবে না? না যদি দেন তো তখন অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন। মুক্ত পুরুষ উনি। পেছন-টান তো আর ওর নেই।

রিক্সাওয়ালা-রিক্সা ছুটিয়ে দিল। একটু এগিয়ে মোড়ের মাথায় পেঁছে বলল, 'কি আর দেখতে যাচ্ছেন বাবু ওখানে। বুড়ি মা আছেন। আছেন পিসীমা আর বুড়ি-মার নাতনী। ভুতের বাড়িতে ওই মাত্র তিন জন মানুষ। খুব দুঃখে আছেন ওরা। চিঠি লিখে এলে ভাল করতেন। এত বেলায় পেঁছলে ওদের···' রিক্সাওয়ালা বাকী কথা আর শেষ করল না।

মনে মনে বেশ চিন্তায় পড়লেন মুরারীবাবু, যে বুড়িমার কথা বলল রিক্সাওয়ালা, সম্পর্কে তিনি নিশ্চয়ই ওর কাকীমাই হবেন! কিন্তু কি যেন নাম ও'র···? বেশ ক'বছর

আগে একখানা চিঠি ডাকে এসেছিল ওর নামে, কে যেন মারা গেছেন তার শ্রাদ্ধের চিঠি। পাঠান হয়েছিল এখান থেকেই। যথারীতি উত্তর তার দেননি উনি। আর কিছুদিন আগে ওর সম্পর্কের এক ভাইপোর বিয়ে গেল কলকাতায়, সে বিয়ের চিঠিতে ওর নাম-টাই ব্যবহার করা হয়েছিল বংশের প্রধান পুরুষ হিসাবে, সেই নিমন্ত্রণ-পত্র একখানা উনিই পাঠিয়েছিলেন এদের নামে। কিন্তু নামটা কি এ বাড়ির কর্ত্রীর? মনোরমা? না মনমোহিনী কি?

সোজা রাস্তায় রিক্সা আসতেই রিক্সাওয়ালা বলল, 'ওই যে বাবু, ওই সামনের দিকে হাকিমবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি আগে নাকি কত কি ধুমধাম হত ও বাড়িতে। এখন, বলছি তো, ভূতের আড্ডা। দেখলে দুঃখ হয়।'

ভেঙ্গে পড়া লোহার গেটের সামনে রিক্সা থামিয়ে রিক্সাওয়ালা চেঁচাতে লাগল, 'ও রাখালদা, রাখালদা, বাড়ি আছো নাকি? তোমাদের বাড়িতে লোক এসেছে গো একবার এদিকে এসো।' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে ও বলল, 'বাবু, রাখালদা এ বাড়ির মাহিষ্য।'

সুটকেশ-বিছানা নীচে নামিয়ে দিয়ে রিক্সাওয়ালা ফের বলল, 'নামুন বাবু, রাখালদা না এলেও মাল আমিই ভিতরে দিয়ে আসব।'

পুরণো জরাজীর্ণ বিশাল বাড়িটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিক্সা থেকে নামলেন মুরারীবাবু। ছেলেবেলায় বাবার কাছে বহুবার শুনেছিলেন এই চক মিলানো হাকিম বাড়ির কথা। বাবা ওর বহুদিন তো বাস করেছিলেন এই বাড়িতেই। তখন নাকি এ বাড়ির দরজায় হাতী বাঁধা থাকত। আর এখন…!

পরিচয় দিলে ওকে চিনবে তো এখন এ বাড়ির সবাই। নাকি ধুলো পায়েই আবার ফিরতে হবে ওকে।

ভাঙ্গা একটা ঝুড়ি ভর্তি কাঠ কুটো নিয়ে জঙ্গলের মাঝ থেকে বার হয়ে এলো এক বুড়ো। খালি গা তার। হাঁটুর উপরে তুলে পরা ধুতি।

সারা মুখে তার ক্লান্তির ছাপ। কাছে এসে ভাল করে দেখল ও মুরারীবাবুকে। হঠাৎ হাতের ঝুড়ি মাটিতে ফেলে প্রায় ছুটেই কাছে এসে দুহাতে মুরারীবাবুকে ধরল। তারপর মুরারীবাবুকে চমকে দিয়ে আবেগ-ভরা গলায় বলল, 'তুমি, তুমি!! তুমি!!! এত দিন পরে মনে পড়ল সবার কথা! কি পাষাণ প্রাণ গো তোমার! এসো এসো ভিতরে এসো।' বলে বিছানা আর সুটকেশটা দুহাতে তুলে নিয়ে হাঁটা দিল বাড়ীর দিকে।

অবাক মুরারীবাবু রিক্সার ভাড়া মেটালেন। রিক্সাওয়ালার অবাক চাহুনির সামনে থেকে সরে এলেন বাড়ির বাগানে। সে বাগান এখন প্রায় জঙ্গলই হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি ঘটল? এইমাত্র যে কাণ্ড করে গেল এ বাড়ির পুরণো কাজের লোক, তার মানে কি? কোনও সন্দেহ নেই যে লোক চিনতে ওই বুড়ো ভুল করেছে। কে

কোথায় চলে গেছে আর এখন ওকেই সেই লোক বলে ভুল করছে ও। আরো ঝামেলা তো !

বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ফিরে দাড়াল রাখাল। বুড়ো ব্যস্ত হয়ে বলল, 'ও কি, অমন থমকে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আবার কি কোনও বদ মতলব এল নাকি মাথায়? দোহাই তোমার, আর কাঁদিও না ওই বুড়িকে আর ওই কচি বাচ্চাটাকে। কি দোষ করেছে ওরা তোমার কাছে শুনি?' কথার শেষে ও এগিয়ে এসে যেন ওকে আগলে দাঁড়াল। বলল, 'চল চল, ঘরে চল।'

এ ডাক শুনেও এগোলেন না মরারীবাবু। থমকে দাঁড়িয়ে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বাড়িতে তুমি বহুদিন কাজ করছ। না?'

অবাক রাখাল বলল, 'শোন কথা, তা কি তুমি জান না?'

'আমাকে তুমি ঠিক চিনেছ? কে আমি বলতো?'

'ওমা, এ কি হেঁয়ালি সুরু করলে তুমি বলতো?'

বলল অবাক রাখাল, 'আমি এ বাড়ির মাহিষ্য, খেটে খাওয়া মানুষ, আমার সঙ্গে না হয় এমন করলে ছোড়দা, পারবে মার সঙ্গে এমন করতে, পারবে সনুমাকে এমন করে দুঃখ দিতে? কাকে বলছি এসব কথা। তোমার কি আর মন বলে কিছু আছে। থাকলে কি আর এত বছর এমন নিরুদ্দেশে থাকতে পারতে! যা করেছ তা করেছ। এখন ওসব ছাড়। বাড়িতে এসে বস। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে।

রাখাল যে ভীষণ ভুল করেছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেন মুরারীবাবু। বললেন, শোন, রাখাল তুমি এই যে কি সব কথা বললে এতক্ষণ, তার মানে কিন্তু আমি বুঝিনি। কারণ আমি তোমার সেই ছোড়দা নই। আমার নাম মুরারী রায় চৌধুরী। তবে হ্যাঁ, আমিও এই বংশেরই মানুষ। বাবার নাম গোপীবল্লভ রায়চৌধুরী। তিনি তো তার ছেলেবেলায় এ বাড়িতেই থাকতেন। এখন আমি কলকাতায় বাগবাজারে থাকি। রিটায়ার করে ভাবলাম এক বার দেশ দেখে যাই, তাই আসা। দুখানা পোষ্টকার্ড ছেড়েছিলাম আমার আসার খবর দিয়ে। বুঝেছি তা তোমরা পাওনি। তুমি কিন্তু মিছিমিছি কোনও ঝামেলা পাকিও না! বুঝলে? তা হলে আমার আর এখানে থাকা হবে না।'

'তুমি ছোড়দা সীতাংশু রায়চৌধুরী নও!' অবাক রাখাল জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি বলছ?'

'না আমি সীতাংশু রায়চৌধুরী নই।' বললেন মুরারীবাবু। 'তা যাই হোক, এ বাড়ির মার নামটা কি বলতো? নামটা আমি এখন ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'মার নাম মনোরমা।' বলল রাখাল, 'পিসিমার নাম সুভাষিনী। আর ছোড়দির নাম সান্ত্বনা। সবাই সনু বলে ডাকে।' বলে ও হাতের মাল বাগানের মাঝে নামিয়ে রেখে হঠাৎ মুরারীবাবুর দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। কাতর ভাবে বলল, 'তুমি যে হও বাবু এ বংশের তো কেউ। এই বুড়োর একটা কথা শুনবে? নিজের পরিচয় না হয় না-ই

দিলে এখানে। এই জঙ্গল গাঁয়ে কে আর তোমার খোঁজ করতে আসবে। এ বাড়ির সবাই তোমাকে যেভাবে নেবে, তুমি না হয় সেভাবেই থাকলে এখানে।'

অবাক মুরারীবাবু বললেন, 'মানে! কি বলছ তুমি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'কি আর বলব তোমাকে বাবু...' গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রাখাল, 'এ বাড়িতে আমার বাপ দাদা মাহিষ্যির কাজ করে গেছে। আমিও এসেছিলাম সেই ছোট বেলায়। আমার তখন বয়স হবে আট কি দশ। বড়বাবুর ছোটছেলের বয়স তখন হবে চার কি পাঁচ। সে-ই আমার ছোড়দা। বড়দা মারা গেলেন বিয়ের আগেই। ছোড়দার বিয়ে হল ধুমধাম করে। সনু মা এল। তখন এ বাড়িতে কত আনন্দ, কত হাসি। বড়-বাবুও সেই সময় গত হলেন। তখন শুনেছিলাম বটে কলকাতায় এ বাড়ির জ্ঞাত-কুটুমরা থাকেন। তাদের শ্রাদ্ধের চিঠি দেওয়া হবে। তা আপনারা তো কেউ আসেন নি। তাই আর কাউকে চিনি না। সুখে দুঃখে দিন চলে যাচ্ছিল। কি যে হল, ছোটমায়ের ধরল কাল-অসুখে। ও দিকের হাটতলায় তখন পাস করা এক নতুন ডাক্তারবাবু এসে-ছিলেন, তিনি শহরের পাস করা এক ডাক্তার। তাকে ডাকা হল। কত ওষুধ, কত সুঁই-ফোঁড় চলল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে ছোড়দা একটা খাসের পুকুর ইজারা দিয়ে সে টাকায় শহর থেকে আরও বড় ডাক্তার ডেকে আনল। সে ডাক্তার এসেই বলল, সব ভুল চিকিৎসা হয়েছে। যে রোগ নয় তার ওষুধ পড়েছে! ছোটমাও আর থাকলেন না!

'কি যে হল ছোড়দার কে জানে, সারাক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকত। কেউ কিছু বললেই বলত, 'সামান্য কটা টাকা বাঁচাতে গিয়ে আমি ওকে মেরে ফেলেছি। কেন প্রথমেই শহরের বড় ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলাম না!' শেষে ছোড়দা একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। গেল তো গেলই, আজও তার আর দেখা নেই। কত কথা রটেছে। কেউ বলে সে সাধু হয়ে গেছে। কেউ কেউ আরও খারাপ কথা বলে। বাবু, ভেবে দেখ, বুড়ি মা আর ছোট্ট মেয়েটার কথা। কেঁদে কেঁদে বুড়িমার চোখের দৃষ্টি গেছে। ভাগ্গিস পিসীমা ছিল, তা না হলে যে কি হত কে জানে। আর সনুমা, তাকে তুমি না হয় নিজের চোখেই দেখবে চল।' এত কথা বলে থামল রাখাল।

মুরারীবাবু বললেন, 'বেশ তো সব কথা বুঝলাম। তা আমাকে তুমি ঠিক কি করতে বলছ, শুনি?'

'আপনাকে বাবু ঠিক আমাদের ছোড়দার মত দেখতে। আপনি ছোড়দা হয়ে ফিরে আসুন আজ এ বাড়িতে। সবার মুখে আবার হাসি ফিরুক। অন্তত আর যে কটা দিন বুড়িমা বাঁচে, তাকে একটু সুখে থাকতে দিন আপনি। তারপর না হয় যা ভাল বুঝবেন করবেন।' থামল রাখাল।

একটু হাসতে চেষ্টা করলেন মুরারীবাবু। বললেন, 'পাগল হলে তুমি রাখাল! মিথ্যা কখনও সত্যি হয়? আমি রাজী হলেও যখন মিথ্যা ধরা পড়বে তখন আমার বা

ওই বৃদ্ধার কি অবস্থা হবে তা কি ভেবেছ? মনের দুঃখে তো তখনই তিনি মারা যাবেন।'

'তা আর হবে না বাবু।' বলল রাখাল, 'বুড়িমা তো চক্ষেই দেখে না। পিসীমার অত বুদ্ধি নেই। আর যদি বল, সনুমা, তার আর তখন বয়স কতই বা ছিল যে সে, তার বাবাকে চিনবে। আর বললাম না, এই দেশ-পাড়াগাঁয়ে কে আর আপনাকে ধরতে আসবে? তা ছাড়াও আপনি তো কারও সঙ্গে তঞ্চকতা করছেন না। আমি তো সবই জানলাম। কেউ কিছু বললে, সত্যি মিথ্যার আমিই তো সাক্ষী দেব। ভেবে দেখুন কথাটা আমার বাবু।

মনস্থির করে ফেললেন মুরারীবাবু। আচ্ছা জায়গাতেই বিশ্রাম নিতে এসেছেন উনি। সুটকেশ বিছানা হাতে তুলে নিয়ে স্টেশন মুখো হাঁটা দিলে এখনও হয়ত বিকালের কোন ট্রেন ধরা যাবে। সেই ভাল হবে ওর পক্ষে। তা নয়ত কি এখানে এখন উনি অভিনয় করবেন, যা নয় তার। এ অসম্ভব। সুটকেশ বিছানা তুলতেই যাচ্ছিলেন উনি। হঠাৎ তখনই বাগানের শেষ থেকে ডাক শুনতে পেলেন মেয়েলী গলায়, 'রাখালদা, কে ওখানে, কার সঙ্গে কথা বলছ? বেলা অনেক হল, নিরিমিষ্যি ঘরের উনুনে আগুন দিতে হবে না? কাঠকুটো কিছু পেলে?

কাঁপা গলায় রাখাল বলল, 'পিসীমা···।' কথা কেন যেন ও শেষ করতে পারল না। অসহায়ের মত দুচোখ মেলে তাকিয়ে রইল মুরারীবাবুর দিকে। ওর দুচোখে তখন আকুতি।

মহিলা মাথায় আঁচল তুলে আরও বেশ কিছুটা এগিয়ে এলেন সামনে। মাথার কাপড় আরও কিছুটা টেনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রাখাল গাছ কাটতে চাস? কোন গাছটা পছন্দ করলি?' বলে থমকে থেমে গেলেন। বড় বড় চোখ করে মুরারীবাবুর দিকে কিছু-ক্ষণ তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ও মা, ছোড়দা তুমি! তুমি ছোড়দা!' কথার শেষে প্রায় ছুটে এসে মুরারীবাবুর দুটো হাত শক্ত করে ধরলেন। বললেন, 'একি চেহারা করেছ ছোড়দা। ছি ছিঃ। এতদিন পরে মনে পড়ল আমাদের! কি পাষাণ প্রাণ গো তোমার। একবারও মা-মেয়ের কথা ভাবলে না! চল, চল, ঘরে চল। আর তোমাকে ছাড়ছি না।'

মুরারীবাবু তাকিয়ে দেখলেন, রাখালের দুচোখে সেই আকুতি। এক সেকেণ্ড ভেবে নিলেন মুরারীবাবু। কাউকে ঠকাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তো ওর নেই! তা যখন নেই তখন এই নতুন ভূমিকায় ক'দিন অভিনয় করে দেখা যাক না। আপনজনদের তাতে যদি মঙ্গল হয় তো সেটাই লাভ।

মহিলা থমকে বললেন, 'ও রাখালদা, তুমি অমন থমকে রইলে কেন। নাও নাও, সুটকেশটা তোলো। আমি বিছানাটা নিচ্ছি! চল ছোড়দা, চল। কাকীমা তোমাকে দেখলে প্রাণে বাঁচবে।'

'কি হয়েছে মার ?' অবাক মুরারীবাবু শুনলেন, তিনি নিজেই ওই কথাগুলো বলছেন।

'ওর মন একদম ভেঙ্গে গেছে ছোড়দা। তার উপরে রাত দিন সনুর চিন্তা কি হবে ওর। বয়স তো কম হয়নি। অত চিন্তা সইবে কেন এ বয়সে ? বিছানা নিয়েছে কাকীমা।'

'ডাক্তার দেখান হয়নি ?'

'ডাক্তার !' হাসলেন মহিলা, 'দুবেলা দুমুঠো যে জুটছে কি করে তা ভগবানই জানেন আর জানে রাখালদা। চিকিৎসার টাকা আসবে কোথা থেকে ?'

কথা বলতে বলতে ওরা বাগান পার হয়ে বাড়ির সামনে এসে পড়ল। ভিতর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সনু সনু কোথায় গেলি। আয় শিগ্গির। কে এসেছে দেখ এসে।'

বুকের ভিতরে কেমন যেন করে উঠল মুরারী বাবুর। এইবার উনি ধরা পড়ে যাবেন। ডাক শুনে যে আসবে সে তো বড় জোর বারো-চোদ্দ বছরের মেয়ে। রাখাল যাই বলুক তার চোখকে কি আর উনি ফাঁকি দিতে পারবেন।

মহিলা আবার ডাক দিলেন।

ভিতর বাড়ির দরজার সামনে এরপর যে এসে দাঁড়াল, তার দিকে তাকিয়ে মুরারীবাবুর মনটা যেন কেমন করে উঠল।

দুঃখের প্রতিমূর্তি একটা বার-চোদ্দ বছরের মেয়েই এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। মুখে হাসি নেই, চোখের চাহনিতেও কেমন যেন হতাশা-মাখা! কোন দিকেই না তাকিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'পিসী ডাকছ কেন ?'

'ডাকছি কেন!' অবাক মহিলা বললেন, 'ওরে তুই একবার তাকিয়ে দেখ, দেখ কে এসেছে।'

মেয়েটা মুখ তুলে তাকাল। দেখল কিছুক্ষণ। মুখের ভাব, চোখের চাহনী ওর একটু একটু করে বদলে যেতে লাগল। হতাশা-ভরা মুখে ক্রমে যেন আনন্দের ছোঁয়া লাগল। ক'পা সামনে এসে ও বলল, 'বাবা!' তারপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরারী বাবুর বুকে।

দুহাতে বুকের মাঝে ওকে ধরলেন মুরারীবাবু। জীবনে অনেক-কিছু থেকে বঞ্চিত উনি। তা হলেও নিজে কখনও কাউকে বঞ্চনা করেন নি। তা করেন নি বলেই তো গোটা কর্ম জীবন অমানুষিক খেটে আশপাশের সবার মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছিলেন। হাসেনি কেউ। সবাই শুধু হাত বাড়িয়ে চেয়েই গেছিল! দাও দাও, তেমন করে না দিতে পারার দুঃখেই তো কলকাতা ছেড়েছেন উনি। ছুটে এসেছেন অজানা অচেনা এই জায়গায়। এখানে তার জন্য এ কি সুখ অপেক্ষা করে আছে।

মেয়েটা অভিমান ভরা গলায় বলল, আমাদের ফেলে কোথায় তুমি চলে গেছিলে বাবা! জানো, ঠাকুমা আর চোখে ভাল দেখতে পায় না। খুব অসুখ। ডাক্তারবাবু বলেছেন, বাঁচবে না। কেন তুমি চলে গেছিলে বাবা। আমাদের কত কষ্ট।'

পিসীমা বললেন, 'ওরে মুখপুড়ি, তোর কি এখন এসব কথা বলার সময় হল! চল, চল ভিতরে চল। আগে ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করা। বসা। তারপর যত কিছু বলার বলিস। আর বলেই বা কি করবি? ওর তো পাথর প্রাণ। বিছানা বাক্স-এনেছে, কে জানে হয়ত ওসব ফেলেই আবার একদিন চলে যাবে। আমরা মরলাম কি বাঁচলাম, তাতে আর ওর কি আসে যায়।'
বুকের মধ্যে আবার যেন কেমন করে উঠল মুরারী বাবুর। ভীষণ একটা রাগ হল সেই অচেনা সীতাংশুবাবুর উপরে। এত নিষ্ঠুর মানুষ হতে পারে।
মেয়েটা ভয় পেয়ে আরও নিবিড়ভাবে ওকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আর আমাদের ফেলে চলে যাবে না তো বাবা?'
কি যে হল কে জানে। চাপা এক আনন্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুরারীবাবু বললেন, 'না, রে, আর আমি কোথাও যাব না। চল ভেতরে চল।'
একটা মহা মিথ্যা, একটা অসম্ভব অবাস্তব স্বপ্নকেই সত্যি বলে মেনে নিলেন মুরারীবাবু! ধরা পড়বেন একদিন উনি, তাতে সন্দেহ নেই। তখন যে আরও করুণ এক নাটকের অভিনয় হবে এ বাড়িতে তাতেও সন্দেহ নেই। তবুও আজকের এই অপূর্ব সুন্দর মিথ্যার আমেজকে কেন যেন আর অস্বীকার করতে পারলেন না মুরারীবাবু।
সব অন্যায় পাপ নয়। সব মিথ্যাই আপাত সুখ দেয়। সেই নিষ্পাপ সুখটাই দুর্বল মনের মানুষের মত মেনে নিলেন মুরারীবাবু!
বৃদ্ধা বললেন, 'এসেছিস, আয় কাছে আয়। চোখে তো আর তেমন জোর নেই, দেখিনি কিছুই ভাল করে।' বলে ওর গোটা দেহে হাত বুলিয়ে পরম তৃপ্তিতে বললেন, 'হ্যাঁ, এই তো আমার সেই সিতু। সেই নাক, সেই চোখ মুখ। হ্যাঁরে আর আমাকে দুঃখু দিবি না তো রে?' বলেই ডাকলেন, সনুমা একবার এদিকে আয় তো! দেখু তো তোর বাপ কি পড়েছে, গেরুয়া? না না সিতু, ও পরে তুই আমার কাছে আসিস না। ও আমি সইতে পারব না। আমাকে আর জিয়ন্তে দগ্ধাসনি বাবা। সুখ যে কি সে তো ভুলেছি। চক্ষের জলই সার। আর আমাকে কাঁদাস না। কি রে, চুপ করে রইলি কেন? কিছু বল। একবার মা বলে ডাক বাবা। আয়, কাছে আয়।
মুরারীবাবু শান্ত ভাবে বললেন, 'হাটতলার ডাক্তার কি তোমাকে দেখছে না কি? না, না, অন্য ডাক্তার ডাকতে হবে। রাখাল এদিকে কোনও নতুন ডাক্তারবাবু এসেছেন না কি? বিকালে আমাকে নিয়ে যেও তো! মার চিকিৎসার ব্যাপারে আর হেলা-ফেলা নয়।'
দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে সব কিছু এতক্ষণ দেখছিল রাখাল। সেখান থেকেই কেমন করে যেন বলল, 'তুমি এসেছ ছোড়দা, এখন তুমি যা কর তাই। নাও, এখন যাও মুখ-হাত ধুয়ে জামা-কাপড় ছাড়। বড়মার এখন একটু ঘুমাবার সময়। না ঘুমালে কষ্ট হবে।'
বৃদ্ধাকে যত্ন করে শুইয়ে দিলেন মুরারীবাবু। তারপর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। এরপর বেশ কটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটেগেল তা বুঝতেই পারলেন না মুরারীবাবু।

একটা অজানা ভয় মেশানো অদ্ভুত স্খের অন্ভূতি ওকে যেন কেমন বেপরোয়া করে দিল। শ্ধ্ মাঝে মাঝে হঠাৎ রাখালের ম্খোম্খি হয়ে একট্ যেন মনের ভিতর কাঁপ্নি লাগত ওর। কিন্তু নির্বিকার রাখাল ওর মনের ভয় ম্ছে দিয়ে ক্রমে ওকে দ্ঃসাহসী করে তুলল।

কদিন পরে বৃদ্ধাকে বললেন উনি, 'মা, আমি কাল সকালে একবার কলকাতায় যাব। সেখানে কিছ্ কাজ আছে আমার। তুমি চিন্তা কর না। আমি ঠিক ফিরে আসব।' একথা বলেই ম্রারীবাব্ ব্ঝলেন কি ভীষণ কাণ্ডই না করে বসেছেন উনি। কোনও কথা বললেন না বৃদ্ধা। অন্ধ দৃষ্টি মেলে একবার শ্ধ্ ওকে দেখতে চেষ্টা করলেন। তারপর দ্টো দ্র্বল হাত দিয়ে ওকে আঁকড়ে ধরলেন। সে ম্ঠো ছাড়ান সহজ নয়।

টাকা-পয়সা সবই ফুরিয়েছে ওর। শহরে যেতেই হবে। তাই ওই ম্ঠো ছাড়ালেন উনি। বাক্স-বিছানা রেখে, একটা ছোট থলিতে কাপড়-গামছা নিয়ে পরদিন যখন ঘরের বাইরে এলেন, তখন মায়ের ম্খে চোখে সে কি চাহ্নি! সন্ একটা কথাও বলল না। শ্ধ্ দরজায় হেলান দিয়ে বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। সে চাহ্নিতে ব্যথা ভরা ভয়। সেই চাহ্নির সামনে নিজেকে বড় অপরাধী বলে মনে হল ম্রারীবাব্র। এ উনি কি করে চলেছেন! এর শেষ হবে কি ভাবে?

শ্ধ্ স্ভাষিনী পিসী বললেন, 'দাদা, আবার আমাদের কাঁদিয়ে চলে যাচ্ছ না তো?'

ট্রেনে বসে অনেকক্ষণ ভাবলেন ম্রারীবাব্, এখন ওর কি করা উচিত। যা চলেছে তাতে তো মনে হয় সান্ত্বনা, স্ভাষিনী, কেউই ব্ঝতে পারেনি কিছ্ই। বৃদ্ধার কথা বাদ। এক রাখাল, তবে সে-ই তো এই নাটক বানিয়েছে। ইচ্ছা করলে কি এখন এই মিথ্যা নাটকটা বাকী জীবন ধরে উনি অভিনয় করে যেতে পারবেন? যদিই বা পারেন, তা করা কি উচিত হবে? ন্যায় অন্যায় কোন দিকে পাল্লা ভারী? তাছাড়া দেশের আইন-কান্ন কি ভবিষ্যতে ওকে বিপদে ফেলবে না? এসব কিছ্র পর আপন বিবেক, তার কাছে উনি কি কৈফিয়ত দেবেন?

যতই চিন্তা করলেন উনি ততই যেন সব কিছ্ আরও জট বেঁধে উঠতে লাগল। কারণ তার আর কিছ্ই নয়, একটা ভাললাগার লোভ ওকে পেয়ে বসেছে। তা কোনও য্ক্তি মানে না! এখন যে নিঃশব্দে আর সরে আসবেন উনি, তা আর কখনও করতে পারবেন না। কতগ্লো অসহায় চোখের চাহ্নি ওকে যেন কি এক বাঁধনে বেঁধে ফেলেছে। শ্ধ্ কি তাই, এতদিন বাদে উনি যেন আজ সত্যি জীবনের স্বাদ ব্ঝতে পারছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে ওর যেন এক নতুন জন্ম হয়েছে।

যা-ই কিছ্ হোক না কেন, যা-ই পরিণতি থাক, হাকিমপ্রের হাকিমবাড়িতে ফিরেই যাবেন উনি!

ব্যাঙ্কের ঝামেলা এক দিনে মিটল না। ক'দিন কলকাতায় থেকে যেতে বাধ্য হলেন ম্রারীবাব্। সে ক'দিন অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করলেন। আবার ফিরতি ট্রেনে উঠে

একটু যেন স্বস্তি পেলেন। হাকিমবাড়ির ফটকের কাছে পেঁছে দেখলেন, ফটকের সামনে দুজন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। রাখাল তাদের সঙ্গে কথা বলছে।
ওকে রিক্সা থেকে নামতে দেখেই রাখাল বলল, 'এত দেরী করলে ছোড়দা! ওদিকে বড়মার অবস্থা খুব বাড়াবাড়ি। যাও, শিগ্গির ভিতরে যাও।' বলে ভদ্রলোক দুজনকে বলল, 'না, বাবুমশাইরা, গাছটা এখন আর বিক্রি করব না। ছোড়দা এসে গেছে, এখন আর চিন্তা কি। দরকার পড়লে আমি আবার খবর দেব।'
একরকম ছুটেই বৃদ্ধার ঘরে পেঁছালেন মুরারীবাবু। পালঙ্কের দুপাশে বসে সান্ত্বনা আর সুভাষিনী। দুজনের চোখেই জল। পায়ের কাছে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু। তিনি একটা ইনজেকশন তৈরি করছেন। সবাই মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। কান্না ভরা গলায় সনু ঝুঁকে পড়ে ডাকল, 'ঠাম্মা, ঠাম্মা, বাবা এসেছে, দেখ, বাবা এসেছে।'
শীর্ণ একটা হাত একটু নড়ল। সে হাত পরম যত্নে ধরলেন মুরারীবাবু। একটা আধ-বোঁজা চোখ বহু কষ্টে খুলল। কাকে যেন খুঁজল।
ঝুঁকে পড়ে মুরারীবাবু বললেন, 'মা, মা, এই তো আমি। তুমি কি কিছু বলবে?'
বহু কষ্টে বৃদ্ধা বললেন, 'মেয়েটাকে আর ভাসিয়ে দিস না বাবা।'
শীর্ণ হাতটা আপন বুকে ধরে মুরারীবাবু বললেন, 'না মা না, আমি আর কোথাও যাব না ওদের ফেলে।'
'আঃ', পরম তৃপ্তিতে বৃদ্ধা চোখ বুঝলেন।

ভোর বেলা শ্মশান থেকে ফিরলেন মুরারীবাবু কাছা ধারণ করে। ঘরের দরজায় আগুন লোহা ছুঁয়ে দাঁতে নিমপাতা কাটলেন। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ছে তখন নিজের ঘরে গিয়ে একটু একলা শুলেন। একটু যেন ঝিমুনিও এসেছিল ওর। দরজার কাছে অল্প আওয়াজ হতেই তন্দ্রা ছুটে গেল। দেখলেন, সনু ঘরে ঢুকছে, হাতে চিনির পানার গ্লাস।
গ্লাসটা সনু রাখল মাথার কাছের টেবিলে। মুরারীবাবুকে অবাক করে দিয়ে গিয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। মুখ তুলে তাকাল কেমন করে যেন আবার মুরারীবাবুর দিকেই। অবাক মুরারীবাবু দেখলেন, ওর চোখে সেই প্রথম দিনের দেখা অসহায় চাহুনি ফিরে এসেছে।
জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবি মা?'
'হ্যাঁ, আগে তুমি পানাটা খেয়ে নাও।'
গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন মুরারীবাবু। মেয়ের চোখের চাহুনি ওর বুক কাঁপিয়ে দিল। একটু ভয়ও পেলেন উনি মনে মনে, বললেন, 'কি বলবি মা বল।'
কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সনু বলল, 'আপনি কি শ্রাদ্ধ মিটলেই এখান থেকে চলে যাবেন? আর থাকবেন না?'

মুহূর্তে সব কুয়াশায় জাল যেন ছিঁড়ে গেল। সব মিথ্যা সত্যি হয়ে গেল। স্পষ্ট করে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন মুরারীবাবু। না, মেয়ের চোখে আর কোনও সন্দেহের ছায়া নেই। আছে শুধু সেই অসহায় চাহনি। স্পষ্ট করেই জিজ্ঞাসা করলেন মুরারীবাবু, 'আমার পোষ্টকার্ড তুই পেয়েছিস মা?'

'হ্যাঁ পেয়েছি। মিসেস রায় চৌধুরী লেখা থাকতে ওগুলো আসতে দেরী হয়েছে। ওদুটো আমি উনুনে পুড়িয়ে দিয়েছি।'

'তা হলেও মা, রাখাল সব জানে! ওরই বদ্ বুদ্ধিতে…', কথা শেষ করতে পারলেন না মুরারীবাবু।

'পিসীমা কিন্তু 'কিছুই জানে না বাবা।'

চমকে উঠলেন মুরারীবাবু। বললেন,' 'কি বললি তুই? বাবা! তিন কুলে আমার কেউ নেই মা! রাখালটা লোভ দেখাল। কি কাণ্ড করে বসলাম দেখ তো। জানি, যেতেই হবে। মিথ্যা কি আর কখনও সত্যি হয়? এদিকে আমরা দুজনেই মা বিরাট ভুল করে বসেছি। তুই আর আমি। এখন দেখ তাই কত ব্যথা!'

চোখ বেয়ে টস টস করে জল ঝড়ে পড়ল সনুর। কেমন করে ফের তাকাল ও মুরারীবাবুর দিকে। চোখের জল মোছার চেষ্টা না করেই বলল, 'ভুল আমি করিনি বাবা। বাবা, তুমিও আর ভুল কর না। অশৌচ চলছে, বিছানায় এখন শুতে নেই তোমাকে। আমি কম্বল, এনে দিচ্ছি। তার আগে চিনির পানাটা খেয়ে নাও বাবা।'

হাতের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে পরম তৃপ্তিতে মুরারীবাবু বললেন, 'ভুল হয়নি তুই বলছিস মা, বলছিস? যা তাহলে কম্বলটা এনেই দে। বড় ক্লান্তরে আমি। একটু নিশ্চিন্তে শুই। আর ভুলের কথাই যদি ওঠে তো তখন ধরা পড়ে যে শাস্তি কপালে, লেখা আছে, ভোগ করব। তার আগে আর'…কথা শেষ করলেন না মুরারীবাবু।

জল-ভেজা চোখে দরজা খুলে সনু বাইরে বার হয়ে গেল। ওর মুখে তখন হাসি।

অন্যরকম

সুনীল দাশ



'তোমরা তিনজনের একজনও ভূত বিশ্বাস ক'রো না, অথচ তিন বন্ধুই ভূতের গপ্পো শোনার জন্যে বসে আছ। তোমাদের কাছে ওই রকম কোনো কাহিনী বলার মানে হয় না, তবে এতো ক'রে বলছ যখন, তখন আমি আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি। কিন্তু একটা শর্ত আছে, বলা শেষ হ'লে ওই নিয়ে কেউ আমায় কোনো রকমের প্রশ্ন করতে পারবে না।'—ব'লে ডক্টর সান্যাল তাঁর পাইপে আগুন ধরালেন।

বাইরে টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে যা মেঘ তাতে মনে হচ্ছে খানিক পরেই আবার মুষলধারে নামবে। এই এলাকার ট্রান্সমিটার জ্বলে গিয়ে বিকেল থেকেই কারেন্ট নেই। পাহাড়ের গায়ে এই ট্যুরিস্ট বাংলোয় জেনারেটারও নেই। মোমের আলোয় আমরা তিন বন্ধু ডক্টর সান্যালের শর্তে রাজি হয়ে গিয়ে অশরীরী আত্মা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা শুনতে আগ্রহী হলাম।

ডক্টর সান্যাল বলতে শুরু করলেন।

আমি তখন সবে এম, এস-সি পরীক্ষা দিয়েছি। একেবারে ছেলেবেলার থেকেই ভূতটুতের ব্যাপারে আমার বিশ্বাস-টিশ্বাস কিছু ছিল না। তবে ওই সময়টা থেকে প্যারানর্মাল বিষয়টা আমাকে একটু একটু করে বেশ টানতে শুরু করেছিল। উদ্ভট, বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা যায় না এমন কিছু শুনলেই সেটা তলিয়ে চুলচিরে দেখার জন্যে ছুটে যেতাম।

সেবার গেছিলাম আমেদাবাদ শহরে।

আমার মেশোমশাই আমেদাবাদের প্রবাসী বাঙালী ছিলেন। নদীর ওপারে, সবরমতী আশ্রম থেকে বেশ কিছুটা দূরে, একটা বাড়িও করেছিলেন মেশোমশাই। তবে তার দুই ছেলে বাইরে চাকরি করায়, বিপত্নীক মেশোমশাই তখন একলাই থাকতেন সে বাড়িতে। পুরোনো এক চাকর ছিল সে বাড়িতে। ওই এলাকাটাই তখন খুব

ঝিরিঝিরি। মেশোমশাইয়ের বাড়ি আর নদীর মাঝ বরাবর একটা দরজা-জানালা বন্ধ বাইরের থেকে তালামারা দোতালা বাড়ি প্রথম দিন থেকেই নজর টেনেছিল আমার। হালে নদীর ওপারটার শহর বেশ জমজম করতে শুরু করেছে, নতুন নতুন বাহারী ঘর-বাড়িতে। জমির দাম চড়েছে। খুঁজে ওখানে এখন জমি মিলবে না। কিন্তু তালামারা ওই বাড়িটা পড়ে আছে দিনের পর দিন। বাড়ির সামনে পাঁচিল ঘেরা বিশাল জায়গা। এ বাড়ি ভেঙে বিশাল জায়গাটা নিয়ে কিছু একটা করার উদ্যম দু একজন নিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ এগোয় নি। আমার মেশোমশাই এবং আশপাশের লোকজনের মুখে শুনলাম বাড়িটা নাকি অভিশপ্ত। যে ওখানে বাড়ি করতে আসবে তার অপঘাত মৃত্যু নাকি অনিবার্য। ব্যাপারটা ঠিকমত বলতে না পারলেও আবছা-আবছা ধারনা দিল ওই বাড়িটা থেকে খানিক দূরে মুচিপাড়ার লোকজন।

ওই মুচিপাড়ার রামকান্ত তখন সে বাড়ির কেয়ার-টেকার। বাড়ির মালিক তখন দূর দেশে থাকেন। রামকান্ত খুব সাহসী লোক। তার কাছেই বাড়ির চাবি। কেনার জন্যে কেউ খোঁজ খবর করলে সে দরজা খুলে দেখায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। অশরীরীদের আনাগোনার ব্যাপারটা পরখ করবার জন্যেও কখনো সখনো ধনী কেউ কেউ তাদের কাউকে পাঠিয়েছেন শোনা গেল। রামকান্ত ওই বাড়ির আউট-হাউসে, সামনের গেটের পাশেই দুটো ঘরের কোনো একটাতে রাতে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একরাত কাটিয়ে তারা আর কেউ দ্বিতীয় রাতে আসে নি। মস্করা করে গেছে, ভাগ্যিস বাইরের ঘরে ছিল। ভেতরের কোনো ঘরে বা দোতলায় থাকলে আর প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরতে হতো না।

রামকান্তর থেকে খোঁজখবর নেওয়ার পর আমি মেশোমশাইকে ধরলাম ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলার জন্যে।

আমার মেশোমশাই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। খুব বিজ্ঞ মানুষ। তার কাছ থেকে জানা গেল, ওই বাড়িতে এক বৌ খুন হয়ে যাওয়ার পর থেকেই নানারকমের উৎপাত চলছে ওখানে। বৌটির গা-ভর্তি সোনার গয়নার লোভেই তাকে খুন করেছিল কেউ। সে বৌ নাকি এখনো গয়না পরে ঘুরে বেড়ায় সারা বাড়িময়। মরার পর থেকে বৌটি একটির পর একটি প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে। গয়নার লোভ দেখিয়ে সে মানুষ টেনে নিয়ে যায় ওই বাড়ির মধ্যে, তারপর গলাটিপে মেরে রেখে যায়। এক রাতের জন্যেও যারা নাকি ওই বাইরের দুটো ঘরের কোনো একটাতে শুয়েছে, তারা সকলেই বৌটির হাসি, হাঁটাচলার শব্দ শুনেছে।

এসব শোনামাত্র আমি ঠিক করলাম একটা রাত ওই বাইরের দুটো ঘরের একটাতে থাকবো।

মেশোমশাই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বললেন, 'তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে ভুতুড়ে গপ্পে কান দিচ্ছ। যত্তসব!'

কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা হওয়ায় মেশোমশাই নিজেই রামকান্তকে ডেকে সব ব্যবস্থা করে-

ছিলেন। আমি রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে, সঙ্গের একটা ঝোলায় কিছু জিনিষ পত্তর নিয়ে চলে গেলাম সেখানে।

হেমন্তের রাত। শীতের আমেজ এসে গেছে বেশ খানিকটা। রামকান্ত একটা সুতির চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। একটা ঘরে আমার জল, হ্যারিকিনের আলো সব বন্দোবস্ত করে সে পাশের ঘরটায় চলে গেল। রাত কাটানোর জন্যে আমি মেটাফিজিক্সের মোক্ষম একটা বই পড়তে শুরু করে দিলাম। হঠাৎ রাত্রে বৃষ্টি শুরু হ'ল।

ঘণ্টাখানেক পর থেকেই আমার বাড়ির ভেতরটায়, দোতলায় যাওয়ার জন্যে কৌতূহল বাড়তে থাকল! কিন্তু ঘরের ভেতর দিকের দরজাতে তালা দেওয়া। রামকান্ত এসে খুলে না দিলে ভেতরে যাওয়া যাবে না। আমার কৌতূহলটা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা হ'ল যে আমি রামকান্তকে ডাকার জন্যে বাইরের দিকের দরজাটার খিল খুললাম।

দরজা খুলেই আমি অবাক!

দেখি, দরজার সামনে, অন্ধকারে রামকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটা অন্তর্যামী নাকি? তবে লোকটা বেশ শীতকাতুরে! নইলে এমন হালকা শীতে মাথা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিয়েছে কেন?

আমি ঘরের মধ্যে ফিরে এসে, ঝোলার থেকে টর্চটা নিতে নিতে বললাম, 'দোতলার ঘরে যাবো। তালাটা খুলে দাও ভাই।'

রামকান্ত আমার কথায় কতটা অবাক হ'ল দেখলাম না, সে ততক্ষণে নিঃশব্দে চাবির গোছা বার করে অন্দর মহলে যাবার দরজা খুলে দিল। আমি টর্চটাকে পকেটে পুরে হাত বাড়িয়ে হ্যারিকিনটা তুলে নিয়ে রামকান্তকে অনুসরণ করলাম।

ভয়ডর জিনিসটা আমার চিরকালই কম। কিন্তু রামকান্ত যেন আরো বেপরোয়া। ওই দরজা থেকে এগিয়ে ভেতরে কয়েক পা এগিয়েই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। আলোটা না নিয়ে ও অন্ধকারেই সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে দিয়ে উঠতে থাকল হাতে চাবির গোছা নিয়ে। আমি হ্যারিকিনটা নিয়ে ওর পেছনে পেছনে উঠলাম। ওকি আমি হঠাৎ দোতলায় যাচ্ছি বলে খুব বিরক্ত! এখন একবারও আমার দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

দোতলায় পেঁছে সে প্রথম ঘরটাই খুলে দিল। আমি আলোটা নামিয়ে রেখেছি। ঘরটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটা বাদুড় ডানা ঝাপটে বেরিয়ে গেল। একই সঙ্গে কুচকুচে কালো একটা বেড়াল বেরিয়ে এসে বারন্দার রেলিংয়ের বসে বিশ্রী রকমের ডাক দিল। অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বলছিল। আমার দিকে একবারটি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে নিয়েই সে ঝাঁপ দিল নিচের চৌকো অন্ধকার চত্বরে। সঙ্গে সঙ্গে আমি পকেট থেকে টর্চ বার করে দেখতে গেলাম। টর্চটা জ্বালতে জ্বালতেই আমি একবার তাকালাম রামকান্তের মুখের দিকে।

এই প্রথম ভয়ে শিউরে উঠলাম আমি। কেঁপে গিয়ে আমার হাত থেকে টর্চটা পড়ে

গেল। দেখলাম মাথার চাদর মুড়ি দিয়ে অন্য একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এ রামকান্ত নয়। এ যথেষ্ট বয়স্ক। মুখটা বিশ্রী রকমের পোড়া। একটাও কথা না বলে লোকটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস বইতে শুরু করেছে এই সময়। কেমন দিশেহারা হয়ে আমি হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

পুরোনো আমলের বড় ঘর। আসবাব-পত্তর কিছু নেই, ফাঁকা। শুধু রঙচটা দেওয়ালে যেন কিছু অয়েল-পেন্টিং। এ বাড়ির মালিক পরিবারের বিভিন্ন লোকের তৈলচিত্রই হবে। আলো তুলে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে ছবিগুলো দেখলাম। আশা করছিলাম ওর মধ্যে সোনার অলংকারের জন্য খুন হয়ে যাওয়া বধূটিকে খুঁজে বার করবো। কিন্তু ও ঘরে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের তৈলচিত্রই বেশি। শুধু একটি ছবি অল্প বয়েসী একটি ছেলের। বছর উনিশ-কুড়ি বয়স হবে। যীশুর মত সরল সুন্দর অথচ কেমন যেন বিষাদ মাখানো মুখশ্রী। ছবিটার চোখ দুটো খুব জীবন্ত। এক্ষুণি বুঝি দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়বে দুচোখ বেয়ে।

এর মধ্যে একটা অন্য রকমের ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে টের পেলাম। ওই ঘরটাতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় বা আতংক নয়, একটু আগে দেখা ওই বিশ্রী রকমের পোড়া মুখের বৃদ্ধ নয়, কি রকম একটা বিষণ্নতা আমার বুকের মধ্যে যেন চেপে বসতে শুরু করল। অকারণ বুকের ভেতরটা বিষাদে দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। ওই রকম একটা গা-ছমছমে মারাত্মক আতংকের পরিবেশে আমার ভেতরকার এই পরিবর্তনটা দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। এ রকম হচ্ছে কেন? ক্রমশ বাড়ছে। এ ধরনের অসহ্য কষ্ট তো বেশিক্ষণ আমি সইতে পারবো না। বাইরের ঝোড়ো বাতাস এবং বৃষ্টি আর কতক্ষণ চলবে? বিশ্রী রকমের পুড়ে যাওয়া মুখের বৃদ্ধটি কি এখনো সিঁড়ির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে?

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, অল্প সময়ের মধ্যে আবহাওয়া বদলে গেছে পুরো। বৃষ্টি থেমে গেছে। ঝোড়ো বাতাসও নেই। চারিপাশ শান্ত। আকাশে চাঁদ। চাঁদের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র।

ঘরের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আরো বেশি করে অবাক হ'তে হল আমায়। ঘরটা থেকে যত দূরে সরে যেতে থাকলাম আমার বুকের ভেতর থেকে খানিকটা আগের মারাত্মক বিষাদভাবটা ততই হালকা হ'য়ে যেতে থাকল। বেশ অনুভব করলাম, ভয়ংকর বিষণ্ন এলাকাটার বাইরে চলে যাচ্ছি আমি। বুকের ভেতরে যে দুমড়োনো ভাবটা ছিল সেটা শান্ত হয়ে এলো।

এরপরেই দেখি, সেখানে দোতলা থেকে সিঁড়িটা ছাদের দিকে উঠে গেছে, সে জায়গাটায় দুধ সাদা পোশাকে কেউ দাঁড়িয়ে আছে ফিকে জ্যোৎস্নায়। গয়নার লোভ দেখিয়ে মানুষ টেনে আনা সেই বৌটির প্রেতাত্মা সালোয়ার কামিজ পরে দাঁড়িয়ে নেই তো?

পর মুহূর্তেই ভুল ভাঙল। যীশুর মত মুখশ্রীর সেই তরুণটি—চোস্ত আর চুড়িদার পরে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে যেতে একবার পিছন ফিরে তাকাল মাত্র। ওকে দেখে আমার ভয় হল না, দুঃখ হল।

পাতলা জ্যোৎস্না ছিল, তবু আলোটা সঙ্গে থাকলে ভাল হয় ভেবে আবার ঘরটাতে ঢুকলাম। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আবার বুকের মধ্যে বিষাদের ভারি পাথরটা চেপে বসতে থাকল। হ্যারিকেনটা নিয়ে আমি একরকম ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। আর বেরিয়ে আসার পর, আগের মতই, ঘর থেকে যতদূরে সরতে লাগলাম আমার ভেতরের বিষাদটাও তত পাতলা হতে থাকল।

সিঁড়ির মুখে হ্যারিকেনটা নিয়ে গিয়ে দেখলাম কেউ কোথাও নেই। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করবো! পরিত্যক্ত এই বাড়িটার মধ্যে অল্প সময়ের ফ্যারাকে আমি অচেনা যে দুজনেকে দেখলাম তাদের একজনও এই মুহূর্তে আমার সামনে নেই। কিন্তু ওদের এলাকায় আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি বলে ওরা কি আমায় শাস্তি দেবে? এক্ষুনি কিছু একটা কি ক্ষতি করবে আমার?

আমি আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলাম না। ছাদে উঠে যাওয়ার ওই সিঁড়িটা আমায় কেমন যেন টান ছিল, ভীষণ রকমের টানছিল। মনে হচ্ছিল তক্ষুণি ছুটে যাই ওই খোলা ছাদটাতে আর ওই উঁচু ওই ছাদটা থেকে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়ি নিচে। সত্যি সত্যিই কেউ যেন আমায় ভেতর থেকে ঠেলছিল। আমার ভেতরের সেই ঠেলা আর হালকা চাঁদের আলোয় সেই সিঁড়িটার ডবল টান কেমন এক চুম্বক শক্তির আকর্ষণের মত আমাকে খোলা ছাদের দিকে উঠিয়ে নিচ্ছেল।

ছাদের খোলা দরজা দিয়ে ছাদে চলে এলাম। চাঁদের আলোয় প্রকাণ্ড প্রাচীন ছাদটা যেন হাসছিল। আমি সেই ছাদ থেকে লাফ দিয়ে পড়ার জন্যে এগোতে গেলাম, সেই সঙ্গে আমার পেছন থেকে দু-তিনজন লোক আমায় চেপে ধরল। আর তখনই সেই রাতে প্রথমে জ্ঞান হারালাম আমি।

পরে জ্ঞান ফিরল যখন দেখলাম রামকান্ত এবং আরো চারজন আমায় ঘিরে বসে আছে। আমি চোখ মেলতে তারা আশ্বস্ত হ'ল।

রামকান্ত বলল, 'আপনি ওই ভেতরের বাড়ির ছাদে গিয়েছিলেন কেন? আপনাকে ভেতরে যাওয়ার দরজার তালা খুলে দিল কে? আপনি কেন ছাদের ওপর থেকে লাফ দিতে যাচ্ছিলেন?'

আমি রামকান্তের প্রশ্ন এড়িয়ে উল্টে তাকেই প্রশ্ন করলাম, 'তুমি ছিলে কোথায় রামকান্ত? আমি তোমাকে ডাকতেই তো দরজা খুলেছিলাম!'

'আমি তো পাশের ঘরেই শুয়েছিলুম। মাঝরাতে একবার উঠে আপনি কি করছেন দেখতে এসে আপনার দরজায় ঠেলা দিতেই ওটা খুলে গেল। অন্ধকার। ঘরে আপনি নেই। লণ্ঠনটাও নেই। কিন্তু ভেতরে যাওয়ার দরজায় তালা মারা। ভয় পেয়ে গেলুম। মুচি পাড়ায় গিয়ে এদের চারজনকে ডেকে আনলুম। লণ্ঠন আর লাঠি-

সোটা নিয়ে খ্ুঁজতে শ্ুর্ু করল্ুম। নিচের থেকে একটু আগে আমাদের একজন দেখেছে আপনি হ্যারিকেন নিয়ে ছাদের সিঁড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন। তাই তো সময় মত গিয়ে আপনাকে ধরতে পারল্ুম। নইলে কি সর্ব্বনাশটাই হতে যাচ্ছিল।'

আমি বললাম, 'শোনো, মেশোমশাইকে এসব কথা কিছ্ু বলো না। এই নাও, এই টাকাটা রাখো। তোমরা মিষ্টি খেয়ো সবাই।' বলে ওদের কিছ্ু টাকা দিয়েছিলাম। সকলেই খ্ুশি হয়েছিল। তারপর থেকে ভোর হওয়া পর্যন্ত ওরা আমার কাছেই থাকল। আমি কি দেখেছি না দেখেছি কিছ্ুই বলিনি ওদের। ওরাও কিছ্ু জিজ্ঞাসা করেনি। শ্ুধ্ু একজন কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে জানতে চাইল, বউটির গায়ে আন্দাজ কত ভরি গয়না ছিল?

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তোমাদের মধ্যে কেউ কি কখনো ওই বউটির আনাগোনা টের পেয়েছো? বউটি খ্ুন হয়েছিল কবে?'

রামকান্ত বলল, 'এ সব ডাক্তার সাহেবই জানেন। তার ম্ুখ থেকেই আর পাঁচজন এসব ঘটনা শ্ুনেছে।'

আমি আর কোনো কথা বললাম না। আমার রাতের সেই ব্ুক চাপা পাথর-ভারের মত বিষাদের অন্ুভবটার কথা মনে করে তখনো কেমন আচ্ছন্ন লাগছিল। পরবর্তী বহ্ুকাল পর্যন্ত ওই অস্ুভবের স্ম্ৃতিটা আমায় খ্ুব ভাবিয়েছে। বছর দ্ুয়েক পরে একবার তো আমি স্রেফ সেটা পরখ করতেই আবার গেছিলাম মেশোমশাইয়ের ওখানে। কিন্তু ততদিনে সে বাড়ি ভেঙে ওই জায়গায় মাল্টিস্টোরিড হাউস-কমপ্লেস তৈরী হয়ে গেছে।'

একটানা এতোটা বলার পর ডক্টর সান্ন্যাল এই প্রথম থামলেন। বাংলোর আর্দালিটা এই সময় আমাদের সকলের জন্যে কফি আর পাকোড়া নিয়ে হাজির হয়েছে।

শর্ত ছিল কোনো রকমের প্রশ্ন করা চলবে না, তাই আমরা কেউ কিছ্ু বলছিলাম না। কিন্তু অন্যদের মত তখন আমার ম্ুখেও প্রশ্ন এসে আটকে আছে। প্রথম প্রশ্ন গয়না পরা সেই বউটি ডক্টর সান্যালের গল্পে এক বারও আসেনি কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, দোতলার ওই ঘরের দ্ুঃখ-ছায়া। ব্যাপারটা কি?

কফির পেয়ালার চুম্ুক দিতে দিতে ডক্টর সান্ন্যাল মোমের আলোয় আমাদের তিন বন্ধ্ুর দিকে তাকিয়ে নিলেন একবার। তারপর বললেন, 'গল্পের শেষ অংশ কিন্তু এখনো বলিনি। শেষের দিকটাতে অন্য একটা চমক আছে—সেটা পরে বলবো। আগে ওই মন ভার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বলে নিই।

'প্যারানর্মাল সাবজেক্টটাকে নিয়ে তারপর তো কম পড়াশোনা করিনি। কিন্তু বহ্ু বছর ধরেই আমি ওই ব্যাপারটার কোনো রকমের নজির পাচ্ছিলাম না। তারপর হালে, কলিন্স উইলসনের মিস্টিরিস্ বইটিতে পেয়েছি 'থট্ প্রজেক্সন' কথাটা। অতৃপ্ত আত্মার দ্ুঃখ স্থানের সীমায় ঘন হ'য়ে সঞ্চিত থাকে। ওই এলাকায় ঢ্ুকে পড়লে সেই বিষাদ অন্য মান্ুষের মধ্যেও সংক্রামিত হবে। এবার গল্পের শেষটুকু বলি।

'যা বলছিলাম, পরদিন সকালে রামকান্তের ওখান থেকে মেশোমশাইয়ের কাছে এলাম যখন, সদ্য ঘুম থেকে ওঠা মেশোমশাই আমায় দেখে হেসে বললেন, 'কেমন হ'লো—তোমার ভৌতিক মালমশলা যোগাড় ?'

ছোট্ট করে জবাব দিয়েছিলাম, 'ভালোই।'

মেশোমশাই হেসে বলেছিলেন, 'ঝলমল করে মল বাজিয়েছে ? নাকি চাপা হাসির সঙ্গে চুড়ির শব্দ শোনা গেল ?'

'আপনার গল্পের সঙ্গে আমার দেখার কোনোরকমের মিলই নেই, আমি তো অন্যরকম দেখেছি।'

'অন্যরকম ! অন্যরকম কি ?' এবার মেশোমশাই সত্যি-সত্যিই চমকে উঠলেন। তার চোখ মুখের ভাব একেবারে পাল্টে গেল। আমি একেবারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আগের রাতের সব ঘটনা খুলে বললাম।

শোনার পর মেশোমশাই কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। তার মুখের রেখায় তখন রীতিমত আতঙ্ক জেগে গেছে। খানিকপরে বললেন, 'ঠিকই দেখেছ তুমি।' আমি বললাম, 'কিন্তু মেশোমশাই, এর আগে যারা দেখেছে তারা সবাই তো দেখেছে খুন হয়ে যাওয়া বউটিকে।'

'তারা কেউ বাড়িটার ভেতরে যায়নি। আসলে তারা কেউ সত্যিসত্যি কিছু দেখেনি। আমার গল্পটা তাদের কল্পনাকে উসকে দিয়েছে খানিকটা করে।'

'মানে ?' আমি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি।

'মানে, ওই বাড়িতে সোনার গয়নার লোভে কোনো বউ খুন হয়নি। ওটা আমার বানানো গল্প। এ তল্লাটে আমি ছাড়া আর পুরোনো লোকতো কেউ নেই। আমার গল্পটা চালাতে তাই অসুবিধে হয় নি। আজ আমি তোমাকে খুলেই বলি, ওই ভুতুড়ে গপ্পোটা ছেড়ে আমি বেশ কিছু লোককে বোকা বানিয়েছি। যারা ওই বাড়ি এবং জায়গা কিনতে এসেছে। তাদেরকে আমি ওই গপ্পটা বলে খানিকটা ভয় ধরিয়ে দিতে চেয়েছি। ওখানে গোটা জায়গাটা জুড়ে মাল্টিস্টোরিড্ বিল্ডিং উঠলে আমার বাড়িটার দশাটা কি হবে ভেবে দ্যাখো। দক্ষিণটা পুরো আটকে যাবে।'

'কিন্তু বাড়িটা পোড়ো বাড়ি হ'ল কি করে ?'

মেশোমশাই আমার প্রশ্ন শুনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন প্রথমে। তারপর ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'ওই বাড়িতে যারা ছিল তাদের মধ্যে এক বয়স্ক পাগল এক দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে মারা যায়। তার মুখটা বিশ্রী রকমের ঝলসে গেছিল। ওই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যে ওদের উনিশ বছরের সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেটি ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। তারপরই ওরা বাড়ি ফাঁকা করে, তালা বন্ধ করে বম্বে চলে যায়। রামকান্তের বাবাকে কেয়ার-টেকার করে যায়—পরে রামকান্ত সেই চাকরি করে যাচ্ছে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'বাড়ির খদ্দেরদের আপনি তো আসল এই ঘটনাটাই বলতে পারতেন। এর প্রতিক্রিয়া কি কম হ'তো?'
আবার খানিকটা সময় চুপ করে থাকলেন মেশোমশাই। তারপর নামানো গলায় বললেন, 'কোনদিন কাউকে বলিনি। আজ বিশ বছর পর তোমাকে বলছি। ছেলেটির সাধারণ অসুখ-বিসুখে আমিই ওষুধ দিতুম। একদিন কথায় কথায় ওকে বলেছিলুম বংশে পাগলের রোগ থাকলে, পাগল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় সে বংশের মানুষদের মধ্যে। আমার ওই অসতর্ক মন্তব্যটা যে সুস্থ ছেলেটাকে ওভাবে পাগল করে ছাড়বে ভাবতে পারিনি। ছেলেটির আত্মহত্যার পর থেকে একটা অপরাধ-বোধ কুরে কুরে খেয়েছে আমাকে।'
এই পর্যন্ত বলে ডক্টর সান্যাল আমাদের তিন বন্ধুর মুখের দিকে তাকালেন। বোধহয় দেখতে চাইলেন, তিনজন ভূত অবিশ্বাসী বন্ধুর ভাবনার মধ্যে কোথাও একটু চিড় ধরেছে কিনা।

———

শরৎ যখন

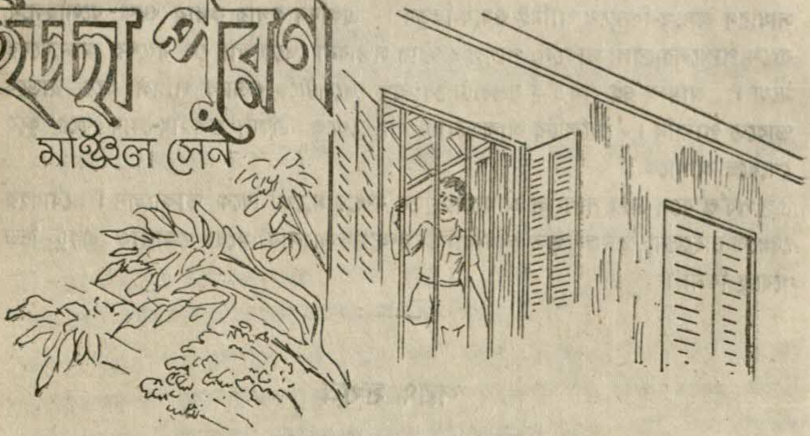
উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

আগের কালে শরৎ যখন
চুপিসাড়ে আসতো
আগমনী গানের সুরে
শিউলি সুবাস ভাসতো!
গাঁয়ের পথে সে গন্ধটা
হয়নি নিরুদ্দেশ
একটু খুঁজলে যায় যে পাওয়া
কদম ফুলের রেশ।
মাইক থেকে ভর দুপুরে
আগমনীর গান,
রাঙামাটির বাঁকা পথের
দেবে কি সন্ধান?
দুধ কুয়াশার চাদরখানা
মলিন এখন ধোঁয়ায়
মা দুর্গার অভয় হাসি
করুণ কিসের ছোঁয়ায়?

———

ইচ্ছা পূরণ

মঞ্জিল সেন



খোলা জানালা দিয়ে দূরে আকাশের দিকে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল সোনা। একটা কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঘাম ঝরানো বিচ্ছিরি একটা দিন, পাখার হাওয়া পর্যন্ত গরম হয়ে উঠেছে, ঘরের ভেতরটাও যেন তেতে উঠেছে। এই জ্যৈষ্ঠ মাসই হল ওর জন্মমাস, আগে কত ঘটা করে ওর জন্মদিন পালন করা হত, ভাবতেই কেমন যেন আনন্দ হল ওর, তারপরই বুক ঠেলে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস···

কালো মেঘটা খুব তাড়াতাড়ি অনেকটা জায়গা জুড়ে আকাশ ঢেকে ফেলল, একটা দমকা হাওয়া উঠল। দড়াম দড়াম করে দরজা জানালা আপনা থেকেই বন্ধ হবার শব্দ আসছে চারধার থেকে। এবার ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আঃ কি ঠাণ্ডা! সারাদিনের উত্তাপ কোথায় যে মুহূর্তে মিলিয়ে গেল, সমস্ত শরীরটা জুড়িয়ে গেল ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলকে। বাইরে ধুলো উড়ছে, একটু দূরে মস্ত নিমগাছটা ভীষণ দুলছে, এই বুঝি ভেঙ্গে পড়ে।

ঠিক তখুনি একছুটে ঘরে এসে জানালাগুলো বন্ধ করতে লাগলেন ওর মা। মাথার পাশের জানালাটা বন্ধ করতে যেতেই সোনা বলে উঠল, "ওটা বন্ধ কোর না মা, ঝড় দেখতে আমার খুব ভাল লাগছে।"

"কিন্তু ঘর যে ধুলোয় ভরে যাবে সোনা", মা বললেন।

"পরে ঝাঁট দিয়ে দিও", ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সোনা, "বন্ধ ঘরে আমার হাঁপ ধরে যায় মা; ওটা অন্তত খোলা থাকুক, আমি বাইরেটা দেখি।"

মার বুক ঠেলে একটা বড় নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল, গলা ঠেলে একটা কান্নাও বেরিয়ে আসতে চাইল।

"মুন্নার আসার সময় হয়েছে না?" সোনা আবার বলল, "বৃষ্টি হলে ও ভিজবে, অসুখ করবে।"

"হ্যাঁ, যাই দেখি", মা চলে গেলেন।

ঝড় কিন্তু মেঘটাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল, বৃষ্টি হল না। হয়তো অন্য কোথাও হচ্ছে, তবে ঝোড়ো হাওয়ায় গরম ভাবটা কেটে গেছে। একটা ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বইছে। সোনা আরামে দু'চোখ বুজল।

সোনা জানে ও কোনদিন ভাল হবে না। ও আর এখন ছেলেমানুষটি নেই, পনেরয় পড়েছে, সব বুঝতে পারে। এ বছরই আসল অসুখটা ধরা পড়েছে, তার আগেই রোগটা শরীরের মধ্যে ঢুকে গেছিল, সবাই তখন ভেবেছিল সাধারণ অসুখ-বিসুখ। এখন সবাই জেনে গেছে এ রোগের হাত থেকে মুক্তি নেই ওর, শরীরের রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে নষ্ট করে দিচ্ছে শ্বেত কণিকা—লিউকোমিয়া। দু'বার হাসপাতালে যেতে হয়েছিল সোনাকে, রক্ত দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন লাভ হয়নি, শ্বেত কণিকার আক্রমণ ঠেকান যায়নি। সোনাও আর হাসপাতালে থাকতে চায়নি, মিছিমিছি ওখানে থেকে লাভ কি! তাছাড়া ওর বাবার অনেক টাকা খরচ হয়েছে হাসপাতালের চিকিৎসায়, বাবার অসহায় দু'চোখের দিকে তাকালে ওর কেমন যেন কষ্ট হয়। ওর জন্যই তো বাবা হঠাৎ যেন বুড়িয়ে গেছেন, এমন রোগের চিকিৎসা কি সহজ কথা! তাও যদি ওর ভাল হবার আশা থাকত। ও জিদ করেই বাড়ি চলে এসেছে, অবিশ্যি হাসপাতালের ডাক্তারবাবুরাও যে ওকে রাখতে চেয়েছিলেন এমন নয়।

কি সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল ওর, কেমন শুকিয়ে গেল। লেখাপড়ায় ও ভাল ছিল, প্রথম পাঁচজনের মধ্যে ওর নাম থাকত··· । ডান চোখের কোল বেয়ে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। একটু লজ্জা হল সোনার, জলটা ও মুছে ফেলল। মা দেখতে পেলে বড় কষ্ট পাবে। ও বুঝতে পারে মায়ের কষ্ট, বুকে কত বড় ব্যথা মা চেপে রেখেছে তা মার মুখের দিকে তাকালেই ও বুঝতে পারে। ও যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তাই মার নিজের সঙ্গে এই যুদ্ধ। এটা না বোঝার মত ছোটটি আর ও নেই। তাছাড়া একটানা প্রায় এক বছর বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওর চিন্তা শক্তিও যেন বেড়ে গেছে, বড়দের মত অনেক কিছুই বুঝতে পারে আজকাল।

"দাদামণি।"

মুন্নার ডাকে ওর চমক ভাঙ্গল। ইস্কুল থেকে ও ফিরে এসেছে। দশ বছর বয়স, যেমন মিষ্টি দেখতে তেমন কথায় পাকা। বোনকে খুব ভালবাসে সোনা। ও হাতের ইশারায় বোনকে কাছে ডাকল। বিছানায় ওর পাশে বসে মুন্না বলল, "জান দাদা, আমাদের বাংলার দিদিমণি আজ আসেননি, বড় দিদিমণি আমাদের ক্লাশ নিলেন।

আজ গল্পের ক্লাশ হল। হ্যাঁ, আমাদের গল্প বলতে হল। তুমি সেই যে বরফের দেশে সাদা ভালুকের আর হারিয়ে যাওয়া দুই ভাই-বোনের গল্পটা বলেছিলে, আমি সেটা বললাম। বড় দিদিমণি বললেন আমার গল্পটা ভাল হয়েছে।"

মুন্নার মুখে এক ঝলক গর্বের হাসি। সেদিকে তাকিয়ে হাসল সোনা। মুন্নার কিন্তু কথার শেষ নেই, ফুলঝুরির মত কথা বেরুচ্ছে মুখ থেকে। সোনার ঘুম পাচ্ছে, একটা অবসাদ ওকে যেন ঘিরে ফেলেছে। হঠাৎ ওর মনে হল অনেক দূর থেকে যেন মুন্নার গলা ভেসে আসছে, "এই দ্যাখ, আমি বকে মরছি আর দাদাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।"

* * *

বাবা ওকে সুন্দর একটা ডাইরি এনে দিয়েছিলেন, আর একটা দামী ডট্ পেন। শুয়ে শুয়েই ও মনের কথা লিখত ডাইরির পাতায়, সেই সঙ্গে ছোট ছোট কবিতা। লেখার দিকে ছোটবেলা থেকেই ওর একটা ঝোঁক ছিল, অনেক ভাল ভাল বই পড়েছে। আশা ছিল বড় হয়ে ও একজন লেখক হবে, ছোটদের জন্য মজার মজার গল্প লিখবে, সুকুমার রায়ের মত। তিনিও তো বেশিদিন বাঁচেননি, মাত্র ছত্রিশ বছর, আর পনের বছরেই ওর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, জীবনের কোন সাধই ওর পূর্ণ হল না। সেদিন ও লিখল—

আশা ছিল অনেক কিছু
কে তুমি ডাকলে পিছু—
সময় হল এবার তবে যাই
রেখে গেলাম ইচ্ছেটাকে তাই।

সেদিন ডাক্তারবাবু ওকে ইঞ্জেকশন দিতে এলেন। দামী দামী সব ইঞ্জেকশন, বাবা এখনও আশা করে আছেন ও হয়ত ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুকে ও বলল, "একটা কথা জিগ্যেস করব ডাক্তারবাবু?"

"একটা কেন, যত খুশি তুমি জিগ্যেস কর না", ডাক্তারবাবু হেসে বললেন।

"আচ্ছা আমার চোখ দুটোও কি খারাপ হয়ে গেছে?" একটু ইতস্তত করে সোনা বলল।

"চোখ!" ডাক্তারবাবু যেন অবাক হলেন, "চোখ খারাপ হবে কেন? চোখ তো তোমার দিব্যি ভাল।"

"তবে মাঝে মাঝে ঝাপসা দেখি কেন?"

"সেটা হয়ত দুর্বলতার জন্য", ডাক্তারবাবু জবাব দিলেন, "তুমি দেয়ালে ওই ক্যালেন্ডারের লেখাগুলো পড়তে পার?"

সোনা ঘাড় কাৎ করে বলল, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, এটা কি লিখেছি বল তো?" ডাক্তারবাবু তাঁর প্যাডে কিছু লিখে

ওর থেকে এক কি দেড় হাত দূরে সেটা তুলে ধরলেন। সোনা পড়ল, "সোনা ইজ এ গুড্ বয়।"

"তবে?" ডাক্তারবাবু বললেন, "তোমার চোখে কোন দোষ নেই, অনেকদিন শুয়ে আছ তো, তাই মাঝে মাঝে অমন হয়। যখন ভাল হয়ে উঠবে, ওসব কিছু থাকবে না।"

"ভাল!" সোনা ম্লান হাসল, "আমি আর ভাল হব না, আমি জানি।"

ডাক্তারবাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি ইঞ্জেকশন দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "তুমি ওসব চিন্তা কোর না, মনে জোর না থাকলে অসুখ সারে না।"

সোনা আর কথা বাড়াল না। একটা অদ্ভুত ক্লান্তি ওকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আপনা থেকেই চোখ বুজে আসে।

পরদিন মুন্নাকে ও বলল, "আমাকে একটা খাম এনে দিবি? সাদা খাম হলেও হবে।"

মুন্না কোথা থেকে যেন একটা সাদা খাম এনে ওকে দিয়ে বলল, "কাকে চিঠি লিখবে দাদা?"

"ভগবানকে", সোনা হেসে বলল।

"ওমা, ভগবানকে কেউ আবার চিঠি লেখে নাকি!" মুন্না বড় বড় চোখ করে বলল, "ভগবানকে সবাই তো পুজো করে। তুমি যাতে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ তার জন্য মা কত পুজো করে। জান দাদামণি, মা ঠাকুরঘরে বসে কাঁদে, খুব কাঁদে, হ্যাঁ, আমি দেখেছি।"

"তুই মাকে কাঁদতে মানা করবি," সোনা ধরা গলায় বলল, "আমি যদি দূরে অনেক দূরে কোথাও চলে যাই, তুই মাকে বলবি দাদা বলেছে যেখানে যাচ্ছে সেখানে খুব ভাল থাকবে, সবাই ভালবাসবে, মা যেন দুঃখ না করে।"

"কোথায় যাবে তুমি? তোমার না অসুখ! ডাক্তারবাবু তোমাকে শুয়ে থাকতে বলেছেন না!" একটু শাসনের গলায় বলল মুন্না। সুযোগ পেলেই দাদার ওপর ও একটু শাসন ফলায়।

সোনা একটু হাসল, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। এতগুলো কথা বলে ও হাঁপিয়ে পড়েছে।

* * *

জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ় এল।

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল।

সোনা কাঁপা কাঁপা হাতে ডাইরিতে লিখল:

বরষা তুমি এলে
মেঘের ডানা মেলে।
আমি এবার যাই
ডাক এসেছে ভাই।

আর ও লিখতে পারে না, কলমটা আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, শরীরের সব শক্তি যেন ফুরিয়ে গেছে।

ওর শরীর আরও খারাপ হয়েছে, ডাক্তারবাবু সেদিন ইঞ্জেকশন দিতে এসে গম্ভীর মুখে চলে গেলেন। সোনা বুঝতে পারে ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। সেদিন মা যখন ওর পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন, ও বালিশের তলা থেকে সেই খামটা বার করে মার হাতে দিল। ওটুকু করতেই ও যেন ভীষণ ক্লান্ত, ঝিমুনি ভাবটা আবার এসে গেল।

ওর মা একটু অবাক হয়েই খামটা খুললেন। ভেতরে ডাইরির ছেঁড়া পাতায় লেখা ছোট্ট একটা চিঠি। তিনি পড়লেন ঃ

আমার প্রিয় মা, বাবা,

আমি জানি আমার চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে, তাই আমার শেষ ইচ্ছেটা তোমাদের জানিয়ে দিয়ে গেলাম। আমি দু'চোখ মেলে এই পৃথিবীকে আর দেখতে পাব না, কিন্তু আমার চোখ দিয়ে আরেকজন যদি দেখতে পায় তবে তার কত আনন্দ হবে বলতো। আমার বয়সী কোন দৃষ্টিহীন ছেলেকে আমি আমার চোখ দুটো দিয়ে যেতে চাই। তার মধ্যে আমার দৃষ্টি বেঁচে থাকুক, আমার চোখ দিয়ে সে এই পৃথিবীর গাছ-গাছালি, ফুল-পাখি, মানুষ সবকিছু দেখুক, এই আমার শেষ ইচ্ছে। ইতি—

তোমাদের আদরের সোনা।

মার ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল, দু'চোখের কোল বেয়ে নামল জলের ধারা। তিনি ওর শিওরে বসে পড়ে কপালে চুমু খেতে খেতে কান্নার ভেজা গলায় বললেন, "তাই হবে সোনা, তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হবে।"

ঘুমের মধ্যে বোধহয় একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখে সোনার দু' ঠোঁটের ফাঁকে ফুটে উঠল মিষ্টি এক টুকরো হাসি।

এক কুমারের কথা

রেবন্ত গোস্বামী

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়—নয় শুধু রূপকথা,
সত্যিকার এক কুমার ছিল—বলছি তাহার কথা।
এক হাতে তার থাকত ধরা আঁচন রঙের তুলি
অন্য হাতে খেয়ালখোলা ক্ষ্যাপার গানের ঝুলি।
সেই তুলিতে মন রাঙানো আকাশকুসুম ফোটে,
ঝাড়লে ঝুলি সুরের নেশার ঝরণাধারা ছোটে।
সেই কুমারের রাজ্য ছিল ছন্দকথায় ভরা,
বাদলা মেঘে বাঁধ-না-মানা নিত্য হাসির ঝরা।
সৈন্যরা তার নিয়মহারা সৃষ্টিছাড়া ভারি,
উলটো করে ধরত তারা ধনুক তরবারি।
গড়ল কুমার আজব জগৎ খেয়াল রঙে আঁকা,
ডিমগুলো সব লম্বা সেথায়, কুমড়োগুলো বাঁকা।
সেথায় লোকে চাঁদনী রাতের গানটি এনে কেড়ে
পাল্লা ধরে গায়ের জোরে গিটকিরি দেয় ঝেড়ে।
সর্দি হলে ডিগবাজি খায়, হাঁচতে টিকিট কাটে,
মাথায় মলম মাখতে শাকের ঘণ্ট শিলে বাটে।
ছুটতে কুমার লাগাম ছাড়া পক্ষিরাজে চড়ে—
রাম-খটাখট্ খুরের আওয়াজ মনের তেপান্তরে।
ঝাপসা রাতের মখমলটা ভিজত চাঁদিম হিমে,
বটের তলে জ্বলত জোনাক চকমকি টিমটিমে।
বিদ্‌ঘুটে সেই রাত্তিরে এক কালদানব এসে
আনন্দময় কুমারটিকে হঠাৎ ধরে ঠেসে।
রামধনুকের রাজ্যে তখন মেঘ হল যে জমা—
কোথায় গেল মুশকিল আসান ব্যাঙ্গমী ব্যাঙ্গমা?
হয়ত তখন তপস্যাতে সে এক ব্রহ্মচারী
যাচ্ছে পেতে ঐ দানবের মারণ-তরবারি!
কিন্তু যে হায় তার আগেতেই সবার চোখের জলে
আলোয় ঢাকা অন্ধকারে কুমার গেল চলে।
ফুরিয়ে গেল রূপকথাটি। মুড়িয়ে গেল নটে।
তার রাঙানো আকাশকুসুম আজও তেমন ফোটে।
ঘুমায় কুমার গানের পালা সাঙ্গ সেদিন করে,
সেই সুরেতে ছোট্ট বড়র মন আজো রয় ভরে।
বাজবে সে সুর ভাসিয়ে সুদূরে—বাজবে চিরদিনই,
সেই কুমারের নাম সুকুমার—সবাই তাকে চিনি।

যদুর কীর্তি

শৈবাল চক্রবর্তী



মামা যেমন ডাকাবুকো ভাগ্নে তেমনি ভীতুর ডিম। যদুর এই ভয়ে জড়সড় ভাব নিয়ে বংশী মামা কম বকাবকি করেন না তবু ছেলের স্বভাব শোধরায় না। সন্ধ্যাবেলা হয়ত কোথাও শেয়াল ডাকল, ব্যাস অমনি যদুর মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। আর বংশীমামা এই সেদিনও শেষ রাতে রণ-পা ধরে এ গাঁ ও গাঁ ঘুরে বেড়াতেন। তখন ডাক বিলি হত এই ভাব। এখন মামা ডাকঘরের বড়বাবু। এখন তাই আর ঘোরা-ঘুরির কাজ নেই তবু মামা হাসতে হাসতে সকালবেলা দৌড়ে আসে পাক্কা পাঁচ মাইল। মুগুর ভাঁজে দুবেলা নিয়ম করে। তাই এই পঞ্চান্ন বছর বয়সেও শরীর যেন কামানের গোলা। খাড়া লম্বা নাক, হাঁটা চলা, ইয়া বুকের ছাতি। একটা হাঁক দিলে তিনটে গাঁয়ের লোক শুনতে পায়। বঁড়শে, বালটিকুরি আর বাতাইতলার সব লোক যে বংশীবদন বাঁড়ুজ্জেকে চেনে তার সাহসের জন্যে তার ভাগ্নে কিনা আরশোলা দেখলে লেপের তলায় গিয়ে ঢোকে কেউ বিশ্বাস করতে না চাইলেও এ সত্যি।

চেহারাতেও যদু রোগাপটকা। কে বলবে তার বয়স তেরো। দেখে মনে হয় যেন দশ পেরোয় নি। বছরে একবার নিয়ম করে ম্যালেরিয়ায় ভোগে আর সর্দিজ্বর তো লেগেই আছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন মনটা ভয়ে এত কাবু থাকে বলেই এত ঘন ঘন অসুখ হয়। সন্ধের নিস্তারিনী সংঘের বিখ্যাত তাসের আড্ডা ছেড়ে মামাকে ঘরে বসে থাকতে হয় যদুর জন্যে। বাড়িতে একা থাকতে নারাজ সে একেবারে। অন্ধকারে উঠোনে কোন ছায়া নড়লে যদু ভাবে ওটা গোভূত বা তার সাঙ্গোপাঙ্গো কেউ। চোর ডাকাত কি ভুঁড়ো শেয়ালের ভয় তো আছেই সবচেয়ে যাতে যদু কাবু তা হল ভূত। তাই যেই অন্ধকার হয় অমনি সে আর ঘর ছেড়ে বের হয় না। তাই মামা সারা সন্ধে ঘরে বসে মেঘনাদবধ কাব্য পড়ে আর যদু স্কুলের পড়া তৈরি করে। লেখাপড়ায় ভাগ্নে মামার নাম রাখবে। প্রতি বছর ক্লাসে ওঠে প্রথম হয়ে। তবু বংশী মামার ভাবনা পদে পদে যার এত ভয়, সত্যিকারের কোন বিপদে পড়লে সে কি করবে!

হঠাৎ এ পাড়াতেই কিনা চোরের উপদ্রব দেখা দেয়। রাতবিরেতে খুটখাট শব্দ, তারপরই দেখা যায় এটা নেই, সেটা নেই। একরাতে যদুদের বাড়িতেও চোর আসে। খুটুর খুটুর শব্দ শুনেই যদু মামাকে জড়িয়ে ধরে। বংশীমামা শুয়ে শুয়েই হাঁক দেয়, 'কে র‍্যা ?'
বাস অমনি চুপচাপ। মামা একহাতে লাঠি আর একহাতে লণ্ঠন নিয়ে চারপাশ ঘুরে দেখে এসে বলে, পালিয়েছে। খুব বাড় বেড়েছে বেটাদের। ধরে দিতে হবে একদিন দু চার ঘা।
কিন্তু তার দুদিন পরে ফের চোর আসে। মামা-ভাগ্নে দুজনে অঘোরে ঘুমিয়ে তখন। কেউ কিছু টের পায় নি। চোর জানলার শিক ভেঙে ঢুকে মামার হাতবাক্স হাতিয়ে পালিয়েছে। অত জিনিসের মধ্যে হতচ্ছাড়াব বাক্সটার ওপর নজর পড়েছে ঠিক। ওতে সংসার খরচের টাকা ছিল। মামার দুঃখ সে বিশ পঞ্চাশের জন্যে নয়। বাক্সর তলায় পুরনো চিঠিপত্রের তাড়ার নিচে ছিল মামার আংটি, যদুর দিদিমা যা বারো বছরের বংশীবদনকে দিয়েছিলেন তার পৈতের সময়। মামার দুঃখ সে আংটি চুরি গেল বলে! মায়ের চিহ্নটুকু এমন বেঘোরে খোয়া গেল বলে মামার সে কী আপশোষ। যত রাগ যদুর ওপর। আমি না হয় ঘুমোচ্ছিলুম তা তুই একটু যদি ডেকে দিতিস আমায়। যদু মুখ গোঁজ করে বসে থাকে। ঘরে কেউ ঢুকেছে সে টের পেয়েছিল ঠিকই। তার ঘুম মামার মত গাঢ় নয়। কিন্তু মুখ খুলতে পারে নি ভয়ের চোটে। মামা আংটিটার জন্যে হাহুতাশ করে। সকালে সেই দুঃখে মুগুর ভাঁজা বাদ দেয়। আংটিটা যদুরও খুব ভাল লাগত। কী সুন্দর মিনে করা। মাঝখানে লেখা 'আশীর্বাদ'। চোরটার ওপর ভারী রাগ ধরে তার।
এবার বোশেখ মাস পড়তেই গরম পড়ে যায় খুব। কালবোশেখীর দেখা নেই, এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে নি কোথাও। মামা একতলায় গরমে হাঁসফাঁস করে। বাইরে তবু কিছুটা হাওয়া আছে। যদুকে বলে, 'চ যদু, ছাতে শুই গিয়ে।' কথাটা যদুর খুব মনে ধরে না। গরমে কুলকুল ঝরে ঘামতে তার আপত্তি নেই কিন্তু খোলা ছাতে তো ভূতের উৎপাত। আবার নিচে একা থাকলে চোরে ধরবে। ওপরে ভূত, নিচে চোর, মাঝখানে মামা। যদু যায় কোথায় ? মামা বিছানা বালিশের পাহাড় এক হাতে তুলে ছাতে নিচে ঠকার করে ফেলে। মোটা একটা লাঠি মেজের ওপর ঠুকে যদুকে ভরসা দিয়ে বলে, 'ডরো মৎ।' সে লাঠিতে চোর তো ছেলেমানুষ ডাকাতও কাত হবে। আংটি চুরির পর বেজায় ক্ষেপে গেছে মামা। বলে, 'এসপার কি ওসপার। তাই লাঠির ব্যবস্থা।
'প্রথম রাতে তুই জাগবি, ছাতের বিছানার ওপর সমান করে চাদর পেতে দিতে মামা বলে, 'আর শেষ রাতে আমি।' এই বলে পাশ ফিরে পাশবালিশ জড়িয়ে মামা নাক ডাকাতে শুরু করে, যদু নেহাৎ জানে মামার অভ্যেসের কথা। সে আওয়াজ অন্য কেউ শুনলে ভাবত কাছে পিঠে কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছে বা

মামা চোরের জন্যে লাঠির ব্যবস্থা করেছে ভূতের কথা ভাবে নি। মামা ঘুমিয়ে পড়ে অমনি রাজ্যের ভয় গ্রাস করে যদুকে। যদুর মনে হয় ওই ব্রহ্মদৈত্য নামছে, ওই শাঁকচুন্নী তেড়ে আসছে তাকে। আসলে নারকেল গাছের পাতা কাঁপছে চিলেকোঠার দেয়ালে, কি খাল পার থেকে প্যাঁচা ডাকছে। বাগানের গাছপালার ভেতর দিয়ে ঝোড়ো বাতাস বয় আর যদু ভয়ে কাঁপে। তার মনে হয় ওই একটা, দুটো, তিনটে পাল্লা দিয়ে ছুটে আসছে তাকে ধরবে বলে। উসখুস করতে করতে যদু উঠে পড়ে। সে জানে মামা জানতে পারলে বকুনি দেবে তবু, এই নিশুতি রাতে একা এতগুলো ভূতের মুখোমুখী হওয়ার মত সাহস তার কই। যদু পেছোয় আর পেছোয়। 'মামা গো' বলে ডুকরে উঠবে ডাক ছেড়ে তাও গলায় আওয়াজ ফোটে না।

পেছোতে পেছোতে যদুর খেয়ালই নেই সে ন্যাড়া ছাতের সীমানায় চলে এসেছে। এরপর প্যাঁচার ডাক জোরালো হয়ে বাজতে গাছের ছায়াটা দমকা হাওয়ায় হঠাৎ দুলে ওঠে যদু তখন মামার নাম ভুলে 'মা গো' বলে একটা ডাক দিয়ে আলসে টপকে পড়ে নিচে। নেহাৎ বরাত জোর, নইলে হাত পা তার ভাঙত নিশ্চয়। ভূতের ভয়ে 'পপাত ধরনী তলে' হয়ে সে বিছানা নিয়েছে জেনে মামাও তাকে দিত ঘা কতক। কিন্তু একতলায় তখন আংটি চোর দেয়ালে সবে সিঁধকাঠি লাগিয়ে ফুটো করছে। পড়বি তো পড় তার পিঠের ওপর। যদু চেঁচায়, মামু—গো, মামা। চোর চেঁচিয়ে ওঠে 'বাপরে বাপ।' চীৎকার চেঁচামেচিতে মামার ঘুম গেছে ভেঙ্গে। আর যায় কোথা। মামা লাঠি নিয়ে চড়াও চোরের ওপর। চোখ পাকিয়ে বলে, 'বার কর আংটি।'

সে কী ধমক! চোরের নাম বিপিন। রোগা ফিনফিনে চেহারা। সে কান মলবে না নাক মলবে ভেবে পায় না। আসলে হাতচাকু হাতড়ে আংটি পেয়েছিল বলেই লোভে বেড়ে গিয়েছিল তার। এবার এসেছিল মোটা দাঁওয়ের লোভে। লোভে পাপ, পাপে পিঠব্যথা।

সেদিন থেকে যদুর কী খাতির। সবাই জানল যে ছাত থেকে লাফ মেরে সে-ই ধরেছে চোর। খবর পেয়ে যে দারোগাবাবু এলেন সেই রণদুর্মদ বড়ুয়াও এক হাতে গোঁফে তা দিতে দিতে আর এক হাত বাড়িয়ে দিয়ে যদুর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, 'বাঃ ভারী সাহসী ছেলে তো! তোমার নাম কি খোকা।'

সেই যে যদুর নাম হয়ে গেল সেই থেকে ভয়ও উধাও হল তার মন থেকে। চোর বা ভূত কাউকে সে পরোয়া করে না এখন আর। সন্ধেবেলা মামা তাসের আড্ডায় গেলে সে বাড়িতে একা দুলে দুলে ভূগোল পড়ে কি অংক কষে। হাতের লেখা লিখতে মাঝে হাতটা চোখের কাছে নিয়ে দেখে যদু। তার আঙুলে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে মামার সেই কিনে করা আংটি যার মাঝখানে লেখা 'আশীর্বাদ।' বংশী মামা ওটা যদুকে দিয়ে বলেছে 'ওটা তুই-ই রাখ বাপু। 'আংটিটা যে যদুর অনামিকায় ঠিকঠাক বসে গেছে বলে যদু খুশি শুধু তাই নয়, মামা বলেছে, 'এটা তোর বাহাদুরীর পুরস্কার।'

আর সেই জন্যেই যদুর আনন্দের সীমা নেই। এক জিনিসটার বাহার তার ওপর মামার উপহার। আর কে পাবে তাকে?



॥ দুর্ভাগ্য ॥

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

গরীবের ছেলে বাবলা।

বাবা নেই। মা পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে। হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে একটি নোংরা বস্তীর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভাঙা বাড়িতে বাস করে ওরা। পাঁচ ইঞ্চির দেওয়াল। মাথায় টিনের চাল। কোন শিলিং পর্যন্ত নেই। গ্রীষ্মে প্রচন্ড তাপ। বর্ষায় ছ্যাঁদা টিনের ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়ে বৃষ্টির ফোঁটা। এই নিয়েই ছেঁড়া কাঁথায় গরীবের দিন যাপন। তবুও বাবলা বস্তীর অন্যান্য ছেলেদের মতো নয়। লেখাপড়ায় দারুণ আগ্রহ ওর।

বয়স আর কত? বছর পনেরো হবে। দশম শ্রেণীতে পড়ে। প্রতি বছর স্কুলে ফার্স্ট হওয়ার জন্য স্কলারশিপও পায়। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। গায়ের রঙ ফর্সা। মাথায় ঘন কালো চুল। চোখ দুটো ভাসা ভাসা। এই চোখ দুটোই ওর শরীরের প্রধান সম্পদ। এমন চোখ সচরাচর দেখা যায় না। কেমন যেন স্বপ্নালু, কবি-কবি চোখ। মায়া মমতায় ভরা। কাজল কালো দীঘির মতো।

যাই হোক। স্কুলের প্রায় সকলেরই প্রিয় এই সহজ সরল ছেলেটিকে ঘিরে সবাই অনেক স্বপ্ন দেখেন। শিক্ষকেরাও প্রত্যেকেই ভালবাসেন বাবলাকে। সকলেরই আশা একদিন এই ছেলেটিই হয়তো বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবে।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা এগিয়ে আসছে। তাই গভীর মনোযোগে পরীক্ষার পড়া করে চলেছে বাবলা। যদিও সবই ওর মুখস্ত। সবই ওর জানা। তবুও কথায় আছে না, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ। তা সেই অধ্যয়নের তপস্যাই করে চলেছে সে।

বাবলা পড়ছে বটে কিন্তু মনে তার সুখ নেই। কেননা পরীক্ষার ফি জমা দেবার শেষ দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। শিক্ষক মহাশয়রা চাঁদা তুলে কিছু টাকা অবশ্য দিয়েছিলেন কিন্তু অভাবের সংসারে সে টাকাও খরচা হয়ে গেছে এখন কি করে যে যোগাড় হবে টাকাগুলো সেই চিন্তাতেই অস্থির হয়ে উঠেছে ও। মা আপ্রাণ চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

বাবলার মা বাবলাকে নিয়ে সাহায্য চাইতে মনিবের বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু গিন্নীমার সে কি মুখ। বিদ্রূপ করে বলেছিল—এঃ। গরীবের ঘরে ঘোড়া বাই। পেটে নেই ভাত ছেলেকে লেখাপড়া শেখাবে।

আর এক বাড়িতে বলেছিল—আবদার মন্দ নয় তো! এই তো সেদিন কাজে লাগলে মাসে তিরিশ টাকা মাইনে, তাতেও পেট ভরে না? আবার ছেলের লেখা পড়ার অজুহাত দেখিয়ে টাকা চাইতে এসেছ? ঝিয়ের ছেলে লেখাপড়া কত করে তা আমাদের জানা আছে। সিনেমা দেখার পয়সার টান ধরেছে, তাই ঐসব বলছ। না বাপু সাহায্য টাহায্য হবে না। তাতে পোষায় কাজ কর না পোষায় চলে যাও।

এরপরে আর কথা চলে না। বাবলাকে নিয়ে ফিরে এলো বাবলার মা। ওরা গরীব। তাই বলে ওদেরও যে সমাজের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে, ওরাও যে লেখাপড়া শিখে বড় হবার স্বপ্ন দেখে এ কথাটা কেউ বুঝল না।

অবশেষে বাবলা ঠিক করল যেমন করেই হোক টাকা সে যোগার করবেই। তবে চুরি করে নয়, ভিক্ষে চেয়েও নয়। সৎ উপায়ে রোজগার করে। কিন্তু কি করে কি করবে সে? একদিন বিকেল বেলা এই সব চিন্তা করতে করতে হাওড়া ব্রীজের ওপর এসে দাঁড়াল বাবলা। গঙ্গার শীতল হাওয়ায় মন প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল তার। কি চমৎকার। কত জাহাজ, কত স্টিমার, কত নৌকা! কত বাস, কত ট্রাম, কত মানুষ। সবের মূলে তো টাকা। টাকা না থাকলে এসব কিছুই থাকত না। অচল অনড় হয়ে পড়ে থাকত সব। এই যে এত মানুষ। মানুষের মিছিল, সবই তো টাকার জন্যে। টাকার লালসায় সবাই ছুটছে। টাকার জন্যেই চাকরি। টাকার জন্যেই পরিবহণ। টাকার জন্যেই সব কিছু। টাকা শুধু নেই বাবলাদের। সামান্য কিছু টাকা হলে ওর পরীক্ষার ফি-টা জমা দেওয়া হয়। কিন্তু তাও ওদের নেই। কেন নেই? এক এক সময় মনে হয় ওর, এমন একটা দিন কি কখনো আসবে না, যেদিন কোন ছাত্রই বই কিনতে পয়সা লাগবে না, পরীক্ষার ফি জমা দিতে লাগবে না, স্কুল কলেজে মাইনে দিতে হবে না। সমস্ত খরচই বহন করবেন দেশের সরকার।

বাবলু অন্যমনস্ক ভাবে হাওড়া ব্রিজের রেলিং ধরে নিচের দিকে তাকিয়ে এইসব দেখছিল আর ভাবছিল। এমন সময় কে যেন ডাকল পিছন দিক থেকে—এই যে খোকা, শুনছো?

বাবলা একটু এগিয়ে গেল লোকটির দিকে—বলুন।

—আমার একটা কাজ করে দেবে ভাই?

—কি কাজ?

—আমার ট্যাক্সিটা জ্যামে আটকেছে। ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার সঙ্গে অনেক মাল রয়েছে। একটু হাত লাগাবে?

বাবলা বলল—বেশ তো, এ আর এমন কি? কই দিন। বলে ট্যাক্সির কাছে এগিয়ে গেল।

ভদ্রলোক একটি হোল্ডল ও একটি স্যুটকেশ বাবলার ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেও বেশ কিছু নিলেন। অনেক দূর থেকে আসছেন ভদ্রলোক। সেই গড়িয়া থেকে। সারা রাস্তায় জ্যাম জট। কিন্তু এখানে এসে গাড়ি আর চলে না। হাতে সময় দশ মিনিট। মাদ্রাজ মেল হয়তো ধরা যাবে না। তবুও একবার শেষ চেষ্টা।

মাল বইতে তো অভ্যস্ত নয় বাবলা। তাই পদে পদে হোঁচট খেতে লাগল। তবুও ঘর্মাক্ত কলেবরে যখন তারা স্টেশানের প্লাটফরমে এলো তখন মাদ্রাজ মেল স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ভদ্রলোক কোন রকমে ছুটে উঠে পড়লেন একটি সাধারণ বগীতে। তারপর ভদ্রতা করে একটা টাকা ছুঁড়ে দিলেন প্লাটফরমের ওপর। দুর্ভাগ্য এই, সেটাও একটি ভিখিরির ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে।

বিরস বদনে ফিরে আসছে বাবলা। এমন সময় গেট পার হাত গিয়েই বাধা পেল সে।

—টিকিট ?

বাবলা অবাক হয়ে বলল—আমি তো ট্রেনে চাপিনি।

—নাই বা চাপলে ? প্লাটফরমের ভেতরে ঢুকলে টিকিট কেটে ঢুকতে হয় তা জানো না ?

বাবলা কুণ্ঠিত হয়ে বল—সত্যি, খুব ভুল হয়ে গেছে। আসলে এক ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়েছিলেন। তাই তাঁর মালগুলো একটু বয়ে দিচ্ছিলাম।

—হুঁ। একটু আগে দেখছিলুম বটে কার কি যেন বইছ। তা আজকের মতো ছেড়ে দিলুম। আর কখনো টিকিট না কেটে এর ভেতরে ঢুকবে না বুঝেছো ?

বাবলা ঘাড় নেড়ে চলে এলো।

এই হল সুরু। এরপর থেকে প্রতিদিনই বাবলা ঐ কাজ সরু করল। লোকজন কেউ বাস অথবা ট্যাক্সি থেকে নামলেই ছুটে গিয়ে তাদের হাত থেকে মাল পত্তর চেয়ে নিয়ে বইতে সুরু করল। প্লাটফরমের গেটেও ওকে আর বাধা দিত না কেউ। সবাই বুঝে গিয়েছিল গরীবের ছেলে পেটের জ্বালায় এই সব করছে।

এইভাবে বাবলা ওর পরীক্ষার ফি যখন যোগাড় করল তখন ওর শরীর খুব ভেঙে পড়েছে। প্রবল জ্বরে ছটফট করল কদিন। তারপর আবার সুস্থ হল।

পরীক্ষার টাকা জমা দেওয়া হল।

পরীক্ষার দিনও এগিয়ে এলো একসময়।

শিক্ষক মহাশয়রা বললেন—ভালো করে পরীক্ষা দাও বাবলা, পাস করলে আমাদের সবারই মুখ উজ্জ্বল হবে। চাকরি হয়তো পাবে না। দুটো টিউশনিও তো করতে পারবে। তাছাড়া মুর্খ নাম ঘুচবে। বস্তীর ছেলে বলে কেউ আর অবহেলা করবে না তোমাকে।

বাবলা পরীক্ষার দিন মাকে প্রণাম করে পরীক্ষা দিতে গেল।

জীবনের এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। নতুন জায়গা, অচেনা গার্ড। রঙিন কাগজের প্রশ্নপত্র। বাবলা মন দিয়ে লিখে যেতে লাগল। ইংরাজি অঙ্ক বাংলা সংস্কৃত সব হয়ে গেল ভালো ভাবে। গোলমাল বাধল ইতিহাস পরীক্ষার দিন। প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে এক মনে লিখে চলেছে বাবলা। এমন সময় গোলমাল। চারিদিকে হৈ হট্টগোল। কি হ'ল? কি ব্যাপার! না, প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে।

হঠাৎ হৈ হৈ করে ওদের ঘরে ঢুকে পড়ল একদল ছেলে। তারপর উত্তর লেখা খাতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দুমড়ে মুচড়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে লাগল সব। বাবলার শক্তি নেই বাধা দেবার। ওরা আলো পাখা ভেঙে চুরে, জানালার কাচ ভেঙে, টেবিল ঠুকে এমন কান্ড করল যে তা বলবার নয়। ওদের সঙ্গে বাবলাদের ঘরের কিছু ছেলেও যোগ দিল।

সবাই চেঁচাতে লাগল—প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছে। এই পরীক্ষা বাতিল করো। এমন প্রশ্ন করল কে? কর্তৃপক্ষ জবাব দাও।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল বাবলা। যাঃ কি সর্বনাশ হয়ে গেল। এত দিনের এত চেষ্টা সব ব্যর্থ হয়ে গেল। এক নিমেষে একটা দমকা হাওয়ায় সমস্ত স্বপ্নের জাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল যেন। একটা বোবা কান্না জমাট বেঁধে উঠল ওর বুকে। স্কুল থেকে এসে ঝোড়ো কাকের মতো ডালমিয়া পার্কের নরম কচি ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর ভেঙে পড়ল আকুল কান্নায়। কান্নার আবেগে জোয়ারের গঙ্গার মতো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল সে। কিন্তু ওর এই নীরব কান্নার সাক্ষী তো কেউ রইল না। অবশ্য সাক্ষী থেকেই বা লাভ কি? যা ঘটে গেছে তা তো আর মোছা যাবে না।

অনেক পরে নিজের মনের সঙ্গে বোঝা পড়া করে ঘরে ফিরল বাবলা। পড়ায় আর মন বসল না। তবুও কালকের পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে হবে।

পরদিন আবার পরীক্ষা দিতে গেল বাবলা। সবাই বলল, এত ভেঙে পড়বার কি আছে? এ রকম প্রায়ই হয়। ভণ্ডুল পরীক্ষা আবার হবে। বাবলার অন্ধকার মনে আশার আলো জাগল একটু। তাই যেন হয়। শুধু একবার কেন বার বার পরীক্ষা দিতে রাজি আছে বাবলা।

যাই হোক। পরীক্ষা শেষ হ'ল। শুরু হ'ল প্রতীক্ষার পালা। তবে আবার নতুন করে পরীক্ষা নেওয়া হল না। নির্দিষ্ট সময়েরও দু মাস পরে ইনকমপ্লিট গেজেট বেরলো। আর তাতেই জানা গেল ঐ উপদ্রুত কেন্দ্রের সমস্ত ছাত্রকে কর্তৃপক্ষ R. A. করেছেন। কেন্দ্রের কোন ছাত্র আগামী তিন বছর বোর্ডের কোন পরীক্ষাই দিতে পারবে না।

———



অন্য যুদ্ধ

দিলীপকুমার বন্দোপাধ্যায়

পাশাপাশি দুই দেশ। পূর্বদেশ আর পশ্চিমদেশ। দু' দেশের রাজায় রাজায়, মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে খুব বন্ধুত্ব। তাই দুই দেশের প্রজাদের আনন্দের সীমা নেই। এক রাজার প্রজারা অন্য রাজার রাজ্যে নিশ্চিন্তে যখন তখন ঢুকে পড়ে। কোন দেশের সৈন্যরাই কোন আপত্তি করে না। করার প্রশ্নই ওঠে না। এক সপ্তাহ দু' সপ্তাহ আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে ছুটিছাটা কাটিয়ে আবার ফিরে আসে নিজের রাজ্যে। এভাবেই দু'দেশের প্রজাদের দিন কাটছিল নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়।

কিন্তু চিরদিন এমন চললো না। একদিন পূর্বদেশের প্রজারা পাশের রাজ্যে ঢুকতে গিয়ে দেখল, সামনেই তরোয়াল উঁচিয়ে সৈনিক। তরোয়ালের সামনে দাঁড়িয়েই পূর্ব-দেশের এক নির্ভীক প্রজা জিজ্ঞেস করল, 'সেকি! পশ্চিম দেশে আমার দাদা-বৌদি থাকে। দেখা করতে পারব না? এ রকম হুকুম দিল কে?'

পশ্চিমদেশের রক্ষী মেজাজ চড়িয়ে জবাব দিল, 'হুকুম দেবার অধিকার যার আছে, তিনিই দিয়েছেন।'

'হেঁয়ালি ছেড়ে একটু সোজা ভাষায় বলো না রক্ষীভায়া—'

ভায়া সম্বোধনে বোধহয় রক্ষীর মেজাজ একটু নরম হলো, 'হুকুম দিয়েছেন আমাদের রাজামশাই। বুঝেছ—'

রক্ষীর জবাব শুনে অবাক হয়ে প্রজারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'তবে যে শুনি, দুই রাজায় নাকি হরিহর আত্মা!'

সেকথা শুনে এক বর্ষীয়ান প্রজা বলে ওঠেন, 'ভুলে যাও, ভুলে যাও। ওসব এখন পুরনো দিনের বাসি গল্প।'

'তা বটে, তা' বটে—' বলতে বলতে প্রজার দল আবার নিজেদের ঘরে ফিরে আসে।
পশ্চিমদেশের রাজার এহেন হুকুম শুনে পূর্বদেশের রাজা পরমজিৎ নিজের মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'একি ব্যাপার বলো তো। পশ্চিমদেশের রাজা হঠাৎ এমন একটা হুকুম জারি করলেন কেন? গত রোববারের ভোজসভায়ও তো রাজা বিক্রমজিৎ এ বিষয়ে কিছুই জানাননি আমাকে। অথচ—'
'অথচ তার পরের দিনই এমন একটা আদেশ দিলেন, যাতে পূর্বদেশের কেউ ওদেশে পা রাখতে না পারে। এরই নাম কূটনীতি, যাকে আমরা সবাই বলি রাজনীতি—'
'খোঁজ নিয়ে দেখো তো মন্ত্রী, ভেতরের রহস্যটা কী। আর হ্যাঁ, আজই ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দাও, এখন থেকে পশ্চিমদেশ থেকে পূর্বদেশে আসাও নিষিদ্ধ।'
পূর্বদেশের মন্ত্রী গোপনে গুপ্তচর লাগাল, পশ্চিমদেশের ভেতরের খবর জানতে। এক সপ্তাহ পরে গুপ্তচর এসে খবর দেয়, 'মন্ত্রীমশাই, ব্যাপার গুরুতর। যে অন্নপূর্ণা নদী পশ্চিমদেশ থেকে পূর্বদেশে এসে ঢুকেছে, তারই ওপর একটা বাঁধ তৈরি করছে ওদেশের প্রযুক্তিবিদরা। কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে।'
মন্ত্রীমশাই তাড়াতাড়ি এ খবর দেন রাজা পরমজিৎকে। রাজামশাইও তড়িঘড়ি তলব পাঠান দেশের প্রধান বিজ্ঞানীকে।
সব শুনে পক্বকেশ বিজ্ঞানী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়েন, 'ব্যাপার খুবই গুরুতর। অন্নপূর্ণা নদীর পশ্চিম অংশে বাঁধ তৈরি হলে নদীতে জল খুবই কমে যাবে। জলের অভাবে আমাদের চাষবাস মার খাবে, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে পূর্বদেশে। দলে দলে লোক মরবে। মহারাজ, শিগগির এর একটা বিহিত করুন, না হলে আমাদের এই সোনার দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে—'
রাজা পরমজিৎ, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান বিজ্ঞানী মিলে এক গোপন বৈঠক বসে। সেখানেই ঠিক হয়, আগামীকালই একজন দূত পাঠানো হবে পশ্চিমদেশে, যাতে অন্নপূর্ণা নদীর ওপর বাঁধ বানানোর কাজ বন্ধ করেন রাজা বিক্রমজিৎ।
কিন্তু বিষণ্ণ মুখে ফিরে আসে পূর্বদেশের দূত। রাজা বিক্রমজিৎ বলে পাঠিয়েছেন, অন্নপূর্ণা নদীর ওপর বাঁধ তৈরি বন্ধ করা সম্ভব নয় কোনো অবস্থাতেই। এমন কি এজন্য যুদ্ধে নামতেও তিনি প্রস্তুত।
রাজা পরমজিৎ মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাজ্যের কোষাগারের অবস্থা তেমন ভালো নয়। তাছাড়া আমি বিশ্বাস করি, যুদ্ধ করে কোন সমস্যার সমাধান হয় না। আপনি কী বলেন?'
নিচু স্বরে মন্ত্রী উত্তর দেন, 'ঠিক আছে মহারাজ, আমাকে একটু ভাবতে দিন। দেখি, অন্য কী উপায় আছে?'
সপ্তাহখানেক পরে মন্ত্রীর পরামর্শে দেশের কয়েকজন বাছা বাছা সাহসী যুবককে

পশ্চিমদেশে পাঠানো হলো। এদের ওপর দায়িত্ব ছিল, রাতের অন্ধকারে গোপনে অন্নপূর্ণা নদীর বুকে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নির্মীয়মান বাঁধ তৈরির কাজটা পুরোপুরি ভেস্তে দেবে।

কিন্তু যে পাঁচ যুবককে পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে তিনজন ফিরে এলো কোনো রকমে।

ফিরে আসা তিন যুবককে নিজের দরবারে ডেকে ধমকের সুরে বললেন মন্ত্রী, 'তোমরা ভীরু কাপুরুষের দল। দেশের জন্য এই সামান্য কাজটাও করে আসতে পারলে না। ধিক তোমাদের। এখন বলো তোমরা, রাজার সামনে আমি মুখ দেখাব কী করে?'

যুবকদের দলপতি হাতজোড় করে করুণ স্বরে বলল, 'আমাদের শতচ্ছিন্ন অবস্থা দেখে কি আপনি বুঝতে পারছেন না কী করম বিপদের মধ্যে আমাদের দিন কাটাতে হয়েছে। অন্নপূর্ণা নদীর দু'পার জুড়ে কত যে সৈন্য গুপ্তচর ওরা মোতায়েন করেছে, তা' আপনাকে কী বলব মন্ত্রীমশাই। বাঁধের নিচে বিস্ফোটক বসাতে গিয়ে আমাদের দু'জন ওদের হাতে ধরা পড়েছে। শুনেছি ঐ দুজনকে নাকি ওরা ফাঁসি দিয়েছে অন্নপূর্ণা নদীর পারে। আমাদেরও এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে—'

সমবেদনার স্বরে বললেন মন্ত্রী, 'সত্যিই খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু কী আর করা যাবে বলো। ঠিক আছে, রাজাকে বলে ঐ দুজন যুবকের পরিবারকে আর্থিক ক্ষতি-পূরণের বন্দোবস্ত করব।'

দিন কয়েক পরে রাজা পরমজিতের মন্ত্রণাকক্ষে আবার এক গোপন বৈঠক বসল। প্রধান বিজ্ঞানী বললেন, 'পূর্বদেশকে জব্দ করবার একটা ভালো উপায় বার করেছি মহারাজ। এতে যুদ্ধ করতে হবে না। অথচ ওদের জব্দ করা যাবে—'

'বলুন, তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন উপায়টা কী। আমার আর তর সইছে না বিজ্ঞানী-প্রবর। যেদিন থেকে অন্নপূর্ণা নদীতে বাঁধ তৈরির ব্যাপারটা শুনেছি, সেদিন থেকে রাতে আমার ঘুম নেই। দিনেও স্বস্তি নেই—'

'মহারাজ, আপনি আমাদের দেশের সব কামারশালাকে পশ্চিম সীমান্তে সরিয়ে এনে নতুন করে তৈরি করে দিন। খরচটা রাজকোষ থেকেই করবেন। নাহলে আমাদের কামাররা হয়তো ওখানে যেতে চাইবে না—'

গম্ভীর মুখে রাজা পরমজিৎ বললেন, 'খরচ না হয় করলাম। কিন্তু এতে আমাদের কী লাভ?'

নিজের সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে প্রধান বিজ্ঞানী বললেন, 'লাভ আছে মহারাজ। অনেক ভেবেচিন্তেই উপায়টা বের করেছি। দেখেছেন তো, কামারশালার পাশ দিয়ে আপনার রথ যখন যায়, তখন আপনি রেশম কাপড় দিয়ে নিজের চোখ ঢাকেন। কেন ঢাকেন? কারণ, কামারশালার পোড়া কয়লা থেকে যে ধোঁয়া বেরোয়, তাতে চোখ জ্বালা করে। চোখ খুলে রাখা যায় না। তাই না—'

একটু থেমে রাজার দিকে তাকান প্রধান বিজ্ঞানী। রাজা বলেন, 'ঠিকই বলেছেন আপনি—'

এক ঢোক আঙ্গুরের রস পান করে প্রধান বিজ্ঞানী আবার বলতে শুরু করেন, 'আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আমাদের পূর্বদেশে সব সময় হাওয়া বইছে পূব থেকে পশ্চিমে। তাই বলছিলাম, আমরা যদি আমাদের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর দেশের সব কামারশালাগুলো নতুন করে বসাই, তবে পুবের হাওয়ার ধাক্কায় সেই কারখানার ধোঁয়া উড়ে যাবে পশ্চিমদেশে। কয়লা-পোড়া· এত ধোঁয়ায় ওদের দেশের আবহাওয়া দূষিত নোংরা হয়ে যাবে, মানুষজন রোগে ভুগবে বেশি। অনা-বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হবে—'

রাজা পরমজিৎ হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মতো আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠেন, 'দারুণ বুদ্ধি দিয়েছেন আপনি। রাজা বিক্রমজিৎকে এতবার অনুরোধ করলাম, একবার অন্তত আলোচনায় বসবার জন্য। কিন্তু কিছুতেই শুনলো না। এবার বাছাধন বুঝবে কত ধানে কত চাল। প্রধান বিজ্ঞানী, আপনাকে ধন্যবাদ। রাজকোষাধ্যকে বলে দিচ্ছি, আপনার এই পরামর্শের জন্য একশো স্বর্ণমুদ্রা পাবেন।'

রাজা পরমজিতের আদেশে রাজ্যের সব কামারশালা নতুন করে বসানো হলো দেশের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর। সমস্তই রাজকোষাগারের খরচে।

রাজ্যের সব গণ্যমান্য মানুষের উপস্থিতিতে এইসব কামারশালাগুলির উদ্বোধন করলেন রাজা পরমজিৎ স্বয়ং।

রাজা পরমজিৎ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বললেন, 'আপনারা হয়তো ভাবছেন, সারা রাজ্যের কামারশালাগুলি তো ভালোই কাজ করছিল। তবে কেন এগুলো নতুন করে আবার বানানো হলো রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর। সমস্ত ব্যাপারটা আপনাদের হয়তো মনে হচ্ছে খামখেয়ালী। কিন্তু এটা খামখেয়ালী নয়। সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেই আপনারা সব বুঝতে পারবেন। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন, প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমদেশ অন্নপূর্ণা নদীতে বাঁধ দিয়ে আমাদের শুকিয়ে মারবে। এটা একটা ষড়যন্ত্র—'

এই সময় রাজা একটু থামলে প্রজার দল একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'আমরা এর প্রতিশোধ চাই। পশ্চিমদেশের এই ঘৃণ্য চক্রান্ত আমরা সহ্য করব না। কিছুতেই না—'

উত্তেজনা একটু কমলে রাজা পরমজিৎ আবার বলতে শুরু করেন, 'পশ্চিম দেশকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের সব কামারশালাকে আমরা সরিয়ে এনেছি পশ্চিম সীমান্তে। এ সবই অবশ্য করেছি আমাদের প্রধান বিজ্ঞানীর পরামর্শে।

এক প্রধান ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'ব্যাপারটা নদীতে বাঁধ দেওয়া নিয়ে। তার সঙ্গে কামারশালা সরানোর সম্পর্কটা কোথায়?

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান বিজ্ঞানী এবার উঠে দাঁড়ান, 'আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন এর ফলাফল—'
কিছুক্ষণ পরে প্রধান বিজ্ঞানীর নির্দেশে সব ক'টা কামারশালার চুল্লিতেই আগুন জ্বালানো হলো। পরপর দাঁড়িয়ে থাকা একশো কামারশালার চুল্লি জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। আগুন জ্বলে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে কামারশালাগুলির একশো চিমনির মুখ দিয়ে কয়লা-পোড়া কালো ধোঁয়া বেরোতে লাগল গলগল করে। হালকা বাতাস বইছিল পুব থেকে পশ্চিমে। সেই বাতাসের ধাক্কায় চিমনির সব কালো ধোঁয়া উড়তে উড়তে পেরিয়ে গেল সীমান্তের ওপারে। কালো ধোঁয়ায় একেবারে মাখামাখি হয়ে গেল ওপাশের মাঠঘাট গাছপালা ঘরবাড়ি। ঐ দৃশ্য দেখে আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল এপাশের সমবেত জনতা।

'উচিত শিক্ষা হয়েছে ব্যাটাদের—,' 'ইঁট মারলে পাটকেল খেতে হবে—' ইত্যাদি নানারকম উত্তেজক মন্তব্য ভাসছিল বাতাসে।

হঠাৎ দেখা গেল, সীমান্তের ওপাশ থেকে বেশ কিছু মানুষ ছুটে আসছে এদিকেই। এরকম কোন ঘটনার জন্যই বোধহয় তৈরি ছিল পূর্বদেশের সৈন্যদল। ওরা পুরো সীমান্তটা পাহারা দিয়ে রেখেছে আগে থেকেই।
'কী ধোঁয়া, চোখ জ্বলে গেল, মরে গেলাম—' চিৎকার করতে করতে হতভাগ্য লোকগুলো সীমান্ত পেরিয়ে এলো এপারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদেশের সৈন্যদের তরোয়ালের খোঁচায় ফিরতে বাধ্য হলো নিজেদের দেশে।

কামারশালার আগুন জ্বলার পর সাধারণ মানুষ ফিরে গেল যে যার ঘরে। কেবল প্রধান বিজ্ঞানী বাদে। একটু দূরে একটা উঁচু টিলার মাথায় নতুন তৈরি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে প্রায় সারা দিনই প্রধান বিজ্ঞানী বসে থাকেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। দেখেন, কামারশালার চিমনির ধোঁয়ায় সীমান্তের ওপারে কী ধুন্ধুমার কাণ্ড লেগে গেছে।
এদিকটায় অন্নপূর্ণা নদীর একটা উপনদী আছে। তার দু'পার জুড়ে বিরাট বসতি গড়ে উঠেছিল। দূরবীণ চোখে লাগিয়ে প্রধান বিজ্ঞানী দেখেন, গ্রাম ছেড়ে সব মানুষ ছুটছে পশ্চিমদেশের রাজধানীর দিকে। দেখে দুঃখও হয়। কিন্তু কী করা যাবে। রাজার নষ্টামিতেই প্রজার কষ্ট।
রাজার মন্ত্রণাকক্ষে আবার অধিবেশন বসে।
রাজা পরমজিৎ বললেন, 'মন্ত্রী, পশ্চিমদেশের হালচাল এখন কেমন? গুপ্তচর কোন খবর এনেছে?

প্রৌঢ় মন্ত্রী হেসে জবাব দিলেন, 'গুপ্তচরের কাছ থেকে যা খবর পেয়েছি, তা' খুবই সন্তোষজনক। পূর্বসীমান্ত থেকে বহু মানুষ চাষবাস ছেড়ে পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিমদেশের রাজধানীতে। ঐসব উদ্বাস্তু মানুষের ব্যবস্থা করতেই নগরপালের অবস্থা নাজেহাল—'

হাসিমুখে রাজা তাকালেন প্রধান বিজ্ঞানীর দিকে, 'দেখা যাচ্ছে, আপনার পরিকল্পনা পুরোপুরি সার্থক—'
তৃপ্তকণ্ঠে জবাব দিলেন প্রধান বিজ্ঞানী, 'আমার এই পরিকল্পনা আসলে এক অন্য ধরনের যুদ্ধ। কিন্তু পশ্চিমদেশের রাজা বিক্রমজিৎ কি কোনরকম সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন?'
'এখনো পাঠান নি। তবে পাঠাতেই হবে, এ বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নেই—'
সভা ভাঙতেই প্রধান প্রতিহারী খবর দিলেন রাজা পরমজিৎকে, 'মহারাজ, পশ্চিমদেশের দূত এসেছে রাজা বিক্রমজিতের কাছ থেকে—'
'দূতকে এখনই নিয়ে এসো—'
কিছুক্ষণ পরে পশ্চিমদেশের দূত রাজা পরমজিৎকে যথোচিত মর্যাদায় অভিবাদন করে তাঁর হাতে দিলেন রাজা বিক্রমজিতের একটি বিশেষ পত্র।
সেটি পড়তে পড়তে রাজার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সভাসদদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'রাজা বিক্রমজিৎ সন্ধির প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, অন্নপূর্ণা নদীর ওপর বাঁধ তৈরিও আমাদের কামারশালার ধোঁয়া দিয়ে তিনি বৈঠকে বসতে চান। তা' আপনাদের কী মত?'
মন্ত্রী, সেনাপতি, প্রধান বিজ্ঞানী, কোষাধ্যক্ষ সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'অত্যন্ত উত্তম প্রস্তাব। যত তাড়াতাড়ি এই বৈঠক হয়, ততই সকলের মঙ্গল।'
রাজা পরমজিৎ বললেন, 'তথাস্তু।'
রাজার মুখে যুদ্ধজয়ের হাসি।

সুখ

কঙ্কাবতী মিত্র

বনে বনে কোলাহল গাছের পাতায়,
হাওয়া এসে কথা বলে কত সুখ পায়।
নদী চলে ধীরে ধীরে
এঁকে বেঁকে বালি চিরে,
গুণগুণ গান গেয়ে বলতে কী চায়?
পিয়ালের বন আজ ঘন ছায়া দেয়,
বুক ভরে সব সুখ কেড়ে নিতে চায়।
মেঘেরা সে বাধা ঠেলে
মহা সুখে দিল মেলে
আকাশের রাজ্যের সারা কিনারায়।



এক বংশীবাদকের গল্প

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

অগাধ সমুদ্রে জাহাজডুবির পর মানুষটা একাই বেঁচেছিল।
সারারাত উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে রাত্রিশেষে সে যখন এক দ্বীপে এসে পেঁছল তখন তার ক্লান্ত অর্দ্ধচেতন অবস্থা।
সে এক আশ্চর্য দ্বীপ।
এ দ্বীপ পৃথিবীর সীমানার মধ্যে হলেও কোন ভু-খণ্ডের মানুষই এ দ্বীপের খবর রাখেন না। এখানে যারা বাস করে তারাও জানে না বাকি অংশের কোন জনপদ বা মানুষের কথা। সৃষ্টির রাজ্যে এ এক সৃষ্টিছাড়া দেশ ;
ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল আগন্তুক মানুষটি।
প্রথম দর্শনেই বিস্ময় জাগালো মনে।
বেলাভূমি ছাড়িয়েই বনভুমি। সেখানে কত রকম গাছ। ফুল গাছগুলি আগন্তুকের অচেনা নয়। কিন্তু কই, একটা গাছেও তো ফুল ফুটে নেই। একটা পাখী পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও।
এই প্রত্যুষেও চারদিকে কি অদ্ভুত স্তব্ধতা। শোনা যাচ্ছে শুধু মাত্র সাগরের ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ।

আর হ্যাঁ, ওই তো কিছু মানুষ জঙ্গলে কাঠ কাটতে ঢুকছে। তারা কাঠকাটা শুরু করল। ভেসে আসছে কাঠ কাটার শব্দ। কিন্তু মানুষগুলোর মুখে তো কোন ভাষা নেই। ওরা কি কথা বলতে পারে না ?

ভাবতেই আগন্তুকের প্রাণের ভেতরটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। সে একজন শিল্পী। বংশী-বাদক। সাগর জলে তার অন্য সব কিছু জলাঞ্জলি গেলেও বাঁশীটি আছে। অভ্যাস বশে বাঁশী বার করে সে ফুঁ দিল।

অমনি যেন এখানে প্রকৃতির রাজ্যে এক মহা সোরগোল শুরু হয়ে গেল। আগন্তুকের বাঁশীর সুর বাতাসে বহে নিয়ে গিয়ে ছড়িয়ে দিল এখানকার প্রকৃতির অন্তঃপুরে।

বৃক্ষশ্রেণীর পাতায় পাতায় শুরু হোল কী আশ্চর্য কম্পন, ছড়িয়ে পড়ল মুগ্ধ মাদকতা। বনে কাঠ কাটতে এসেছিল যেসব মানুষের দল তারা থমকে গিয়ে তাকালো সাগর তীরে। এ সুর—এ ধ্বনি তারা বুঝি কখনও শোনে নি! করাত, বাটালি সব ফেলে ওরা দুদ্দাড়িয়ে ছুটে এসে ঘিরে ধরলো আগন্তুক এবং বংশীবাদককে।

বোবা হলেও মানুষগুলি কালা নয়। বংশীবাদকের বাঁশীর সুর আজ বহুকাল বাদে তাদের কাজ ভুলিয়ে দিয়েছে।

এই আশ্চর্য দ্বীপের একটা ইতিহাস আছে। ভারী আজব সে ইতিহাস। বিশ্বের কোথাও এর আগে এমনটি কখনও ঘটেনি।

এ দ্বীপের বর্তমান রাজা গজপতির ঠাকুর্দা জগৎপতি অত্যন্ত চতুর ও নিস্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। দ্বীপের প্রজাদের ওপর তাঁর অত্যাচার আর শোষণ ছিল নিত্যকার ব্যাপার। তবু তারা রাজার বিরুদ্ধে কখনও বিদ্রোহ করে নি—শুধু একবার ছাড়া।

সে সনে রাজার অত্যাচার চরমে পেঁাছেছিল। প্রকৃতিতে অজন্মা আর মড়কে গোটা রাজ্যটা মরতে শুরু করেছিল কিন্তু সে বছরও রাজা তাঁর রাজস্বের ভার প্রজাদের ওপর থেকে কমাতে রাজী হলেন না।

এক সময় প্রজারা এক সঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল।

আর তখনই রাজা জগৎপতি চরম নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করলেন। রাজসভায় অনুগত এক জাদুকরকে দিয়ে আশ্চর্য জাদু তৈরী করলেন তারপর তা ছড়িয়ে দেওয়া হল দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে।

সেই জাদুর প্রভাবেই বোবা হয়ে গেল দ্বীপের সব মানুষ।

সেই থেকেই একমাত্র রাজা ছাড়া এ দ্বীপের প্রজাকুল বংশপরম্পরায় বাকশক্তিহীন। কিন্তু তারা শুনতে পায়। ছেলেবেলা থেকেই তারা শেখে শুধু হুকুম তামিল করতে আর রাজার জন্য পরিশ্রম করতে। এর বাইরে কোন সুর, কোন ছন্দ এ দ্বীপে প্রবেশ করে না। সেই কতকাল আগে থেকেই।

সুরছন্দহীন দ্বীপটা তাই ধীরে ধীরে বদলে গেছে জাদুকরের প্রভাবে। মানুষের নীরব-

তার অভিমানেই বুঝি দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে গান গাওয়া পাখীর ঝাঁক। প্রকৃতিও ভুলে গেছে গাছে গাছে ফুল ফোটাতে।

আজ তাই এ দ্বীপের এক মাত্র ভাষা রাজার হুকুম আর যন্ত্রের শব্দ।

কিন্তু এই নিঃশব্দ নীরবতার দ্বীপে হঠাৎ এ কোন সুর এল।

ওই সুর নাড়িয়ে দিয়েছে এখানে দিন-রাত্তির কাজ করা লোকগুলির অন্তর। ও সুর যে তাদের কাজ ভোলানোর মন্ত্র।

সারা দ্বীপের মানুষ ছুটে আসে। বংশীবাদকের সুরের মায়া তাদের বোবা মনে ভাষা ফোটাতে শুরু করে।

আলোড়ন ওঠে প্রকৃতির রাজ্যেও। বাঁশির সুর বাতাস বয়ে নিয়ে যায় দূর-দূরান্তে। ছোট রঙীন পাখীরা আবার উড়ে আসতে শুরু করে। ফুল গাছের শাখায় বসে দোল খেয়ে বাঁশীর সুরে পাখীরা গানের সুর মেলায়।

প্রকৃতির রাজ্যেও ছন্দ জাগে—বহুবছর বাদে একটা দুটো করে কুঁড়ি জন্মে ফুল ফুটতে শুরু করে দ্বীপের গাছের পাতার ফাঁকে।

আশ্চর্য দ্বীপ কি জাদুকরের জাদুর মায়া থেকে মুক্তি পেল ?

কিন্তু বেশী দূর গড়াল না। রাজার প্রহরী এসে বন্দী করল বংশী বাদককে। ধরে নিয়ে গেল রাজ সভায়।

বংশী বাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। সে নাকি এ দ্বীপের সমস্ত শোষণ আর নিঃশব্দ নিয়মানুবর্তিতাকে ভঙ্গ করেছে। রাজ্য জুড়ে তুলেছে সুরের কোলাহল !

সিংহাসনে বসে রাজা গজপতি বংশীবাদককে প্রশ্ন করলেন,—অভিযোগ সম্পর্কে তোমার কি কিছু বলার আছে ?

বংশীবাদক বললো,—আমার বাঁশীর সুর পারে শুধু অ-সুরকে বিনাশ করতে মহারাজ।

ব্যাস, হাতের বাঁশী কেড়ে সেই মুহূর্তে কয়েদখানায় পাঠানো হোল বংশীবাদককে।

বোবা রাজ্যে আবার নামলো নিঃশব্দ নিয়মানুবর্তিতা। শাসন হোল আরও শক্ত। সুরের মায়ায় যে কয়েকটি পাখী উড়ে এসেছিল তারাও ফিরে গেল, যে কটা ফুলগাছে নতুন কুঁড়ি ফুটেছিল, না ফুটতেই সেগুলোও পড়লো ঝরে।

এবার শুধু বোবা নয়, রাজ্যের মানুষ বোবা যন্ত্রণায় পাথর হয়ে গেল।

এই ভাবে পরিবর্তিত হয়ে চললো ঋতুচক্র।

বংশীবাদকের খবর আর কেউ রাখে না।

কিন্তু বংশীবাদক নেয় রাজার খবর, রাজ্যের খবর, কয়েদখানার প্রহরীটির মাধ্যমেই। রাজার প্রহরী হলেও এই সময়ের মধ্যে সেও ভালবেসে ফেলেছে বংশীবাদককে। বংশী-বাদক বাঁশীহারা হয়ে এখানে গুণগুণ কণ্ঠে সুর তোলে। প্রহরীর সঙ্গে কথা হয়। সেই সুর আর ইঙ্গিতের বিনিময়ে।

সেই খবরটা আনলো।

এ রাজ্যের একমাত্র রাজকন্যা মুক্তমালা অসুস্থ।
অজানা এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে দিনে দিনে ক্ষয় পাচ্ছে তার শরীর। রাজবৈদ্য আর নাকি তার জীবনের আশা খুঁজে পাচ্ছে না।
অবশেষে রাজা ঘোষণা করেছেন যে কোন পুরুষ মুক্তমালাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে তার সঙ্গেই তিনি বিয়ে দেবেন তাঁর একমাত্র কন্যার।
কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউই পারে নি সে অসাধ্য সাধন করতে। দিনে দিনে নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছে রাজকুমারী।
রাজপ্রাসাদে নেমে এসেছে গভীর শোক। মহারাণী মূর্ছা যাচ্ছেন বার বার।
কিন্তু রাজকুমারীর রোগের কারণটাই এখনও খুঁজে পাওয়া যায় নি। আজকাল সর্বদাই সে ম্রিয়মান। কি যেন চিন্তা করে দিবারাত্র। খাওয়া-দাওয়া ছেড়েছে, রাজবৈদ্যের ওষুধও আজকাল মুখে তুলতে চায় না। শরীর তার ক্রমশঃ কৃশ পাণ্ডুর।
প্রহরীর মাধ্যমেই রাজার কাছে খবর পাঠাল বংশীবাদক!
রাজকুমারীকে আরোগ্যের চেষ্টা সে একবার করতে চায়।
শুনে তো সবাই অবাক। নাক কুঁচকোলেন রাজবৈদ্য, উপহাস করলো সভাসদরা। কয়েদখানায় এতদিন থেকে নির্ঘাত মাথা বিগড়েছে লোকটার।
কিন্তু রাজী হলেন স্বয়ং রাজা। হয়তো ভাবলেন, পরীক্ষা করে দেখাই যাক্ "যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ"।
সাময়িক সময়ের জন্য কয়েদখানা থেকে বার করে এনে বংশীবাদককে ফিরিয়ে দেওয়া হোল তার সেই পুরনো বাঁশী।
বংশীবাদক রাজকুমারীর কক্ষে পা রাখল।
রাজপালঙ্কে দুগ্ধ ফেনিল শয্যায় যেন পড়ে আছে এক বিবর্ণকান্তি শ্বেত গোলাপ।
অপলক চোখে বংশীবাদক তাকিয়ে রইল সেই রোগক্লিষ্ট সৌন্দর্যছটার পানে।
তারপর কখন যে যে তার বাঁশীতে ফুঁ দিয়েছে নিজেই জানে না।
বহুদিনের অবরুদ্ধ সুর আজ আবার মুক্তি পেয়েছে বংশীবাদকের বাঁশের বাঁশীতে।
নিজের সুরের মায়ায় নিজেই তন্ময় হয়ে গেছে বংশীবাদক। ভুলে গেছে বিশ্বচরাচর।
এক ভাবে কেটেছে দিন—আবর্তিত হয়েছে সময়—কিন্তু রাজকুমারী মুক্তমালার কক্ষে বাঁশীর সুর থামে নি।
যেন আকণ্ঠ পিপাসায় রাজকুমারী প্রাণ ভরে শুনেছে সে সুর—প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠেছে তার মন—বিস্বাদ পৃথিবীটা আবার বুঝি ধ্বনিময়, ছন্দময় হ'য়ে উঠছে রাজকুমারীর কাছে—সুরের মায়ায় মনের বিমর্ষতায় মেঘ যাচ্ছে কেটে—বিবর্ণ শ্বেত গোলাপ আবার প্রস্ফুটিত হচ্ছে নতুন সৌরভ আবেগে।
রাজকুমারী মুক্তমালা আরোগ্য হয়ে উঠলেন আশ্চর্য দ্রুততায়।
বিস্মিত হলেন রাজা। রাজবৈদ্য সভাসদবৃন্দ প্রত্যেকেই যেন হতবাক্। কি মন্ত্র আছে ঐ বাঁশীর সুরে—নাকি এও এক জাদু!

—রাজকুমারীকে বিবাহ? না, না মহারাজ, আমি এক অজ্ঞাত কুলশীল বংশীবাদক মাত্র, আমার সে যোগ্যতা কোথায়?

বংশীবাদক রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল,—আমি তো শুধু চেয়েছিলাম সুরের যে অভাব রাজকুমারীকে অসুস্থ করে তুলেছিল তা থেকে তাকে মুক্তি দিতে। আর সত্যিই যদি আপনি আমায় কিছু দিতে চান তবে অনুমতি দিন রাজকুমারীর মত এ দ্বীপের প্রতিটি মানুষের অ-সুর যন্ত্রণার মুক্তি যেন আমি সুরের মন্ত্রে দিতে পারি।

রাজা গজপতি সিংহাসনে বসে বিস্মিত হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন বংশীবাদকের দিকে। তারপর অস্ফুট স্বরে বললেন—আমি অনুমতি দিলাম বংশীবাদক।

এরপরের কথা আর না বললেও বোধ হয় চলে। রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল বংশীবাদক। খোলা প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে এবার সে অকুতোভয়ে বাঁশীতে ফুঁ দিল। তার সুর আবার দ্বীপে ফিরিয়ে আনলো চলে যাওয়া পাখীদের। পাখীর গানে, বাঁশীর সুরে গাছে গাছে আবার ফুল ফুটালা, রূপময় ধ্বনিময় ছন্দের জাগরণে জাদুকরের জাদুর হোল বিনাশ। আশ্চর্য দ্বীপে মানুষ বহুযুগ বাদে আবার কণ্ঠে ভাষা পেল। গান গাইতে শুরু করল। তাদের গানের সুর কাজের ছন্দের সঙ্গে মিললো।

তারপর বংশীবাদক একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

যখন কেউ খুঁজে পেল না তার হদিশ তখন কেউ কেউ অনুমান করলো বংশীবাদক তার কাজ সেরে সাগরে ভেলা ভাসিয়ে চলে গেছে নতুন কোন দেশে, কেউবা বললো, তার বাঁশী নিয়ে সে মিশে আছে এই দ্বীপেরই সাধারণের মধ্যে।

শুধু রাজপ্রাসাদের সেই উঁচু গবাক্ষে দাঁড়িয়ে রাজকুমারী মুক্তমালা নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে আজও অপেক্ষা করে থাকে—।

বংশীবাদক একদিন ফিরে আসবেই।

বেড়াল ফেড়াল

রঞ্জন ভাদুড়ী

তুই বলছিস আমার বেড়াল মাছ খেয়েছে তোর
তার মানে তুই কী বলতে চাস, আমার বেড়াল চোর?
জানিস কি তুই কোন্ বংশের বেড়াল আমি পুষি?
সদ্বংশের অবতংস আমাদের এই পুশি।
পরের জিনিস ছোঁয় না তো, খাওয়া দূরের কথা,
নিজের ঘরেই সময় কাটায় যায় না যথাতথা!
আছাড়-পাছাড় হাঁটকায় না, ছোঁয় না ইঁদুর-ছুঁচো,
টাইম-বাঁধা খাবার খেয়ে করে সে কুলকুচো।
ভুল করছিস—মাছ খেয়েছে অন্য কোনও বেড়াল।
চোর যারা হয়, বেড়াল তো নয়—তাদের বলে ফেড়াল।

দুষ্টবুদ্ধি শিয়ালের কথা

শ্রীঅশোক সী



সে ঠিক কতদিন আগের কথা—তা' মনে নেই। তবে অনেক অ-নে-ক দিন আগে যেমনটি ঘটেছিল তা' আজ তোমাদের শোনাচ্ছি। শোনো—

তখন কুকুরের সঙ্গে শিয়ালের ছিল বন্ধুত্ব। খুব ভাব দু'জনের মধ্যে। কিন্তু ভাব থাকলে কি হবে—দু'জনে একসঙ্গে এক জায়গায় কিন্তু বাস করত না।

কুকুর থাকত লোকালয়ে—মানুষের সঙ্গে। আর শিয়াল থাকত বনে-জঙ্গলে, ঝোপে-ঝাড়ে—লোকালয়ের বাইরে। যেমন এখনও থাকে।

একদিন কুকুর, শিয়ালের গর্তে তার কাছে গিয়েছিল বেড়াতে। শিয়াল তাকে দেখে হাসতে হাসতে বলেছিল, এসো বন্ধু, এসো। বসো আমার কাছে।

কুকুর শিয়ালের কাছ ঘেঁসে বসে, তার দিকে চেয়ে বলেছিল, তারপর তুমি কেমন আছ, বন্ধু?—আজকে কেমন খাওয়া জুটলো?

শিয়াল হাসতে হাসতে বলেছিল, আজ একটা খরগোশ শিকার করেছিলাম—বেশ ভালই খাওয়া হয়েছে!

কুকুর শিয়ালের হাসিতে যোগ দিয়ে বলেছিল, তা' হলে আজ তোমার বরাত খুলেছে বলো। তা' বেশ! তা বেশ!

শিয়াল বলেছিল, তা' বন্ধু, সেই মাংসের এখনও কিছুটা আছে—তুমি খেয়ে যাও না।

কুকুর বলেছিল, না ভাই থাক, তোমার কষ্টের শিকার—ও মাংসে আর ভাগ বসাবো না। তা' ছাড়া কি জানো, আমি তো থাকি লোকালয়ে, মানুষ-জনের সঙ্গে। মোটামুটি ভালই খেতে পাই সেখানে। এই বলে একটু থেমে কুকুর ফের বলেছিল, কিন্তু তুমি তো অনেক দিন হল আমার ওখানে যাওনি। একদিন এসো আমার কাছে বেড়াতে।

শিয়াল কুকুরের নিমন্ত্রণে তাড়াতাড়ি বলেছিল, যাবো, যাবো—নিশ্চয়ই তোমার কাছে বেড়াতে যাবো। তবে কি জানো ভাই, তোমার কাছে যেতে হলে সময় আর সুবিধা বুঝে যেতে হয়। জানোই তো, মানুষগুলোকে দেখলেই আমার কি রকম ঘেন্না লাগে।

কুকুর শেয়ালের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, কেন, তুমি তো আমার কাছে রাতের বেলা যেতে পারো—যখন মানুষ-জন শুয়ে পড়ে, তখন।

শিয়াল বলেছিল, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তোমার কাছে ফাঁক বুঝে যত তাড়াতাড়ি পারি নিশ্চয়ই যাবো···এখন এসো গল্প করা যাক— ।

ঝোপ-ঝাড় ঘেরা শিয়ালের গর্তের আধো আলো-ছায়ার মাঝে বসে বসে দু' বন্ধুতে নিজের নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলাবলি করছিল। বাইরে তখন অনেক অনেক উঁচু আকাশটা ঘিরে ঝরে পড়ছিল দুপুরের সিসেগলা রোদ।

কুকুর থাকত এক বড়লোকের বাড়ি। বাড়িটাও ছিল মস্ত বড়। বাড়ির চারিদিক ঘিরে বাগান। তাতে নানা ফল-ফুলের গাছ। কুকুর সেই বাগানে থাকত ছাড়া। ঘুরত নিজের খুশীমত যেখানে-সেখানে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা যখন সে সেই বাগানে ঘুরছিল, তখন তার হঠাৎ চোখে পড়েছিল দূরে কলাবাগানের মাঝে যেন কার এক ছায়া নড়ছিল সেখানে।···কে এল এমন সময়? চোর-টোর নয়ত?—ল্যাজ খাড়া করে চোখ দুটো মেলে সে ভাল করে সেইদিকে চেয়েই বুঝতে পেরেছিল—না চোর-টোর নয়। তার শিয়ালবন্ধু এসেছে চুপি চুপি তার সঙ্গে দেখা করতে।

তখন সে আনন্দে চিৎকার করে বলেছিল, এসো এসো শিয়ালবন্ধু এসো—আঃ! আজ আমার কি আনন্দ!

শিয়াল তার সামনে এসে বলেছিল, তুমি ভাল আছো তো বন্ধু?···আজ ক'দিন হল তুমি আর আমার কাছে আসছো না দেখে ভাবলাম তোমার হল কি? যাই একবার খোঁজ-খবর নিয়ে আসি। তাই এসেছি— ।

কুকুর খুশী খুশী গলায় বলেছিল, ভালই হল তুমি এসেছো।—কি জানো, আমি যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়ির মালিকের ছেলের বিয়ে। খুব ধুমধাম হচ্ছে। তাই আজ ক'দিন তোমার কাছে যেতে পারিনি ভাই। কিছু মনে করো না।—তা' এসো, চলো আমার ঘরে। সেখানে বসে বসে খুব মজায় দু'জনে গল্প করা যাবে।

শিয়াল বলেছিল, না ভাই, তোমার ঘরে যাবো না···বিয়ে বাড়িতে এখন মানুষ-জন গিশ্ গিশ্ করছে। কোথায় কে দেখে ফেলবে!

কুকুর বলেছিল, আরে না না, তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছো—তোমাকে কেউ কিছুটি বলবে না। তুমি তো আমার বন্ধু।...তাছাড়া তুমি আমার মালিককে চেনো না—অত ভাল লোক দেখা যায় না। তিনি জানেন যে, তুমি আমার বন্ধু। তাই সেদিন তিনি আমাকে বলছিলেন, আমার মত তোমাকেও তিনি পুষবেন— ।

কুকুরের কথা শুনে শিয়াল হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ কুকুরের দিকে তাকিয়ে পরে ধীরে ধীরে বলেছিল, আমি মানুষের সঙ্গ পছন্দ করি না!

কুকুর তার কথায় কান না দিয়েই বলেছিল, তা' এসেছ ভালই হয়েছে। বিয়ে-বাড়ির ভোজ। অনেক রকম খাবার-দাবার। তার বেশ কিছুটা অংশ আমার কপালেও জুটেছে। চলো না দু' বন্ধুতে মিলে এখন সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক— ।

শিয়াল নাক সিঁটকে বলেছিল, না ভাই, মানুষের রান্না-করা কোনো খাবার খেতে

আমার মোটেই ইচ্ছে নেই···আর তাছাড়া তুমি তো জানো আমি কাঁচা মাংস খেতেই ভালবাসি ! তা যাক, তোমার এই আতিথেয়তার জন্যে তোমায় অনেক ধন্যবাদ । এখন চলি । এই বলে বিস্মিত কুকুরের সামনে থেকে শিয়াল চলে গিয়েছিল ।

তারপর অনেকগুলি দিন কেটে গিয়েছিল একে একে । নানান কারণে কুকুর তার বন্ধু শিয়ালের কাছে যেতে পারেনি । শিয়ালও আর আসেনি তার কাছে—কি জানি কি কারণে ।

শুধু কুকুরের মাঝে মাঝে মনে পড়ে যেত তার শিয়াল বন্ধুর কথা । অবাক হয়ে ভাবত, মানুষের সঙ্গ শিয়ালের ভাল লাগে না কেন । সে নিজেও তো প্রায় শিয়াল জাতীয় জীব । কই সে তো মানুষকে ঘৃণা করে না, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে । মানুষরাও তাকে ভালবাসে । তবে শিয়ালের বেলায় তা হবে না কেন ? শিয়ালও তো মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের সঙ্গী হতে পারে । তাতে বাধা কোথায় ? এই কথা সে বুঝে উঠতে পারে না । এইসব ভাবতে ভাবতে তার মুখ হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে যেত ।

সে বছর হয়েছিল ভীষণ খরা । বর্ষার আকাশে মাঝে মাঝে মেঘের আনাগোনা হত বটে—কিন্তু বৃষ্টি হত ছিটেফোঁটা মাত্র । তাতে মাটির খিদে মিটত না । তাই দিনে দিনে শুকিয়ে গিয়েছিল নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা ।

জলই প্রাণীর জীবন । তাই জলের অভাবে, তেষ্টার জ্বালায়—যে বনটিতে শিয়াল থাকত, সেই বনের ছোট-বড় সব জীব-জন্তুই চলে গিয়েছিল । চলে গিয়েছিল জলের খোঁজে দূরে—অনেক দূরের কোনো বনে ।

কেবল যায়নি ঐ শিয়াল । সে একা তার পুরানো ভিটে কামড়ে পড়েছিল । কিন্তু শুধু থাকলেই তো হয় না । জল চাই, খাদ্য চাই···তবে প্রাণে বাঁচবে । কিন্তু ঐ শিয়ালের ভাগ্যে যদিও দু'চার ফোঁটা জলের দেখা মিলত কখনও-সখনও কোনো শুকিয়ে যাওয়া খাল-বিলের নীচে—তবে ছোট ছোট শিকারযোগ্য প্রাণীর অভাবে খাদ্য সে জোগাড় করতে পারত না কোন মতেই । তবু সে দাঁতে দাঁত কামড়ে ভিটের মায়ায় পড়েছিল এখানে ।

এমনি ভাবে থাকতে থাকতে শেষে একদিন খিদের জ্বালা আর সহ্য করতে না পেরে নিজের গর্তে শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল—কি করা যায় ? ঠিক এমনি সময় হঠাৎ তার কানে এল গর্তের বাইরে কুকুরের ডাক ।

ডাকটা কানে আসতেই শিয়ালের মাথায় বুদ্ধির একটা ঝলক খেলে গিয়েছিল । আরে এই তো—তার বন্ধু ঐ কুকুরটার সাহায্যেই তো এখনি কিছু খাদ্য জোগাড় করতে পারে । এই না ভেবে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে হাসি হাসি মুখে বলেছিল, আরে বন্ধু যে-এসো এসো, অনেকদিন পর এলে— !

কুকুর মুখটা তুলে দেখেছিল—তার বন্ধু শিয়াল আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছে । সে বলেছিল, একি বন্ধু, তুমি যে অনেক রোগা হয়ে গিয়েছ ! কারণ কি ?

শিয়াল মাথা নেড়ে বলেছিল, তুমি কিছুই জাননা দেখছি। আর কি করেই বা জানবে…থাকতো মানুষের সঙ্গে। মানুষরা মাটির গভীর থেকে কত কি কৌশলে জল তোলে তাই দিয়ে চাষ-আবাদ করে। বনে-জঙ্গলে খরার অবস্থা কি তা' তো তোমাদের জানবার কথা নয় ভাই।

কুকুর বলেছিল, খরার কথা আমিও শুনেছি। তোমার খোঁজ নিতে আসবো আসবো করেও নানান ঝঞ্ঝাটে এতদিন তা হয়ে ওঠেনি ভাই। তুমি কিছু মনে করো না। তা তুমি কেমন আছো তা তো বললে না ?

শিয়াল বলেছিল, বলাবলির আর কি আছে—না পাচ্ছি জল, না পাচ্ছি খাদ্য, বেঁচে আছি কোনমতে।

কুকুর তাই শুনে দুঃখে বলেছিল, তা এমনি কষ্ট করেই বা তুমি আছো কেন ?—আমার ওখানেই তো যেতে পারতে ভাই। বাড়িতে আমাদের অঢেল জল, অঢেল খাদ্য—সেই থেকে তুমিও নিশ্চয়ই ভাগ পেতে।

শিয়াল বলেছিল, না না অমন সুখে আমার কাজ নেই। তাছাড়া তোমায় তো আগেই বলেছি—মানুষের সঙ্গ আমি মোটেই পছন্দ করি না। আর মানুষের রান্না করা ঐ ভাত-ডাল, তরকারি মাংস—ওসবের গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না—খাওয়া তো দূরের কথা। আমি চাই কাঁচা মাংস খেতে।

শিয়ালের কথা শুনে কুকুর গম্ভীর হয়ে বলেছিল, কিন্তু ভাই, প্রয়োজনে তো প্রাণীদের অনেক অভ্যাস বদলাতে হয়—যারা তা পারে তারাই বিপদে বেঁচে যায়।…শুনেছি আমাদের পূর্ব-পুরুষরা নাকি কাঁচা মাংসই খেতো। তারপর মানুষের সঙ্গ পেয়ে তাদের কাছে এসে আমরা আজ মানুষদের আহার গ্রহণ করেছি—তাতে আমাদের এখন কি খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে, না আমরা না খেয়ে মারা যাচ্ছি।

শিয়াল সজোরে মাথা নেড়ে বলেছিল, না, তোমার ওকথা আমি মানছি না। তোমার কোন যুক্তিতেই আমি আমার পুরানো অভ্যাস পাল্টাবো না।

কুকুর জিজ্ঞাসা করেছিল, তাহলে তুমি কি করতে চাও ?

শিয়াল বলেছিল, আমি কাঁচা মাংসই খেতে চাই।

কুকুর অবাক হয়ে বলেছিল, তা কি করে হবে। এখন এই বন তো তোমার শিকারযোগ্য জীবজন্তু শূন্য। তাহলে তুমি কোথায় কাঁচা মাংস পাবে।

শিয়াল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হেসে কুকুরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, কেন, তোমার সাহায্যে।

শিয়ালের কথা শুনে কুকুর অবাক হয়ে বলেছিল, সেকি! আমি তোমায় কিভাবে সাহায্য করতে পারি ? তাছাড়া তুমি তো আমার সঙ্গে লোকালয়ে যাবে না—মানুষের রান্না খাদ্য খাবে না—তবে ?

শিয়াল বলেছিল, কেন এতো খুব সহজ ব্যাপার—তুমি যে বাড়িতে থাকো সেই

বাড়ির মালিকের অনেকগুলি পোষা হাঁস আছে। আমি দেখেছি।…তুমি সেই হাঁসগুলি থেকে রোজ একটা করে হাঁস আমার জন্যে এনে দিতে পারবে না?

শিয়ালের কথা শুনে কুকুর বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, সেকি! এ তুমি কি বলছ শিয়াল-ভাই! তারপর একটু থেমে ফের বলেছিল, না না, এ হতে পারে না। তোমার কথায় আমি চুরি করবো না, কোনো অন্যায় করবো না, আমার মালিকের কাছে কোনো অবিশ্বাসের কাজ করবো না!

শিয়াল বলেছিল, কেন এতে দোষ কিসের? ক্ষুধার্ত বন্ধুর জন্যে না হয় কিছু অন্যায় কাজই করলে।

কুকুর বলেছিল, তুমি ক্ষুধার্ত তা বুঝছি। কিন্তু তার জন্যে অন্য ব্যবস্থাও তো নেওয়া যেতে পারে—অন্য খাদ্যও তো খেতে পারো তুমি।

শিয়াল বলেছিল, না না, অন্য কিছুতে হয় না, খাদ্যের অভ্যাস আমি পাল্টাতে পারি না। আর তাছাড়া তুমি তো আমার বন্ধু। বন্ধুর জন্যে না হয় অন্যায়ই করলে! তাতে ক্ষতি কি?

কুকুর বলেছিল, একি অসম্ভব, আজগুবি যুক্তি তোমার। বন্ধুর জন্যে কাজ করতে পারি, ক্ষতি স্বীকার করতে পারি, তা বলে কোনো অন্যায় কাজ আমার দ্বারা হবে না! আমাকে আর কখনও এরকম অন্যায় অনুরোধ করো না, ও আমি পারবো না। আমাকে ভুল বুঝ না বন্ধু!

শিয়াল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে হেসে উঠে ব্যঙ্গ করে বলেছিল, বন্ধু! ভারী আমার বন্ধুরে! যে বন্ধুকে বিপদের সময় সাহায্য করে না, সে আবার বন্ধু!

কুকুর আহত কণ্ঠে বলেছিল, তোমাকে আমি চিনেছি। তোমার মুখোশ আজ খুলে গেছে, বুঝেছি, বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে বন্ধুকে দিয়ে তুমি অন্যায় কাজ করাতে চাও! তুমি বন্ধু নও, তুমি বন্ধুর মুখোশপরা শয়তান। আমি আজ থেকে আর তোমার মত এমন দুষ্ট বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে চাই না, কোনদিন না, কোনদিনও নয়!

এই বলে ঘৃণায় আর রাগে কুকুর শিয়ালের সঙ্গ চিরদিনের মত ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল।

সেইদিন থেকে আজও শিয়ালের ডাক শুনলে বা শিয়াল দেখলে…কুকুররা সেই অনেক দিন আগের দুষ্টবুদ্ধি শিয়ালের কথা মনে রেখে, ভীষণ রাগে তাদের তাড়া করে।



রহস্য সন্ধানী

পরেশ দত্ত

বোম্বের ভি টি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে সুকোমল বসু মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দীর্ঘকায় পুরুষ, চোখে চশমা, পুরুষ্টু গোঁফ।

আমার পিতৃবন্ধু। বোম্বেমেলের এয়ার-কন্ডিশন কোচ থেকে প্লাটফরমে নেমে আমাকে দেখে অবাক হলেন। 'আরে কাজল যে, কি ব্যাপার বোম্বেতে?' প্রণাম করে হেসে বললাম, 'বোম্বেতে বেড়াতে এসেছি কাকাবাবু'। 'আই সি' আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে জিগ্যেস করলেন, 'একাই এসেছো? তা বেশ।' পাশে দাঁড়িয়ে এক তরুণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'মিঃ অজিত খাণ্ডেলওয়াল, আমার কলিগ।' করমর্দন করে মিঃ খাণ্ডেলওয়ালকে জিগ্যেস করলাম, 'আপনিও কি কাকাবাবুর সঙ্গে সি, বি, আইতে কাজ করেন?'

চোখের দৃষ্টিতে আমাকে নিঃশব্দে তর্জন করলেন কাকাবাবু। বুঝলাম বোম্বেতে ওঁদের আসল পরিচয় প্রকাশ করতে চান না। নিশ্চয় কোনো গোপন তদন্তে এসেছেন। তদন্তের ব্যাপারে কিছু জিগ্যেস করা চলবে না।

দুটো স্টীল ট্র্যাঙ্ক কুলির মাথায় চাপিয়ে কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, 'বোম্বেতে কোথায় উঠছ?'

'বোম্বেতে এই প্রথম আসছি,' হেসে জানালাম 'এখানকার কিছু জানি না কোথায় উঠব তারও ঠিক নেই, কাছাকাছি একটা হোটেল 'টোটেল দেখতেই হবে।' তাই তো থমকে দাঁড়ালেন কাকাবাবু, 'বোম্বেতে থাকার জায়গা পাওয়া বেজায় কঠিন।

তা ছাড়া সব হোটেলও ভাল নয়, ক্রফোর্ড মার্কেটের কাছে হোটেল মেঘদূত আমাদের অ্যাকোমডেশন বুক করা আছে। চলো তোমারও কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি।'

ভিটি স্টেশনের বাইরে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম আমরা তিনজনে। সকালেই পথে অজস্র গাড়ি কিন্তু ট্রাফিক জ্যাম নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা হোটেল মেঘদূতের সামনে পৌঁছে গেলাম। পুরনো আমলের তিনতলা বাড়ী। সামনে জম-জমাট রাস্তা।

হোটেল ম্যানেজার খাতির করে বসালেন কাকাবাবুদের। হোটেলের বয় দোতলায় একটা ঘর খুলে দিল। ঘরটা এত ছোট যে তার ভেতরে আর একটা ক্যাম্প খাটিয়াতে রাখার জায়গা নেই। কাকাবাবু হোটেলে আমার থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতে বললেন ম্যানেজারকে। কিন্তু ম্যানেজার স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এক হপ্তার আগে হোটেলে কোন সীট খালি হবার আশা নেই। কিন্তু কাকাবাবু নাছোড়বান্দা। ম্যানেজারকে বললেন আমার থাকার জন্যে একটা ব্যবস্থা করে দিতেই হবে।

'আচ্ছা দেখছি।' অনিচ্ছা সত্ত্বেও হোটেল-বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন ম্যানেজার। ফিরে এসে জানালেন আমার জন্যে ব্যবস্থা হতে পারে তিনতলার ছাদের একটা ঘরে। ঘরটা আসলে হোটেলের লাম্বার রুম—ভেঙ্গো-ডাকনা রাখার কাজে ব্যবহার করা হয়, বড় একটা কেউ বাস করে না ঘরটাতে।

'বলুন এই ঘরে থাকতে পারবেন?' গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন ম্যানেজার বল্লভ দাস।

'পারব,' তখনই জবাব দিলাম, 'কোনো অসুবিধে হবে না।'

তিনতলার ঘরটা অনেকদিন খোলা হয় নি। দরজা খুলতেই নাকে একটা ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ঝাপটা মারল। তবে সব কটা জানালা খুলে দিতেই দুর্গন্ধ কিছুটা কমে গেল। ঘরের এদিকে ওদিকে স্তূপাকার করা রয়েছে কিছু পুরানো বিছানা, কাগজ-পত্তর, গোটা তিনেক ছোট বড় স্টীল ট্রাঙ্ক। উত্তরের জানালার ধারে পাতা রয়েছে বহুকালের ধুলো পড়া লোহার সিঙ্গেল খাটিয়া।

দুপুরে খাওয়ার পর ফের দেখা হলো কাকাবাবুর সঙ্গে জিগ্যেস করলাম, 'নিশ্চয় অফিসের কাজে এসেছেন'? চোখ টিপে কাকাবাবু বললেন 'বুঝতেই পারছ এখানে ছদ্মনামে আমাদের পরিচয়। কোনোরকমের কৌতূহল প্রকাশ কোরো না। জান তো তদন্তের কাজ আমাদের খুব গোপনে করতে হয়।

'জানি বৈ কি'। সি, বি, আই অফিসারদের খুব গোপনে কাজ করতে হয়, চোর, ডাকাত, সাংঘাতিক খুনেদের পেছনে সাবধানে ঘুরে বেড়াতে হয়'। সুতরাং কাকা-বাবুরা কেন বোম্বেতে এসেছেন জানা সম্ভব নয়।

পরের দিন থেকেই বোম্বাইয়ের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখার জন্যে একা বেরিয়ে পড়লাম। টুরিস্ট গাইড দেখে প্রথম দিনেই গেলাম এলিফেন্টা কেভ্ দেখতে। গেটওয়ে

অফ ইণ্ডিয়ার পাশ থেকে সমুদ্রগামী স্টিমারে চেপে বললাম, সমুদ্রের সীমানায় এক সময় বোম্বাইয়ের স্থল সীমা হারিয়ে গেল। নীল দিগন্তে, ঘণ্টা খানেক পর স্টিমার এসে ভিড়ল সমুদ্রের মাঝখানে একটা বিশাল পাহাড়ের পাদদেশে। দীর্ঘ সোপানে পৌঁছলাম এলিফেণ্টা গুহায়। পাহাড়ের বিশাল গুহার অভ্যন্তরে সপ্তম শতাব্দীতে তৈরি হিন্দু দেব-দেবীদের প্রাচীন মূর্তি। পর্তুগীজ দস্যুরা ধ্বংস করেছে বিশাল বিশাল দেবদেবীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অমূল্য শিল্প-সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে কিছু গোয়ার জলদস্যুদের উন্মত্ত ধ্বংসলীলায়।

বিকালে হোটেলে পৌঁছে কাকাবাবুর কাছে শুনলাম এক আশ্চর্য ঘটনা। কাকাবাবুর সহকারি মিঃ খাণ্ডেলওয়াল দুপুরে B. A. R. C র কাছে মানমুদে কি একটা তদন্তের কাজে গেছিলেন একাই। দুপুরের ডাউন ট্রেনে ভীড় ছিল না। ফাঁকা ট্রেনের কামরায় এদিকে ওদিকে দু-চারজন যাত্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। মিঃ খাণ্ডেলওয়াল ঠিক বলতে পারছেন না কেমন করে যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন গাড়িতে। ঘুম ভাঙ্গে মানমুর্দ স্টেশনে। ট্রেন তখন একেবারে খালি। সকলে গাড়ি থেকে নেমে যেতেও তাঁকে নামতে না দেখে কয়েকজন কৌতুহল বশে ডাকাডাকি করেন। সাড়া না দিতে সন্দেহ হয়। তখন তাঁকে ধরাধরি করে গাড়ি থেকে নামায় রেলের লোকজন। হুঁশ ফিরতে দেখে তার হাতের দামী অটোমেটিক ঘড়ি, পকেটের কাগজ-পত্তর টাকাপয়সা সবই খোয়া গেছে। কিছুটা সুস্থ হতে তাকে ভি, টির গাড়িতে তুলে দেয়া হয়। হোটেলে ফিরে এসে টাকাপয়সার চাইতে কাগজপত্তর খোয়া যাওয়াতে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন মিঃ খাণ্ডেলওয়াল। সন্ধ্যায় কাকাবাবু ফিরে এসে সব শুনে বললেন, চোর টাকা পয়সা ঘড়ি নয়, গোপনীয় কাগজ-পত্তর হাতাবার জন্যেই ও'র পিছু নিয়েছিল। এরপর আমাদের আইডেনটিটি আর গোপন থাকবে না। এখন থেকে প্রকাশ্যেই কাজ করতে হবে।' ঘটনার পিছনে গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পেলেন কাকাবাবু।

কাকাবাবুকে চুপি চুপি জিগ্যেস করলাম, 'আপনারা কি কোনো মার্ডার কেসের তদন্তে এসেছেন'।

'না তার চাইতেও সিরিয়াস কেসের তদন্তে এসেছি'। কাকাবাবু জানালেন 'বলব, পরে বলব'।

সারাদিনের ঘোরাঘুরিতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাতের খাবার পর চারতলায় নিজের ঘরে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘরের ভেতর কিসের যেন শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হলো কে যেন চলা ফেরা করছে। মাথার কাছে সুইচ জেলে দিতেই কয়েকটা ধেড়ে ইঁদুর চটপট পালিয়ে গেল। ফের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু তখনই ঘুম এলো না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। হঠাৎ মনে হলো ঘরের ভেতর কেউ এসেছে শোনা যাচ্ছে তার ভারি পায়ের শব্দ। চোখ খুললেই তাকে দেখতে পাবো কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হলো না। কিছুক্ষণ পর পায়ের শব্দ আর শোনা গেল না। আলো জেলেও কারুকে দেখতে

পেলাম না। দারুন অস্বস্তিতে সারা রাত ভালো ঘুম হলো না। ঠিক করলাম এই হোটেল ছাড়তেই হবে।

ভোররাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কাকাবাবুর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গলো। জিগ্যেস করলেন, 'কি ব্যাপার এত বেলা পর্যন্ত ঘুমচ্ছো কেন, রাতে ভালো ঘুম হয়নি বুঝি ?' হেসে জবাব দিলাম, 'নতুন জায়গায় সহজে আমার ঘুম আসতে চায় না'। কাকাবাবু বললেন, 'বোম্বের বিখ্যাত প্রিন্স অফ ওয়েল্স মিউজিয়াম দেখনি নিশ্চয়, চলো আজ দেখে আসবো'।

ব্রেকফাস্টের পর কাকাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে মিঃ খাণ্ডেলওয়াল। বুঝলাম কাকাবাবু আর ওঁকে একলা ছাড়ছেন না।

১৯১৪ সালে তৈরি মিউজিয়ামের শিল্প, কলা, প্রত্নতত্ত্বও ন্যাচারাল হিস্ট্রি সেকসন ঘুরে দেখলাম। অজন্তা ইলোরা ও এলিফেণ্টার চিত্রশিল্পের কিছু নমুনা দেখার পর, বিভিন্ন শতাব্দীর ভাস্কর্য ও ধাতু মূর্তিও খুঁটিয়ে দেখলেন কাকাবাবু। মিউজিয়ামের প্রাচীন ভাস্কর্যের ঘরে খাণ্ডেলওয়ালা ও আমাকে বসিয়ে রেখে তিনি কিউরেটরের ঘরে ঢুকলেন।

ঠিক তখনই মনে পড়ে গেল বোম্বে মিউজিয়ামে অষ্টম শতাব্দীর বিষ্ণুর ধাতুমূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ার কথা দুতিন মাস আগে কাগজে খবর বেরিয়েছিল। কাকাবাবু ওই মূর্তির ব্যাপারে তদন্তে এসেছেন কি ? কিন্তু কাকাবাবু নিজে না প্রকাশ করলে জানার উপায় নেই।

মিউজিয়াম থেকে ফিরে দুপুরের খাওয়ার পর একটা বই খুলে পড়তে না পড়তেই ঘুমে চোখ জুড়ে এলো। রাতে ভালো ঘুম হয় নি, তোফা ঘুম হলো। যখন ঘুম ভাঙ্গলো সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। কলকাতার চাইতে এক ঘণ্টারও বেশী দেরিতে বোম্বাইতে সন্ধ্যা হয়। মেরিন ড্রাইভে গিয়ে বসতেই সমুদ্রের ভিজে হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে এলো। ফেরার পথে চৌপাট্টিতে হোটেলের খোঁজ নিলাম। হোটেলের ওই গুদাম ঘরে আর একটা দিনও নয়। পেয়েও গেলাম একটা মাঝামাঝি হোটেল।

ফিরে এসে কাকাবাবুকে খবরটা দিলাম। জানালাম কাল দুপুর বারোটার চেক আউটের পরই অন্য হোটেলে চলে যাচ্ছি।

'আমাদেরও দু' একদিনের মধ্যে বোম্বে ছাড়তে হবে,' অন্যমনস্ক ভাবে উচ্চারণ করলেন কাকাবাবু। জিগ্যেস করলাম 'যে কাজে বোম্বে এসেছিলেন তা মিটে গেছে কি ?' 'না' কাকাবাবু বললেন, 'দিল্লী থেকে খুব চাপ দিচ্ছে জরুরি কল এসেছে, দু'এক দিনের মধ্যে কাজ শেষ করে দিল্লী ফিরে যেতে হবে'।

রাতের খাওয়া সেরে ঠিক করলাম ঘুমবো না, জেগে থেকে দেখব কি ঘটে। মনের ভুল না অন্য কিছু। রাত বারোটা, একটা, দুটো বাজল, কোনো কিছুই ঘটল না। ঘর ছেড়ে ছাদে কিছুক্ষণ পায়চারি করলাম। নিশুতি রাত, মাথার ওপর তারাভরা

কালো আকাশ, 'কে, কাজল না' ? অন্ধকার ছাদের অপর-প্রান্ত থেকে কাকাবাবুর গলা শুনলাম। কাকাবাবু কাছে এগিয়ে এসে বললেন, 'কি এখনও ঘুমোও নি' ?
'না ঘুম আসছে না কাকাবাবু'। জবাব দিলাম।
'আমারও তাই'। আমার ঘরে কোনো চেয়ার নেই, খাটিয়ার পাশে রাখা একটা বড় স্টিলের বাক্সের উপর বসে বললেন, 'রাত্রে একটা আশ্চর্য স্বপ্নদেখার পর কিছুতেই আর ঘুম আসছে না। হেসে বললাম, 'পুলিশের লোকেরাও স্বপ্ন দেখে ?'
হা হা করে সজোরে হেসে উঠলেন কাকাবাবু। 'পুলিসের লোকেরা কি মানুষ নয়'।
'কি স্বপ্ন দেখলেন' ? জিগ্যেস করলাম।
'তার আগে তোমার শোনা দরকার বোম্বেতে কেন এসেছি'। গম্ভীর মুখে বললেন কাকাবাবু।

'এখন আর তোমাকে বলতে বাধা নেই।' নিচুগলায় বললেন কাকাবাবু, 'বোম্বে মিউজিয়াম থেকে চুরিযাওয়া অষ্টম শতাব্দীর একটা অষ্টধাতুর বিষ্ণু মূর্ত্তি উদ্ধার করার কাজে এখানে এসেছি'।
'কোনো সন্ধান পেলেন ?' জিগ্যেস করলাম।
'না সন্ধান পেতে বোধ হয় আর বেশি দেরি হবে না।' আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক গ্লাস জল খাওয়াও দেখি। আশ্চর্য স্বপ্নটা দেখার পর গলাটা শুকিয়ে এসেছে'। প্লাসটিকের জগ থেকে কাকাবাবুর দিকে কাচের গ্লাসে জল এগিয়ে দিলাম। গ্লাসের অর্ধেক জল খেয়ে কাকাবাবু বললেন, 'রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল, খালি ফর্সা গা বড় বড় আয়ত চোখ এক প্রৌঢ় আমার ঘরে এসে হাসছে।
অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম "কে আপনি" ?
'তুমি যে বিষ্ণু মূর্তির সঙ্গে খোঁজে এখানে এসেছো, আমি সেই মূর্তির শিল্পী'। জবাব দিল সেই আশ্চর্য লোকটি।
"অষ্টম শতাব্দীর তৈরি মূর্তির শিল্পী আপনি ?"
"হ্যাঁ আমি ভাস্করবর্মা, ঐ মূর্তি তৈরি করেছিলাম রাজার আদেশে।"
জিগ্যেস করলাম "আপনি কি চান ?"

'আমি'। স্মিত হাসল স্বপ্নে দেখা মূর্তি "আমি তোমার কাছে কিছু প্রত্যাশায় আসিনি, তোমাকে সন্ধান দিতে এসেছি।"
"কিসের সন্ধান ?"
"যার সন্ধানে তোমরা এখানে এসেছ। সেই হারিয়ে যাওয়া মূর্তির সন্ধান আমি জানি ?"
"কোথায় আছে সেই মূর্তি ?"
"মূর্তির উপর বসে আছ, জাননা তার সন্ধান," হা হা করে হেসে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ছায়ামূর্তি।

লাফিয়ে উঠলাম, 'বলেন কি ? আমার এই ঘরে মিউজিয়াম থেকে হারিয়ে যাওয়া বিষ্ণুমূর্তি লুকানো রয়েছে' ?
বাক্স থেকে দাঁড়িয়ে উঠে স্টিলের বাক্সের মজবুত তালাটা নেড়ে চেড়ে দেখলেন, 'না পুলিস ফোর্স ছাড়া এ তালা ভাঙ্গা সম্ভব নয়, দেখি সকালে বোম্বে পুলিসের হেল্প নিয়ে যদি কিছু করা যায়' ।
......সিগারেট ফেলে দিয়ে ছাদের ওদিকে অন্ধকারে হারিয়ে গেলেন কাকাবাবু । বলে গেলেন, 'তুমি এখন ঘুমাও সকালে যাহোক করা যাবে' ।
কিন্তু বাকি রাতে আর ঘুম এলো না । নিচে কাকাবাবুর ঘরে গিয়ে দেখি তিনি তখনও ঘুমোচ্ছেন ।
খাণ্ডেলওয়াল বললেন, 'মাথা ধরার জন্যে কাল সন্ধ্যার পর থেকেই ট্যাবলেট খেয়ে শুয়েছেন, রাত্রে আর ওঠেননি' ।
'রাত্রে উনি একবারও ওঠেন নি' ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম ।
'না কই আর উঠলেন, ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়েছিলেন' ।
খণ্ডেলওয়াল জিগ্যেস করলেন, 'কেন বলুন তো কোনো দরকার আছে ?'
'হ্যাঁ বিশেষ দরকার,' উনি ঘুম থেকে উঠলে আমাকে জানাবেন ।'
ঘণ্টাখানেক পর কাকাবাবু নিজেই আমার ঘরে এলেন, 'কি হে কাজল কি জরুরি দরকার আছে শুনলাম ।'
'কাকাবাবু,' ও'র দিকে একবার চোখ বুলিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কাল রাত্রে কি একবার ঘুম থেকে ওঠেন নি ?'
'না এককাপ চায়ের সঙ্গে ট্যাবলেট খেয়ে শুয়েছিলাম, রাত্রের মিলও নিইনি', কাকাবাবু আমার মুখের দিকে চেয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কেন বলতো ?'
'যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে একটা কথা জানাবেন ।'
কাকাবাবু নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন ।
'বোম্বে মিউজিয়াম থেকে চুরি যাওয়া কোনো জিনিসের খোয়া-যাওয়া ব্যাপারে তদন্তে এসেছেন কি ?'
'তুমি জানলে কি করে ?' কাকাবাবু অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ।
'জিনিসটা কি অষ্টম শতাব্দীর তৈরি অষ্ট ধাতুর বিষ্ণু মূর্তি ?'
'অবাক করলে তুমি' আরও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন । 'এসব কথা তুমি জানলে কি করে, কে বলল তোমাকে ।'
'আপনি ।'
'আমি ? কি বলছ তুমি । এসব কথাত কাউকে জানাইনি ।'
টেবিলে তখনও আধ গ্লাস জল চাপা দেওয়া রয়েছে । সেদিকে তাকিয়ে গতরাতের ঘটনার কথা বললাম কাকাবাবুকে ।
সবশুনে স্টিলের বড় বাক্সটার দিকে তাকালেন কাকাবাবু । বললেন, 'ঘুমোবেনা মনে

করেও তুমি হয়ত কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছ। তবু আমি একবার চান্স নেব। লোকাল পুলিস স্টেশনের সাহায্য নিয়ে বাক্সটা খুলতে হবে। আমি এখনই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।'

সকাল দশটা নাগাৎ বোম্বে পুলিসের দুটো ভ্যান এসে দাঁড়াল হোটেলে। পুলিস সমস্ত হোটেল বাড়ি ঘেরাও করে ফেলেছে।

সার্চওয়ারেন্ট দেখিয়ে হোটেল সার্চ করতে চাইলে ম্যানেজার অবাক হয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি না আপনারা কেন আমার হোটেল সার্চ করতে চাইছেন?'

'এখনই জানতে পারবেন' কাকাবাবু তিনতলার গুদাম ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্টিল বাক্সের চাবি চাইতে ম্যানেজার জানালেন, চাবি তাঁর কাছে নেই। একজন বোর্ডার বাক্সটা গচ্ছিত রেখে গেছেন।

শেষ পর্যন্ত তালা ভাঙতে হয়েছিল। সেই স্টিল বাক্সের মধ্যে সত্যিই পাওয়া গেছিল অষ্টম শতাব্দীর অষ্টধাতুর বিষ্ণুমূর্তি।

কাকাবাবু বললেন, 'আরও অন্যান্য শিল্প দ্রব্যের সঙ্গে এই বিষ্ণুমূর্তিও বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছিল।'

কাজ শেষ করে পুলিস চলে যেতে ভাবতে বসলাম, কাল নিশীথ রাতে কে এসেছিল আমার ঘরে?

কেন?

রবীন স্বর

কাক তাড়াতে 'হুশ্'
গরুকে বলো 'হ্যাট্'
তবে কেন শীতলপাটি
মাদুরকে বলো 'ম্যাট্'?
হাতে মাদুলি
আঙটি পাথর কবচ,
তবে কেন লেখাপড়ায়
করলে এত খরচ?
উড়িয়ে গ্রহ ভাঙ্ছো এটম
আলোকে করছো ধ্বনি,
তবে কেন বেলপাতাতে
পুজো করছো শনি?



খোঁড়া ইঁদুর আর কালো বেড়াল

রবিদাস সাহারায়

পাহাড়তলির গাছের নীচে বাঁধা আছে তিনটি ঘোড়া। তারা যাবে দূরে এক পাহাড়িয়া অঞ্চলের দিকে। ঘোড়ার যারা আরোহী তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

কয়েকদিন ধরে এই অঞ্চলের দুটি ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার লোকের ধারণা তারা ঐ দূরবর্তী অঞ্চলের বিরোধীদের কবলে পড়েছে। তাদের সন্ধান করার জন্যই এই আয়োজন।

বন্দুক পিঠে ঝুলিয়ে তৈরী হল তিনজন ঘোড়-সওয়ার। মুলীক, ডেঙ্গা ও টুংকাই। ঘোড়ার পিঠে চড়ে মাঠ পেরিয়ে তারা চলতে শুরু করল। বেশ কিছুদূর গেলেই একটা ছোট জঙ্গল। তারপরেই আবার মাঠ। ঐ মাঠে পড়লেই দূরে দেখা যায় বিপক্ষ মুঙ্গাদের অঞ্চল।

এই বিস্তীর্ণ এলাকার দুই প্রান্তে বাস করে দুটি পার্বত্য জাতি—টোরি ও মুঙ্গা। অনেককাল ধরে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই আছে। কিন্তু আগে তা ছিল না। মিলেমিশে এক সঙ্গে বাস করত এই পার্বত্য আদিবাসীরা। এখন দুটি দলই দু' দলের ঘোরতর শত্রু।

জঙ্গলটা পেরিয়ে মাঠে পড়তেই তারা এক জায়গায় থেমে পড়ল। মুলীক বলল, "ওটা কি? দ্যাখ তো ডেঙ্গা, ঐ ঝোপটার পাশে ওটা কি পড়ে আছে?"

ডেঙ্গা সেদিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে একটা মানুষ, তবে জ্যান্ত নয়।"

টুংকাই বলল, "আমরা যাদের খুঁজতে যাচ্ছি, তাদেরই কেউ নয় তো?"

তিনজনেই সেদিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

কাছে এসে তিনজনই অবাক। দেখল মুখ থুবড়ে একটি ছেলে পড়ে আছে। তবে তাদের অঞ্চলের কেউ নয়। মুঙ্গা জাতের কোন ছেলে।

মুলীক বলল, "যাই হোক না কেন, দেখা যাক কি ব্যাপার।"

ঘোড়া থেকে নামল তিনজন। মুলীকই আগে এগিয়ে গেল। ঘাসের উপড় পড়ে থাকা ছেলেটাকে উলটে পালটে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "আরে, ছেলেটা মরেনি বোধ হয়। এখনও বেঁচে আছে।"

"দেখি, দেখি।" বলে ডেঙ্গা ও টুংকাই ছেলেটার বুকে হাত দিয়ে দেখল। প্রাণ তখনও আছে। কিন্তু গায়ে অনেক ছোরার আঘাত।

মুলাকি বলল, "ওকে আমাদের ডেরায় নিয়ে চল। দেখি বাঁচানো যায় কিনা।"

ডেঙ্গা বলল, "কিন্তু ও যে শত্রুপক্ষের ছেলে।"

মুলাকি বলল, "তা হোক, ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারলে ওর কাছ থেকে আমাদের হারানো ছেলে দুটোর খবরও পাওয়া যেতে পারে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ।" টুংকাই বলল, "ওকে খুব সাবধানে ঘোড়ার উপর তুলে নিয়ে যেতে হবে।"

টুংকাইর ঘোড়াটা একটু বড়-সড় ছিল। সেই ঘোড়ার পিঠে খুব সাবধানে শুইয়ে রাখা হল ছেলেটিকে। টুংকাই চলল ঘোড়াটাকে ধরে পায়ে হেঁটে। অন্য দুজন ঘোড়ায় চড়ে খুব ধীরে ধীরে চলতে লাগল।

গাঁয়ে এসে পেঁছল তারা। তখনও ছেলেটার জ্ঞান ফেরে নি। বুড়ো বৈদ্যকে এনে চিকিৎসা করানো হল। সারাদিন পর সন্ধ্যায় জ্ঞান ফিরল ছেলেটির। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে লাগল আরও একটা দিন। ছেলেটি দেখতে সুশ্রী, কিন্তু একটা পা একটু খোঁড়া।

সুস্থ হবার পর ছেলেটি তার কাহিনী বলতে লাগল। তার গল্প শোনার জন্য গাঁয়ের অনেকেই ঘিরে বসল তাকে। বিশেষ করে টোরিদের সর্দার ওয়াম্বা। তার কৌতূহল যেন সকলের চেয়ে বেশি।

ছেলেটি বলল, "মুঙ্গা অঞ্চলের সর্দারের ছেলে আমি। মুঙ্গাদের নিয়ম আছে সর্দারের বংশে প্রথম ছেলে যদি কোন খুঁত নিয়ে জন্মায় তা হলে বাবা-মা তাকে ত্যাগ করে। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলে তাকে। পরবর্তী ছেলে পিতার মৃত্যুর পর হয় সর্দার। এই নিয়ম করেছে আমাদের ওখানকার গোঁড়া বৃদ্ধ লোকেরা। আমার ভাগ্যেও তাই ঘটত। আমার চেহারা সুন্দর বলে আর আমি প্রথম সন্তান বলে আমার উপর বাবার একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। বাবা শুধু গোঁড়া বৃদ্ধলোকদের উদ্যত থাবা থেকেই আমাকে আগলে রাখেন নি, ছোট ছেলের হাত থেকেও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।"

"তাই নাকি ?" বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল সর্দার ওয়াম্বা।

ছেলেটি বলল, "হ্যাঁ, আমার ছোট ভাই দেখতে কদাকার, অতি হিংস্র তার স্বভাব। সে আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। মুঙ্গাদের সাহয্যে নিরে সে চেয়েছিল আমাকে সরিয়ে ফেলে নিজে সর্দার হতে।

বাবা জীবিত থাকা অবধি সেটা সম্ভব হতে পারেনি। তা ছাড়া গাঁয়ের সবাই ছোট ভাইয়ের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসত। কিন্তু বাবা যেই মারা গেলেন অমনি ছোট ভাই তার ফন্দি কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করল। দু'দিন আগে সে তার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে এল। একটু দূরে এনেই

সবাই মিলে ভয়ানক ভাবে মারল আমাকে। ভেবেছিল আমি মরেই গেছি। তারপর আমাকে ফেলে দিয়ে গেল টোরি অঞ্চলের সীমানার কাছে। যাবার সময় কয়েক ঘা ছোরাও বসিয়ে দিয়ে গেল যাতে আমি আর বেঁচে না উঠি।"

"ইস্।" দুঃখ প্রকাশ করল অনেকেই।

সর্দার ওয়াম্বা জিজ্ঞেস করল, "আমাদের গাঁয়ের সীমানায় তোমাকে ফেলে দিয়ে গেল কেন?"

ছেলেটি বলল, "ওরা ভেবেছিল এখানে আমাকে মরা অবস্থায় দেখলে লোকে সন্দেহ করবে টোরিরাই আমাকে মেরেছে। তা ছাড়া আরও একটি মতলব ওদের ছিল।"

"কি মতলব?"

"ওরা ভেবেছিল এই সুযোগে লোকদের ক্ষেপিয়ে এই অঞ্চলটাও ওরা দখল করবে। আপনাদের অঞ্চলের উপর মুঙ্গাদের আক্রোশ একেকদিন ধরে। বন্দুক ও পিস্তল যোগাড় করার সুযোগ ওদের নেই, অথচ আপনাদের আছে। ওরা সেই সব অন্ধিসন্ধি জেনে নিতে চায়। এই অঞ্চলের দুটি ছেলেকেও ওরা আটক করে রেখেছে।"

"তাই নাকি? ওরা তাহলে মুঙ্গা অঞ্চলেই আছে? ওদের মেরে ফেলেনি তো?"

"না, এখন মারবে না। সব খবর জেনে নিয়ে হয়তো মারবে।"

"যাক, তোমাকে পেয়ে আমাদের খুব উপকার হল। তোমার নাম কি? কি বলে ডাকব তোমাকে?"

ছেলেটি বলল, "ছোট বেলাতেই আমাকে মেরে ফেলবে বলে আমার কোন নাম রাখা হয় নি। রাখলেও সে নাম জানি না। কেউ আমাকে সে নামে ডাকে না। আমাকে ডাকে খোঁড়া ইঁদুর বলে।"

নাম শুনে সবাই একটু হাসল। মোড়ল বলল, "দেখ, তুমি আমাদের এখানেই থেকে যাও।"

ছেলেটি বলল, "কিন্তু আমি যে আমার মায়ের কাছে ফিরে যেতে চাই।"

মুলাকি বলল, "সে কি, তুমি ফিরে গেলে তোমার ভাই ও তার দলের লোকেরা যে তোমাকে মেরে ফেলবে।"

কথা শুনে একটা দৃপ্ত হাসি ফুটে উঠল খোঁড়া ইঁদুরের মুখে। বলল, "আমি কি আশা করতে পারি না যে আপনার প্রাণদাতা টোরিরা আমাকে বন্দুক দিয়ে সাহায্য করবে এবং আমাকে মুঙ্গাদের সর্দারের আসনে বসিয়ে দেবে?"

ডেঙ্গা যেন একটু রেগে গেল তার কথা শুনে। বলল, "তোমাদের ঘরোয়া ব্যাপারের আমরা নাক গলাতে যাব না। এর পরেও যদি তুমি চলে যেতে চাও তা হলে আমাদের বলবার কিছু নেই।"

খোঁড়া ইঁদুর বলল, "তাহলে আমার প্রাণটা কেন বাঁচালে জানতে পারি কি?"

"নিশ্চয়। আমরা ভেবেছিলাম তোমার সাহায্যে ছেলে দুটিকে আমরা খুঁজে পাব। তাছাড়া মুঙ্গাদের সঙ্গে আসন্ন লড়াইয়ে তুমি আমাদের সাহায্য করবে।"

কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল খোঁড়া ইঁদুর। তারপর বলল, "আমিও বুঝতে পারছিলাম তোমাদের সঙ্গে আমাদের সম্প্রদায়ের লড়াই আসন্ন। কারণ তোমাদের বাড় বাড়ন্ত ওরা আর সহ্য করতে না। বেশ, আমি তোমাদের সঙ্গে থাকতে রাজী আছি যদি তোমরা আমাকে সাহায্য কর।"

টোরি সর্দার বলল, "বেশ তোমাকে সাহায্য করব আমরা।"

খোঁড়া ইঁদুর সেদিন থেকে টোরি অঞ্চলে রয়ে গেল।

ছেলে মহলে বেশ ভাল ভাবে মিশে গেল খোঁড়া ইঁদুর। ছেলেরাও ওকে যেন লুফে নিল। তাছাড়া খোঁড়া ইঁদুরের বয়স তো খুব বেশি হয় নি। খুঁড়িয়ে চলে বলে তাকে আরও ছোট দেখায়। এমন ভাবে খোঁড়া ইঁদুর এখানকার ছেলেদের সঙ্গে মিশে গেল যে তারা ভুলেই গেল, মুঙ্গাদের সঙ্গে তাদের বহুকালের শত্রু সম্পর্ক। ছেলেরা কুস্তি লড়া, শিকারে যাওয়া—সব কাজেই খোঁড়া ইঁদুরকে সঙ্গে নিত।

মাঝে মাঝে প্রত্যেকেই যার যার বাবার কাছ থেকে বন্দুক নিয়ে তা ছুঁড়তে শিখত। কিছুদিনের মধ্যেই সকলে বন্দুক চালনায় বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠল। খোঁড়া ইঁদুরও শিখল ভাল বন্দুক চালাতে।

খোঁড়া ইঁদুর মাঝে মাঝে তার সঙ্গীদের কাছে দুঃখ করত তাকে অন্যায় ভাবে সর্দারির পদ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে। সে বলত তার ছোট ভাই তার চেয়েও দেখতে বড় সড়। সে তার কয়েকজন দুষ্টু বন্ধুকে নিয়ে একটা দল গড়েছে। সে নিজের নাম নিয়েছে 'কালো বেড়াল'। বেড়াল হয়ে সে খোঁড়া ইঁদুরকে মেরে ফেলবে, এ জন্যই সে এই নাম নিয়েছে।

ছেলের দল খোঁড়া ইঁদুরের মনের ব্যাথাটা গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করত। তাদের চোখমুখ লাল হয়ে উঠত। ন্যায় বিচারের জন্য উত্তেজিত হয়ে উঠত তারা। ছেলেদের দলপতি মুরা একদিন বাঁ হাতের তালুতে একটা ঘুসি মেরে বলল, "খোঁড়া ইঁদুর, তুমি আমাদের দেখিয়ে দিতে পার, তোমার ভাই কাল বেড়াল আর তোমাদের জাত ভাইদের আস্তানা ?"

খোঁড়া ইঁদুর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল,"দেখিয়ে আর কি হবে ভাইরা ? লড়াই করতে তো আর পারব না ?

"আলবৎ পারবে।" গর্জে উঠল মুংরা—"আমরা লড়াই করব তোমার হয়ে।" অন্য ছেলেরাও চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তোমার হয়ে লড়ব খোঁড়া ইঁদুর। আমরা সবাই তোমার জন্য বুকের রক্ত দেব।"

খোঁড়া ইঁদুর ভয়ানক উৎসাহিত হল তাদের কথায়। জিজ্ঞেস করল, "আমার হয়ে লড়ে তোমাদের লাভ ?"

মুংরা জবাব দিল, "আমাদের দুটো ছেলেকে ওরা আটকে রেখেছে। তাদের উদ্ধার করব। তোমাকে বসাব সর্দারের পদে।"

খোঁড়া ইঁদুর বলল, "হ্যাঁ ভাই, লড়াই আমাদের করতেই হবে। হাত তুলে জানাও, কে কে বাড়ি থেকে লুকিয়ে বন্দুক আনতে পারবে।"

প্রথমে ষোলটা হাতই উপরে উঠল। কিন্তু একটু পরেই ধীরে ধীরে নেমে এল পনেরোটাই উপরে রইল শুধু দলপতি মুংরার হাত। বাড়ি থেকে এমন ভাবে গোপনে বন্দুক সরিয়ে আনা যে সহজ নয়, একথা চিন্তা করেই সবাই পিছিয়ে এল।

খোঁড়া ইঁদুর এবার সবার দিকে একবার তাকিয়ে বলল, "ছিঃ ছিঃ, এমন করলে কি ভাবে চলবে বন্ধুরা? বেশ, বন্দুক না পারো পিস্তল তো পারবে?"

এবার সবাই বলল, "হ্যাঁ খোঁড়া ইঁদুর তা পারব। পিস্তল তো বাবারা ব্যবহার করেন না। ওগুলো সরাতে পারব।"

মুংরা বলল, "তা হলে তাই এনো। আমার কাছেই শুধু বন্দুক থাকবে। তবে চেষ্টা করো সবাই যাতে বন্দুক আনতে পারো। মুঙ্গাদের তীর ধনুক আমাদের পিস্তলের চেয়েও মারাত্মক, সেই বুঝে আমাদের চড়তে হবে।"

ছেলেরা সবাই মাথা নেড়ে সায় দিল। ছেলেদের সহকারী দলপতি মুন্না বলল, "ভাই খোঁড়া ইঁদুর, সব তো হল, এবার লড়াইয়ে যাবার রাস্তাটা তুমি বাতলাও।"

খোঁড়া ইঁদুর বলল, "সে ভাবতে হবে না, আমি আগেই ভেবে রেখেছি। আমাদের জাতের লোকেরা পরবের মাসে একদিন কেউটে দেবতার পুজা দিয়ে গভীর রাতে দল বেঁধে শিকারে যায় বা কোন অঞ্চল লুটপাট করতে বেরোয়। দরকার হলে খুন-খারাপি করতেও তারা পেছপা হয় না। আকাশের চাঁদ দেখে বুঝতে পারছি কালকেই সেই দিন। কাল গভীর রাতে হানা দিতে হয়তো ওরা এদিকে আসবে। আমরা আগে থেকেই যদি ওদের পথের উপর ফাঁদ পেতে থাকি তাহলে ভাল করেই ওদের লড়াইয়ের সাধ মিটিয়ে দেব।"

মুন্না বলল, "তুমি এখানকার বড়দের কাছে এসব কথা বলনি কেন খোঁড়া ইঁদুর—যে, তোমাদের লোকেরা কাল আসতে পারে?"

খোঁড়া ইদুর বলল, "বড়দের কাছে বলে কি শেষে বোকা বনে যাব? কাল ওরা এদিকেও আসতে পারে বা অন্যদিকেও যেতে পারে। তাছাড়া বড়রা তো নিজেরাই মুঙ্গাদের আক্রমণ রুখবার জন্য তৈরী হচ্ছে।"

"কি করে বুঝলে যে কাল আমাদের উপর অক্রমণ হতে পারে?"

"সেটা অবশ্য আমার অনুমান। কারণ অনেকদিন ধরেই তো ওরা নানা রকম ছল-ছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাকে এমনভাবে মেরে তোমাদের এলাকায় ফেলে দেওয়ার ভেতরও তো ঐ মতলবই ছিল। যদি সত্যি মরে যেতাম তাহলে তো তোমরাও এসব রহস্য জানতে পারতে না।"

মুন্না বলল, "সত্যি। আচ্ছা, যদি কোন অঘটন কাল ঘটে যায় তার জন্য তো আমাদের তৈরী থাকা উচিত?"

খোঁড়া ইঁদুর বলল, "হ্যাঁ নিশ্চয়। কাল রাতে চাঁদ উঠবার আগেই আমরা এখান থেকে বেরুব। একটু কৌশল খাটালে অসাধ্য সাধন করা মোটেই কঠিন হবে না।"

সবাই তখন সাহস পেয়ে বলল, "তাই হবে খোঁড়া ইঁদুর। এখনই বুদ্ধিপরামর্শ সব ঠিক করে নাও।"

গোপন পরামর্শ তখনই হয়ে গেল।

দুটি পাহাড়িয়া অঞ্চলের মাঝখানে আছে ঝোপ-জঙ্গল আর কয়েকটা বড় বড় গাছ যার আড়ালে সহজেই অনেকগুলো মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। সেই জায়গাটাই বেছে নেওয়া হল। কারণ সেখানে ঘাপটে মেরে বসে শত্রু ঘায়েল করতে খুবই সুবিধা। ঠিক হল, সেখানে গিয়েই আগে তারা লুকিয়ে থাকবে।

পরের দিনের ঘটনা। অন্ধকার রাত। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছুক্ষণ আগে ওঠা মলিন চাঁদ। টোরি অঞ্চলের লোকেরা এক জায়গায় বসে নানারকম গল্প-গুজব করছে। দূর থেকে বাতাসে ভেসে আসছে নাকাড়া-টিকাড়ার ক্ষীয়মাণ শব্দ। বোধহয় মুঙ্গাদের অঞ্চল থেকেই আসছে। অনেককাল আগে এই দিনটিতে তারা মুঙ্গাদের সঙ্গে মিলে মিশে উৎসব করত, অভিযানে বের হত। দূরে হলেও তারা ছিল কাছের। দুটি অঞ্চল ভাগ হবার পর উঠে গেছে সেই উৎসবের পাট। তবে মুঙ্গারা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

পুরনো স্মৃতিকথার আলোচনায় মশগুল হয়ে আছে সবাই। নাকাড়া-টিকাড়ার ভেসে আসা আওয়াজ তখন আরও স্তিমিত হয়ে আসছে। এমন সময় সর্দার ওয়াম্বা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, সর্বনাশ হয়েছে! আমাদের গাঁয়ের অনেক ছেলেদের পাওয়া যাচ্ছে না।"

"বলছো কি?"

"হ্যাঁ", তাদের সঙ্গে খোঁড়া ইঁদুরও নেই।"

সেই মুহূর্তে বুড়ো বৈদ্য এসে বলল, "সর্দার, অনেক বাড়ির বন্দুকও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। কার্তুজও উধাও।"

মুলুকি প্রথমটা খুব থতমত খেয়ে গেল। তারপর মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, "হায়, কি ভুলটাই না করেছিলাম ঐ খোঁড়া ইঁদুরটাকে বাঁচিয়ে।"

ডেঙ্গা বলল, "আমি জানতাম ওদের জাতটা আগের মতই শয়তান রয়েছে, ওরা হিংসা ভোলেনি। আমাদের কি সর্বনাশ করে দিয়ে গেল।"

এমন সময় কয়েকজন গ্রামবাসী ছুটে এসে বলল, "সর্দার, মুঙ্গারা দল বেঁধে আমাদের অঞ্চল আক্রমণ করতে আসছে।"

সর্দার কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "তাই নাকি? ওরা দলে কতজন আছে মনে হয়?"

"অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না কিছু, তবে লোক খুব কম হবে না। ওরা প্রায় এসে পড়েছে।"

মুলকি ও ডেঙ্গা হতভম্ব হয়ে গেল। এই অঞ্চলে তারা বন্ধুকধারী টোরি আছে

সবশুদ্ধ ষোলজন। ষোলটা বন্দুকই উধাও। শুধু কয়েকটা পিস্তল রয়েছে তা দিয়ে কি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা যাবে ?

টুংকাই দাঁত কড়মড় করতে করতে বলল, "এমন ভাবে জাঁতিকলে ফেলে আমাদের ইঁদুরের মত মারাই খোঁড়া ইঁদুরের উদ্দেশ্য ছিল। বড় ভুল হয়েছিল ওকে এখানে আশ্রয় দিয়ে।"

সর্দার ওয়াম্বা বলল, "যতক্ষণ সম্ভব হয় ততক্ষণই লড়াই চালিয়ে যাব। কেউ পিস্তলের একটা গুলিও নষ্ট করো না। মনে রেখো, এক একটা গুলি এক একটা মুঙ্গাকে যেন খতম করে। অন্যান্য সবাইকে তীর ধনুক নিয়ে তৈরি হতে বলো।"

মুঙ্গারা বেশ এগিয়ে এসেছে এতক্ষণে। মেঘে ঢাকা ক্ষীণ চাঁদের আলোয় গাছের ফাঁক দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তাদের। ওরা ঘোড়ায় চড়ে আসছে। সর্দার সেদিকে তাকিয়ে বলল, "ওরা আগে আক্রমণ করুক। আমরা সবাই আড়ালে থাকব। চল যাই, সবাই জায়গা বেছে নিই।"

সর্দার ওয়াম্বার সঙ্গে সবাই তৈরী হয়ে জায়গা বেছে নিতে বেরিয়ে গেল। গাছের ফাঁক দিয়ে মুঙ্গাদের দলটাকে এবার স্পষ্ট চোখে পড়ছে। এগিয়ে আসছে তারা তীর ধনুক বাগিয়ে। এদিকে সর্দারের সঙ্গে টোরিরাও প্রস্তুত। চূড়ান্ত লড়াই হবে আজ। শরীরে যতক্ষণ রক্ত আছে তারা লড়াই করবে।

হঠাৎ একি হল! মাঝপথেই দুমদাম শব্দ করে গর্জে উঠল কয়েকটা বন্দুক। সামনের দিকের দুজন মুঙ্গা সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে উলটে পড়ে গেল। অন্য সব মুঙ্গারা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই দলপতির কঠোর আদেশে তীর ধনুক বাগিয়ে ধরল।

এদিকে অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছে সর্দার ওয়াম্বা, ডেঙ্গা ও টুংকাই। ব্যাপারটা কি বোঝার আগেই তুমুল লড়াই বেঁধে গেল ওধারে। মুঙ্গারা যেন খুব বেকায়দায় পড়ে গেছে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে কারা যেন তাদের দিকে গুলি চালাচ্ছে।

আরও এগিয়ে গেল টোরিরা। আরও কাছাকাছি জায়গায় গাছের আড়ালে আড়ালে আশ্রয় নিল। সামনের ঝোপ থেকে শোনা গেল কয়েকজনের কথাবার্তা। সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে সর্দার বলল, "আরে এ যে খোঁড়া ইঁদুরের গলা।"

মুলাকি বলল, "আর আমার ছেলে মুংরার গলাও যে শোনা যাচ্ছে।"

ডেঙ্গা বলে উঠল, "আমি হলফ করে বলতে পারি, আমাদের মুন্নাও আছে ঐ দলে। তার গলাও শুনতে পাচ্ছি।"

চাঁদের আলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তখন। আকাশের মেঘ সরে গেছে। সেই আলোকে দেখা গেল মুঙ্গারা সবাই অস্ত্র ফেলে হাত তুলে দাঁড়িয়েছে। যারা মরে গেছে বা আহত হয়েছে তারা পড়ে আছে মাটির উপর।

মুঙ্গারা পরাজয় স্বীকার করতেই হঠাৎ দেখা গেল একে একে গাছের আড়াল থেকে

বেরিয়ে আসছে ছেলের দল। সবার আগে খোঁড়া ইঁদুর। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও তার গতি যেন আজ বিজয়ী রাজার মত।

খোঁড়া ইঁদুরকে দেখেই ভীষণ ভাবে চমকে উঠল মুঙ্গারা। বলে উঠল, "একি, তুমি বেঁচে উঠলে কিভাবে?"

কালো বেড়াল তখন ঘোড়া থেকে নেমে নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। খোঁড়া ইঁদুরকে দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। "একি, তুমি বেঁচে আছ?" এই কথাগুলো বেরিয়ে এল তাঁর কাঁপা গলা থেকে।

খোঁড়া ইঁদুর বলল, "এখন আমি তোমাকে মেরে ফেলতে পারি, যেমন করে তুমি আমাকে মারতে চেয়েছিলে। অবশ্য তা আমি করব না। এই নাও বন্দুক, লড়াই করো আমার সঙ্গে। যে বাঁচবে সে-ই হবে মুঙ্গাদের সর্দার।"

পেছন থেকে মুঙ্গারাও চিৎকার করে সেই কথার সমর্থন জানাল। খোঁড়া ইঁদুর একটা বন্দুক ছুঁড়ে দিল কালো বিড়ালের দিকে। কিন্তু কালো বেড়াল বন্দুক ধরতেই পারল না। খোঁড়া ইঁদুরের একটা গুলি এসে তাকে ফেলে দিল মাটির উপর।

বেড়ালই ইঁদুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, এটাই রীতি। কিন্তু আজ খোঁড়া ইঁদুরই ঝাঁপিয়ে পড়ল কালো বেড়ালের উপর। তখন শয়তান কালো বেড়ালের দেহে আর প্রাণ নেই। মুঙ্গারাও খোঁড়া ইঁদুরের জয়ধ্বনি করে উঠল।

ততক্ষণে টোরি সর্দার দলবল নিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়েছে। সবাই আনন্দে ঘিরে ধরল খোঁড়া ইঁদুরকে।

খোঁড়া ইঁদুর ছোট বড় সব টোরি বন্ধুদের আলিঙ্গন করে বলল, "আমার ভালবাসা নাও বন্ধুরা। এবার আমি ফিরে যাব নিজের গাঁয়ে। কালই তোমাদের ছেলে দুটিকে এখানে পাঠিয়ে দেব। এরপর কোন মুঙ্গা আর টোরিদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না। আবার দুটি দলের মিলন হবে। বিদায় বন্ধুরা। আবার আমাদের দেখা হবে।"

নিজের হাতের বন্দুকটা টোরিদের দলপতির হাতে ফেরত দিয়ে মুঙ্গাদের নতুন দলপতি খোঁড়া ইঁদুর ঘোড়ায় চেপে বসল। তারপর দলবল নিয়ে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল গাছগাছালির আড়ালে।

পুবের আকাশে তখন রঙিন আলো ফুটে উঠেছে।

ছেলেবেলা

সুখেন্দু মজুমদার

দুপুরবেলা স্কুল পালিয়ে ঘোষবাবুদের ঝিলে,
যেই না সবে ছিপ ফেলেছি অমনি তাড়া দিলে।
ছিপটা ফেলেই দে চম্পট চোখ যেদিকে চায় ;
মনে মনে ভাবছি শুধু ধরতে যদি পায়,
কান মলা তো দেবে আবার বাবার কাছে নালিশ,
তখন কিন্তু আমার হয়ে করবে না কেউ সালিস।
কেউ দেখলে বলবেটা কি ভাববে শেষে কে কি ;
ছুটতে ছুটতে কোথায় এলাম দমটা ফেলে দেখি,
দাঁড়িয়ে আছি চৌধুরীদের আমবাগানের মাঝে,
আসতে কেন হচ্ছে দেরি খুঁজছে বোধ হয় মা যে।
বাড়ি ফেরার পথ চিনি না বলব এখন কাকে,
ছেলেবেলার সেদিন আজও হাতছানিতে ডাকে।

বাজনা বাজে

সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন এল শরৎ,
কাদায় জলে বন্দী যখন
সবাই জড় ভরত।
উড়িয়ে নীলের ওড়না,
চুমকি বসা আকাশ হাসে
লাগছে দেখে ঘোর না ?

আকাশটাকে ধর না,
কেমন ধারা ঝরছে দেখো
সোনার আলোর ঝরণা।
এবার তোরা সাজ না,
ঐ শোনোরে বাজছে কেমন
উৎসবেরই বাজনা ॥



পুলিনবাবুর রাগ

অলোক চট্টোপাধ্যায়

পুলিন বাবুর রাগ বড় সাংঘাতিক। রাগলে তার হাঁটু কাঁপে, চোয়াল শক্ত হয়ে আসে, হাতের মুঠো একবার খোলে একবার বন্ধ হয়, কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম জমে। এছাড়াও তিনি নিজে মাথার ভেতরে একটা ঝিম্ ঝিম্ শব্দ শুনতে পান। ডাক্তার সান্যাল বলেছেন সেটা নাকি হঠাৎ রক্ত-চাপ বেড়ে যাবার দরুণ।

আর সেই কারণেই ইদানীং তার রেগে যাওয়া বারণ। বয়স বাহান্ন পেরিয়ে তিপান্ন চলছে। খাওয়া দাওয়ার কিঞ্চিৎ বিলাসিতা ছিল বয়স কালে। এখন কমাতে হয়েছে, বিশেষ করে আলু, মিষ্টি, আর চর্বি জাতীয় খাবার। দুবেলা ভাতের বদলে একবেলা ভাত একবেলা রুটি। পঞ্চাশ পেরোলেই নাকি এসব সাবধানতা দরকার।

পাড়ার প্রবীণ ডাক্তার দিবাকর সান্যাল একবার তাঁর শরীর স্বাস্থ্য খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে বলেছিলেন,—হার্ট ভালোই। ব্লাড প্রেসার একটু বেশীর দিকে হলেও ভয়ের কিছু নেই। তবে হঠাৎ হঠাৎ ওরকম ভয়ানক ভাবে রেগে যাবেন না। কখন কি হয়ে যায়—

কয়েকদিন আগেই পাড়ার ছেলেরা রাস্তায় ক্রিকেট খেলছিল। পুলিন বাবু পাশ দিয়ে যাবার সময়ে একটা আচম্‌কা অন্‌ড্রাইভ ধড়াম করে এসে তার পেটে লাগে। তারপরে তিনি যেরকম চ্যাঁচামেচি করে রাগ প্রকাশ করছিলেন সেটা মাত্র একশোগজ দূরে ডাক্তার বাবুর চেম্বার থেকে না শোনা যাবার কথা নয়।

ডাক্তার বাবুর কথায় পুলিনবাবু একটু চটে-মটেই বললেন,—কখন কি হয়ে যায় মানে? এই বলছেন হার্ট ভালো, প্রেসারও ঠিকঠাক, তবে?

ডাক্তার সান্যাল অমায়িক হাসলেন।—ভালো হার্ট খারাপ হতে কতক্ষণ? আর আপনি যখন রেগে যান তখন আপনার ব্লাড প্রেসার আমার এই যন্তর দিয়ে মাপা যাবে কি না কে জানে। তাই বলছিলাম এই বয়সে হঠাৎ হঠাৎ ও রকম রেগে যাবেন না। মনকে সামলে রাখুন। মনে রাখবেন ক্রোধ হল গিয়ে ষড় রিপুর অন্যতম।

শুধু উপদেশ পাছে কাজ না হয় তাই তিনি উদাহরণও দিয়েছেন। তার নিজের দেখা তিনজন লোকের ঘটনা তিন জনেরই হার্ট সুস্থ ছিল। প্রেসারও আপাতঃদৃষ্টিতে স্বাভাবিক। কিন্তু তিনজনেরই এক দোষ—অল্পেই রেগে ওঠেন। প্রথম জন যদু বাবুর বাজারে ইলিশ মাছের দাম নিয়ে ঝগড়া করতে গিয়ে মারা যান। দ্বিতীয় জন কেরোসিন তেলের লাইনে পাড়ার একপাল ছেলে লাইন ভেঙে তেল নেবার চেষ্টায় ছিল। তাদের ঠেকাতে গিয়ে তার ব্লাড প্রেসার হঠাৎ বিপদ সীমার ওপরে উঠে যায়। তৃতীয় জন স্কুল-মাস্টার। ভূগোলের ক্লাশে পড়া জিজ্ঞাসা করার সময়ে একটি ছেলে সুইজারল্যাণ্ডের রাজধানীর নাম আর্জেন্টিনা বলায় তাকে তেড়ে মারতে গিয়েছিলেন। কিন্তু একটির বেশী দুটি চড় মারবার আগেই সব শেষ।

কাজেই পুলিনবাবু সাবধান হতে চান। কিন্তু মুস্কিল এই যে রাগ থামানোর কোনো ওষুধ নেই। অন্ততঃ ডাক্তার সান্যালের জ্ঞানতঃ নয়। এদিকে দুনিয়া শুদ্ধ লোক যেন পাকে প্রকারে পুলিনবাবুকে রাগিয়ে দেবার জন্যে ওঁৎপেতে আছে।

বাজারে গেলে জিনিষপত্রের দাম শুনে তার হাড় জ্বলে যায়। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হাত কাঁপে। বাসে ট্রামে উঠলেই লোকেরা তাঁর পা মাড়িয়ে দেয়। ফুটবল খেলা দেখতে গেলে মোহনবাগান ড্র করে। রাস্তাঘাটে ব্যস্ত-সমস্ত লোকেদের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তার ওপরে ইদানীং তার প্রায় টাকপড়া মাথার অবশিষ্ট চুলগুলো পেকে রুপোলী হয়ে যাওয়ায় ছেলে-ছোকরারা অযাচিত ভাবে "দাদু" বলে ডাকে। এমনকি অফিসেও কেউ কেউ আড়ালে বলতে ছাড়ে না। এ সমস্তই, পুলিনবাবু বেশ বুঝতে পারেন, ফন্দি-ফিকির করে তাঁকে রাগিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র।

এই যেমন এখন। দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। আর পুলিনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন হাজরার মোড়ে। অফিসে নির্ঘাৎ লেট। একটার পর একটা বাস আসছে গেট ছাপানো ভীড় নিয়ে। একটাতে উঠতে গেলেন—একজন মাঝবয়সী লোক তার রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে গেল। নিজেও উঠতে পারলো না, পুলিন বাবুকেও উঠতে দিলো না। পরের একটা বাসে উঠে পড়েছিলেন প্রায়। পাদানীতে ডান পায়ের পাতার এক তৃতীয়াংশ রাখতে পেরেছিলেন, হাতলটাতেও ধরার জায়গা হয়ে গিয়েছিল। বাস ছাড়ার মুহূর্তে একটি ছেলে তার কোমর ধরে ঝুলে পড়লো। নেমে পড়তে এক সেকেণ্ড দেরী করলে একটা দুর্ঘটনা অবধারিত ছিল। ছেলেটা বিরক্ত মুখে বলল,—একটু ভাল করে ধরেও থাকতে পারেন না? বাসে চড়া কেন? পুলিনবাবুর ব্রহ্মতালু ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। কিন্তু যেহেতু রাগ করা বারন তাই তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে গুনতে লাগলেন—একশো নিরানব্বই-আটানব্বই-সাতানব্বই……

এই কায়দাটা তাঁর নিজস্ব। অফিসের নারাণ-দা একদিন বলেছিলেন রাগের প্রথম ঝাঁঝটা টের পেলেই ধীরে ধীরে এক থেকে একশো অবধি গুনতে। কিন্তু ক'দিন চেষ্টা করে পুলিন বাবু হাল ছেড়ে দিলেন। একশোর জায়গায় পাঁচশো পর্যন্ত গুনলেও রাগ কমে না, বরং বেড়ে যায়। তারপর একদিন তিনি নিজেই আবিষ্কার করে

ফেললেন যে উল্টোদিক থেকে গুনলে কিছুটা ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ সংখ্যা-গুলো সোজা দিক থেকে আমাদের যতটা মুখস্থ উল্টোদিক থেকে ততটা নয়। কাজেই প্রত্যেকটা সংখ্যাই বেশ ভেবে-চিন্তে মনে করতে হয়। আর ঐ ভাবনার ভীড়ে রাগের খেই কিছুটা হারিয়ে যায়।

পরের বাসটার থেকে জন কয়েক লোক নামায় পুলিনবাবু ওঠবার জায়গা পেলেন বটে তবে তারই মধ্যে একজন তার জামা খামচে ধরল। জনাকয়েক কনুইয়ের গুঁতো মারল। একজনের ছাতার খোঁচায় তার চশমাটা পড়োপড়ো হয়েও আটকে রইল। এই সব বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে উঠতে উঠতে তার মনে হল শান্তভাবে নিয়ম মেনে লাইন দিয়ে ওঠানামা করলে এত ঝামেলা পোয়াতে হয় না। এই কথা ভেবেই খুব রাগ হয়ে যাচ্ছিল—অনেক কষ্টে সামলালেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার জো কোথায়? অনেক চেষ্টায় বাসের মাঝামাঝি অপেক্ষাকৃত ফাঁকা একটু জায়গায় এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই অল্প বয়সী ঝোলা গোঁফ ওয়ালা একটি ছেলে দিব্যি তার পায়ের ওপরে জুতো শুদ্ধ পা চাপিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—পা সরান। গর্জে উঠলেন পুলিন বাবু।—দেখতে পাচ্ছেন না?

—দেখতে পাচ্ছি না, অনুভব করছি শুধু। ছেলেটা নির্বিকার মুখে বলল।—কিন্তু সরিয়ে রাখব কোথায়? জায়গা কই রাখবার?

—সরাবেন কিনা? পুলিন বাবু রাগ সামলাতে সামলাতে বললেন।

আশপাশের কয়েকজন তাল ঠুকল, লেগে যা—লেগে যা—নারদ-নারদ। ছেলেটা অবশ্য এবারে পা সরালো। কোথায় রাখল ভগবানই জানেন। তবে গজগজ করতে ছাড়ল না—অমন চ্যাঁচাচ্ছেন কেন? মারবেন নাকি—?

মারতে পারলে মন্দ হত না। পুলিনবাবু একবার ভাবলেন। জোয়ান বয়সে নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। এখন টাক পড়ে চুল পেকে একটু বুড়োটে দেখার বটে তবে চেহারা একটুও টসকায় নি, ঠিক মত একটা চড় হিসেব করে ছেলেটার গালে কষাতে পারলে দু-পাটি দাঁত নড়িয়ে দিতে পারবেন।

—অত পা বাঁচানোর দরকার তো ট্যাক্সি চড়লেই হয়। অফিস টাইমে বাসে ওঠা কেন? ছেলেটার গজগজানি চলতেই থাকে। পুলিনবাবু হঠাৎ বুঝতে পারলেন রাগে তার হাঁটু কাঁপছে, কপালে ঘাম জমছে। বাসের লোক দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে একদল তাকে আর একদল ছেলেটাকে সমর্থন করে ঝগড়াটা টেনে নিয়ে যাবার তাল করছে। রাগের চূড়ান্ত পর্যায়ে পুলিনবাবু মাথার মধ্যে ঝিমঝিম শব্দটা টের পেলেন। অমনি ডাক্তার সান্যালের মুখটা মনে পড়ল। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠল রক্তচাপ মাপার যন্তরটার ছবি। মুখ ফিরিয়ে বাসের গায়ে "পকেটমার হইতে সাবধান" লেখাটার দিকে তাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে মনে মনে আওড়াতে লাগলেন,—নিরানব্বই—একানব্বই—নব্বই…।

অফিসে পৌঁছতে পনেরো মিনিট দেরী হয়ে গেল। ঢুকতে না ঢুকতেই বড় হলের এক পাশ থেকে যেখানে টাইপিস্টরা বসে, চাপা গলার মন্তব্য কানে এলো—দাদু আজ লেট। গা জ্বলে গেল পুলিনবাবুর, ঐ 'দাদু' শব্দটার জন্যে, এরা কিছুতেই তাঁর ব্লাড প্রেশারকে স্বাভাবিক জায়গায় থাকতে দেবে না। ওদিকে হাজিরা খাতা চলে গেছে বড় সাহেবের কামরায়। তার মানে আরেক প্রস্থ অশান্তি।

বড় সাহেব অবশ্য বিশেষ কিছু বললেন না। শুধু হাত ঘড়িটায় একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,—আজ নিয়ে এ হপ্তায় দুদিন হল। ম্রিয়মাণ মুখে পুলিনবাবু হাত কচলাতে কচলাতে কলকাতার বাস ট্রামের অবস্থার কথা বোঝাতে চেষ্টা করলেন। যেদিনই দেরী হয় সেদিনই করেন। সাহেব অবশ্য শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। মন্তব্যটা ছুঁড়ে দিয়েই তিনি একটা ফাইল পড়তে শুরু করেছিলেন নিবিষ্ট মনে। অগত্যা পুলিনবাবু ঘাড় গুঁজে সইটা করে দিয়েই বেরিয়ে এলেন। আর মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন,—কোম্পানীর গাড়ীতে যাতায়াত করো সাহেব। চড়তে হ'ত অফিস টাইমের বাসে। তাহলে বুঝতে···।

অফিসের টাইমটা আজকাল পুলিনবাবুর বড় কষ্টে কাটে। সারাক্ষণ ভয় হয়—এই বুঝি কখন রাগ করে ফেলেন। আর রাগ করার মতো কাণ্ড তো যথেষ্টই ঘটে। তাঁর অধঃস্তন কর্মচারীরা তার সামনেই কাজ ফেলে গল্প করে। বেয়ারাকে দশবার না না ডাকলে সাড়া দেয় না। দু-একজন নিয়মিত ভাবে ভুল ইংরাজীতে দরকারী রিপোর্ট লেখে—এবং বলতে গেলে তর্কও করে। নেস্‌ফীল্ডের গ্রামার এনে দেখাবে বলে শাসায়। যেন তিনি নেস্‌ফীল্ড না পড়েই পাশ করেছেন। এ সমস্তই পুলিন বাবু বুঝতে পারেন, তাঁকে রাগিয়ে দেবার চেষ্টা। কিন্তু তিনি অসহায়। পঞ্চাশ পেরোলেই মানুষের রাগ করার করার গণতান্ত্রিক অধিকারের অনেকটাই ডাক্তারদের কবলে পড়ে বর্জন করতে হয়।

টিফিনের সময়ে ব্যাগ খুলেই পুলিন বাবুর মাথায় হাত। তাড়াহুড়োয় টিফিন কৌটোটাই ব্যাগে পুরতে ভুলে গেছেন। অমনি ছোট মেয়েটার ওপরে তুমুল রাগ হয়ে গেল। তারই তো এসব খেয়াল করার কথা। —কি করে খেয়াল থাকবে? আপন মনেই গজগজ করলেন পুলিনবাবু।—সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলে কি আর কোনদিকে হুঁশ থাকে!

ঠিক দেড়টার সময়ে উঠলেন তিনি। এখন মিনিট পাঁচেক হেঁটে মোড়ের মিষ্টির দোকানে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আগেও অবশ্য কয়েকটা ভাজাভুজির দোকান আছে। কিন্তু এখন আর ভরসা করে ওসব খেতে পারেন না। হাজার হোক, বয়েস তো হয়েছে।

রাস্তায় অফিসের লোকের ভীড়। ঠেলেঠুলে মোড়ের মাথায় পৌঁছলেন পুলিন বাবু। রাস্তা পেরিয়ে মিষ্টির দোকান। ফুটপাতের আদ্দেকটা জুড়ে হকারের ভীড়। একজন চানাচুর ওয়ালা আর একটা প্লাস্টিকের রকমারি জিনিসের দোকানের মাঝের এক চিলতে

ফাঁক দিয়ে রাস্তায় নামতে হয়। সেখানেও একটা সাদা রঙের অ্যামবাসাডার দাঁড়িয়ে। পুলিনবাবুর আবার রাগ রাগ ভাব হ'ল। এখানে তো গাড়ী রাখার কথা নয়। একবার ভাবলেন চালকের আসনে বসে থাকা লোকটাকে ডেকে কথাটা বলে দেবেন! তারপর নিজেকে সংযত করলেন। কথায় কথা বাড়ে। যদি তর্ক জুড়ে দেয়? সোজা কথা তো আজকাল কেউ শোনে না! তাহলেই সেই ব্লাড প্রেশার। তাই পুলিন বাবু প্রায় রাস্তার ধারের নর্দমার ওপর দিয়েই গাড়ীটির পাশ কাটিয়ে গেলেন।

মিনিট দশেক বাদে পুলিন বাবু যখন মিষ্টির দোকান থেকে বেরোলেন তখন তার ব্লাড প্রেশার কত কে জানে। বসবার জায়গা নিয়ে এক মারোয়াড়ীর সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। জলের জন্যে বেয়ারার উদ্দেশ্যে বার দশেক গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কাউন্টারে বসা লোকটির সঙ্গে প্রায় হাতাহাতি হবার উপক্রম। দাম নিয়ে খুচরো টাকা ফেরৎ দেবার সময়ে একটা তেল চিট্‌চিটে ছেঁড়া নোট পুলিন বাবুকে গছানোতেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত।

যাক্‌ গে। ওসব কথা পুলিনবাবু আর ভাবতে চান না। অর্থাৎ ধাপে ধাপে গলা চড়িয়ে ছেঁড়া নোট পালটে দেবার দাবী জানিয়েও শেষ পর্যন্ত বেড়ে যাওয়া ব্লাড প্রেশারের ভয়ে তাঁকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছে। নোটটা পালটানো যায়নি। অর্থাৎ দু দুটো টাকা একপ্রকার গচ্চাই গেল। রাস্তা পার হতে পুলিনবাবু একমনে গুনছিলেন —একাশী-আশী-উনআশী। রাগের ঝোঁকে বারবার উন-আশীর পরে অষ্টআশী গুনে ফেলে আবার ঐ অষ্টআশীর থেকেই নামতে নামতে পুনশ্চ উনআশীর পর অষ্টআশী গুনে ফেলায় তার রাগ চতুর্গুণ বেড়ে গেল।

অ্যামবাসাডর গাড়ীটা এখনো ফুটপাথের ফাঁক আটকে দাঁড়িয়ে। বিরক্ত মুখে তার পাশ কাটিয়ে ফুটপাথে ওঠার মুখেই বিপদ। বছর তিরিশেকের এক ছোকরা হাতে ব্রীফকেশ নিয়ে তীর বেগে আসছিল। পুলিনবাবুর সরার জায়গা নেই। দু-পাশে হকার। সরার সময়ও ছেলেটা দিল না। সবেগে এসে এক ধাক্কায় পুলিনবাবুকে বিপর্যস্ত করে দিল। তাঁর চশমা ছিটকে পড়ল প্লাস্টিকের দোকানে, হাতের ব্যাগটা চানাচুরের ডিবেতে তিনি নিজে পড়ে যেতে যেতে চানাচুর ওয়ালার কোমর জড়িয়ে ধরে কোন মতে সামলালেন।

আশ্চর্য! ছেলেটা একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশও করল না। সোজা গিয়ে গাড়ীর দরজায় হাত রাখল। পুলিনবাবু টের পেলেন তার হাটু কাঁপছে। কপালে ঘাম। মাথার ভেতরে ঝিমঝিম শব্দ। হঠাৎ কি হল কে জানে। ছেলেটা গাড়ীতে ওঠার আগের মুহূর্তেই থপ করে তার কনুইটা চেপে ধরলেন।

একটাও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালো ছেলেটা। বোঝা গেল ভয়ংকর ব্যস্ত। একহাতে খামচে ধরল পুলিনবাবুর জামার বুকের কাছটা। বেশ বোঝা গেল তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েই সে গাড়ীতে উঠবে। এই ঘটনাতেই পুলিনবাবু রাগের শেষ সীমায় পেঁাছে গেলেন।

চোখের পলক ফেলতে না-চেনা সমস্ত দেবদেবীকে ডেকে নিলেন তিনি।—হে মা কালী, মা দুর্গা, শীতলা-ষষ্ঠী-জগদ্ধাত্রী-সরস্বতী-সন্তোষীমা! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—অপরাধ নিও না বাবারা! একবার—শুধু একটিবার রাগ করব। ব্লাড প্রেসারটাকে একটু সামলে রেখো—

ছেলেটা ধাক্কা দিল, সজোরেই। কিন্তু পুলিনবাবু পড়ে গেলেন না। কারণ ততক্ষণে ছেলেটাকেই তিনি শক্ত হাতে ধরে ফেলেছেন।

নাঃ। ঝগড়া-ঝাঁটি, চেঁচামেচি নয়? ওতে তাঁর বিশেষ সুবিধে হয় না। ডাক্তারের কথা মনে পড়ে ভয় হয়। উচিত তর্কও বিশীক্ষণ চালাতে পারেন না। তার চেয়ে এই ভাল।

ছেলেবেলায় মুগুর ভাঁজা হাত। ডান হাতের পাঞ্জা বাঘের থাবার মত আছড়ে পড়ল ছেলেটার গালে। অনেক রাগ অনেকদিন ধরে অনেকের ওপর জমা ছিল। ঠিকমত উশুল হয় নি। সেইজন্যেই হয়তো চড়টার ওজন একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা আছড়ে পড়ল চানাচুর ওয়ালার ঘাড়ে। ব্রীফকেস উড়ে গেল প্লাসটিকের দোকান লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়ে। চারদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল হঠাৎ।

পুলিনবাবু নিচু হয়ে চশমা খুঁজছেন। চারদিকে ছোটাছুটের শব্দ। একটা লোক আবার তাঁকে ধাক্কা দিয়ে দৌড়ে গাড়ীটায় উঠে পড়ল। গাড়ীটাও হঠাৎ স্টার্ট দিয়ে নক্ষত্রগতিতে বেরিয়ে গেল। খুব কাছেই একটা কান ফাটানো আওয়াজ। বোমা ফাটল, আগুনের ঝলক। সাঁই সাঁই শব্দে কি সব যেন বাতাস কেটে পুলিনবাবুর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আঁতকে উঠলেন তিনি এবং টের পেলেন তার মাথার মধ্যের ঝিম্‌ঝিম্‌ শব্দটা হঠাৎ যেন বেড়ে গিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। তার হাত-পা এলিয়ে এল।

* * *

ঘণ্টা খানেক পর।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের ঘরের নরম সোফায় বসে আছেন পুলিনবাবু। চোখের সামনে সিনেমার মত যা যা ঘটে গেল তা তখনও ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। এত কাণ্ডের নায়ক নাকি তিনিই।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, পুলিশ থানার অফিসার ইনচার্জ আর লালবাজার থেকে আসা পুলিশের দুই বড়কর্তা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেছেন। প্রশংসার স্রোত বয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে। ঘরে রিপোর্টারের ভীড়। সবাই তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে চায়। কালকেই কাগজে বড় বড় হেডিং এ খবর থাকবে—"জনৈক ভদ্রলোকের একক প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক ডাকাত ধৃত" অথবা ঐ জাতীয় কিছু।

হ্যাঁ, ব্যাঙ্ক ডাকাত। চারজন ছিল দলে। ব্যাঙ্ক থেকে রিভলবার দেখিয়ে আড়াই লাখ টাকা লুঠ করে পালানোর সময় তাদেরই একজন ধাক্কা মেরেছিল পুলিনবাবুকে। বাকি তিনজন পালিয়েছে বটে, পুলিনবাবুর চড়খেয়ে ঐ একজন পালাবার সুযোগ পায়

নি। ব্রীফকেস থেকে আড়াই লাখের মধ্যে দু লাখ টাকা উদ্ধার হয়েছে। আর ধরা পড়া আসামীর কাছ থেকে পুলিশ ইতিমধ্যেই বাকিদের নাম ধাম হদিশ জেনে নিয়েছে, ফলে বাকি টাকা সমেত তারা অচিরেই ধরা পড়বে বলেই আশা করা যায়।

এই মাত্র পুলিনবাবুর নিজের অফিসের ডাকসাইটে বড় সাহেব এসে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। ব্যাঙ্ক থেকে ফোনে খবর পেয়ে চলে এসেছেন খোঁজ নিতে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন, তাঁর অফিসের একজন কর্মীর এই কৃতিত্বে তিনি অভিভূত। এর জন্যে অফিস থেকে তাকে যাতে পুরস্কৃত করা হয় তার চেষ্টা করবেন তিনি। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারও ইতিমধ্যে জানিয়েছেন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে পুলিনবাবুকে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

ব্যাঙ্কের বাইরে লোকের ভীড়। তারা পুলিনবাবুকে একবার দেখতে চায়। চতুর্দিকে অভিনন্দনের জোয়ার। তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়া উচিত কিংবা সাহসিকতার জন্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে ভূষিত করা উচিত সে নিয়ে ছোটখাট তর্কও হচ্ছে। মাঝখানে পুলিনবাবু মুহ্যমান।

—স্যার মুখটা একটু তুলুন তো। বিচিত্র চেহারার ক্যামেরা তাগ করে একাধিক ফটোগ্রাফার বিনীত সুরে আর্জি জানাচ্ছে।—একটু ডানদিকে ঘোরান, আহা, অতটা নয়। একটু হাসুন—

পুলিনবাবু হাসি হাসি মুখেই অনুভব করলেন কপালে আবার ঘাম জমেছে। মাথার মধ্যে ঝিঁঝির ডাক। না-না, উপস্থিত কারো ওপর নয়। পুলিনবাবুর এই মুহূর্তে দারুণ রাগ হচ্ছে ডাক্তার স্যানালের ওপর। যিনি তাকে রাগ করতে বারণ করেছিলেন।

চোয়াল শক্ত করে তিনি মনে মনে গুনতে লাগলেন,—একাশী-আশী-উনআশী-অষ্টআশী —না-না, আটাত্তর-সাতাত্তর—।

বাঘের মাসী

নয়নরঞ্জন বিশ্বাস

বাঘের মাসী বেড়াল সেদিন গেল বাঘের বাড়ী,
বলল বোন পো বড্ড খিদে চাপাও ভাতের হাঁড়ি।
আমি বরং কুটনো কুটি বাটনা বাটি বসে,
তুমি মাজ হাঁড়ি কড়াই ঝামা দিয়ে ঘষে।
শুকনো দেখে বন-বাদাড়ের খড়ি নিয়ে এলে,
তখন আমি. উনানটাতে আঁচটা দেব জ্বেলে।'
বাঘ বলল. 'ওগো মাসী গাঙের ধারে গিয়ে,
ভাবছি বিরাট মাছটা আনি তোমার তরে নিয়ে।
তুমি আমার বেড়াল মাসী মাছটা তোমার প্রিয় ;
আশ মিটিয়ে পেটটা পুরে হাপুস দিয়ে খেও।'
বেড়াল মাসী হাসি খুশী বলল, 'বাহা ! বেশ—
এইনা হলে মিছেই আসা ঘুরতে তোমার দেশ'।
ঘণ্টা দেড়েক কাবার হলে বোনপো এলো ফিরে,
বেড়াল মাসী রান্না ঘরে বসল পেতে পিঁড়ে।
অনেক রকম রান্না হল খুশবু ছড়ায় ভীষণ,
বেড়াল মাসীর বসার তরে বোনপো পাতে আসন—
বলল. 'মাসী খেতে বস, হল অনেক বেলা,
খিদেয় তোমার পেটটা জ্বলে রাঁধলে তো বেশ মেলা !'
পেটুক বেড়াল বেজায় খেল পেটটা করে ফুলো.
খাবার পরে আলিস্যিতে মেঝের উপর শুলো।
বাঘ বলল, 'পেটুক মাসী একাই খেলে খাবার ?
খিদেয় আমার পেট যে জ্বলে তোমায় করি সাবাড়—'
এই না বলে 'হালুম খেলুম' বাঘ সে গেল তেড়ে,
বেড়াল কাঁদে, 'ওরে বাবা ফেললো আমায় মেরে—'
এক নিমেষেই বেড়াল মাসী হল পগার পার ;
সেদিন থেকে বাঘের বাড়ী যায় না বেড়াল আর।

———

লিপ ইয়ার

শ্রীকুঞ্জবিহারী পাল

তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর,
তদ্রূপ এপ্রিল, জুন, নভেম্বর ;
আটাশ সংখ্যক দিন ফেব্রুয়ারী ধরে,
বাড়ে তার একদিন চতুর্থ বৎসরে। ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে, ইংরেজী ফেব্রুয়ারী মাস হয় আঠাশ দিনে ; প্রতি চার বছর পরে ফেব্রুয়ারী মাসের দিন সংখ্যা দাঁড়ায় উনত্রিশ। ওই বছরটাকে আমরা লিপ-ইয়ার বলে থাকি। কোন বছরে লিপ-ইয়ার হবে তার হিসেব খুব সোজা। ইংরেজী সালটাকে চার দিয়ে ভাগ করলে যদি কোন ভাগশেষ না থাকে তবে সে সালটা হবে লিপ-ইয়ারের বছর। অর্থাৎ সে বছর ফেব্রুয়ারী মাসে দিনের সংখ্যা হবে আটাশের বদলে উনত্রিশ। ১৯৮৬ সালটা লিপ-ইয়ারের বছর নয়। ২৯৮৮ সালটা অবশ্যই লিপ-ইয়ারের বছর। লিপ-ইয়ারের সালে বছরে ৩৬৫ দিনে না হয়ে, হবে ৩৬৬ দিন। তবে এ হিসেবে একটা ত্রুটি আছে যার উল্লেখ ওপরের কবিতাটিতে নেই।

যে সব সংখ্যার শেষে দুটি শূন্য থাকে তা চার দিয়ে বিভাজ্য হয়ে থাকে ; যেমন ১৮০০, ১৯০০ প্রভৃতি সংখ্যাকে চার দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়। কাজেই আগের নিয়ম অনুসারে গত ১৯০০ সালটাতে লিপ-ইয়ার হওয়ার কথা ছিল! কিন্তু তা হয় নি। কারণ কি? না, যে সব সালের শেষ সংখ্যা দুটি শূণ্য সেক্ষেত্রে সংখ্যাটি যদি চারের বদলে চারশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তবে সে সালটিকেই লিপ-ইয়ার বছর ধরতে হবে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আগামী ২০০০ সালটা হবে লিপ-ইয়ারের বছর। ১৬০০ সালটাও ছিল লিপ-ইয়ার।

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় নেয় একবছর। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ক্রান্তীয় বছর বা ট্রপিকাল ইয়ার। এ রকম এক বছরে ৩৬৫·২৪২২ টি গড় সৌর দিন রয়েছে। ঘণ্টা-মিনিটের হিসেবে এটি দাঁড়ায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড। সৌর দিন বা 'সোলার ডে' বলতে আমরা বুঝি, দুপুর বেলা সূর্য ঠিক মাথার ওপরে যখন ওঠে তখন থেকে পরের দিন দুপুরে আবার মাথার ঠিক ওপরে ওঠার সময়টাকে সৌরদিনে ২৪ ঘণ্টা। আমাদের পঞ্জিকা অনুসারে

আমরা যে দিন মাস-বছর গুণে থাকি তাতে দেখা যাচ্ছে এক বছরে রয়েছে ৩৬৫ টি সৌর দিন। একে আমরা পঞ্জিকার বছর বা ক্যালেণ্ডার ইয়ার বলে থাকি। কাজের সুবিধের জন্যই এ ব্যবস্থা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্রান্তীয় বছর আর পঞ্জিকার বছরের মধ্যে ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডের ব্যবধান রয়েছে। চার বছরে এই ব্যবধান দাঁড়ায় ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। কাজেই প্রতি চার বছরে এই ঘাটতি সময়টুকু পূরণ করা হয় লিপ-ইয়ার বছরের একটি দিন যোগ করে। তার মানে যে-বছর লিপ-ইয়ার হবে সেবার পঞ্জিকার বছর হবে ৩৬৬ দিনে।

প্রাচীন সভ্য দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো, মিশর প্রভৃতি দেশে সৌর দিনের হিসেবেই বছর গণনা করা হত। সুসভ্য রোমানরা কিন্তু চান্দ্র মাস হিসেবে বছর গুণত। তাছাড়া এখানকার শাসকদের মর্জির ওপরও বিষয়টার অনেকখানি নির্ভর করত। জুলিয়াস সিজার মিশর অধিকার করে সেখাসে বসবাস করবার সময়ে ব্যাপারটা তার নজরে আসে। তিনি লক্ষ্য করলেন, রোমের বছর গণনা থেকে মিশরীয়দের বছর গণনা অনেক বেশী বিজ্ঞান সম্মত। তিনি দেশে ফিরে এলে তাঁকে রোমের একচ্ছত্র আধিপত্য দেওয়া হয়। সেটা যীশু খৃষ্টের জন্মের ৬৩ বছর আগের কথা। এর কয়েক বছর পর তিনি গ্রীক জ্যোতির্বিদ সোসিজিনিসের উপদেশ অনুসারে লিপ-ইয়ারের ধারণা যুক্ত করেন পঞ্জিকার বছরের সঙ্গে। এটা খৃঃ পূঃ ৪৭ সালের কথা।

কিন্তু এখানে একটা গণ্ডগোল থেকে গেল। আগেই বলা হয়েছে লিপ-ইয়ারে পুরো একটি দিন যুক্ত হয় বছরের সঙ্গে। একটি দিন মানে ২৪ ঘন্টা। কিন্তু হিসেব মত ওটা হবে ২৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪ সেকেণ্ড। তার মানে প্রতি চার বছরে অর্থাৎ লিপ-ইয়ারে ৪৪ মিনিট ৫৬ সেকেণ্ড বেশী যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ঠিক হল প্রতি একশ' বছর পরের বছরটি (যেমন ১৮০০, ১৯০০-চার দিয়ে বিভাজ্য হলেও) লিপইয়ার বলে গণ্য করা হবে না। আগেই যে বাড়তি সময়টা যুক্ত হয়ে গেছে তা একশ' বছরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ১৮ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ড। কাজেই প্রতি একশ বছরের শেষে যদি লিপ-ইয়ার না হয় অর্থাৎ সে বছরটি যদি ৩৬৫ দিনেই ধরা হয় তবে আগের বাড়তি সময়টা হয়তো পুষিয়ে যাবে। কিন্তু এসব করেও শেষরক্ষা হল না। দেখা যাচ্ছে, জমার ঘরে ১৮ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট ২০ সেকেণ্ডের বদলে খরচের খাতায় যে ২৪ ঘণ্টাটাই উবে গেল। তার মানে আবার ঘাটতি পড়ল ৫ ঘণ্টা ১৬ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। ৪০০ বছরে এ ঘাটতি দাঁড়াবে ২১ ঘণ্টা ৬ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডের। ঠিক হল, যে সালের শেষে দুটি শূন্য আছে তা যদি ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় তবেই লিপ-ইয়ার হবে, অন্যথায় হবে না। কিন্তু এ করতে গিয়েও বা রেহাই পাওয়ার লক্ষণ কোথায়? এবারে যে বাড়তি সময়টুকু চলে যাবে তার পরিমাণ ৩৩০০ বছরে প্রায় একদিনে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় দাঁড়াবে। ব্যাপারটা অন্যভাবেও বলা যায়। প্রতি ৩৩০০ পঞ্জিকার

বছরে মোট যত দিন হবে তা হবে প্রতি ৩৩০০ ক্রান্তীয় বছরের দিনের চেয়ে একদিন বেশী।

বিজ্ঞান তার আধুনিক এবং উন্নত পদ্ধতির সাহায্যে নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করে যখনই কোন প্রাচীন সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে, দেখা যায়, সমস্যাটা তখন আরও জটিল-রূপে এসে পথরোধ করে দাঁড়ায় বিজ্ঞানের সামনে!

রাত দুপুরে

সমর পাল

রাতদুপুরে করুণ সুরে
গাইছে যে গান বাতাস জুড়ে
বনের ছিঁ-ঝিঁ পোকা।
ছন্দ মেনে তালে তালে
বইছে বাতাস গাছের ডালে
দেখছে ব'সে খোকা!

রাতদুপুরে নেই কোন ঘুম
খোকনকে কেউ দেয় নাকে চুম
থাকে একাই জেগে।
প্রকৃতি তার মনের কোণে
সঙ্গ দিয়ে বাসা বোনে
যায় না খোকন রেগে!

মা-বাবা-ভাই, নেই কোন বোন
কেউ বলে না খোকনরে শোন
তুইতো আমার প্রিয়।
তবুও সে আজ দৃঢ় মনে
বেড়ায় ঘুরে পাহাড় বনে
তোমরা প্রীতি দিও!



গেজিং—লম্বা একফালি দেয়াল চুপটি করে শুয়ে আছে গায়ে আঁকুবুকি নিয়ে। তার পিছনে গেজিং গোমফা লাল হলুদ রঙ মেখে উঁকি মারছে। চারদিকে পাহাড়গুলো গলায় মেঘের মাফলার জড়িয়ে আয়েশ করে বসে আছে।

সূর্য্যিমামা লজ্জায় মুখটুখ লাল করে টুপ করে ডুব দিলেন। কে জানে কে এসে একখানা কালোরঙ ভরা বালতি উপুড় করে দিলে আকাশে। টুপ টুপ করে জোনাকির মত আলো জ্বলে উঠল। তাই দেখে তারারাও সাহস করে বেরোতে লাগল এক এক করে। সবশেষে চাঁদমামা একমাথা দুশ্চিন্তা নিয়ে এসে পৃথিবীর ছায়া চাঁদমামাকে পুরোপুরি ঢেকে দেওয়ার আগেই ঘুমবুড়ো এসে আমাদের লেপচাপা দিয়ে দিল।

জঙ্গলের পথে—পাকা রাস্তা ছেড়ে একটা শুঁড়িপথ হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে নেমে গেছে গাছপালার ফাঁক দিয়ে হুই নদীটার দিকে। নিচের থেকে নদীটা বলছে—জলদি এসো। জঙ্গল বলছে—সামালকে!

নামছি তো নামছি। পা চলতে চায় দুড়দুড়িয়ে, ছুটে। শরীর বলে—এ্যাইও, মরবি নাকি শেষকালে। চাদ্দিকের গাছপালা গুলো মাথাটাথা নেড়ে ভাবছে—এতটা বয়স হল, মানুষের মত এমন ছেলেমানুষ আর দেখলাম না। কেউ তাড়া করছে না, নিচে ঐ একফালি নদী ছাড়া কিছুটি নেই, তবু ছুটছে। নদীর কাছে পেঁছে দেখি, নদীটা হো হো করে হাসছে, নাচছে। তার শরীরটা থেকে জল, পাথরগুলোর ধাক্কা মেরে, নটরাজের জটার মত ছিটকে ছিটকে উঠছে। ভাবটা যেন—পেরোও দিকি!

পেরোতে গিয়ে বুক ঢিপ ঢিপ। ভরসা তো কেবল দুজোড়া বাঁশ। পা দিলেই দুলে

উল্টে ফেলে দিতে চায়। নিচেই নদীটা হাজার হাত তুলে ডাকছে—আয়, দেখবি কেমন লুফতে লুফতে চোখের পলকে নিয়ে যাব সেই তেপান্তরের পারে।

নদীর পারে পাথরগুলো বড় বড় কচ্ছপের মত পড়ে আছে ঘাড় গুঁজে, আর নদীটা ওদের ঠাট্টা করতে করতে চলেছে ছুটে। দুদিকে হুমড়ি খেয়ে থাকা পাহাড়গুলোর ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো নদীর পারে শরীর বিছিয়ে বিশ্রাম করছে। দূরে ধ্বসে যাওয়া একটা পুলের থাম বোকার মত একা একা দাঁড়িয়ে আছে।

মাখামাখি সবুজ ছাড়িয়ে আবার সেই ঘন ছাই রঙয়ের ফিতে এঁকেবেঁকে পালিয়েছে। ওপরে পাহাড়ের গা থেকে পাথরগুলো মুখ বাড়িয়ে উঁকি মারছে। হলদেটে নীল আকাশটা আর পছন্দ হল না ভগবানের। খুব যত্ন করে লাল, কমলা, বেগুনি রঙ মাখাতে আরম্ভ করলেন। শরীর বলতে লাগল—আর তো পারি না। মন বলে—চল্ না বাবা ; পথের ধারে থামিস নে। শরীর সে কথা শুনলে তো! বসে পড়লাম পথের ধারে। একদিকে পাহাড়গুলো অন্ধকার মেখে ভূত সেজে দাঁড়িয়ে আছে, আরেকদিকে ছবির মত দু চাট্টে বাড়ি হারিকেনের টিপ পরবে বলে তৈরি হচ্ছে। খাড়া দাঁড়ানো গাছগুলোর ফাঁকে মুরগিগুলো এখনো খাবার খুঁজে চলেছে। প্রজাপতির মত গোটাকয়েক ছেলেমেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। এ সোনম—বলে কে যেন কাকে হাঁক দিল। সোনম ছেলে কি মেয়ে, নাকি মুরগিছানা বা প্যাঁকপেঁকে হাঁস কিছু বোঝা গেল না। কেউ জবাবই দিল না।

তাঁবু টাবু খাটাব বলে ঠিক করেছি, কোত্থেকে একজন দেবদূত এসে হাজির। পিঠে বোঝা, মুখে হাসি। বললে—চল আমার সাথে। পেঁছে দেব য়োকসম, দেখবে কেমন পাহাড় টপকে নিয়ে যাই। চুপি সাড়ে তখন অন্ধকার নামছে। দেবদূতের পিছু পিছু আমরা চললাম জঙ্গল ভেঙ্গে, নদী পেরিয়ে। অন্ধকারের বোরখাপরা গাছগুলো আমাদের আর দেবদূতের কথাই কানাকানি করতে লাগল। শরীর যেন পাথর। ঘাম যেন নদী। দেবদূত আমার বোঝা নিল নিজের কাঁধে, তবু পা নড়ে না। রাজা ছিল পিছনে। মালগাড়ির ইঞ্জিনের মত আমায় ঠেলে নিয়ে চলল। অন্ধকারের মধ্যে টর্চের ফ্যাকাশে আলোর লুকোচুরি খেলা। এই আছে এই নেই।

শেষে পেঁছলাম টিঙ টিঙ। আশ্রয় একটা পেয়ে শরীরটা মনের মুখ চাপা দিল। পাহাড় হয়ে গেলাম। নট নড়ন চড়ন নট কিছু। দেবদূত মুকুন্দ প্রধান বললে—আমি তবে আসি। কাল আমার ইস্কুল খুলবে। ও য়োকসম ইস্কুলের মাস্টার। ইংরেজি পড়ায়। বাড়ির মালিককে আমাদের দেখাশুনা করতে বলে ও বলল—তবে আসি। ঝিঁ ঝিঁ গুলো আমাদের বলতে লাগল—ঝিঁ ঝিঁ ছি ছি। পারলে না। দুয়ো। কানে তুলো গুঁজলাম। এদিকে শীত বাবাজীও—এইতো পেয়েছি বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি গরম জামা আর কম্বলের খোলসটা পরে ফেললাম। তাই দেখে পাহাড়ি হাওয়া গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হি হি করে হাসতে লাগল।

য়োকসম—সকালবেলা পাহাড় জঙ্গলের সাথে মনটাও রোদ মেখে ঝকমক করতে লাগল। ছোটো বড় ছেলেমেয়েগুলো একমুখ হাসি নিয়ে বই বগলে আঁকাবাঁকা পথটা বেয়ে চলেছে ইস্কুলে। ছোটরা যাবে টিঙটিঙের ক্ষুদেদের ইস্কুলে আর এট্টু বড়রা—য়োকসমের হাইস্কুলে। দু চারটে ক্ষুদে আমাদের দেখে দাঁড়িয়ে একগাল হেসে বললে—মিঠাই। লজেন্স দিতেই মহাখুশি হয়ে লাফাতে চলে যাচ্ছে! তাই দেখে আমরা খুশি। চাদ্দিকের গাছপালাও খুশি। ওদিকে ভেড়ার পালের মত নাদুস মেঘের বাচ্চাগুলো গুঁড়ি মেরে পাহাড় বাইতে শুরু করেছে। আকাশের নীলে সোনালী রঙ ধরেছে। গাছপালার আড়ালে দুচাট্টে বাড়ি আড়মোড়া ভাঙছে। রোদ্দুর এসে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে বলছে—ওঠ বাবা উঠে পড়। বেলা যে হল।

সরু পথের ফিতেটা জঙ্গল ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় হারিয়ে যেতেই এসে গেল য়োকসম। ধুলোমাখা পথের ধারে সবুজ গালচে পাতা। তাতে কোথাও হলুদ কোথাও লাল সাদা নক্সা কাটা। দুটো ছোট্ট কাঠের বাড়ি। তাতে দোকানদার বসে রোদ্দুর পোয়াচ্ছে। বস্তায় ভরা নুন চাল ডাল। শীতবলে ওদেরও রোদ পোয়াতে বারান্দায় বসিয়ে দিয়েছে। এককোণে ছোট্ট একফালি ডাকঘর। ডাকবাক্সটা না দেখলে কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই। ছোট ছোট একঝাঁক পাখি দলবেঁধে একবার এদিক একবার ওদিক উড়ে বেড়াচ্ছে। যেন পছন্দ করার মত কিচ্ছুটি নেই এখানে। দুচাট্টে সরষে ফুলের মত পাকাবাড়ি। সরকারি আপিস। একটায় অবলা জীবগুলোর চিকিচ্ছে হচ্ছে। সেখানে একটা গরু হাম্বা হাম্বা করে তার অসুখের কথা বলছে। পাশের খোপে ঘোড়াটা পা ঠুকে ঠুকে ফররর করে সায় দিচ্ছে—তা যা বলেছ। চাট্টে মোটা সোটা হাঁস কেউ সাদা কেউ রঙীন জামা পরে হেলেদুলে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছে। পাহারাদার ফড়িং মাথার ওপর উড়ছে। মুরগিটা তার ছানাপোনাদের বললে—দেখ। ঐ চ্যাপ্টা ঠুঁটিদের মত ঘুরে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করিস নে।

বড় দোতলা হলুদ বাড়িটাই ইস্কুল। ওখানেই দেবদূত মুকুন্দ ইংরেজি পড়ায়। একটা চুড়োয় গাছপালার আড়ালে ছবির মত সুন্দর ড্যানির বাড়ি। ড্যানি বোম্বাইতে হাত পানাড়ে গান গায়! আমরা সেসব ছবিতে দেখি। ভারি নামডাক তার।

একটা বাঁক পেরিয়ে সার সার গালচে পাতা। কোনটা গাঢ় সবুজ কোনটা ফিকে সবুজ। কারো গায়ে বা সোনালি জরির কাজ। তারই গায়ে গায়ে ধোঁয়া রঙের সব বাড়ি। ডানদিকে দূরে পাহাড়ের মাথায় গোমফা যেন মুকুটের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাছপালাগুলো আমাদের সাথে ভাব করতে চাইছে। ফিঙের মত দেখতে মস্ত একটা বাঁশঝাড়ে বসে জানান দিলে—ভিনদেশী এয়েচে গো। একটু আপ্যায়িত করো। সাদা একটা ছোতন যেন সাদা লক্ষ্মীর ঝাঁপি। শুধু দোতলা বাড়ির সমান এই যা। সামনেই পাথুরে সিংহাসন। সেই কবে কে এসে প্রথম রাজা হয়েছিলেন সিকিমে। তিনি বসলেন এই সিংহাসনে। পাশে বসলেন রাণী। মাথার ওপর পাইনের ছাতা। প্রজারা গাইলে—জয় সিকিমাধিপতির জয়। সেই সিংহাসন আজো আছে। সেই

পাইন তার মাথায় ছাতা ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে আজো। শুধু সিংহাসনে কেউ বসে না। লোকেরা এসে মাথা নোয়ায়। চান্দিকের গাছেরা সিংহাসনকে আগলে রাখে। বাতাস এসে ফিস ফিসিয়ে খবর জানতে চায়। সান্ত্রীর মত কতকগুলো পতাকা দুদিকে। একটা পাথর এক মোহান্তর পায়ের দাগ বুকে নিয়ে পড়ে আছে কে জানে কত শত বছর ধরে। আরেকটা পথ ধরে চললেম। দুদিকের গা ঘেঁসা-ঘেঁসি করে দাঁড়ানো গাছেরা বললে—এসো ভাই দ্যাখো তোমাদের জন্যে কেমন সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি কাথোক লেককে।

এক মোহান্তর নাম নিয়ে মোহান্তর মতই শুয়ে আছে কাথোক। তার বুকে চারধারে শান্ত মোষের মত কত পাথর চুপটি করে বসে আছে। বড় মেজ গাছেরা চান্দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। এখানে অশান্তির ঢুকতে মানা। টলটলে জল হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে! আয়নার বুকে কাঁপন উঠছে। মাঝে মাঝে দু একটা মাছ লাফিয়ে উঠে দেখছে কে এল। দূর থেকে পাহাড়রা উঁকি মারছে। দেখে নিচ্ছে আয়নায় নীল সবুজ পোষাকটা কেমন মানিয়েছে। এমনকি আকাশে মেঘগুলোও নড়তে চড়তে ভুলে গেছে। হাঁ করে বেহায়ার মত নিজেদের রূপ দেখছে আয়নায়। ওপরে আকাশ পাহাড় গাছ, জলেও তাই।

ফেরার পথে একটা হলদে প্রজাপতি এসে শুধিয়ে গেল—কেমন আছ? ভালত? তার কাছেই খবর পেয়ে বুঝি এল কালো কোলো ভুসকো ভুলো কুকুর চামর দুলিয়ে এল চমরি গাই। দেখা সাক্ষাৎ করে ভারি খুশি তারা। ভুলো কুকুর তো খানিক দূর এগিয়েই দিলে। বললে—আবার এসো। বললুম—কাল আসব।

ইস্কুলের কাছে আসতেই একদল নানাবয়সী মানুষ। পাহাড় বাইতে এসেছে। ওমা! তার মধ্যে দেখি প্রশান্তদা। দাড়ি আর ভাঙ্গা দাঁত নিয়ে হাসছে। আমাদের গপ্পো শুনতে শুনতে সূয্যি মামা ঘুমে ঢলে পড়লেন। শীতের চোটে হিমালয় কালো কম্বলটা গায়ে মাথায় জড়িয়ে নিলে।

বাখিম—সকাল হতে দেবদূতের কাছে বিদায় নিলাম। য়োকসম তার রঙচঙে ঝকমকে হাসি হেসে বলল-দুগ্গা দুগ্গা। গোটাকতেক পাখি পাহাড় জঙ্গলকে খবর দিতে ছুটল—নতুন মানুষ আসছে গো। পায়ের নিচের পাথরগুলো বললে—চল খানিক এগিয়ে দিয়ে আসি। য়োকসম ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে তারা থেমে গেল। অচেনা পথে যেতে তাদের ভারি ভয়। রোদ্দুর মেখে মেঘগুলো পর্যন্ত সোনালি হয়ে গেছে। গাছগুলো যেন সবুজ সোনা। ফুল তার মধুর গন্ধ ছড়িয়ে ডাকলে —এসো। ডাক শুনে তাকালাম জঙ্গলে। পাহাড়ের গায়ের শ্যাওলা বললে— সাবধানে চলো বাপু। পড়েটড়ে গিয়ে আমাদের বদনাম কোরোনা। দলে দলে গাছ। যেন সব মিটিং করতে চলেছে! মাথায় তাদের সোনালি রোদ্দুরের টুপি। গায়ে কালচে সবুজ শ্যাওলার পোষাক। তাতে ফুলের ছিটে। পিড়িক পিড়িক লালচে সবুজ শ্যাওলা ছোট্ট পাখি উড়ছে। হলদে কালো চিত্তির বিচিত্তির মাকড়সা

জাল বুনতে ব্যস্ত। কোথাও পাহাড়ের মাথা থেকে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে হুড়মুড়িয়ে এসে ঝর্ণা কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। এত ব্যস্ত যে আমাদের কথার জবাব পর্যন্ত দিলে না। সরু হাত খানেক চওড়া ফিতেটা এঁকে বেঁকে কখনো ওপরে উঠছে কখনো নামছে। ঘোর জঙ্গলে রোদ্দুরের জাফরি। নিচে নদী চলেছে আপন মনে। চার চারবার তাকে পেরোলাম। কিছুটি বললে না। মেঘগুলো ছুটে ফাস্টো হয়ে পেঁাছে পাহাড়চুড়োকে ঘিরে নাচানাচি লাগিয়েছে। একবার এ চেপে বসে তো আরেকবার ও। ওদের বেহায়াপনা দেখে আকাশ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সূয্যিমামাও মুখ লুকোলেন। সন্ধ্যা তার কালচে ওড়নাটা গায়ে জড়াবার তোড়-জোড় করছে এমন সময় পাহাড় জঙ্গলের ফাঁকে উঁকি মারল কাঠের বাড়ি। ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে একঝাঁক পাখি এসে চক্কর দিল মাথার ওপর। বললে—বাখিমে আস্তাজ্ঞে হোক। বাংলোর কাছে এসে দেখি চমরি গাইয়ের জাত ভাইরা ভারি বিজ্ঞের মত লেজ দুলিয়ে ঘাস খাচ্ছে। পাখিরা সব অতিথি এসেছে দেখে মহানন্দে চিঁড়িক মিঁড়িক করছে। বাংলোর গেটের কাছে গোটাকয় অর্কিড পাথরের সাথে পরামর্শ করে ঘুমোবার তোড়জোড় করছে। বিরাট লম্বা পতাকাটা মাথা নেড়ে নেড়ে বলছে—উঁহু এখন নয় এখন নয়। অতিথিরা আগে ঘুমোক। পিছন থেকে বাখিম গুহা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—আজকাল আমায় আর কেউ দেখে না। তিব্বতী মহিলা বললেন— ছুক ছুক। পাশের ভালুক কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে জানালে—ঠিকই বলেছ। এখানে একরাতের ভাড়া দশ টাকাই বটে। জানালার বাইরে অন্ধকার ওঁৎ পেতে বসে আছে। ঘরের অন্ধকাররা কেউ কোনায় গিয়ে সেঁধিয়েছে কেউ ছাত্র আঁকড়ে ঝুলছে। বাকিগুলো সব জুটেছে ফায়ার প্লেসের কোটরটায়। মোমবাতির ভয়ে আমাদের সাথে আলাপ জমাতে পারছেন। আমাদের জিনিসপত্রগুলো যে যেখানে পেরেছে ঘুমিয়ে পড়েছে ! একজোড়া দেবদূত এখানেও হাজির। সোনম আর জন! তারা আমাদের খাওয়ালে গল্প শোনালে। শেষকালে বেশি রাতে দেবদূতেরা চলে যেতে কম্বলগুলো আমাদের গায়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ছোকা—ভোর না হতেই মেঘের দল—হেঁইরে জোয়ান হেঁইও বলে পাহাড় ঢাকতে আরম্ভ করছে। আসবার পথে য়োকসমকে একদফা ভিজিয়ে দিয়ে এল। দেবদূতেরা আমাদের রওনা করে দিয়ে নেমে গেল। সূয্যিমামা মেঘের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে মারতে বিরক্ত হয়ে শেষে গা:ঢাকা দিল। মেঘ গুলো সব-হেরো হেরো দুয়ো বলে আরো জোরে পাহাড় ঢাকার কাজে মন দিল। তাই দেখে গাছগুলো কেমন ভয় পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। যারা শুয়ে ছিল তারা শুয়েই রইল। সবজে কমলা শ্যাওলাগুলো আঁকড়ে ধরল গাছ-পাথরগুলোকে। শুধু পায়ের তলায় শুকনো পচা পাতারা গোঙ্গাতে লাগল। পাখিগুলোও ভয়ে অস্থির। একবার এ গাছে আবার ও গাছে। কারো ঘুম ভাঙ্গেনা।

চলতে চলতে পথের ধারে উঁকি দিল ছোর্তেনের সাদা মাথা। বললে—এসো ভায়ারা ছোকায় এস। হুই দ্যাখো ওপরে জলের কল। কাল সন্ধ্যে থেকে জল খাওনি, প্রাণ ভরে জল খাও। ওদিক থেকে গোমকা বললে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। বেড়াগুলো রাস্তাটাকে আগলে রেখেছে। এধারে ওধারে গোটাকয়েক কাঠের বাড়ি হাড়-আলসের মত বসে আছে। কেউ কোথাও নেই। শুধু একঝাঁক পাহাড়ি পায়রা চক্কর দিচ্ছে। ছোট্ট খয়েরি বুক হলুদ ঠোঁট পাখিগুলো বেড়ার মাথায় বসে আছে ঝিম মেরে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। সে কী তার তাথৈ নাচ! দেখতে না দেখতে হাড় কাঁপিয়ে দিলে। আমাদের দুরবস্থা দেখে দাঁড়কাক ন্যাড়া গাছের মাথায় বসে—কা কা করে হাসতে লাগল। আমরা শীতে জড়সড়। ষাট বছরের মহিলা চললেন ক্ষেত চষতে। তাঁর বাবা বুড়োলামা, হাসলে এখনো দাঁত দেখা যায়, ডেকে ঘরে নিলেন, আগুনের ধারে বসতে দিলেন, শালগম খেতে দিলেন। ঠাণ্ডা তো আগুন টাগুন কিছু মানলে না, এসে জড়িয়ে ধরলে। তার আদরে প্রাণ যায়। বাইরে দাঁড়কাক বল্লে—কাকা ফিরে যা! মেঘের দল পাহাড় ধুতেই থাকল। যাদুকরের যাদুতে আশেপাশের সব কিছু অদৃশ্য। কোথাও কিছু নেই। শূন্যে একটা কাঠের বাড়ি। তার মাঝে এক টুকরো রাঙা আগুন। তাকে ঘিরে ঝুপসি আঁধারে আমরা কজন জবুথবু। রাজা ছবি আঁকতে চাইলে। আঙ্গুল-গুলো তার সেতারে ঝালা বাজাতে লাগলে। করতে করতে দুটো বাজল। জিৎ হল মেঘেদের। তারাই দখল করলে জোংরিপথ। হেরো হয়ে আমরা নামতে লাগলাম নিচে। জঙ্গলের গাছগুলো বললে—আহারে পারলে না। তাতে কী? আবার এসো। তাদের আদর গায়ে মাখতে মাখতে বললাম—আবার আসব।

ইন্সপেক্টরবাবুর বয়স

পলাশ মিত্র

ইস্কুলে আজ ইন্সপেক্টর হঠাৎ কেন যে এলেন
একটি প্রশ্ন করবেন বলে বহু ক্লাসেই গেলেন।
এমনই প্রশ্ন, ছাত্র তো ছার, হেডস্যারই হতভম্ব
অবিনাশবাবু অঙ্ক কষান, ঘুচে গেল তাঁর দম্ভ ঃ
হেডপণ্ডিত জটিলেশ্বর বসেছেন এক কোণে
উত্তর দিতে না-পারায় তাঁর ব্যথার পাহাড় মনে ;
ভূগোলের স্যার ভাবছেন নাকি ছেড়েই দেবেন কাজ
এ কি রে প্রশ্ন ! শোনা ইস্তক পড়লো মাথায় বাজ ঃ
ড্রিলের টিচার বারান্দাতেই করছেন পায়চারি
প্রশ্ন শুনেই মাথা যেন তার বড্ড হয়েছে ভারি ;
সারা ইস্কুলে থমথমে ভাব সকলের মনে ভয়
এমন প্রশ্ন ভূভারতে কেউ শোনে নিকো নিশ্চয়।
ঠিক এ সময়ে বাংলাস্যারের মাথায় হঠাৎ এলো
ক্লাস সেভেনেতে যাওয়া হয় নিকো, ওখানে তো পড়ে কেলো—
কেলো মানে সে তো কালীপদ চাকী এক নম্বরি বিচ্চু
কোনো উত্তরই তার কাছে নাকি আটকায় নাকো কিচ্ছু ঃ
সব কিছু শুনে ইন্সপেক্টর ক্লাস সেভেনেতে গেলেন
যাবার আগেও আরো একবার গাণ্ডে-পিণ্ডে খেলেন ঃ
হেডমাষ্টার সঙ্গে আছেন মুখে বেদনার কালি,
কালীপদ শুধু বিকার বিহীন ফিক্ ফিক্ হাসে খালি ;
মোলায়েম স্বরে স্যারেরা বলেন, ওহে কালীপদ চাকী,
যা জানিস বাবা চটপট্ বল্ রাখিস না কিছু বাকি।
ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করেন—ঘড়িতে তিনটে হ'লে
ইস্কুল থেকে কলকাতা যদি সাতাশ মাইল হয়
তা হলে আমার কত বা বয়স তাড়াতাড়ি ফেল ব'লে
সঠিক জবাবে খুশি হয়ে তবে মেনে নেব পরাজয়।
কালীপদ বলে, পেয়েছি জবাব বয়স আপনার যাট—
কেননা আমার দাদার বয়স যদি বা তিরিশ হয়,
সে আধ-পাগল, নিজেকে ভাবছে ছোট লাট বড় লাট
আপনি তো স্যার পুরোটা পাগল যাট হবে নিশ্চয়।
ঠিক ঠিক ঠিক, ঠিক তো বলেছো—ইন্সপেক্টর হাসেন
চাদরের খুটে মুখ চেপে রেখে হেডস্যার শুধু কাসেন।

শহীদ অমরচাঁদ

[ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অজ্ঞাত সৈনিক]

অচল ভট্টাচার্য

গুপ্তচরের মুখে খবরটা শুনে চমকে উঠলেন ইংরাজ সেনাপতি। অবিশ্বাসের স্বরে বল্লেন—গোয়ালিয়র রাজ জীয়াজীরাও সিন্ধিয়া সিপাহীদের বিদ্রোহ দমনে আমাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন, সুতরাং সিন্ধিয়ার রাজকোষের অর্থ ইংরাজদের শত্রু নানা সাহেব আর ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কাছে যাচ্ছে একথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

গুপ্তচরটি তার খবরের সত্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে বলে—সত্যি সাহেব, অমরচাঁদজী সিন্ধিয়ার কোষাগার থেকে সাড়ে বিশ লক্ষ টাকা নানা সাহেবকে পাঠিয়েছেন, রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সৈন্যদের বেতন এবং রসদের জন্যও তিনি অনেক টাকা খরচ করেছেন।

—সব সিন্ধিয়ার টাকা ?

—নিশ্চয়ই হুজুর, নইলে অমরচাঁদজীর নিজের ত অত টাকা নেই।

—কে এই অমরচাঁদ ?

সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে গুপ্তচর সবিস্তারে অমরচাঁদের পুরো নাম বললে, অমরচাঁদ রাঁঠিয়া। বাবার নাম অবীরচাঁদ রাঁঠিয়া, এরা রাজস্থানের বীকানীরের অধিবাসী, সিন্ধিয়ার অধীনে চাকরী নিয়ে নিজের যোগ্যতা দেখিয়ে অমরচাঁদ এখন সিন্ধিয়ার কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন।

সব শুনে সেনাপতি খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে কিভাবে অবিশ্বাস করা যায়, কিভাবে অমরচাঁদের অপরাধ প্রমাণ করা যায়, সমস্যার আশু কোন সমাধান সূত্র বের করতে না পেরে সেনাপতি সাহেব বলেন—ঠিক আছে। রাজকোষ থেকে এত টাকা বেরিয়ে কোথায় গেল সে খবর নেবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাতে শীগগির জীয়াজীরাওকে চিঠি পাঠান আমি সেই ব্যবস্থা করছি, যদি তোমার খবর সত্য হয় তা' হলে নিশ্চয়ই উপযুক্ত পুরস্কার পাবে।

সাহেবের অজ্ঞতায় একটু হেসে গুপ্তচরটি বলল—ওরকম চিঠি পাঠিয়ে কোন কাজ হবে না সাহেব। কারণ সিন্ধিয়া ত আর জানেন না তার রাজকোষে কত টাকা, হীরে, মুক্তা জমা হয়েছিল আর তার মধ্যে কত খরচ হয়েছে এখন কত টাকা আছে।

—সিন্ধিয়া নিজে না জানুন, তার রাজকোষের হিসাব রাখার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আছে।

—আজ্ঞে হিসাব রাখার যা ব্যবস্থা করবার তা ঐ অমরচাঁদজী-ই করেন।

গুপ্তচরটি সিন্ধিয়ার কোষাগারের রহস্যটি ইংরেজ সেনাপতিকে বোঝাবার চেষ্টা করে। গোয়ালিয়র রাজপরিবারের নিয়ম হল রাজা কোনদিন তার কোষাগারে—যার নাম হল গঙ্গাজলী —কি জমা হল নিজের চোখে দেখবেন না এবং তা থেকে নিজের জন্য কিছু খরচাও করবেন না। তাই—

গুপ্তচরকে থামিয়ে দিয়ে ইংরাজ সেনাপতি বলেন—তাই সিন্ধিয়া কোষাগারের হিসাব রাখার কোন ব্যবস্থাও করেন নি।

—ঠিক বলেছেন হুজুর, ইংরাজ সেনাপতির মন্তব্যকে সমর্থন করে গুপ্তচরটি বলে, ফলে যার হাতে কোষাগার তার হাতেই আছে হিসাবপত্র রাখার দায়িত্ব।

—সেই লোক যদি কোষাগারের ধনরত্ন তার নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে যায়?

একটু হেসে গুপ্তচরটি ইংরাজ সেনাপতির প্রশ্নের উত্তর দেয়—তাহলেও সিন্ধিয়া কিছুই জানতে পারবেন না, তবে অমরচাঁদজী সেরকম লোক নন। তিনি এক পয়সা কোষাগার থেকে নিয়ে নিজের জন্য খরচ করেন না।

—তবে তিনি এতটাকা নানাসাহেব আর লক্ষ্মীবাঈকে দিলেন কেন?

—সে খবরও সংগ্রহ করেছি সাহেব। একগাল হেসে গুপ্তচরটি জানায়,-দুষমন ইংরাজকে হিন্দুস্থান থেকে হঠাতে চাইছে—সেটা নাকি খুব ভাল কাজ। তাই অমরচাঁদজীর মত হল যেভাবে হোক এদেরকে সাহায্য করা উচিত।

গুপ্তচরের কথায় লাফিয়ে উঠলেন ইংরাজ সেনাপতি—ঠিক আছে, যুদ্ধে জিতে আমরা যখন অমরচাঁদের বিচার করব তখন তুমিই হবে আমাদের পক্ষে প্রধান সাক্ষী। যদি ঠিক মত অমরচাঁদের অপরাধ প্রমাণ করতে পার তাহলে তাকে ফাঁসি কাঠে ঝোলাব আর তোমাকে দেব যথোচিত পুরস্কার।

সিপাহী বিদ্রোহ দমন করে সত্যি-ই ইংরাজরা ১৯৫৮ খৃীষ্টাব্দে অমরচাঁদকে দেশপ্রেমের অপরাধে ফাঁসী দেয়।

আজও গোয়ালিয়রের লস্কর মরাফা বাজারের দুটো বড় দোকানের মধ্যে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা দেড়শ বছরের পুরানো একটি নিম গাছ দেখা যায়। ঐ গাছেই অমরচাঁদজীকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে এরকম বহু শহীদ আছেন যাদের আত্মদানের কাহিনী আজও ইতিহাসের পাতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থান পায় নি!

খেলার বেলায়

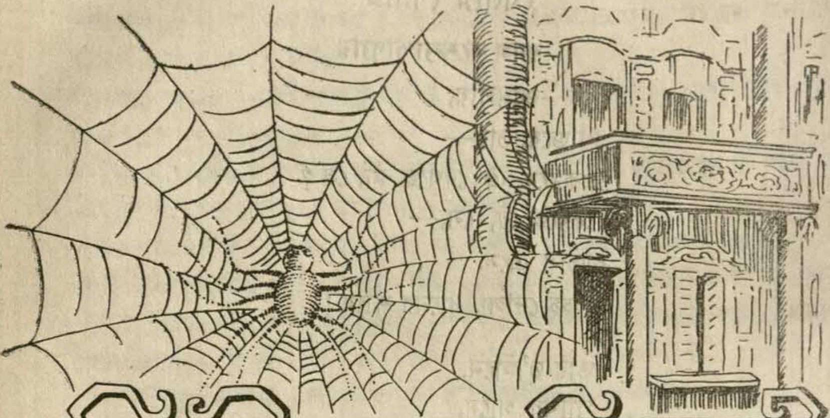
শ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়

পূব—জানলায়,
দাঁড়িয়ে, ঠায়—
একমনে, ঐ দেখছে কী, সে ?
দেখছে যে, সে,—
বাতাস এসে,
দিচ্ছে দোলা, ধানের শীষে !

তার দু'কানে,
পাখির গানে,
বুকের মাঝে লাগছে নাড়া।
উদাস দুপুর,
মন কতদূর—
যাচ্ছে, হয়ে আপন-হারা !

দুপুর, তাকে
যেমনি ডাকে,
বাইরে এসে, খেলতে বলে ;
আনমনে, সে
বাইরে এসে
নাম লেখালো, খেলার দলে।

চলছে খেলা,
দুপুর বেলা,
হঠাৎ, কখন খেলার ফাঁকে,—
মন ঘুরে যায়,
চমকে তাকায় ;
পিছন থেকে, মায়ের ডাকে !



চিলকী গড়ের নিঝুমপুরী

রামকৃষ্ণ দত্ত

চারিদিকে ঘন অন্ধকার, বৃষ্টির দাপটে রাস্তার দুপাশের জঙ্গলগুলো যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। গাড়ীর জানালাটা কোনও রকমে ফাঁক করতেই বৃষ্টির একটা ঝাপটা আমার জামার সামনের দিকটা একদম ভিজিয়ে দিলে। তাড়াতাড়ি বন্ধ করতে বাধ্য হলাম।

পাশের ভদ্রলোক একটু কটাক্ষ করলেন—"কি হচ্ছে দাদা, প্রকৃতির রূপ দেখার শখ হয়েছে বুঝি?"

এরই মধ্যে মনের কোণে একটা অজানা ভয় উঁকি ঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। এমন দুর্যোগ রাত যেন এর আগে কখনও দেখিনি। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে, জঙ্গলের পর জঙ্গল ফেলে বাসটা বেশ ভালই চলছিল। শুধু ভাবনা একটাই—কখন গিয়ে কলকাতা পেঁছই। বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই এই ভাবনাটা হচ্ছিল। রাস্তা নেহাৎ কম নয়। এখনও প্রায় মাইল ছত্রিশ হবে। সঙ্গে ছিল অফিসের বন্ধু জীতেন, পুরো নাম জীতেন্দ্র বিক্রমদত্ত। ওরই অনুরোধে ভোর বেলা কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে ছিলাম একটু দূরে কোথাও বেড়িয়ে আসব বলে। সারা দিনটা রদ্দুর আর রদ্দুরে ভরে গিয়েছিল। কে জানত ফেরার সময় এমন বর্ষা আর দুর্যোগের পাল্লায় পড়তে হবে!

আধবোজা চোখে বাসের মধ্যে বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন যে একটু তন্দ্রা এসেছিল মনে নেই। হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে বাসটা জোরে ক্যাঁ-অ্যাঁ-চ্ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়তেই,

গাড়ীর বেশীর ভাগ প্যাসেঞ্জারই সীটের সামনের দিকে আচমকা ধাক্কা খেয়ে চীৎকার করে উঠলো। আমিও হঠাৎ এরকম একটা ঘটনা ঘটায় বেশ খানিকটা হক্‌চাকিয়ে গেলাম। ঘুমের ঘোর কাটিয়ে বোজা চোখ খুলে বড় বড় করে চোখ চাইবার চেষ্টা করলাম।

কনডাক্‌টারের হতাশ সুরের আওয়াজ—বাস ব্রেকডাউন হয়েছে।

আমি কনডাক্‌টারকে জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার বাস ঠিক হতে কতক্ষণ লাগবে ?"

—"লোক পাওয়া গেলে সময়টা কম লাগবে দাদা, তবে এই দুর্যোগে লোক পেলে হয়। জানিনা আজ রাতে কলকাতা পৌঁছতে পারব কিনা।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত সাড়ে দশটা। এত প্রবল বর্ষায় আর ঝড়ের তাণ্ডবে, বাসের বাইরে নেমে দাঁড়াবার মত অবস্থা একদমই ছিল না। জীতেনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম সে তখন মহা আরামে নাক ডাকিয়ে চলেছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাসে বসে থেকেও বাসের চাকার যখন কোনও গতি হল না, আমি তখন সত্যি সত্যি হতাশ হয়ে জীতেনকে ডেকে বসলাম। আমার ডাকে জীতেনের নাক ডাকা বন্ধ হল। ঘুমের ঘোর কোনও রকমে কাটিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—"কিরে শিবেন, বাস দাঁড়িয়ে কেন ? কোথায় এলাম ?"

—"ঠিক বলতে পারছি না, বাইরে বড্ড অন্ধকার।" কথাটা বলে বাসের দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। জীতেন আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখি বৃষ্টির তাণ্ডব তখন একদমই কমে এসে ফোঁটা ফোঁটায় দাঁড়িয়েছে। আমি এই অবস্থায় বাস থেকে নীচে নেমে আবার কনডাক্‌টারকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় আমরা এসেছি ভাই ?"

—"চিল্‌কিগড়"—কাজের মধ্যেই কনডাক্‌টার বললে।

কনডাক্‌টারের কথা শেষ হতে না হতেই জীতেন ওর জায়গা ছেড়ে হুড়মুড়িয়ে বাসের দরজার কাছে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"কি বললে কনডাক্‌টার ?"

আমি বললাম—"চিলকিগড়"।

জীতেন তড়িৎগতিতে বাস থেকে নেমে চারিদিকে কি যেন দেখতে লাগল।

জীতেন যেন চিন্তা করতে করতে কি একটা হিসেব কষে নিলে। তারপর আমায় বলে উঠলো—"শিবেন দেখতো ঘড়িতে কটা বাজে।"

হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে ওকে বললাম—"রাত প্রায় পৌনে একটা।"

জীতেন বলল—"শিবেন কনডাকটারদের কথা শুনে মনে হচ্ছে এখানেই রাত কাটাতে হবে।"

আমি বললাম—"বলিস কিরে ? খুব ভাবনায় পড়া গেল যে।"

বিজ্ঞের মত জবাব দিল জীতেন—"আমি যখন সঙ্গে আছি, তোর একটা হিল্লে হবে নিশ্চয়। চলে আয় আমার সঙ্গে, দেখা যাক অন্য কোথায় রাত কাটাতে পারি কিনা।

বাসে আমিও রাত কাটাতে চাই না। তবে আজ আমাদের ভাগ্যে মনে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া জুটবে না, বুঝলি।"

ওর কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে না পেরে বললাম—"তার মানে, তুই কোথায় যেতে চাস?"

জীতেন শুধু একটু হেসে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল। আমি বাধ্য হয়েই ওকে অনুসরণ করলাম।

যদিও বৃষ্টি এখন একেবারেই থেমে গেছে তবুও চারপাশে ঘন অন্ধকার। দুপাশের দোকানপাট সব বন্ধ। লোকজনের সাড়া শব্দ নেই। এই অন্ধকারে আমরা যেন গহন অরণ্যের মধ্য দিয়ে নিস্তব্ধ নিঝুমপুরীর দিকে এগিয়ে চলেছি।

বড় রাস্তা ছেড়ে এবার আমরা গ্রামের মেঠো পথে এসে পড়লাম। চলেছি তো চলেছি—মনে হচ্ছিল জীতেনের যেন এখানকার রাস্তাঘাটগুলো আগে থেকেই জানা।

মাঝে মধ্যে রাস্তার ওপর দিয়েই দু-একটা শিয়াল দৌড়ে পালিয়ে গেল। শিয়ালের আনাগোনায় আর ঝোপে-ঝাড়ে খসখস শব্দে সারা শরীরটা যেন শিউরে উঠলো।

জীতেনকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কোথায় যাচ্ছিস বলতো?"

—"ঐ যে এসে গেছি"—বললে জীতেন।

সামনে তাকিয়ে দেখি আবছা আবছা অন্ধকারে কি যেন একটা মস্ত দানবের মত দাঁড়িয়ে আছে! রাস্তার দুধারে ঘন ঝোপ ফেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম। জীতেনও তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঐ অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। হঠাৎ কেন জানিনা নিজেকে বড্ড নিঃসঙ্গ মনে হল। চেঁচিয়ে ডাকলাম—"জীতেন কোথায় গেলি?"

জীতেনের দূর থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল—"শিবেন এগিয়ে আয় আমি আছি।"

হঠাৎ ঘন অন্ধকারে চলে গিয়ে সামনে পড়ল একটা ফাঁকা মাঠ। অত অন্ধকারেও একটা মেঠো পথ দেখতে পেলাম, সোজা এগিয়ে গেছে সামনেই সেই দাঁড়িয়ে থাকা দানবটার দিকে। ক্রমশই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখা গেল, দানব নয় এটা একটা বিরাট প্রাসাদ। রাস্তায় আসার সময় একটু আগে আমার মনের মধ্যে যে কল্পনার উদয় হয়েছিল, এখন দেখছি সেই কল্পনাটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে—সত্যি এই প্রাসাদকে নিস্তব্ধ নিঝুমপুরীই বলা চলে। প্রাসাদের সামনে দেখা গেল একটা বিরাট সিংহদরজা। সামনে এসে দাঁড়াতেই হঠাৎ ভেতর থেকে জীতেনের গলা শোনা গেল—"শিবেন, আমরা এসে গেছি—"

সত্যি দেখলাম, জীতেন আর তার পাশে মুড়ি সুড়ি দেওয়া একটা লোক, হাতে লণ্ঠন নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াল। লোকটার মুড়িসুড়ি দেওয়া দেখে বুঝলাম, খুব বৃষ্টি হওয়ায় গ্রামের বুকে একটু ঠাণ্ডা পড়েছে।

লোকটাকে এবার লক্ষ্য করলাম ভাল করে। হাই তুলছে, বোঝা গেল ঘুমের ঘোর এখনও কাটেনি।

জীতেন এবার লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললে—"কালিচরণ ভেতরে চল্, হারিকেনটা ভাল করে দেখা, না হলে শিবেনের অসুবিধে হবে।"

কালিচরণ আমাকে আলো দেখিয়ে এগিয়ে চলল বাড়ীর মধ্যে। আবার ভাল করে লক্ষ্য করলাম ওকে—চেহারাটা প্রথম দেখলে ওকে যেন একটু ভয় করে। বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা, ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা। মাথাটা দেহের তুলনায় একটু ছোট।

মুখের বাঁ দিকটায়, চোখের ভুরুর ঠিক ওপরেই একটা বিরাট কাটা দাগ। এরজন্য ওর মুখের আসল চেহারাটা বদলে একটা ভয়ঙ্কর চেহারায় দাঁড়িয়েছে। বয়স বছর ষাটের মত হবে। আমি ওর চেহারাটা বার বার দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েছি কয়েক সেকেণ্ডের মত।

জীতেন বললে—"কি রে দাঁড়িয়ে পড়লি যে?"

লোকটাও বললে—"বাবু এগিয়ে আসেন।"

আবার চলতে শুরু করলাম। ভেতর বাড়ীর একটা ছোট্ট উঠানে এসে পড়লাম। জীতেন বললে—শিবেন দেখ এটা হচ্ছে ঠাকুর দালান। ঐ ওপরটাতে আগে পুজো হত। এখন সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, শুধু পড়ে আছে ঠাকুর দালানটা।

এবার আরও ভেতর-বাড়ীতে ঢুকে পড়লাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার, দুপাশের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বহুদিন পড়ে থাকা বাড়ীর একটা অদ্ভুত ভ্যাপসা গন্ধ নাকে আসতে লাগল। মনে হল, দরাজা জানলা বন্ধ হওয়া বন্ধ ঘরে চামচিকের বাসা না থাকলে এমন গন্ধ হয় না।

কোনও রকমে দুটো ঘরের মাঝের সরু পথটাকে ফেলে একটু পরেই ভেতর মহলে পেঁছে গেলাম।

সামনে চলতে চলতে হঠাৎ কালিচরণ থেমে গিয়ে আমায় ডাকলে—"বাবু এগিয়ে আসেন", ওর হাতের হারিকেনটা সামনের দিকে তুলতেই চোখে পড়ল মহলের কোণের দিকে একটা লোহার ঘোরান সিঁড়ি। ও বললে—"বাবু ঐ সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে এবার।"

উঠতে উঠতে বুঝলাম, বহুদিন পড়ে থাকা সিঁড়িটা এখনও বেশ মজবুত। সিঁড়ি বেয়ে দোতলার ছাদে এসে পেঁছিলাম। ফাঁকা জায়গায় পড়াতে বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। আকাশের দিক তাকিয়ে দেখি—আকাশটায়, একদিকের মেঘ পাতলা হয়ে, ভাসা ভাসা মেঘের ভেতর দিয়ে অস্পষ্ট একফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণের দুর্যোগের ভয়াবহ রূপ কেটে গিয়ে প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধরূপ চোখে পড়ল।

জীতেনকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"কিরে কোথায় এলাম বলত? কিছুই বুঝতে পারছি না!"

জীতেন বললে—"এখুনি সব বুঝতে পারবি।" তারপর কালিচরণকে উদ্দেশ্য করে বলল—"ডান পাশের ছোট ঘরটায় চল, রাত্তিরটা ওখানেই কাটাব। ঘরে একটা হ্যারিকেন রেখে দিয়ে যা।

কালিচরণ আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকলো। সে তাড়াতাড়ি ঘরের জানালাগুলো খুলতে গেল। জীতেন বলল—"সব জানলা খুলতে হবে না। বাইরে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে, দুটো খুললেই চলবে।
কালিচরণ জানালার দিকে এগিয়ে গেল।
জীতেন হ্যারিকেনটা ধরে ঘরের চারপাশটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বলল—না ঘরটা বেশ পরিষ্কারই আছে।
আমি ঐ আলোতেই দেখলাম, ঘরের একপাশে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করান রয়েছে ছত্রী সমেত একটা অপূর্ব নক্সা করা খাট্। দেওয়ালের আর একপাশে পড়ে আছে বিরাট তিনটে সোফা। স্প্রিংগুলো কাপড় ছিঁড়ে ওপর দিকে ঠেলে উঠেছে, বসবার অবস্থা নেই। কি খাটের কাঠ কি সোফার কাঠ, এত সুন্দর, মজবুত আর কারুকার্য-করা যা দেখলেই বোঝা যায়—এরা পুরোনো আভিজাত্যের একটা চিহ্ন এখনও বহন করে চলেছে।
ঘরের চারদিকের দেওয়ালে বেশ ভাল ভাল কিছু ছবি অগোছাল ভাবে আটকানো। তবে সিলিং-এর আর একপাশে বর্ষার জল যে ছাদ থেকে ঘরে ঢুকেছে তার চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে দেওয়ালের গা দিয়ে জল গড়ানোর দাগ দেখে।
তক্তাপোষের ওপর চোখ পড়তেই বোঝা গেল, তোষক একটা পাতা আছে, দুটো বালিসও। তোষকের ওপর অবশ্য কোনও চাদর নেই।
জীতেন বলল—"কালিচরণ তক্তাপোষটা আর তোষকটা একটু ঝেড়ে দিয়ে একটা চাদর পেতে দিতে পারিস?"
—"হ্যাঁ বাবু", বলে কালিচরণ তক্তাপোষ, গদি আর বালিশগুলো ঝেড়ে দিয়ে হ্যারিকেনটা নিয়ে বেরিয়ে গেল চাদর আনতে। ঘরটা ক্ষণেকের জন্য একটু অন্ধকার হলেও চাঁদের আলো বাইরে থাকায়, ঘরের মধ্যেটা আবছা দেখা যাচ্ছিল।

জীতেনের কথায় ঘর ছেড়ে ছাদের ওপর দুজনে এসে দাঁড়ালাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি, বিরাট প্রাসাদ নীচে থেকে কিছুই আন্দাজ করা যায় না।
জীতেন বললে—"ঐ যে দূরে ফলের বাগান দেখছিস, ওখানে একসময় ঘন জঙ্গল ছিল। ছোট ছোট বাঘ বেরোতো ঐ জঙ্গলে। এখন অবশ্য তার চিহ্ন পাওয়া যায় না, লোকালয় আশে পাশে বেড়েছে বলে। তবে শেয়ালের উপদ্রপ লেগেই আছে।"
আমি বললাম—"কি ব্যাপার রে জীতেন, প্রাসাদের ঐ দিকটা এমন পোড়ো বাড়ী হয়ে আছে কেন? এ প্রাসাদটাই বা কার? এটা জমিদার বাড়ী বলেই মনে হয়। তোরই বা এ প্রাসাদের সঙ্গে কি সম্পর্ক?"
জীতেন বললে,—"সে অনেক কথা।···শোনা যায়—এই চির্লাকি গড়ের জমিদার "বীর বিক্রম দত্তের" আমলে এই প্রাসাদটা তৈরী হয়েছিল। ঐ পেছনের মহলে থাকতো জমিদারের লেঠেলরা। আর এক পাশে ছিল একটা গুম ঘর, যেখানে প্রজাদের দরকার

হলে শাস্তি দেওয়া হোতো। তারপর ইংরেজ রাজত্বের সুরু হলে এখানকার জমিদারীর হয় অবলুপ্তি।"

আমি হাঁ করে জীতেনের কথাগুলো শুনছিলাম। একটা কথাই বার বার মনের কোনে উঁকি মারতে লাগল। বীর বিক্রম দত্ত আর জীতেন্দ্র বিক্রম দত্ত! নামের একটা বেশ মিল পাওয়া যাচ্ছে তো,—তবে কি জীতেন এই জমিদারের কেউ বা জমিদারীর অংশীদার! কথাটা ভেবে নিয়ে জীতেনকে প্রশ্ন করতে যাবো—এমন সময় কালিচরণের ডাক্—"বাবু ঘরে চলেন"।

আমার প্রশ্ন করায় সাময়িক ছেদ পড়ল! তাকিয়ে দেখি ওর এক হাতে একটা বড় চাদর নক্সা করা, আর কিছু ছোট ছোট কাপড় রয়েছে, অন্য হাতে হ্যারিকেন আর একটা মোমবাতি।

আমরা কালিচরণের পেছন পেছন গিয়ে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়ালাম। কালিচরণ ঘরের মধ্যে গিয়ে তোষকের ওপর চাদর বিছিয়ে দিলে, আর বালিশ দুটোকে ঢেকে দিলে ছোট কাপড় দিয়ে। কোনের দিকে পুরোনো একটা কাঠের টিপয় ছিল এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। কালিচরণ হ্যারিকেনটা ওর ওপর রাখতেই টিপয়টা চোখে পড়ল। হ্যারিকেনের আলো থেকেই মোমবাতিটা ধরিয়ে নিয়ে, 'ও' আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

জীতেন বলল,—"শুয়ে পড়, অনেক রাত হয়েছে।" আমি হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি প্রায় দুটো হবে। বিছানায় শুয়ে আমার কিন্তু মনের মধ্যে থেকে এই প্রাসাদ আর জমিদারীর ইতিহাস জানবার স্পৃহা এখনও যায়নি বলে, জীতেনকে আবার জিজ্ঞাসা করে বসলাম,—"আচ্ছা জীতেন, এই প্রাসাদের সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক বললি নাতো? আর এই জমিদারীর ইতিহাস সম্বন্ধে আমায় যদি আরও কিছু জানাস আমি খুব খুশী হব।"

—"তবে শোন", খাটে শুয়ে শুয়েই জীতেন বলতে সুরু করলে,—"এই চিলকিগড়ে আমাদের চার পুরুষ আগে এক প্রতাপশালী পুরুষ অন্য কোনও জায়গা থেকে এখানে এসে বসবাস করেন। পরে নিজের বুদ্ধির জোরে প্রচুর অর্থ উপার্জন ক'রে বিত্তশালী হয়ে ওঠেন আর সেই সময় অর্থের বিনিময়ে, আশে পাশের বহু জমি করায়ত্ব করেন। আরও পরে দেখা যায়—তিনি নিজেকে ক্রমশ এই জায়গায় পুরোপুরি জমিদার রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। চিলকিগড়ে তাঁর দত্ত বংশেরও প্রতিষ্ঠা হয়। বহু গরীব ও ধনী প্রজাও সেই সমর তাঁর শরণাপন্ন হতে থাকে। তাঁর জমিদার হিসাবে সেই সময় খুবই সুনাম হয়েছিল! এরপর তাঁর বিশাল জমিদারীর ভার পড়ে একমাত্র পুত্র বীর বিক্রম দত্তের ওপর। এই সময় মাকড়দহ জমিদারীর খুব বাড়বাড়ন্ত হয়।

ইংরেজ রাজত্বের তখনও সুত্রপাত হয়নি। জমিদারের ক্ষমতা তখন চারিদিকে সাংঘাতিক। প্রবল প্রতাপশালী জমিদার বীর বিক্রমও এঁদের ব্যতিক্রম নন। মহালের পর মহাল তাঁর অধিকারে এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এই বিরটে প্রাসাদটিকেও

তিনি আরও বিরাট করে প্রায় দুর্গের আকারে তৈরী করলেন। প্রাসাদের মহলও অনেক বাড়ান হল।
প্রথম মহল হল "দেবালয়," তারপরের মহলে হল "বিদ্যালয়"। তৃতীয় মহলে স্থাপনা "রঙ্গালয়," তার পরের মহল ছিল অন্দর মহল বা মেয়ে মহল, প্রাসাদের স্ত্রীলোকদের জন্য। সব শেষে যে মহলটি তিনি করেছিলেন, সেটিকে তখনকার প্রজারা সবাই বলত যমালয়। এখানে থাকতো জমিদারের প্রচুর লেঠেল, তারা ধরে আনত সেইসব প্রজাদের যারা জমিদারকে খাজনা দিত না, অবজ্ঞা করত, বা শত্রুতা করত। এই মহলে ছিল একটি গুমঘর যার অস্তিত্ব এখনও কিছু কিছু আছে।
"ছাদে দাঁড়িয়ে এই মহল সম্বন্ধেই একটু আগে আলোচনা করছিলাম শিবেন। যাক্ ফিরে যাই আবার আগের প্রসঙ্গে—শোনা যায় ঐ গুম ঘরে কত প্রজাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোত। খুন খারাপি, রক্তারক্তির আর শেষ ছিল না। এই ভাবেই চলতে চলতে একদিন কোথায় যে সেই সব জমিদারী তলিয়ে গেল তার খবর কে রাখে। কেবল এই বিরাট প্রাসাদ আর মহলের ধ্বংসাবশেষ বহুদিন ধরে এই জমিদারীর ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলে আসছে।
"বলতে লজ্জা নেই, আমিও এই বংশেরই একজন পুরুষ যে এই জমিদারীর শেষ অস্তিত্ব-টুকুকে আঁকড়ে রাখবার চেষ্টা করে চলেছি। বীর বিক্রম দত্ত ছিলেন আমারই ঠাকুর্দা। আমার বাবা "সিংহবিক্রম দত্তের" এই জমিদারীর ওপর একদমই লোভ ছিল না, ভালও লাগত না। তিনি ছিলেন সুন্দরের পূজারী। মনে প্রাণে ছিলেন শিল্পী। গান বাজনা, ছবি আঁকা এসব নিয়েই তিনি থাকতে ভালবাসতেন, তাই তিনি চিলকিগড়ের পাট চুকিয়ে শহর কলকাতায় গিয়ে বসবাস করেন। তবে অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হওয়ায়, আমাকে মার সঙ্গে শেষে এখানে এসেই উঠতে হয়। মার কাছ থেকে এই জমিদারীর নানা অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা শুনে প্রথম প্রথম রোমাঞ্চিত হতাম। এখন বহুদিন পরে ওসব আর মনের মধ্যে রেখাপাত করে না।
মার মৃত্যুর পর, চিলকাগড় ছেড়ে শহরে চাকরী করতে গেলাম, কারণ অর্থ উপার্জনের একমাত্র সুযোগ তখন সেখানেই ছিল বেশী। প্রথম প্রথম শহর ছেড়ে প্রায়ই দেশে আসতাম। এখানকার অন্য আত্মীয়স্বজনেরা একে একে এই প্রাসাদ ছেড়ে শহরে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আমিও শহরের আকর্ষণে ক্রমশই এখানে আসা ছেড়ে দিলাম। ক্রমে ক্রমে এই বিশাল প্রাসাদ, নিঝুমপুরীতে পরিণত হল।
জীতেনের কথাগুলো শুনতে শুনতে মন থেকে ঘুম কখন চলে গেছে খেয়ালই করিনি। লক্ষ্য করলাম ক্লান্তিতে ঘুম জড়ানো চোখে কথাগুলো বলে সে হাই তুললে। একটু থেমে আবার কোনও রকমে বললে,—"এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝলিতো শিবেন? তবে চিলকিগড়ের কথা মনে পড়লে বা নাম কোথাও শুনলে যেন মনটা ছটফট ক'রে ওঠে।"
আমি আবার প্রশ্ন করলাম,—"আচ্ছা জীতেন, কালিচরণ লোকটা তাহলে কে? ওর কপালে একটা কাটা দাগ কেন রে?"

আমরা আগ্রহ দেখে জীতেন বললে,—আমাদেরই আশ্রিত প্রজার ছেলে। শুনেছি ওর বাবা প্রভুচরণ, ঠাকুর্দার আমলে লেঠেলদের ছিল সর্দার। যেমন লাঠি ঘোরাত তেমনি ছিল সাংঘাতিক শক্তিশালী ও সাহসী। একে একে সব লেঠেলরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ঠাকুর্দার জমিদারী থেকে, শুধু বিশ্বাসী আর প্রভুভক্ত প্রভুচরণকে তিনি তাড়তে তাড়তে পারেননি, আমার বাবার নিরপত্তার কথা ভেবে। সেই থেকেই প্রভুচরণের এখানে বসবাস। তারপরে তার ছেলে কালিচরণও আমাদের এই ভগ্নস্তূপ প্রাসাদে বসবাস করছে বহুদিন ধরে, স্ত্রী সন্তানাদি নিয়ে। কালিচরণই এখন আমাদের এই প্রাসাদের "কেয়ার টেকার" বলতে পারিস। আর কাটা দাগটার ব্যাপার হল—বাবার আমলে একবার আমাদের বাড়ী ডাকাতি হয়। বাবা তখন শহরে ছিলেন। এই কালিচরণও তখন সবে যুবক হয়ে উঠেছে, তার ওপর বাপ প্রভুচরণও গত। আমাদের জমিদারীর অবস্থা তখন পড়ে এসেছে। শুনেছিলাম আমাদের প্রাসাদে ডাকাত পড়ার উদ্দেশ্য হল,—তারা নাকি খবর পেয়েছিল, আমাদের প্রাসাদে গুপ্তধন লুকানো আছে। কিন্তু ডাকাতি করে চলে যাবার সময় তারা সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও গুপ্তধন কোথাও পাওনি। এরপর আরও কিছুদিন পরে আবার একবার ডাকাত পড়ে এই প্রাসাদে কালিচরণও বিরাট লেঠেল তখন। যেমন বুকের ছাতি তেমনই বাপের মত সাহসী। বাপের কাছে তার শিক্ষা নেওয়া সার্থক হয়েছিল, এই কালিচরণই সেদিন লাঠি ধরে ডাকাতদের মোকাবিলা ক'রে এই প্রাসাদকে রক্ষা করেছিল, আর তারজন্য চোখের ওপর বল্লমের খোঁচা খেয়ে তাকে মূল্যও দিতে হয়েছিল। ওর মুখটা তারপর থেকেই একটা বীভৎস চেহারায় পরিণত হয়েছে।……জীতেনের কথাগুলো শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ একটা চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের ঘোরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি পেছনের মহলে অনেক লোকের চিৎকার।

একটু এগিয়ে গিয়ে ছাদের একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি—তারা সব মস্ত জোয়ান, কারুর হাতে মশাল জ্বলছে দাউ দাউ করে। মনে হচ্ছে আগুনের লেলিহান শিখাগুলো যেন সারা প্রাসাদটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দেবে। কারুর হাতে বড় বড় লাঠি, মাথায় ঝাঁকড়া চুলে ললে কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। ওরা চিৎকার করছে—"শিগ্গির দরজা খোল্, না হলে ভেঙ্গে দেবো।"

অন্দর মহল থেকে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল। ভেতর মহল থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠলো,—"কালিচরণ—ডাকাত পড়েছে বাড়ীতে, আমাদের বাঁচা— আমি একটু যেন অবাক হয়ে গেলাম। কি করব এই অবস্থায় ঠিক করতে পারলাম না। কেবল একটা চিন্তাই মাথায় এল। অন্দরমহলে মেয়েরা এল কোথা থেকে! কই এদের কথাতো জীতেন আমায় কিছু বলেনি! ছুটলাম শোবার ঘরে জীতেনকে জিজ্ঞাসা করব বলে—একি! জীতেন কোথায় গেল!—"জীতেন জীতেন" বলে জোরে চিৎকার করতে করতে আবার বেরিয়ে এলাম ছাদে। আবার দেখলাম ডাকাতগুলো

বাইরের দরজাটা ভেঙ্গে ফেলেছে। কালিচরণ লাঠি নিয়ে একা ওদের বাধা দিচ্ছে, কিছুতেই অন্দর মহলে ঢুকতে দেবো না। প্রাসাদের অন্যদিকের ঝোপে একটা খস খস শব্দ হওয়াতে, চোখটা স্বাভাবিক ভাবে সেই দিকে গিয়েই পড়ল। তাকিয়ে দেখি,—এক বৃদ্ধা হাতে একটা ঘড়া নিয়ে খিড়কির দরজা দিয়ে পুকুর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল সারা জায়গাটা বাঁশঝাড়ে ভর্তি তাই অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না। আমি কিছুতেই আমার দৃষ্টি সেদিক থেকে অন্যদিকে ফেরাতে পারলাম না, যদিও এরই মধ্যে অন্দর মহলের দরজা ভাঙ্গারও আওয়াজ কানে এসে লাগল। হঠাৎ দেখি সেই বৃদ্ধা আবার ফিরে আসছে প্রাসাদের দিকে, কিন্তু হাতে তার ঘড়া নেই। ডাকাত-দের কে যেন হঠাৎ ঐ দিকে এসে পড়েছিল, বৃদ্ধাকে দেখে হাতের লাঠি তুলে মারতে এল। আমি তখন বৃদ্ধাকে বাঁচাবার জন্য জোরে প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম—"কালিচরণ বাঁচাও! বাঁচাও!"

ধাক্কা খেলাম জোরে—ঘুম ভেঙ্গে গেল জীতেনের ডাকে,—"কিরে ঘুমের ঘোরে কালিচরণ, কালিচরণ করছিলি কেন?"

আমি এবার হকচকিয়ে গেলাম!—তাহলে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম!

ঘুম জড়ানো চোখে তাকিয়ে দেখি, ভোর হয়ে গিয়ে সারা ছাদটায় সকালের রোদের আমেজ এসেছে।

জীতেনের প্রশ্ন,—"কিরে কিছু বললি না তো?"

আমি বললাম—"ও কিছু না, ভোর হয়ে বেলা হয়ে গেল এবার বেরুতে হবে। কথাটা বলে ধড় মড় করে উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে।

দরজার কাছে দেখি, কালিচরণ ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে একটা পুরোনো ট্রের ওপর চায়ের কাপ। কাপ থেকে বেশ ধোঁয়া উঠছে তখনও।

জীতেন আমাকে তৈরী হতে বলে চট্‌পট্‌ নীচে নেমে গেল লোহার সিঁড়ি বেয়ে। আমি চা খেতে খেতে ছাদে বেরিয়ে দিনের আলোয় প্রাসাদটাকে ঘুরে ঘুরে দেখলাম। মনে হল,—এত যার ইতিহাস, সে আজ কত একলা।

এরপর প্রাসাদের পেছনটা দেখবার জন্য নীচে নেমে গেলাম। দেখলাম প্রাসাদে একটার পর একটা ঘর। ঘরগুলো দিনের বেলায়ও যেমন অন্ধকার তেমন স্যাঁত-সেঁতে। পেছনের সেই বড় দরজা আর গুমঘরের ধ্বংসাবশেষ, সবই আমার রাতের দেখা স্বপ্নের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে! কি অদ্ভুত সব ভুতুড়ে ব্যাপার!

কৌতূহল নিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম প্রাসাদের বাইরে দেখতে,—স্বপ্নে দেখা পুকুর-গুলো প্রাসাদের বাইরে দুপাশে সত্যি আছে কিনা!.........

আশ্চর্য! সত্যিই তো পুকুরগুলো আছে দেখছি। পশ্চিম দিকে অন্দর মহলের মেয়েদের জন্য একটা পুকুর, আর পূবদিকের সেই পুকুরটা, যেখানে বৃদ্ধা একটা ঘড়া লুকিয়ে রেখেছিল, সেটাও। এমনকি দেখতে পেলান, প্রাসাদের খিড়কি দরজা দিয়ে সেই মেঠো সরু পথটাও বেরিয়ে পুকুরের ধার দিয়ে বরাবর চলে গেছে বাঁশঝাড় আর

ফলের বাগানের দিকে। এই সেই পথ, যে পথে আমার স্বপ্নে দেখা বৃদ্ধা ঘড়া হাতে পুকুরের দিকে গিয়েছিল। ভাবছি—তাহলে! হিসেবটা মনের সঙ্গে মেলাতে পারছি না। এবার জীতেনকে ডাকতেই হল। আমি বললাম,—"আশ্চর্য ব্যাপার! জানিস জীতেন, আমি কাল রাত্রে সত্যিই স্বপ্ন দেখেছিলাম, এই প্রাসাদের সব ঘর, দরজা, জানলা, পুকুর, এমনকি ডাকাত পড়া থেকে আরও অনেক কিছু জিনিষের। আরও আশ্চর্য কি জানিস? আজ দেখছি বাস্তবে তার সব কিছুই মিলে যাচ্ছে আমার স্বপ্নের সঙ্গে। কেবল একটা জিনিষের হদিশ করতে পারছি না বলে আবার তোকে জিজ্ঞাসা করছি,—

তোদের এই প্রাসাদে গুপ্তধন থাকার ব্যাপারটা সম্বন্ধে কি জানিস বলতো?"

জীতেন আবার বলতে শুরু করলে,—"শুনেছি ভাই, এই প্রাসাদে ডাকাত পড়ার বহু আগে, এই প্রাসাদেরই এক বৃদ্ধা নাকি একটি বড় ঘড়া প্রাসাদের কোথাও লুকিয়ে রাখে সকলের অজান্তে। সকলের ধারণা সেটাই। অবশ্য জানিনা এটা গুজবও হতে পারে। আমরা এরপর সারা প্রাসাদ, প্রাসাদের ঘরের তলায় দেওয়ালে আরও যেখানে যেখানে থাকার সম্ভাবনা, সব জায়গারই সেই ঘড়া খুঁজে বেড়িয়েছি, কিন্তু সবই বৃথা।

জীতেনের কথাগুলো আমার কানেই যাচ্ছে না তখন ভাল করে—অবাক হয়ে ভাবছি এও কি করে সম্ভব হল! মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা জোর পেয়ে গেলাম এবার, ভাবলাম সব ঘটনাই যখন আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তখন বাকিটুকুও মিলে যাবে নিশ্চয়!

জীতেনকে ডেকে বললাম,—"জীতেন—তোরা শেষ পর্যন্ত গুপ্তধনের ঘড়াটা খুঁজে পেলিনা তো? এবার আমি বলি,—এবার এই পুকুরটায় দেখতো!"

জীতেন আর কালিচরণ আমার কথায় অবাক হল। আমি বললাম,—"দেখ দেখ পুকুর ঘেঁটে দেখ।"

আমার কথা শুনে কালিচরণ সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু লোককে নিয়ে পুকুরে নেমে পুকুর তোলপাড় করতে শুরু করে দিল? কিছুক্ষণের পর হঠাৎ কালিচরণই চিৎকার করে উঠল—"বাবু এখানে একটা ঘড়া মতন কি যেন ঠেকছে!"

জীতেন বললে—"তোল কালিচরণ তোল দেখি।" আমিও আশ্চর্য হলাম খুব মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল আমার। কিছুতেই ভেবে পেলাম না! এটা কি করে সম্ভব হল!

দেখি, সত্যি সত্যি একটা তামার মরচে ধরা ঘড়া তুলেছে কালিচরণ। এবার পুকুর পাড়ে তুলে এনে রাখলো ঘড়াটা। আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে দেখছি—কি বেরোয় ওর ভেতর থেকে—মুখ খুলতেই দেখা গেল 'বাদশাহী মোহর' একটা দুটো নয়, রাশি রাশি.........

জীতেনের তখন যা অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না—পাগলের মত চিৎকার করতে লাগল সে,—মোহর! মোহর! কালিচরণ—গুপ্তধন পেয়েছি এতদিনে…

এই ঘটনা ঘটে যাবার বহুদিন পরেও—মাঝে মধ্যে যখনই চিলাকিগড়ের কথা মনে পড়ে—কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না সেদিনের মোহর পাওয়ার ঘটনাটা সত্যি ঘটেছিল না স্বপ্ন দেখেছিলাম !

মামার বুদ্ধি

শৈলেন কুমার দত্ত

গদাই মামার ঘুমের ব্যাঘাত করল সেদিন মশায়
হাসব কি হায় ! কান্না পেল মামার করুণ দশায় !
অন্ধকারে ঘরের কোণে কোথায় তারা থাকে
মশারিটার ফোকর কত কেবল খেয়াল রাখে !
মারতে গেলে ঠিক সময়ে পালায় তারা উড়ে
সেদিন তাদের বাড়ল নাচন বিরক্তিকর সুরে ।
ঘুমের আশা ভঙ্গ মামার, চুপটি করে বসে
কেমন করে ঢুকছে মশা দেখেন দু চোখ ঘষে ।
বাইরে তখন সংখ্যা যত ভিতরে তার বেশি
কামড় খেয়ে উঠল ফুলে মামার দেহের পেশী ঃ
মশার মাথায় বুদ্ধি বটে ! কিন্তু মামার কাছে
এমন যে হার মানতে হল, তুলনা তার আছে !
ঘরের সকল মশা যখন ঢুকল ফোকর গলে
বেরিয়ে এলেন বাইরে মামা, বুদ্ধি কেমন খোলে !
ফোকরগুলো বন্ধ করে তাকিয়ে দেখেন হেসে
সকল মশা বন্দী তখন মশারিটায় এসে ।
ক্রুদ্ধ মশা চেঁচায় যখন জব্দ নিজের পাকে—
বাইরে তখন ঘুমোন মামা আরামে নাক ডাকে !

———



তুলতুলির সাধ

সাগরিকা শর্মা

বিকেল বেলা বাবা অফিস থেকে ফিরেই ডাকলেন-তুলতুল, তুলতুলি—

তুলতুল তখন ওর ছোট্ট হারমনিয়মটি নিয়ে বসেছিল গলা সাধতে। বাবার ডাক শুনতে পেয়েই পড়ে রইল হারমনিয়ম—এক ছুট্টে চলে গেল বাবার কাছে। তুলতুল জানে বাবা মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফিরবার সমবার ওর জন্যে একটা না একটা কিছু নিয়ে আসেন। ঐ হারমনিয়ামটিও এভাবে নিয়ে এসেছিলেন একদিন। হাঁপাতে হাঁপাতে তুলতুলি গিয়ে দাঁড়ালো বাবার সামনে। কপালের ওপর থেকে কোঁকড়া চুলের গুছি সরিয়ে দিয়ে জিগেস করল-কি বাপি?

বাবার হাতে একটা ছোট্ট কাচের বাক্স তার মধ্যে কি এসব? তুলতুলির চোখ দুটি খুসীতে ঝিলিক খেয়ে গেল। বাবা কাচের বাক্সটি মেয়ের চোখের সামনে তুলে ধরে বললেন,—দেখতো মামণি, কি এনেছি তোমার জন্য?

এইবার তুলতুলি ভাল করে চেয়ে দেখল, ছোট্ট কাচের বাক্সটিতে ভরে তাছে স্বচ্ছ রুপোলী জলে। ছোট ছোট ঘাস মতো কি যেন আছে ওর মধ্যে। আর আর কি চমৎকার ছোট্ট ছোট্ট রঙীন মাছ ঘুরে ফিরে খেলা করছে ঐ এতটুকুনি জলে। নীল, খয়েরী, লাল, সোনালী কত।

বাবা হাসি মুখে বললেন,—এই অ্যাকুইরিয়ামটি আজ আনলাম মা তোমার জন্যে—বলতে বলতে অতি আদরে মেয়ের হাতে অ্যাকুইরিয়ামটি তুলে দিলেন।

তুলতুলি খুসীতে টলমল করে উঠল—ও দিদা, দেখে যাও, বাবা আমার জন্যে কি নিয়ে এসেছে? ও কিষাণদা দেখে যাও।

স্মিত মুখে বাবা তার মা মরা আট বছরের মেয়ের খুসী দেখতে লাগলেন। দিদা টল টলে পায়ে ছুটে এলেন,—কি হলো রে তুলি কি হলো? ওমা! খোকা বুঝি আজ তোর জন্যে একেবারে খাঁচা শুদ্ধ মাছ নিয়ে এসেছে? বাঃ খুব সুন্দর তো দেখতে—তা আনলেই তো হলো না ওদের এখন কি খাইয়ে জীইয়ে রাখবি?

তুলিতুলির বাবা মৃদু হাসলেন,—ওসব ব্যবস্থা আমি করে দেব মা, তুমি কিছুছু ভেবো না আর।

কিষাণও এসে এতক্ষণে সবিস্ময়ে সকৌতুকে মাছগুলিকে দেখছিল। হঠাৎ হুট করে তুলতুলির হাত থেকে অ্যাকুইরিয়ামটি তুলে নিয়ে বলল,—ওসব মাছ মানুষ করতে তুমি পারবে না দিদিমণি, ও ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও—

তুলতুলি হেসে উঠল—শুনছ বাবা? কি বলছে কিষাণদা? মাছ কে নাকি মানুষ করবে?

বাবাও হেসে ফেললেন,—মাছকে মানুষ করতে করতে কিষাণটাই না মাছ হয়ে যায়।

কিষাণ অপ্রস্তুত হয়ে—বলল, আমি কি তাই বলেছি নাকি? আমি তো মাছগুলিকে পোষার কথা বলছি।

দিদা বললেন—থাক, তোকে আর বক্তিমে করতে হবে না কিষাণ। এবার আয় তো, আমার ঠাকুর ঘরের বাসনগুলো মেজে দিবি।···

এরপর থেকে বাড়ির মধ্যে অ্যাকুইরিয়ামটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে উঠল তুলতুলি আর কিষাণের কাছে।

ওদের জল পালটে দেওয়া, খাবার খাওয়ানোতে যে কি আনন্দ তা' আর কাউকে বোঝানো যায় না। এরকম আনন্দ কি আর জগতে আছে? আর মাছগুলো তো সব সময়ই খেলা করছে। তুলতুলি অবাক হয়ে ভাবে একতিলও কি ওদের বসে থাকতে নেই? ওদের হাঁপ ধরে না? ঘুম পায় না? তুলিতুলি চোখ বড় বড় করে ওদের দেখে, কত রকম ভাবে যে ওরা সাঁতার কাটে আর এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়ায়—আশ্চর্য্য! সত্যিই কি ভালো যে লাগে ওদের দেখতে। ছোট্ট কাচের বাক্সটির মধ্যে যেন একটা রঙীন খুসীর পৃথিবী। কত রকম যে ওদের গায়ের রঙ লাল, নীল, খয়েরী সোনালী আর রুপোলী—কত রকম।

তাই তুলতুলি মাছগুলির নাম দিল লালি, নীলি, সোনালী আর রুপোলী।

···কিছুদিন পরেই গ্রীষ্মের ছুটি। ছুটির কিছুদিন আগে দেশের বাড়ী থেকে ছোট কাকা এলেন মাকে কয়েক মাসের জন্যে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবার ইচ্ছেয়।

দিদার কিন্তু যেতে আপত্তি—কি করে যাই বল? মা-মরা ঐটুকুনি নাতনীকে ফেলে রেখে?

ছোটকা বললেন, বেশ তো তুলতুলিকে নিয়েই চল না? ও তো এখন একটুখানি বড়ো হয়েছে···আর তুমি কাছে থাকলে ওর কোন অসুবিধেই হবে না। দেশের বাড়ীটাও দেখে আসবে। কখনও তো গ্রাম দেখে নি।

এবার বাবা আপত্তি করলেন—ওর পড়াশুনা রয়েছে—মাষ্টার আসবে—

তুমি কিছু ভেবো না দাদা, একমাস পরে আমিই ওকে এখানে রেখে যাব। পড়া-শুনোর কথা বলছ? তা কয়েকটা বই-পত্তর সংগে নিয়ে চলুক না? ওর কাকীর কাছে পড়বে। আমার ছেলে রিণ্টুও তো প্রায় ওরই বয়েসী—এক সঙ্গেই পড়বে দুজনে? তুই কিসে কাঁচা রে তুলি? অঙ্কে? তাহলে অঙ্কের বইটিই সঙ্গে নিয়ে চল।

অবশেষে কিছুটা ইচ্ছেয় কিছুটা অনিচ্ছেয় তুলতুলি ছোট কাকু আর দিদার সঙ্গে দেশের বাড়ীতেই চলল। কিন্তু মাছগুলিকে ছেড়ে যেতে তো মন চায় না। যদিও কিষাণদা তাদের দেখাশুনো ঠিক মতোই করবে—তবুও যাবার আগে ছলছল চোখে তুলতুলি কাচের বাক্সটির সামনে দাঁড়িয়ে মাছগুলির কাছে বিদায় নিয়ে গেল।

এই লালি, নীলি, সোনালী, রুপালী তোরা সব ভাল থাকিস, আমি দেশের বাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছি। কিষাণদা রইল, ও তোদের দেখাশুনা করবে। আমি একমাস পরে আবার এসে তোদের খাওয়াবো—আদর করবো।

দেশের বাড়ীতে এসে তুলতুলি তো অবাক। পৃথিবীতে যে এত চমৎকার জায়গা আছে তা সে কল্পনাই করতে পারে নি। এখানে আকাশটা কি নীল, সবুজ ধানের ক্ষেতে সোনালী ধানের শীষ হাওয়ায় দুলছে। কত রকমের ফুলগাছ রাস্তার এপাশে ওপাশে। অযত্নে কত রঙীন আর সুগন্ধী ফুল ফুটে আছে। আর গাছের ডালে ডালে কত রকমের পাখি এদিক সেদিক থেকে উড়ে উড়ে এসে বসছে।

বাড়ীর পেছনের দিকে একটা টলটলে পুকুর। ছোট কাকু অনেক মাছ ছেড়েছেন সেখানে। স্বচ্ছ জলের তলায় ছোটো বড়ো মাছগুলি সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝে ওপরের জলে ভেসে উঠছে। মনে হয় চঞ্চল মাছগুলি মনের খুশিতে ছোটাছুটি করছে। ওদের কোলকাতার বাড়ীর সেই কাচের বাক্সের মাছগুলো সেই তুলনায় অনেক নিস্তেজ অনেক প্রাণহীন। অথচ ওদের কত যত্ন করা হয়—কত খেতে দেওয়া হয়।

কাকুদের বাড়ীতেও কিষাণদার চেয়ে কিছু বড় একটা ছেলে কাজ করে। নাম রাজু। ও কোন দেশের লোক কেউ জানে না। তবে কথাবার্তায় মাঝে মাঝে পশ্চিমী টান এসে যায়। পাঁচ ছয় বছর আগে নাকি হাটের কাছে পথে বসে কাঁদছিল—কাকু পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। সেই থেকেই কাকুর কাছেই আছে। ওর কোন আত্মীয় স্বজনের হদিশ পাওয়া যায় না। মাছ মাংস খায় না। সকাল সন্ধে হাতে তালি দিয়ে রাম রাম ভজন করে। তুলতুলির সাথে তার ভাব হয়ে গেল খুব। দেশ গাঁয়ের কত গল্প যে শোনে তার কাছে।

…সেদিন সন্ধে থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর হাওয়া। কাকীমণি তুলতুলি আর রিণ্টুকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে শুইয়ে দিলেন। কিন্তু রাত্তিরে হঠাৎ শোঁ শোঁ হাওয়া আর বাজ পড়ার প্রচণ্ড শব্দে তুলতুলির ঘুম ভেঙ্গে গেল। বুঝতে পারল ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি হচ্ছে। ভয়ে সে পাশে শুয়ে থাকা দিদাকে জড়িয়ে ধরে তার বুকের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে রইল। দিদারও ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল, বললেন,—ভয় কি দিদি ঘুমো। ওরকম বৃষ্টি দেশে গেরামে হামেশাই হয়। কাল সকালবেলা উঠে দেখবি আমাদের বাড়ীর উঠোনও বৃষ্টির জলে ডুবে গেছে। আবার দিনেকের মধ্যেই জল নেমে যাবে। ওতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তো তোর কাছেই আছি। ঘুমো এখন।

খুব ভোরবেলা কিন্তু তুলতুলির আবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাকিয়ে দেখল, দেয়ালের ওপরের ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে আঁধার মুছে দেওয়া ভোরের আভাস। পাশে দিদা তখনও অঘোরে ঘুমিয়ে। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে তখনও। তুলতুলি পা টিপে টিপে বারান্দায় এল। দিদা ঠিকই বলেছেন। সমস্ত উঠোনটাই জলে জলময় হয়ে গেছে। আর আশ্চর্য! রাজুদা এই বৃষ্টির মধ্যে এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে জল ঘাঁটছে কেন? এক মুহূর্ত তাকিয়েই তুলতুলি কিন্তু কাণ্ডটি বুঝতে পারলো। ছল-ছলাদি স্রোতে পুকুর থেকে অনেক-অনেক ছোটো বড়ো মাছ ভেসে এসেছে। বৃষ্টির জলে তারা ছড়িয়ে পড়েছে উঠোনের চারদিকে। মনের খুসীতে এদিক ওদিকে সাঁতার কাটছে। এমন মন মাতানো দৃশ্য তুলতুলি আর কখনো দেখে নি। আর রাজুদা করছে কি জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে একটা একটা করে মাছ ধরছে আবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে পুকুরে।…

—ও' রাজুদা মাছগুলিকে ধরে আবার ছেড়ে দিচ্ছ যে? রাখো না ধরে? দেখো অতো মাছ দেখলে পরে কাকীমণি কত খুসী হয়! কত রকমের রান্না করে—বিস্মিত হয়ে বলল তুলতুলি।

—চুপ চুপ দিদিমণি, ঠোঁটে আগুল দিয়ে চাপা স্বরে বলল, রাজু—বাবু ঘুম থেকে উঠলে পরে এখনই সব মাছ খলুই দিয়ে ধরে রেখে দেবে। তারপর তো ঝাল, ঝোল ভাজাভুজি নানারকম রান্না-বান্না হবেই। এখন আমি যতটুকুন পারি এই জলের জীবগুলিকে ওদের আস্তানায় পাঠিয়ে দি'—যতক্ষণ বাঁচে-আনন্দে বাঁচুক। দেখ না —মা বাবা আর ছেলে মেয়েরা মিলে কি রকম আনন্দ করে বেড়াতে বেরিয়েছে? আজ যে ওদেয় নতুন বারিষের পরব গো দিদিমণি।

সত্যিই তো তুলতুলিও দেখল ঝাঁকে ঝাঁকে কত মাছ জলের মধ্যে ঘুরছে—ফিরছে লাফাচ্ছে। কি আনন্দ ওদের। কী যে ভালো লাগছে দেখতে!…কিন্তু একটু পরেই দৃশ্যান্তর হলো। কাকু উঠে পড়লেন আর সোৎসাহে জলের মধ্যেও নেমে পড়লেন। ততক্ষণে রাজুদাও ভাল মানুষের মতো সরে পড়েছে। তার ছোট্ট ঘরের তক্তপোষে বসে তখন প্রাণ খুলে গান গাইছে—

রাম ভজ রাম কহ রাম গুণ গাওরে,
আরে রাম ভজ···

তুলতুলি অবাক হলো ছোট কাকু অতো চটপট মাছগুলি কীভাবে ধরছেন! আর ঐ ছটফটে মাছগুলোও খলুইতে পড়েই একটুখানি নড়েচড়েই কি রকম যেন নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে। কাকীমনিও একটু পরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন—উৎফুল্ল হয়ে বললেন,—বাঃ আজ তো অনেক রকম রান্নাব্বান্না করা যাবে।

কাকীমণির কথা শেষ হতে না হতেই রিণ্টুও এসে পড়ল সেখানে। উল্লাসে দু'হাত তুলে প্রায় নেচে নেচে বলতে লাগলো, আজকে ফিস্ট—আজকে ফিস্ট—কী মজা—কী মজা—

কাকীমণি সেদিন অনেক কিছুই রান্না করলেন, ঝোল ঝাল, চচ্চড়ি ভাজা। তুলতুলি কিন্তু খেতে মোটেই ভাল লাছছিল না। কেবলই মাছগুলোর ছুটাছুটির আনন্দটা ওর চোখের সামনে ঝিলমিল করতে লাগলো। এবার কলকাতায় গিয়ে ঐ ছোট্ট কাচের বাক্সের বদ্ধ জলের বন্দী মাছগুলোকে কোনো পুকুরে কি নদীতে ছেড়ে দিয়ে এলে হয় না? ওরা নিশ্চয় ঐটুকু জলের মধ্যে কত কষ্ট পাচ্ছে! ঠিক আছে—তুলতুলি মনকে প্রস্তুত করে নিল—কোলকাতায় ফিরে গিয়ে বাপীকে সঙ্গে নিয়ে ও সেই রঙীন মাছ গুলিকে কোনো জলের জগতে ছেড়ে আসবে।···

···কিছুদিনের মধ্যেই তুলতুলির গরমের ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এল। ছুটি ফুরোবার আগের দিন ছোট্ কাকু তুলতুলি আর দিদাকে নিয়ে আবার কোলকাতায় চলে এলেন। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই কিষাণকে দেখতে পেল তুলতুলি।

—ও কিষাণদা লালী নীলিরা ভাল আছে তো? —উৎকণ্ঠ হয়ে প্রশ্ন করল তুলতুলি।

কিষাণ কিন্তু কিছু না বলে মুখটি কালো করে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেলো। তুলতুলি অবাক। ওর ছোট্ট বুকটার মধ্যে কিরকম একটা বিবর্ণ ব্যথা রিণ রিণ করে উঠল। সে আর কিছু না বলে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে অ্যাকুইরিয়ামটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

একি। কাচের বাক্স যে শূন্য। একটিও মাছ নেই। জলটলও কিছু নেই বাক্সটাতে। কি হলো! তুলতুলি কিছুই বুঝতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ততক্ষণে বাবাও এসে দাঁড়িয়েছেন ওর পাশটিতে। বাবা ধীরে ধীরে বললেন, মাছগুলো সব মরে গেল মামণি,—তুমি চলে যাওয়ার পরেই একটা দুটো করে মরতে আরম্ভ করল কেন বুঝলাম না। কিষাণ তো যত্ন—আত্তি করে ঠিকই খাওয়াতো।

তুলতুলি কিছু না বলে শূন্য দৃষ্টিতে বাক্সটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাবা আবার বললেন—তুমি মন খারাপ করো না মামণি, আমি তোমাকে আরেকটি অ্যাকুইরিয়াম কিনে দেব।

তুলতুলি বিষণ্ণ হেসে বলল না বাপী, আমার আর অ্যাকুইরিয়াম চাই না। ওদের কষ্ট। তাই তো মরে গেল সব।

মেয়ের কথায় বাবা একটু বিস্মিত হলেন। মেয়ের মনের কোমলতার স্পর্শ পেলেন নিজের অনুভূতিতে। খুসী হয়ে নিবিড় স্নেহে তুলতুলিকে নিজের কাছে টেনে নিলেন।

ঘর বাড়ি

সুদেব বক্সী

চাঁদের রঙে বাড়ি আমার। সূর্য রঙের ভিটে—
এই খানেতেই থাকবো শুয়ে, রাখব মাথা ইটে।
অযুত-নিযুত জানলা ঘরের—পর্দা দোলে হাওয়ার
সামনে চোখের নৌকো আছে, খুশির ঢেউয়ে বাওয়ার।
গ্রামগঞ্জ, শহরতলী এবং আছে গহর,
দূর বা নিকট-দুই-ই আছে, আছে ওসার-বহর।
বনজঙ্গল, নদী আছে, সঙ্গে আছে পাহাড়
খেলা আছে, কাজও আছে, আছে যে জিত্ বাহার
কিছু কিছু সবই আছে—আমার বাঁধা ঘরে
ভিড় জমাতে সবাই এসো আগে কিংবা পরে।
আজকে বোধ হয় গৃহপ্রবেশ, এলাম বটে নিতে—
চল, চল পা চালিয়ে—কাটবে ঘরের ফিতে।
ঘর চিনেছি, জন চিনেছি, আর চিনেছি মাটি—
বিশ্বজোড়া ভিটেটা তাই রাখবো পরিপাটি।

———



নতুন বন্ধু

সমীর কুমার সামন্ত

জীবনে এই প্রথম বড় পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে জয়। কিন্তু এতেই বোধহয় সে ফেল করবে। একে টেস্টে খারাপ রেজাল্ট করেছে, তার উপরে হঠাৎ নতুন-কেনা বাড়ীতে উঠে আসা—দুয়ে মিলে তার মনে যে কী চাপ সৃষ্টি করেছে! পড়ায় একটুও মন দিতে পারছে না। অথচ এজন্যে বাড়ীর বড়দের কোনো চিন্তা আছে বলে বোধহয় না। বাবার নাকি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই ভালো রেজাল্ট ছিল। মাধ্যমিকটাকে তাই কোনো ব্যাপার বলেই মানতে চান না।

হাতে আর মাত্র একমাস সময়। এখনও সে নতুন বাড়ীর সাথে খাপ খাওয়াতে পারল না! আগের বাড়ীর চেয়ে এটা অনেক খোলামেলা। বিশেষ করে জয়ের ঘরটা তো পড়েছে একেবারে বাগানের দিকে। জানালার বাইরেই মাধবীলতাটা ফুলে ফুলে ঢেকে গেছে। একটু দূরে দূরে আরো নানান ফুলগাছ। এত সুন্দর বাড়ীটা যিনি বানিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব শৌখিন মানুষ। তবু শেষ পর্যন্ত বেচে দিলেন কেন কে জানে। সুবিধে হয়েছে জয়ের বাবার, প্রায় জলের দরে বাড়ীটা পেয়ে গেছেন।

পরিবেশটা খারাপ লাগে না জয়েরও। পরীক্ষার পরে একদিন ও বন্ধুদের ডাকবে বলে ঠিক করেছে। ঐ বাগানে বেশ চড়ুইভাতি হবে। কিন্তু তারো আগে পরীক্ষাটা দিতে হবে। আর সেটারই প্রস্তুতি হচ্ছে না। বড় ঘরটার চারদিকে সামান্য নোনা-ধরা দেওয়াল, তার উপরে কিম্ভূত সব জীব-জন্তুর মূর্তি আঁকা। উত্তরদিকের দেওয়ালে আবার বিশাল একটা আলমারী, জয়ের সমস্ত বই-খাতা ছড়িয়ে রেখেও সেটা ভরানো

যায় নি। এসবের মাঝে তার ছোট-খাট আর টেবিল-চেয়ার আরো ছোট দেখায়। তার উপরে ওদিকের দেয়ালে বড় যে হরিণটার শিঙে আলো আটকানো, সে সমানে চোখ মটকায়। যেন বলতে চায়—"পড়াশোনা করে কি আর হবে? তারচে' বনে চলো, কত ছুটতে পাবে, নদীর ধারায় নাইতে পাবে। খিদে পেলে গাছের ফল খাবে, চাকরি-বাকরির কিছু দরকার নেই!"

এ অবস্থায় কি পড়া হয়? উল্টে গত দু বছর ধরে শেখা জিনিসও ভুলে যায় জয়। একটা পাটীগণিতের অঙ্ক করতে করতে ঘেমে-নেয়ে ওঠে সে। তবু উত্তর মেলে না। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে।

একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল জয়। পরীক্ষা শেষ হতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি, তখনো তার কিছুই প্রায় লেখা হয়নি। আর ঠিক সেই সময়েই হলের গার্ড এমন চেঁচামেচি শুরু করেন যে ঘুম ভেঙে যায় তার। ইশ্, এটা যদি সত্যি হয়? ভাবতে ভাবতে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে।

রাত জেগে পড়লে মা বকে। অবশ্য জানতে পারলে তো! নিঃশব্দে টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বালতে চায় সে। কিন্তু তার আগেই টেবিলের তলায় কিসের একটা আলো দেখে থমকে দাঁড়ায়। চাঁদের আলো? তা কি করে হয়? এ আলো আসছে আলমারীর তলা থেকে।

ভালো করে লক্ষ্য করে আরো চমকে ওঠে জয়। দেয়াল-আলমারীটা দেয়াল থেকে কিছুটা যেন সরে এসেছে। সন্তর্পণে তাতে হাত দিতেই আরো খানিকটা ফাঁক হয়ে যায়। ওদিকে একটা অতিরিক্ত ঘর আছে। জয়রা আজো সেটা খোলেনি। বাগানের দিকের দরজা খুলে ছেলেটি সেই ঘরে ঢুকে পড়াশুনা করছে! এঘর থেকে টেবিল-ল্যাম্পটা আবার টেনে নিয়ে গেছে আলমারীর ফাঁক দিয়ে।

"এ্যাইও, না বলে যে আমাদের বাড়ী ঢুকেছ?"

ধরা পড়ে গিয়ে ছেলেটা প্রায় চেয়ার উল্টে পড়ে যাচ্ছিল। কোনরকমে সামলে নিয়ে আমতা আমতা করে বলল—"আমি রোজই এখানে পড়তে আসি।"

"কিন্তু বাগানের দিকের দরজা, আলমারীর পিছনে গুপ্ত দরজা—এসব খোলার উপায় জানলে কি করে?"

"বললাম না, আমি এখানে বহুদিন ধরেই আসছি। এক সময়ে তো এ বাড়ীতেই সারা দিন থাকতাম। আর তোমরা মাত্র এই কদিন—"

"বহুদিন ধরে এরকম আসছ!"—বিস্ময়ে ও রাগে জয় বলে ওঠে—"দাঁড়াও, বাবাকে ডাকছি।"

"তোমার বাবাকে ডাকবে?"—বলতে বলতেই ছেলেটির সুন্দর ফর্সা মুখ ভয় ফ্যাকাশে হয়ে যায়। বয়সে হয়তো তারই সমান হবে। একটু মায়া লাগলেও জয় দৃঢ়স্বরে বলে—"বাবাকে তো ডাকতেই হবে। তবে আগে বলো, কেন এখানে পড়তে আসো?"

"বাঃ, এখানে কেমন নিরিবিলি! আর আমাদের ওখানে যা চেঁচামেচি, একটু পড়া যায় না। এদিকে সামনেই পরীক্ষা—"

"ওমা, তুমিও মাধ্যমিক দেবে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

এবার সাগ্রহে কাছে এগিয়ে যায় জয়। ছেলেটি ভারতের ম্যাপ আঁকছিল।

"তুমি নিশ্চয়ই খুব ভাল ছাত্র?"—প্রশ্ন করে জয়।

মুচকি হেসে সে বলে—"কি করে বুঝলে?"

"তোমার ম্যাপ দেখে। এমন সুন্দর আঁকা যার, সে কি খারাপ ছাত্র হয়? আর আমি আঁকলে—ভারতের মাথাটা লজ্জায় নুয়ে পড়ে।"

দুজনেই হেসে ফেলে। তারপর সে বলে—"কিন্তু তুমিও তো ভালো ছাত্র, প্রতি বছর ফার্স্ট না হয় সেকেণ্ড হও।"

"হই না, হতাম। নাইন পর্যন্ত হয়েছি, কিন্তু এবার টেস্টের পর আমার ঠাঁই হয়েছে চার নম্বরে।"

"সে যা হবার হয়ে গেছে। এখন ভালো করে ফাইন্যালের জন্য তৈরী হও। ওঘরে যে হরিণবাবু আছে, তার কাছে প্রার্থনা করো।"

"ও এমনিতেই আমার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটায়! প্রার্থনা করলে তো ডাহা ফেল করাবে।"

"না না, তুমি ওকে ভুল বুঝো না। মন দিয়ে যা চাইবে, তাই পাওয়া যায় ওর কাছে। জানো, ও আগে সত্যিকারের হরিণ ছিল। কারো অভিশাপে পিতল হয়ে গেছে।"

"যাঃ, তাই কখনো হয় নাকি?"

"কেন হবে না? ভরের পরিমাণের তো কোনো হেরফের হচ্ছে না। পরমাণুর গঠন বদলে আজ কাল সাধারণ বিজ্ঞানীরাও এক মৌল থেকে আর এক মৌল করতে পারে। একেবারে অঙ্কের হিসেব!"

অঙ্কের কথায় চট্ করে মনে পড়ে গেল। জয় বলল—"আমায় একটা অঙ্ক করে দেবে? সোজা পাটীগণিতের অঙ্কটা কেন যে মিলছে না। অথচ লজ্জায় বাবাকে জিজ্ঞেস করতেও পারছি না।"

"করে দেবো, কিন্তু আগে বলো, আমার কথা কাউকে বলবে না?"

"প্রতিজ্ঞা করলাম, কাউকে বলবে না।"

"ঠিক আছে, আমার কাছে খাতাটা রেখে শুতে যাও। আমি করে রাখব।"

"না, আমি আব ঘুমোব না।"

বললে হবে কি, খাতাটা ছেলেটি টেবিলে রাখতে রাখতেই বড় একটা হাই তোলে জয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে এমন ঘুম জড়িয়ে এল! ছেলেটি তখনো ম্যাপে পাহাড়-নদী আঁকছে। জয় ফিরে এসে নিজের ঘরে শুয়ে পড়ল।

খুব ভালোভাবে ঘুমিয়ে উঠতে জয়ের বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। মা ওদিকে ডাকা-

ডাকি করছে। কিন্তু জয়ের মন থেকে পরীক্ষার ভারটা যেন নেমে গেছে! আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে সে তাকায় হরিণের দিকে। ওর এমন সৌম্য মুখ আগে কখনো দেখিনি। যেন বলছে—"তুমি কিছু চাইবার আগেই আমি সব দিয়ে দিয়েছি, তুমি বড় হও।"

গত রাতের কথাটা মনে পড়ে যায় জয়ের! চোখে পড়ে, টেবিলের উপর আলো আর তার খাতাটা রয়েছে। তাড়াতাড়ি আলমারীর কাছে যায়। কিন্তু এমন শক্ত আঁটা কিছুতেই খোলা যায় না। হয়তো ওদিক থেকে বন্ধ করে গেছে। যাক্‌গে, ছেলেটি কেমন কথা রেখেছে দেখি। বলে জয় খাতাটা ওল্টায়। ওমা! অমন কঠিন অংকটা কত ছোট্ট করে কষে দিয়েছে! কি সহজ, আর কি সুন্দর উত্তর মিলে গেছে! না, ছেলেটির সাথে ভাব করলে লাভ আছে। বাড়ীর আর কাউকে ওর কথা বলা চলবে না। সেদিন বিকেলে, ওই বন্ধ ঘরটার বাইরের সিঁড়িতে যে ফণিমনসার টবগুলো রাখা ছিল, জয় সেগুলো সরিয়ে রাখে। অন্ধকারে পাছে ছেলেটির পায়ে কাঁটা লাগে।

সকাল সকাল ঘুমিয়ে নিয়ে জয় মাঝরাতে উঠে নতুন বন্ধুর সাথে পড়াশুনা করে। ছেলেটির আবার সাহিত্যবিভাগে সামান্য অসুবিধে হয়। জয়কে পেয়ে সেও বেশ খুশী হয়েছে।

পড়তে পড়তে একসময়ে জয় প্রশ্ন করে—"আচ্ছা, তোমার নাম কি?"

মাথা দুলিয়ে সে বলে—"বলব কেন? তুমি তোমার বাবাকে বলবে, তারপর আমার বাবার কানে উঠবে আর কি!"

জেদ করে সে তাই নামটা বলল না। তবে অন্য সব ব্যাপারে খুব ভালো। ওকে পেয়ে জয়ের একরাতে যেন দশদিনের পড়া এগিয়ে গেল! এমনিতে সারা দিন রাত বই নিয়ে বসতে পারে না সে। এবার থেকে দিনের বেলায় আরো খেলার সময় পাবে। বন্ধুকে সেকথা বলায় ও বলল—"নিশ্চয়ই খেলবে। মনটাকে শুধু পড়ার উপরে চেপে রাখলে সে পড়াটা যে কোথায় তলিয়ে যাবে, পরীক্ষাহলে আর খুঁজে পাবে না।"

"কিন্তু তুমি কতক্ষণ পড়ো?"

এই তো দেখছ—রাত বারোটা থেকে তিনটে।"

"মাত্র তিন ঘণ্টা!"—জয় হাসতে হাসতে বলে—"জানো, এবারে আমাদের যে নতুন ছেলেটি ফাস্ট হয়েছে, সে দিনে আটাশ ঘণ্টা করে পড়ে।"

"তা কি করে হয়?"

"কেন হবে না? ছাত্র নিজে পড়ে কুড়ি ঘণ্টা, আর তার মাষ্টারমশাইরা পড়েন আট দুজনের হাসি থামলে কিছু সময় লাগে। তখন সে বলে—"জয়, তুমিও বড় বেশী পড়ো। এবার ঘুমোতে যাও।"

"দাঁড়াও, ভৌত বিজ্ঞানের এই প্রশ্নগুলো তোমার কাছে আগে বুঝে নিই।"

"ও আমি লিখে রাখব। তুমি যাও।"

সত্যিই ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল জয়ের। নিজের ঘরে ফিরে এসেই ও ঘুমিয়ে পড়ে। পরদিন সকালে উঠে সে খাতা খুলে দেখে, সত্যিই সব প্রশ্নের সুন্দর সব উত্তর লেখা রয়েছে।

একেকবার কিন্তু জয়ের মনে হয়, এটা ঠিক হচ্ছে না। ও বেচারা একটু নিরিবিলিতে পড়তে আসে, এখানেও ওকে জ্বালানো উচিত নয়। পরীক্ষাও এদিকে দরজায় এসে কড়া নাড়ে। তখন সপ্তাহ খানেক মাত্র বাকি, জয় একদিন বলেই বসে—"দেখো ভাই তোমার মত ছাত্রের স্ট্যাণ্ড করা উচিত। আমি আর তোমাকে জ্বালাব না, তুমি নিঃশব্দে এসে পড়ে যেও।"

"এমন কথা বলছ কেন? তুমিও তো আমাকে অনেক সাহায্য করেছ।"

"আমার কথা ছেড়েই দাও। বাড়ীর কারো আমার উপরে আস্থা নেই! দুপুরে আমি ঘুমোচ্ছিলাম দেখে মা বলল—'ছেলেটার কিচ্ছু হবে না!"

"তুমি বললেই পারতে যে স্কলারশিপ পাবে!"

"কেন মিথ্যে বলতে যাব?"

"মিথ্যে কেন, সত্যিই। হরিণবাবু তোমায় আশীর্বাদ করেছে যে!"

"তোমায় করেছে?"

"হ্যাঁ। আজও শেষ একবার আশীর্বাদ চেয়ে নিয়ে যাব। আশা করি, পরীক্ষাটা ভালোই হবে।"

এবং সত্যিই পরের রাত থেকে নতুন বন্ধু আর এলো না। জয়েরও অবশ্য তেমন আর দরকার ছিল না। তবু মনটা কেমন করতে লাগল।

পরীক্ষার দিনগুলো হুহু করে কেটে গেল। তারপর নতুন পাড়ার ছেলেদের সাথে আলাপ হল। কিন্তু সেই বন্ধু যে কোথায় থাকে, কাদের ছেলে জয় জানতে পারল না।

পরীক্ষার ফল বেরোল। জয় পেল স্কলারশিপ। ওদের স্কুল থেকে ওই প্রথম। হৈ চৈ পড়ে গেল ইস্কুলে, বাড়িতে। কিন্তু জয়ের মন পড়ে রইল নতুন বন্ধুর দিকে। একটু রাগও হল। রেজাল্ট বেরোবার পরেও কি একবার আসতে নেই? নাকি সে এ অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে?

জয়ের পরীক্ষার খবর পেয়ে বহুদিন পরে ওর ছোটকা এল দেশে। বাড়ী আরো জমজমাট। সাগর পারের গল্প শুনতে মেতে ওঠে জয়। মা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তার থাকখাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

কাকা থাকবে সেই বন্ধ ঘরটায়। ওরা এ বাড়ীতে আসার পর বোধ হয় এই প্রথম তার তালা খুলল। অবাক হয়ে জয় দেখল—যেন বিশ বছরের ধুলো আর মাকড়সার জালে ভরা ঘর; মাঝখানে তার টেবিল আর চেয়ার দুটো পায়া ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে! কে ভাঙল?

মনের প্রশ্ন তার মনেই রইল। মা ওদিকে দেয়ালের ছোট কুলুঙ্গী থেকে একটা প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট পেয়েছে। সেটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সবার হাঁচি এসে গেল। অবশেষে পাতলা সেই প্যাকেট থেকে বেরোল কয়েকটা কাগজ।

"এটা নিশ্চয়ই নির্মলবাবুরা ফেলে গেছেন।"—মা কাগজগুলো দেখতে দেখতে বলে—'হ্যাঁ, এই যে তাঁর ছেলের মাধ্যমিকের মার্কশীট।"

জয় উঁকি মেরে দেখে বলে—"বাবাঃ, এ যে দেখি সাব ৯০%-এর কাছাকাছি নম্বর! অবশ্যই সে কোনো স্ট্যাণ্ড করেছিল?"

"শুনেছি সে খুব ভাল ছাত্র ছিল। কিন্তু নিয়তি কী নিষ্ঠুর! নির্মলবাবুর স্ত্রী আগেই মারা গিয়েছিলেন। মনের দুঃখে শেষ পর্যন্ত তিনি বাড়ী বেচে কাশী চলে গেলেন।

"ছেলেটি কি মারা গেছে, মা?"

"হ্যাঁ। এই দেখ, খামের মধ্যে বেচারার একটা ফোটোও রয়েছে।"

ফোটোটা দেখে চমকে উঠল জয়। এই তো তার সেই বন্ধু! তার মানে—

আর কিছু ভাবতে পারে না জয়। ধীর পায়ে, দেয়ালের সেই লুকোনো দরজা খুলে নিজের ঘরে চলে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখে—হরিণবাবুর চোখেও যেন অশ্রুভরা!

সম্পাদকের নামে

অশোককুমার মিত্র

ডাক এসেছে, 'হলদিয়ায়,'
সম্পাদকের, 'জলদি আয়,
এই সুযোগে সবার মাথায়
আচ্ছা করে ঘোল দি আয়।'
ঘোল কোথা হে—অতিথিশালায়
চর্ব্য চোষ্য থালায় থালায়
বলছি দেখে, একে একে
আরে পেটে, কোল দি 'আয়।'
হলদি নদীর হলদিয়ায়
ঢেউ ডেকে কয়, দোল দি আয়।
সম্পাদকের সোনার নামে
আমরা জয়ের বোল দি আয়,
সবাই জয়ের ঢোল দি আয়।



সেবক জঙ্গলের ধারে

সুনীল ভট্টাচার্য

তখন মংপুতে থাকি। নভেম্বরের শেষে শিলিগুড়ি গেছিলাম। বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সেবক রোড ধরে চলতে চলতে গাড়িটা হঠাৎ থেমে যাওয়ায় ভয় হল। গাড়ি বোধ হয় বিগড়েছে। ঠিক হতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। সন্ধ্যের পরে এই জঙ্গলের ধারে থাকা নিরাপদ নয়। সেবক রোড ধরে ওপরের দিকে গেলে একটু পরে ডানদিকে পড়ে কালিঝোর বাংলো। তিস্তার তীরে এই সুন্দর বাংলোর নীচে নদীর বালি ঢাকা চরে মাঝে মাঝে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা যায়। বাংলোর পাশের পল্লীতে কখনও কখনও বাঘ আসে। বাঘের আবির্ভাব হলে কুকুরের সংখ্যা কমে যায়।

ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম—কি হল? গাড়ি খারাপ হল নাকি। সে আঙুল দিয়ে দেখাল সামনের দিকে। গাড়ির হেড লাইটের আলো পড়েছে রাস্তায়। সেখানে দেখি বাঘের একটা বাচ্চা রাজকীয় পদক্ষেপে রাস্তা পার হচ্ছে। বাচ্চাটা চলে যাবার পরেও ড্রাইভার বসে রইল। বললাম—দেরি করছ কেন? এবার চল। খড়্গবাহাদুর বলল—স্যার, মনে হচ্ছে ওর সঙ্গে ওর আম্মা আছে। এখন গেলে অ্যাটাক্ করতে পারে। আমরা খানিক্ষণ অপেক্ষা করেও বাঘিনীকে দেখতে পেলাম না। ড্রাইভার বলল—বোধ হয় আগে চলে গেছে। এখন যাওয়া যাবে। ড্রাইভার হর্ন বাজিয়ে বেশ জোরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল।

মংপু ফিরে এসে সেখানকার কুইনিন ফ্যাক্টরির প্রধান মিঃ মুখার্জিকে ঘটনাটা বলেছিলাম। তিনি শুনে বললেন—আগে ঐ অঞ্চলে বড় বড় বাঘ ছিল, এখন আর বিশেষ নেই। একবার ঐখানে একটা অদ্ভুত জিনিষ দেখেছিলাম। মংপু থেকে শিলিগুড়ি যাচ্ছি, সন্ধ্যে হব হব। একটা ট্রাক একটা বড় সাপের লেজ মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। বোধহয় মিনিটখানেক সাপটা পড়ে রইল। তারপরে আঘাতটা সামলে নিয়ে প্রায় তিন চার ফুট খাড়া হয়ে বিরাট ফণা তুলে প্রতিশোধ নেবার জন্যে এগিয়ে গেল। একটা স্টেশন ওয়াগন আসছিল। সেটাই বোধ হয় তার লক্ষ্য ছিল। ড্রাইভার দেখতে পেয়ে খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করেছিলাম,—কি সাপ ছিল সেটা? মুখার্জি সায়েব বললেন,—বোধহয় শঙ্খচূড় হবে। শঙ্খচূড় সাপ খুব বড় হয়। শুনেছি তরাই অঞ্চলে বড় বড় অজগর সাপও আছে।

কয়েক বছর পরে একদিন সন্ধ্যে বেলায় সেবক রোডের ধারে করনেসন ব্রীজের কাছে বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিলিগুড়ি ফিরব। অনেকক্ষণ পরে একটা বাস এলো, কিন্তু যা প্রচণ্ড ভীড়, বাসে ওঠা গেল না। সহকর্মী সুকল্যাণ একটা ট্যাক্সি থামিয়ে আমায় বলল,—আপনি মেয়েদের নিয়ে এই ট্যাক্সিতে চলে যান। আমি ছেলেদের নিয়ে পরের বাসে ফিরছি। খানিকটা এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলাম দুই ভদ্রলোক স্কুটারে উল্টো দিক থেকে আসছেন। আমাদের দেখে স্কুটার থামিয়ে চিৎকার করে বললেন,—হাঁথি হাঁথি। আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। ট্যাক্সিতে একটু এগিয়ে দেখি, লাইন বেঁধে একদল হাতি রাস্তা পার হচ্ছে। সামনে চলেছে দুটো বড় হাতি এবং পিছনে বিভিন্ন বয়সের চার পাঁচটা বাচ্ছা। ট্যাক্সি থামিয়ে আমি একটা ছবি নিলাম। হাতির পাল রাস্তা পার হয়ে গেল। ট্যাক্সিওয়ালা আমায় উল্টো দিকে দেখতে বলল। দেখি পথের কাছে মস্ত দাঁতওলা বিরাট একটা পুরুষ হাতি দাঁড়িয়ে। শুঁড়টা মাথার ওপরে বাঁকান কান দুটো একটু পিছনে হেলান। মনে হল আক্রমণ করবার প্রস্তুতি চলেছে। ভেবেছিলাম গাড়ি থেকে নেমে কাছে গিয়ে একটা ছবি তুলব। ড্রাইভার বলল, কিছুদিন আগে সেবকের জঙ্গলে হাতি একজন মানুষকে মেরে ফেলেছে। সবাই আমায় নামতে বারণ করল। যূথপতির এখন কি মেজাজ কে জানে। যদি ট্যাক্সিকে আক্রমণ করে তাহলে হয়তো সবাই মারা যাব!

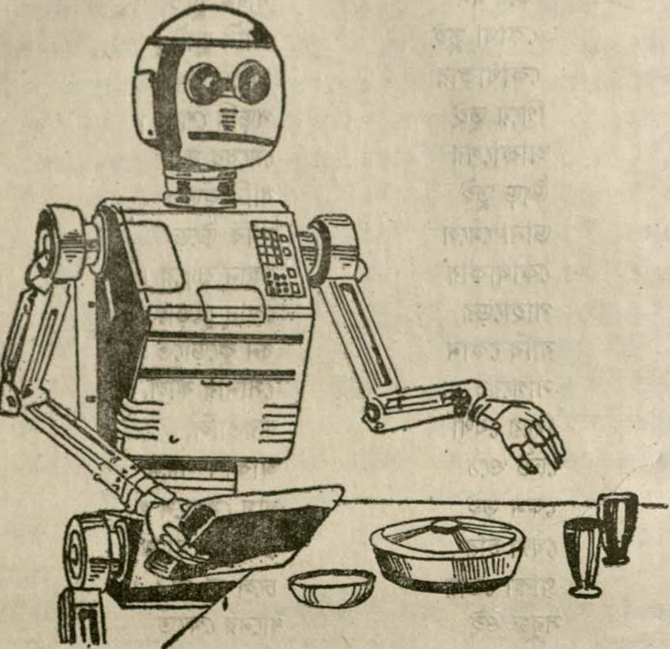
কেনিয়া ন্যাশানাল পার্কে এক ধরণের গাছ আছে যার ফল খেলে হাতিদের নেশা হয়। সেই সময় তারা ভয়ংকর অথবা খুব মজার কিছু করে বসে। একবার ঐ রকম অবস্থায় একটি হাতি দুজন জার্মান ভ্রমণকারীদের মোটর গাড়ি আটকাল। তারা কোন রকমে গাড়ি থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরে এসে দেখে তাদের গাড়ি নেই। হঠাৎ নজর পড়ল তাদের গাড়ির জায়গায় একটা তোবড়ান টিনের বড় বাক্স পড়ে আছে। গজেন্দ্রকুমার ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে সামনে একটা টিনের বসবার জায়গা দেখে তার ওপর বসে পড়ে। দেখতে দেখতে বাক্সটা একটা টিনের কচ্ছপ হয়ে গেল। রাগ করে কুমার টিনের মোড়া থেকে উঠে পড়ল। মনে মনে ভাবল,—মানুষের কাজই এমন কাঁচা। তাদের মতন মোটা বুদ্ধি দিয়ে শক্ত করে বানাবে, তা নয়। এমন জিনিষ বানিয়েছে বসতে না বসতে সেটা মাটিতে শুয়ে পড়ল।

মনের কথা

সৃঞ্জয় চক্রবর্তী

ওরে মন বাঁধন টুটে
কোথা তুই যাবি ছুটে ?
কোথাকার অচিন দেশে
গিয়ে তুই পড়বি শেষে ?
আকাশের মেঘের মত
উড়ে তুই যাবি কত ?
ডানা মেলে যাবি উড়ে
কোথাকার কোন্ সুদূরে ।
পাহাড়ের কোন্ চূড়োতে
যাবি কোন ধন কুড়োতে ?
সাগরের সোনার কলি,
দিয়ে যেথা করতালি,
ঢেউ ওঠে আকাশ পানে
কেন তুই যাস্ সেখানে ?
ঘেরা চার দেওয়াল মাঝে,
থাকা তোর চলে না যে !
সবুজ ওই ধানের ক্ষেতে
কেন মন, যা সরে যেতে ?
বরষার অঝোর ধারা
করে তোকে আত্মহারা ।
মেঘের ওই গভীর স্বরে
ছুটে যাস্ তারই তরে,
বিজলীর আলোর পলক,
কেন আনে অমনি চমক ।
শুনে কোন দেশের কথা
ছুটে তুই যাসরে তথা ?
খুঁজে তুই ফিরিস সে পথ,
ঘুরে এই বিশ্বজগৎ
কখনও পাতাল ফুঁড়ে,
কখনও স্বর্গে উড়ে,
চলে যাস পাগলের মন,
ছাড়া পেলে যখন তখন ।

———



ভূতের খোঁজে

দেবাশিস রায়চৌধুরী

ল্যান্সডাউন রোড-এর যে বাড়িটায় ছোটবেলায় থাকতাম, সেটা তখনই বেশ পুরানো হয়েছিলো। ঘরে ঘরে বাদুড়ের গন্ধ না থাকলেও উঠোনের ধারে বড় বারান্দায় রাত্রে খেতে বসলে কিচ কিচ করে ছুঁচোর ডাক শোনা যেত। উঠোনের এক কোণে ছিল একটা ভাঁড়ার ঘর। অনেক বছর আগে যুদ্ধের সময়, কি তারও অনেক আগে হয়ত সেখানে চাল, ডাল, মশলাপাতি, তেল, নুন, আমের ঝুড়ি, ঘুঁটের বস্তা জমিয়ে রাখা হত। কিন্তু আমি জন্মে থেকে ঐ ঘরটাতে শুধু কয়লা রাখতে দেখেছি। সেখানে রাত্রে বাল্ব জ্বলত না। দিনের বেলাতেও ঘরের একটিমাত্র জানালা বন্ধ থাকতো বলে দরজার সামনেটুকু ছাড়া ঘরের ভেতরটা পুরোটায় অন্ধকার। এ ঘরটায় খুঁজলে, আমাদের ধারণা ছিল, কয়লার ঢিপির পেছনে সাপ, গিরগিটি, ছুঁচো আর কড়িকাঠে ঝোলা বাদুড় মিলবে। মুখে না বললেও আমাদের সকলেরি মন বলত ঐ ঘরে আরো কিছু আছে।

গরমের ছুটিতে দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর আমার আর আমার ভাই গগির বাধ্যতামূলক ঘুমের ব্যবস্থা হত একতলায় মায়ের ঘরে, অথবা দোতলায় কাকিমার ঘরের খাটে। কাঠের জানালা বন্ধ করলে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেওয়ালের গায়ে এসে পড়ত রাস্তার গাছপালা, চলন্ত গাড়ি ঘোড়ার উল্টো ছবি। ঘুম না এলে সেদিকে তাকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে গল্প করতাম। প্রায়ই গল্পের বিষয় হয়ে পড়ত গগির আর আমার পড়া বিভিন্ন ভূতের গল্প। তারপরেই বইয়ের গপ্পো ছেড়ে প্রসঙ্গ ঘুরে যেত আমাদের বাড়িটার দিকে। অন্ধকার ঘরে, দুপুর বেলা হলেও বেশ গা ছম্ ছম্ করতে থাকত এই ভেবে যে এ বাড়িতেও হয়ত ভূতের আনাগোনা আছে। না থাকার তো কোন কারণ নেই। গল্পে যেমন ভূতুড়ে বাড়ির বর্ণনা পেতাম আমাদের এই বাড়িতে সব না হলেও তার কিছু কিছু লক্ষণ তো ছিলই। উঠোনের কোণের কয়লার ঘরটা ছাড়াও আমার ভাইয়ের ধারণা ছিল সিঁড়ির তলার কোণেও ভূতের আনাগোনা থাকতে পারে। আমি ভাবতাম দোতলার বাথরুমের পাশের ছোট ঘরটাই বা বাদ যায় কেন? বাড়ির সকলে ঘুমুলে পর দুপুর বেলা সে ঘরে ঢুকে দেখেছি জেঠিমার আমলের কাঁচ-ঝাপসা হওয়া ড্রেসিং টেবিল, ঠাকুরদার আমলের তোরঙ্গ আর সুটকেশ, ঠাকুরদার গড়গড়া, মর্চে ধরা ট্রাঙ্ক, পোকায় কাটা বইপত্র, আরো রাশি রাশি কত কি রাখা থাকত। আমি অবশ্যি ওর মধ্যে থেকেই একটা রং গুলবার প্যালেট্ আর একটা কাঁচের পেপার ওয়েট উদ্ধার করেছিলুম। তবু ঘরটা সম্পর্কে সন্দেহ যেত না।

যেটা আমার বা গগির কারুরই ঠিক বিশ্বাস হতনা সেটা কোনো ভাঁড়ার ঘর, বা কোণের ঘর, বা সিঁড়ির তলা সম্পর্কে নয়—একেবারে খোদ রাস্তার ধারের বড় বসার ঘরটা নিয়ে। খাবার টেবিলে বড়রা খেতে বসলে দু-একবার শুনেছি অনেকেই বলেছেন কেউ কেউ একটু ঠাট্টা করে, আমাদের বাইরের ঘরে মাঝরাতের পর টুং টাং করে পিয়ানো বাজার শব্দ পাওয়া যায়! অথচ সে সময় আমাদের বাড়িতে পিয়ানো ছিলই না। শুধু এ বাড়িতেই নয়, আশে পাশের কয়েকটা বাড়ির অনেকেই নাকি সেই বাজনা শুনেছে! গগি বলল, পাশের বাড়ির বন্ধু গুড্ডু রাজুদের জিজ্ঞেস করলেই হয়। তারা যদি রাত্রে একটু কষ্ট করে জেগে থেকে কান পেতে শোনে, তাহলেই বুঝতে পারব রাত্রে পিয়ানো সত্যি বাজে কিনা। ঠিক হলো সেদিন বিকেলেই প্রস্তাবটা করতে হবে। এইসব আলোচনা করতে করতে নিশ্চয় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। পাশ ফিরে দুজনে ঘুমোতে যাব এমন সময় বিকট স্বরে "ম্যাগনোলিয়া" বলে আইসক্রীমওয়ালার চিৎকারে চমকে উঠলাম। আর ঘুম এলো না।

গুড্ডু রাজুদের আমাদের মতো ভূতের বাতিক ছিল কিনা জানিনা তবে প্রস্তাবটা করতেই গুড্ডু বলে উঠলো, প্ল্যানচেট্ করলে হয় না? প্ল্যান্চেটের কথা আমরাও যে শুনিনি তা নয়। শুনেছিলাম কয়েকজনে মিলে কোনো মৃত ব্যক্তিকে চিন্তা করে

একটা পয়সার ওপর সকলে তর্জনী ছুঁইয়ে বসে থাকলে নাকি ভুতেদের আগমন হয়। এছাড়াও জানতাম একজন জ্যান্ত মানুষকে 'মিডিয়াম' করে বসিয়ে মৃত ব্যক্তিকে ডাকলে তিনি নাকি সেই জ্যান্ত লোকটির ওপর ভর হন ; তার হাতের পেন্‌সিলে খস্‌ খস্‌ করে লেখা হতে থাকে মৃত ব্যক্তিটিকে করা নানা প্রশ্নের উত্তর। আমাদের প্রস্তাবটা মন্দ লাগল না। কিন্তু 'মিডিয়াম' হবে কে ? তার চেয়ে বাবা পয়সা ছুঁয়েই দেখা যাক্‌। তখন ঠিক হল আগামী বৃহস্পতিবার দুপুর বেলা বাড়ি একদম খালি হয়ে গেলে একতলায় আমাদের শোবার ঘরের জানলা বন্ধ করে পয়সা ছুঁয়ে পাশের ঘরের অশরীরী পিয়ানো বাদককে ডাকা হবে। দলের মধ্যে একটু বড় বলে আমি আর গুড্ডু একবার বলেছিলাম বাইরের ঘরেই বসা হক। তাতে রাজুর আর গগির প্রচণ্ড আপত্তি। যতই বলি ভুত এলে তো আর তোদের ঘাড় মট্‌কাবেনা, এ ভুত তেমন জাতেরই না। বড়জোর পিয়ানোর সুন্দর বাজনা শুনতে পাবি দিনে দুপুরেই। কিন্তু কে কার কথা শোনে। গুড্ডু রেগে গিয়ে গগি আর রাজুকে বলল, তোরা ভীতু। তার পর তুমুল কথা কাটাকাটি, কে ভীতু, কে ভীতু নয়, কে মাঝরাতে বাইরের ঘরে শুতে পারে একা, অথবা উঠোনের কোণের ঘরে যেতে পারে, অথবা ছাদের সিঁড়ি দিয়ে একা একা উঠে যেতে পারে ছাদে ; এইসব আর কি। আমি দেখলাম মহা বিপদ। মাঝখান থেকে প্ল্যান্‌চেটই না ভেস্তে যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ভুত আসুক বা নাই আসুক প্ল্যান্‌চেটের পর ভয় পাইনি প্রমাণ করার জন্যে, রাত আটটার পর ছাদে উঠে বাঁ দিকের দেয়ালে প্রত্যেককে আলাদা ভাবে গিয়ে নাম লিখে আসতে হবে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আবার তুমুল ঝগড়া। সারা দুপুর ধরে চারজনে পয়সা ছুঁয়ে অনেক ডাকাডাকি করেও ভুতকে নামাতে পারিনি। গুড্ডু দোষ দিচ্ছে রাজুকে, প্ল্যান্‌চেটের সময় দুবার ঢেকুর তোলার জন্য। গগি দুবার পয়সা থেকে হাত উঠিয়ে গা চুলকেছিল। তবে আমার ধারণা ও' নিশ্চয় তখন ফারুক্‌ ইঞ্জিনিয়ারের ছক্কা মারার কথা ভাবছিল। তাই প্ল্যান্‌চেট সফল হল না। ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির বাইরের ঘরে সত্যিই পিয়ানো বাজানো ভুত আছে কিনা তা আর জানা হবে না —এই দুঃখ করতে করতে যে যার উঠে পড়তে বসতে যাব, এমন সময় রাজুই মনে করিয়ে দিলো রাত আটটায় ছাদে উঠে নাম লেখার ব্যাপারটা। প্রস্তাবটা আমারি, তাই না বলার কোন সুযোগ নেই। অবশ্য কারণও নেই! বাইরের ঘরেই যখন ভুত ধরা পড়ল না, তখন তো সারা বাড়িতে কোথাওই তাকে আর পাওয়া যাবে না। সত্যি বলতে কি একটু মনটা খারাপই লাগছিল।

বড়রা জানলে মুস্কিল, তাই গলির দরজা দিয়ে আটটা নাগাদ গুড্ডু রাজুরা চুপি চুপি এলো। সিঁড়ির গোড়ায় চারজনে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমে আমি তারপর গুড্ডু, গগি শেষে রাজু। এইভাবে গিয়ে কাজ সেরে আসা হবে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শুনলাম জেঠিমার ঘর থেকে রেডিওতে স্থানীয় সংবাদ শেষ হয়ে রাগপ্রধান গান শুরু

হবার ঘোষণা। ওপর থেকে একবার নীচে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে ওদের বললাম, আগে আমি যাচ্ছি তারপর তোরা আসবি। ভয়ের কিছুই নেই।

আন্দাজ তিন সেকেণ্ড লেগেছিল ছাদে উঠতে। পকেট থেকে চক্‌টা বের করে অন্ধকারেই চিলেকোটার দরজা খুলে ফেললাম। ছাদটা অবশ্য সম্পূর্ণ অন্ধকার নয়। মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকের দেয়ালের সামনে গিয়ে নামটা লিখতে যাব, হঠাৎ একটা জিনিস দেখে দুদ্দাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম কয়েকটা ধাপ টপকেই। আমার আর নাম লেখা হল না।

আমি নাম লিখব কি? সেখানে আমার আগেই ইংরেজী অক্ষরে লেখা রয়েছে আমারি ডাক নাম—B-A-B-U-M!



পেডিগিরি

মুস্তাফা নাশাদ

চিঁড়ে মুড়কি বাতাসা,
শিলিগুড়ির পাতা চা।
কড়া লিকার সু-স্বাদু,
মুখ ধুয়ে নে, খা আতু।

আতু বলল রেগে,
পুসিকে তোর দে!
ব্রেকফাস্টে টোস্ট—
খাই তো চিকেন রোস্ট!

কুত্তা আমি পেডিগিরি!
প্রাতঃরাশের এ কি ছিরি?
পুসির মতো নেটিভ?
খাব কি পারগেটিভ!

———

নিশিথ রাতের বন্ধু

কমল লাহিড়ী



বাপটুর গল্প শেষ হতেই তিনুমামা বললেন, এতো হাসির গল্প হয়ে গেল। ভূতের গল্পের পরিবেশটাই হয় নি। তাছাড়া অন্ধকার রাত্রিতে গ্রামের রাস্তায় একা একা চলার সময় নিজের ছায়া দেখেও অনেকে ভয় পায়। না বাপটুবাবু তোমার এ গল্প ঠিক জমল না।

তিনুমামার কথায় মিইয়ে গেল বাপটু। আমরা সবাই বোকার মতো তিনুমামার দিকেই তাকাই। বাইরে ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে টিপ টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে। মাঝে মাঝে মেঘের ডাক। বিকেল থেকে লোডশেডিং তাই ঘরে একটা ডিমলাইট জ্বলছে। সব মিলিয়ে পরিবেশটাও গা ছমছম করে ওঠার মত।

কয়েকদিন গুমোট গরমের পর আজ আকাশটা সকাল থেকেই মেঘে ঢাকা ছিল। দুপুরের একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হল। আমাদের গল্পের আসর ঠিক সময়েই বসেছিল। আজ তিনুমামা নিজেই ভয় বা রোমাঞ্চকর গল্পের কথা ঠিক করেছিলেন। ভয়ের গল্প আমরা সবাই ভালবাসি। কিন্তু কে আগে বলবে, তাই নিয়ে কিছু কথা হলেও বাপটু ওর মামাবাড়িতে এক অন্ধকার রাত্রির অভিজ্ঞতার কথা নিয়েই গল্পের আসর শুরু করেছিল। কিন্তু ওর গল্প শেষ হতেই তিনুমামা ঐ মন্তব্য করলেন।

তিনুমামা মানে তপেশ সন্যাল আসলে বাপটুর ছোট মামা। রেলে চাকরি করেন থাকেন সেই সুদূর মধ্যপ্রদেশে। ভীষণ আমুদে লোক। প্রতিবছরই পুজোর মাসখানেক আগে ছুটি নিয়ে বাপটুদের বাড়ীতে চলে আসেন। আর তিনুমামা এলেও আমাদের ভীষণ মজা হয়। প্রতিদিন বিকেলে আমাদের সবাইকে নিয়ে গল্পের আসর বসান।

এবারও পুজোর ছুটির কিছু আগেই এসেছেন।

আমরাও যথা নিয়মে বাপটুদের মল্লিকপাড়ার বাড়িতে মজা করে গল্প শুনছি। আজ তিনুমামার কথা শুনে আমরা আর কেউ মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছি না। বাবলি একটু বেশি কথা বলে। বাপটুর গল্পের ওই মন্তব্য শুনে তিনুমামাকে চেপে ধরল বাবলি, তাহলে এবার আপনিই একটা জম্পেশ গল্প বলুন মামা। যা শুনে আমরা সবাই এক-সঙ্গে আপনাকে জড়িয়ে ধরতে পারি।

বাবলির কথাই সবায় হেসে উঠি এবার। রুমালে মুখ মুছে তিনুমামা বলেন—বেশ তোমাদের অনুরোধ আর বাবলির অনারে আমি একটা ঘটনা বলছি। তবে প্রথমেই বলে রাখি এটা কিন্তু গল্প নয়—সত্যি ঘটনা।

ঘটনাটা আমার জীবনেই ঘটেছিল। কথাটা মনে পড়লে এখনও আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। পুরো ব্যাপারটা আজও একটা জটিল রহস্যই রয়ে গেছে আমার কাছে।

আজ থেকে কুড়ি বছর আগেকার কথা। আমি তখন রেলের চাকরিতে চার বছর ঢুকেছি। সেবার বর্ষার সময় হঠাৎ বদলির হুকুম হ'ল মধ্যপ্রদেশের এক গহন পাহাড়ী অঞ্চল বৌরিডাণ্ড বলে একটা জায়গায়। নতুন একটা রেল লাইন বসেছে, এখান থেকেই কনস্ট্রাকশানের কাজ চলছে তাই রেলের বাবু, অফিসার আর কুলিমজুরদের অসুখ-বিসুখের জন্য ডাক্তারখানা আর ডাক্তার বাবুতো চাই। আমার নতুন চাকরি বলে সেখানেই বদলি হতে হ'ল।

আমার উপরওয়ালা ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে দিলেন, কনস্ট্রাকশন বিভাগ খুব ভাল। অনেক সুবিধে আছে। বৌরিভাণ্ড ছোট স্টেশন হলেও নতুন রেললাইনের কাজের জন্য এখন অনেক লোকজন সেখানে। হাসপাতাল আর কোয়ার্টারও পাশাপাশি।

জুলাই মাসের মাঝামাঝি এক বিকেলে আমার জিনিসপত্তর গুছিয়ে বৌরিভাণ্ডের উদ্দেশ্যে গাড়িতে চেপে বসলাম।

কিন্তু মামা, এ গল্পের মধ্যে ভয়ের তো কিছু দেখছি না। তিনুমামা একটু থামতেই বাপটু বলে ওঠে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে তিনুমামা বলেন, যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি তাতে এটুকু ভূমিকার যে প্রয়োজন আছে বাপটুবাবু। আর বানিয়ে ভূতের গল্প তো বলছি না। সে রাত্রে বৌরিভাণ্ড স্টেশনে যে ঘটনার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম তা শুনলে তোমরাও আর কথা বলতে পারবে না। কথা শেষ করে আমাদের সবার মুখের দিকেই তাকান তিনুমামা। পরিবেশটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাওয়াটা আমি বলি, সে যা হয় হবে আপনি ঘটনাটা শুরু করুন মামা।

আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনু মামা বলেন, হ্যাঁ শোন। বৌরিভাণ্ডে পেঁছতে গেলে দুবার গাড়ি বদলাতে হবে। আমি যাচ্ছি ডোঙ্গর গড় থেকে। এখান থেকে প্রথমে বম্বে মেলে বিলাসপুর। তারপর গাড়ি বদল করে অনুপপুর। এই অনুপপুর থেকে আর এক গাড়িতে বৌরিভাণ্ডে যেতে হবে। জায়গাটা মধ্যপ্রদেশের মধ্যস্থলে।

অনুপপুর জংশনে এসে গাড়ি থেকে নামতেই এক দুঃসংবাদ শুনলাম। বৌরিভাণ্ডের গাড়ি তিনঘণ্টা লেট।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল নেমেছে। খুব বেশি মানুষজনও নামে নি এখানে। এই অনুপপুর থেকেই ভুপাল জব্বলপুর আর কাটনি লাইনের গাড়ি যায়। তাই এটা জংশন স্টেশন। আমার গাড়ি আসবে কাটনি থেকে। স্টেশনের চারপাশে ছোট

ছোট পাহাড়। লাল কাঁকরে বিছানো স্টেশন চত্বরে বসে স্থানীয় ছত্তিশগড়ি মানুষদের কথা শুনে সময় কাটছে।

দিনের শেষ আলোটুকু মুছে রাত্রি নামল। স্টেশন চত্বরও প্রায় জনমানব শূন্য। ধীরে ধীরে স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের ঘরে ঢুকে পরিচয় দিয়েই সেখানে জমিয়ে বসলাম। মাস্টার মশাই ভাল মানুষ। আমার পরিচয় শুনে খুশিই হলেন। তবে অনেক কথার সঙ্গে এও বললেন, বৌরিভাণ্ডে আজ গাড়ি লেট থাকার জন্য বেশ রাত করে পেঁছুবে। তাই অচেনা অজানা জায়গায় রাত্রিতে না গিয়ে, সে রাতটা তাঁর কোয়ার্টারে থেকে পরদিন সকালের গাড়িতেই বৌরিডাণ্ডে যেতে বললেন।

কিন্তু একে নতুন চাকরি। তারপর কনস্ট্রাকশন বিভাগের কাজ। তাই দেরি না করে রাতের গাড়িতেই যাব ঠিক করলাম। দু'বার কফি সিঙ্গাড়া খেয়ে শরীরটাও এখন ঝরঝরে লাগছে। মাস্টার মশাইয়ের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার স্টেশন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। আমার গাড়ি আসার প্রথম সংকেতও হয়ে গেছে।

আরও আধঘণ্টা পরে একটা অজগর সাপের মত হেলতে দুলতে পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে ট্রেন এসে থামল স্টেশনে। দেহাতী মেয়ে পুরুষ নিজেদের বোচকা নিয়ে একসঙ্গে হুড়োহুড়ি শুরু করল। এত মানুষ যে কোথায় ছিল এতক্ষণ বুঝি নি। এই সব অঞ্চলে পুরুষের চেয়ে মেয়েরাই কর্মঠ বেশি। মাটি বওয়া পাথর কাটার মত শক্ত কাজ এখানে মেয়েরাই করে আর ছোট বাচ্চাদের একটা কাপড়ের পুঁটুলি করে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নেয়।

অনুপপুর স্টেশনে বিজলি বাতি নেই। দুটো বড় হ্যাজাক প্ল্যাটফর্মের দুই দিকে ঝুলছে। তারই মৃদু আলোয় কোনও রকমে নিজের হোলডল আর এ্যাটাচি হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ইঞ্জিন ভোঁস ভোঁস শব্দ করে জল খেতে গেল। আমার কামরার আর দু'জন যাত্রী উঠেছে। তারা একবার আমার দিকে তাকিয়ে আবার নিজেদের গল্পে মেতে উঠল। মনে হল এখানেই কোথাও ব্যবসা ট্যাবসা করে।

কিছু পরে গার্ড সাহেবের সংকেত পেয়ে একটা বিকট কর্কশ শব্দ করে উঠল ইঞ্জিন। তারপর টলতে টলতে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চলতে শুরু করল আমার গাড়ি।

জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্যপট দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুটঘুটে অন্ধকারে পাহাড় আর জঙ্গল সবই এক মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা শালগাছগুলো ঠিক বিরাট দৈত্যর মত দেখাচ্ছিল। অনুপপুর থেকে ছ'টা স্টেশন পরেই বৌরিডাণ্ড। কিন্তু ট্রেন যেভাবে ছুটছে তাতে কখন যে পেঁছবে ভগবান জানেন।

সেই কাল সকালের পর ট্রেনে চেপেছি এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। নানা চিন্তাও মাথায় জট পাকাচ্ছে। যাক যা হবার হবে। ডোঙ্গরগড়ের বড় ডাক্তারবাবু তো ভাল করে সব বুঝিয়েই দিয়েছেন। স্টেশনে নেমে কোনদিকে যেতে হবে। কার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। সব কিছু ছবির মত এঁকে বলে দিয়েছেন ডাক্তার সাকু-

সেনা। তাছাড়া আমার যাওয়ার খবর দিয়ে আগাম একটা তারও পাঠিয়ে দিয়েছেন। বৌরিডাণ্ডে এর আগে কোনও ডাক্তার পোস্টিং ছিল না। কম্পাউণ্ডার মহেশ টিরকেই সব দিক সামাল দিয়ে আসছিল। তাকেই আমার যাওয়ার খবর পাঠিয়েছেন। তাই অসুবিধে কিছুই হবার কথা নয়। মহেশ বৌরিডাণ্ডেই থাকে।

মনের ভয়টা দূর করতেই একটু উঠতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়ে ট্রেনটা থেমে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম সামনের বার্থের যাত্রীদের মধ্যে। তারা দুজন ও ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে ঠিক করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দেখলাম, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে কিছু মানুষের ছুটোছুটি। দূরে কে একজন মশাল হাতে দৌড়ে যাচ্ছে। আমার সহযাত্রী দুজনও ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। কি যে ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছি না। বেশ ভয় করছে এবার।

নামব কি-না ভাবছি এমন সময় দূরের সেই মশালের আলো ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল। মশাল হাতে ইঞ্জিনের ড্রাইভার। তার পাশেই গার্ড সাহেব। এবার ট্রেন থেকে নেমে গাড়ি থামার কারণ জানতে চাইলাম। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গার্ড সাহেব বললেন, ভয়ের কিছু নেই। নতুন লাইন বসানোর কাজ হচ্ছে বৌরিডাণ্ড স্টেশনে। সোনালী পাহাড়ের কিছুটা অংশ ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে রাস্তা বের করা হচ্ছে। তাই মাঝে মাঝে উপরের পাহাড় থেকে পাথরের বড় বড় টুকরো ছিটকে এসে লাইনের ওপর পড়ে। আজও তাই ঘটেছে। পাথরের টুকরো গুলো সরিয়ে দিলেই গাড়ি চলবে। আর একটা খবরও বললেন, সামনের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াবে না, তার পরের স্টেশনই—বৌরিডাণ্ড।

গার্ড সাহেবের কথা শুনে মন কিছুটা শান্ত হলেও ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আর একটা চিন্তা দানা বেঁধে উঠল। এখনই সাড়ে দশটা বাজে। যেভাবে গাড়ি চলছে তাতে কত রাত্রে যে বৌরিডাণ্ড পেঁছতে লাগবে কে জানে। এইসব এলোপাথাড়ি চিন্তার মধ্যেই ট্রেনটা দুলে উঠল। ইঞ্জিনের কর্কশ শব্দও শুরু হল। একটানা হুইসেলের শব্দ করতে করতে ধীর মন্থর গতিতে পাহাড়ী রাস্তায় এগিয়ে চলল গাড়ি।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার বৌরিডাণ্ড স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। নিজেকে সংযত করে এ্যটাচি আর হোলডল নিয়ে নিচে নামলাম। আমার সঙ্গীরাও নেমে দ্রুত এগিয়ে গেল সামনে। এখানেও বিজলী আলো নেই। দূরে টিম টিম করে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। লোকজনের ব্যস্ততাও কমে এল। একসময় আবার ট্রেনও ছেড়ে গেল। একটা দেহাতী লোকও চোখে পড়ছে না। আমাকে নেবার জন্যে স্টেশনে যে মহেশ টিরকের আসার কথা ছিল সে কথাও ভুলে গেছি। স্টেশন মাস্টার মশাইয়ের ঘরের দিকেই যাওয়া ঠিক করে এ্যাটাচিটা হাতে নিলাম। হোলডলটা তুলতে গিয়েই চমকে উঠলাম।

অন্ধকারের মধ্যে লোকটা যে কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছে কিছুই টের পাই নি। একটা খিল খিল হাসির শব্দে তাকাতেই দেখি, আমার হোলডল মাথায় নিয়ে একটি ছত্রিশ-

গাড়ি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর তার কাছেই বিরাট লম্বা খালি গায়ের একটি মানুষ। লোকটা একটু এগিয়ে এসে হাত জোড় করে বলল, নয়া ডাংগদার সাহেব তো আপ। আমাদের সঙ্গে আসুন। বহুত রাত হয়েছে। গাড়ি ভি আজ খুব লেট করল। ওর কথা শুনেই চমকে উঠলাম। কারণ বিলাসপুর ছাড়ার পর আর বাংলা কথা শুনিনি। এই ছত্তিশগাড়ি লোকটা হিন্দী আর বাংলা মিশিয়ে কথা বলছে। তাছাড়া আমি যে ডাক্তার আর এখানে আসব এ খবরই বা কে দিল। অনেক প্রশ্নের ভিড় সরিয়ে গম্ভীর ভাবে বলি, তুমি-কে ?

এক ঝলক হাসির ঢেউ তুলে এবার মেয়েটি কাছে এসে বলে, আমরা আপনার নৌকর আছি সাহাব, ও বিরজু আমি মুনিয়া। ডাংগদার বাবুদের সেবাই হামাদের কাম কাজ। কুছু ডর নাহি। আপ আইয়ে।

মহেশ বাবু তো হামাদের সব বাতায়ে দিয়েছেন। উসকা তো কাল সে বুখার তাই আসতে পারে নি। এবার বিরজু নামে লোকটাও কথা বলে হেসে ফেলে। অন্ধকারে ওর সাদা ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যায়।

এবার কিছুটা শান্ত হল মন। ভয়েরও ব্যাপার নয়। কম্পাউন্ডার মহেশ টিরকে অসুস্থ থাকায় এরাই আমাকে নিতে এসেছে। ভালই লাগছে এখন। আমার এ্যাটাচিটাও নিতে হাত বাড়িয়েছিল বিরজু কিন্তু আমিই রাখলাম। বেশ শীত করছে। পাহাড়ী অঞ্চলে এখনই বেশ ঠান্ডা। যাই হোক আর দাঁড়িয়ে না থেকে বিরজু আর মুনিয়ার নির্দেশ মত চলতে শুরু করলাম। উঁচু নিচু রাস্তায় হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে। আগে বিরজু তারপর মুনিয়া শেষে আমি।

স্টেশন পেরিয়েই একটা বড় পুকুর। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দূরে পাহাড়ের বুকে আগুন লেগেছে দেখতে পেলাম। ওখানেই লাইনের কাজ হচ্ছে। একটা শব্দও কানে আসছে। পুকুর ছাড়িয়ে ছোট একটা ব্রীজ। সেটা পার হয়েই গুন গুন করে গান গেয়ে উঠল বিরজু। মুনিয়ার পায়ের কাঁকন বাজছিল ঝম ঝম করে। আমার সঙ্গে কথাও বলছিল মুনিয়া। ওর পুরো ভাষা না বুঝলেও কিছু বুঝতে পারছিলাম।

প্রায় মিনিট পনের হাঁটার পর একটা বড় মহুয়া গাছের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বিরজু। মুনিয়ার পায়ের শব্দও আর শোনা যাচ্ছে না। একটু এগিয়েই দেখি মুনিয়া বেশ দূরে একটা উঁচু মত টিবির উপর দাঁড়িয়ে আছে। বিরজুর দিকে তাকিয়েই বললাম, কি হল এখানে দাঁড়িয়ে পড়ল কেন।

একটা হাত তুলে দূরে অন্ধকারের দিকে দেখিয়ে বিরজু বলল, ওইখানে নয়া হাসপাতাল আর অপকা কোঠি ভি। খানে কে লিয়ে দুই রাস্তা হায়। এক ডাইনা তরফসে মাঠ পার হোকর আউর দুসরা ঝোরা কা পাস সে।

ডাংগদার সাহাব কো করম খোগা ঝোরা দিখাকে লে চল না। দূর থেকে মুনিয়া বলে ওঠে এবার। এতক্ষণে সত্যি বেশ ভয় করতে শুরু করেছে আমার। এই দেহাতী

কুলি মজুররা কি যে করবে কে জানে। যাই হোক মনটাকে শক্ত করে বললাম, যে রাস্তায় তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে তাই চল।

আর কথা না বলে বাঁ দিকে ঘুরল বিরজু। উঁচু জায়গা থেকে নিচের ঢালুপথে প্রায় লাফিয়ে নামল মুনিয়া। পায়ে পায়ে সেই রাস্তার এগিয়ে যেতেই একটা বিশাল বাঁশ ঝাড় চোখে পড়ল। তার পাশেই মাথা উঁচু করে বড় পাহাড়। পাহাড় দেখে গা ছম ছম করে উঠল। বাঁশঝাড় পেরিয়ে আসতেই দূর থেকে হায়েনার হো হো হাসির শব্দ শোনা গেলে। চমকে উঠতেই ঘুরে বিরজু বলল, ডর লাগছে সাহাব।

গম্ভীর সুরে বললাম,—না-না ভয় করবে কেন—আর কতদূর।

বহুত পাশ মে এসে গেছি। কথাটা বলে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি আমার হোলডলটা বিরজুর হাতে। অবাক কান্ড ওটা তো মুনিয়ার মাথায় ছিল। সে কোথায় গেল। এগিয়ে গিয়ে আবার প্রশ্ন করি বিরজুকে, মুনিয়া কোথায় গেল।

ওর বহুত জলদি কাম আছে সাহাব। ফির ঘরে ঝোর কা পানি ভি নিতে হবে। তাই ও করম খোগা ঝোরার কাছে গিয়েছে। আপ আইয়ে না হামারা সাথ। কথা বলতে বলতেই হাঁটতে থাকে বিরজু। এতক্ষণে ওর সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব গড়ে উঠেছে। পাহাড়ী রাস্তায় চল-তও অসুবিধে হচ্ছে খুব। বিরজুর কাছাকাছি কিছুতেই যেতে পারছি না। ঝির ঝির করে জল পড়ার শব্দ। শুনে বুঝলাম ওদের বলা সেই করম ঝোরা ঝর্ণাটা বোধ হয় এই পাহাড় থেকেই নেমেছে।

বিরজু বলতে থাকে, ঝোরার জল খেতে নাকি চিতল হরিণ ভল্লুক হায়েনা আর মাঝে মাঝে চিতাবাঘও সিদ্ধিবাবার পাহাড় থেকে নেমে আসে। সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা বড় পাহাড় দেখিয়েই বলল। আমার আর শরীর বইছে না। কতক্ষণে যে নিজের কোয়ার্টারে পেঁছুব। ঝর্ণার শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। জঙ্গলের রাস্তা পেরিয়ে এবার একটা মাঠের মধ্যে নামলাম। এতক্ষণ অন্ধকারে চলতে চলতে আর যেন কিছু কিছু অস্পষ্ট মনে হচ্ছে না। অন্ধকারের আলোয় মোটামুটি সবই দেখা যাচ্ছে! মাঠের পরেই ছোট ছোট সাদা তার চোখে পড়ল। কিছু ঘরও। এটাই তাহলে রেল কলোনি।

হঠাৎই মাঠ থেকে পিছনে ফিরল বিরজু। আমার হোলডলটাত মাটিতে নামিয়ে রেখেছে। ওর একটু কাছে যেতেই বলল, ওহি আপকা কোঠি সাহাব। আপনি চলে যান। আমি মুনিয়াকে সাথে নিয়ে আপনার খানা বানিয়ে আনছি। সামান ভি পেঁছে দিব। কথা শেষ করে যেন হাওয়ায়—মিলিয়ে গেল লোকটা। ভীষণ ভয় পেয়ে কিছু বলতে চাইলাম। কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরল না। ঠিক এমন সময় আমার দশ পনের হাত দূরে একটা গাছের পাশ থেকে মুনিয়া আবার দেখা দিল। ওর মাথায় আমার সেই হোলডল। ঝকঝকে দাঁতে হাসির ঝিলিক তুলে মুনিয়া দূর থেকেই বলল, আপ হামার সাথ মে আসুন ডাংগদার সাহাব। বিরজু খুব অবাক হয়ে যাবে। আপকা খানা ভি হাম ঠিক করে রেখেছি। জলদি আসুন।

ঘটনার আকস্মিকতায় তখন কথা বলার কোনও শক্তিই আমার নেই। সব কিছু যেন ম্যাজিকের মত ঘটে যাচ্ছে। অনেকটা যন্ত্রচালিত পুতুলের মত মুনিয়ার নির্দেশ মত হাঁটতে হাঁটতে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ালাম। আমার হোলডল নিয়ে ঘরে ঢুকল মুনিয়া। কোনও তাঁবুতেই আলো জ্বলছে না। ঘরের সামনে দাঁড়িয়েই ভাবছি, কি করব। মুনিয়া ঘরের মধ্য থেকে বলল, বারাণ্ডা মে পানি হায় সাহাব। হাত মুখ ধুয়ে আপনি খানা খান।

কখন যে জল রাখল আর খানাই বা কে বানাল কিছুই বুঝতে পারছি না। ঘরটাই বা খুলল কী করে। আবার ভাবলাম মহেশই হয়ত সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। আর কিছু চিন্তা না করে ঘরে ঢুকলাম। একটা ভ্যাপসা পচা গন্ধ নাকে এল। কিচ কিচ শব্দ তুলে ইঁদুর ছুটে গেল। হঠাৎই মনে পড়ল আমার টর্চটা তো এ্যাটাচির মধ্যেই রয়েছে। এতক্ষণ মনেই পড়ে নি। এ্যাটাচি খুলে টর্চ বের করে জ্বালতেই অবাক হলাম। ঘরের মধ্যে একটি দড়ির খাটিয়া। আর আমার—হোলডল খুলে বিছানাটা সুন্দর করে পাতা। নিশ্চয়ই মুনিয়া করেছে। কিন্তু ও গেল কোথায়। ওর নাম ধরে জোরে ডাকতেই দূরের মাঠ থেকে খিল খিল হাসির শব্দ ভেসে এল।

এবার আর নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব হল না। পড়েই যাচ্ছিলাম মাথা ঘুরে সামনের চেয়ার ধরে সামলে নিতেই আবার বিস্ময়। চেয়ারের সামনেই একটা ছোট টেবিল। আর তাতে স্টিলের থালায় কয়েকটা রুটি আর বাটিতে একটা তরকারি। পাশে একগ্লাস জলও রয়েছে। ডাক্তারি পড়ার সময় থেকেই ভয় ডর দূরে সরিয়ে দিয়েছিলাম। তারপর কয়েক বছর মধ্যপ্রদেশের এই সব পাহাড়ী অঞ্চলে থেকে জন্তু জানোয়ারের ভয়ও কেটে গিয়েছিল তবুও আজ এই মধ্যরাত্রিতে বৌরিডাণ্ডে এসে একের পর এক যে সব ঘটনার সম্মুখে পড়লাম তাতে ভয়টা ক্রমশঃ আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

অনেকটা মনের জোরে আর ঈশ্বরের করুণায় নিজেকে ঠিক রেখে ভিতরের বারান্দায় যেতেই দেখলাম, সত্যি একটা বালতিতে জল রয়েছে। ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ভাল লাগল। আর চিন্তা না করে চেয়ারে বসে খাবারের থালাটায় হাত রাখলাম। এমন সময় আবার চমক। পাশে জানালায় দুটি মুখ দেখা দিল। মুনিয়া আর বিরজু হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। রাগ হলেও হেসেই ফেললাম। হাজার হলেও এই বিদেশ বিভূঁই জায়গায় ওরাই তো আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। আর এই রাত্রিতে খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থাও করে দিল। তাই হেসেই বললাম, ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন ভিতয়ে এস।

আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল ওরা। একটু পরেই দূর থেকে বিকট বাঘের গর্জন ভেসে এল। হঠাৎই যেন মুনিয়া আর বিরজু হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আবার। এবার থেমে থেমে শুধু মু—নি—য়া -মু—নি—য়া হো—শব্দ আর তারপরই মুনিয়ার গলার খিল খিল হাসির শব্দ শুনতে পেলাম।

চেয়ার থেকে উঠে দরজার কাছে যেতেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। এক সঙ্গে অনেক

লোকের কথার শব্দে ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকালাম আবার। লণ্ঠন আর টর্চের আলোও জ্বলছে আমাকে ঘিরে। আমার জেগে ওঠা দেখেই একজন মধ্যবয়সী মানুষ ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে এল। নমস্কারের মত হাত তুলে বলল, আমি আপনার কম্পাউণ্ডার মহেশ টিরকে। হঠাৎ শরীর খারাপ হওয়ায় স্টেশনে যেতে পারি নি। তবে মাষ্টার সাহাবকে সবই বলে রেখেছিলাম। স্টেশন পোর্টার আপনাকে পেঁছে দিত। কিন্তু সাহাব আপনি এত রাত্রিতে এলেন কি করে! ঘরেই বা ঢুকলেন কখন!

মহেশটিরকের কথা শুনে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। আমার ঘরে খাটিয়ার উপরই শুয়ে টেবিলে খাবার থালা বাটি গ্লাসও দেখতে পাচ্ছি। তাই মনের জোর নিয়ে বললাম, কেন আপনিই তো বিরজু আর মুনিয়াকে স্টেশনে পাঠিয়েছিলেন। ওরাই নিয়ে এল। আর মুনিয়া খাবার বানিয়ে খেতেও দিল।

জয় রামজী—জয় রামজী--বলে পিছিয়ে গেল মহেশ। ঘরের লোকেদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠল।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন তিনুমামা আমরা তখন গায়ে গা লাগিয়ে বসেছি। বাপটু আর থাকতে পারল না। মামার হাত ধরে বলল, তারপর কি হল ?

আমাদের দিকে এগিয়ে বসে তিনুমামা—বললেন, তারপর আর কি ? সুস্থ হয়ে উঠতে ভোর হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে তখনও সবাই আমাকে ঘিরে রয়েছে। মহেশ টিরকের মুখেই বিরজু আর মুনিয়ার কাহিনী শুনলাম।

কনষ্ট্রাকশানের শুরু থেকেই বিরজু এই হাসপাতালে সুইপারের কাজ করত। মুনিয়া ওর স্ত্রী। সেও কাজেই লেগেছিল। শুরুতে যে ডাক্তারবাবু ছিলেন তার রান্নাঘরের কাজ সবই করত মুনিয়া। খুব সুন্দর গান গাইতে পারত। তবে ওদের মনে একটা দুঃখ ছিল ছেলেমেয়ে না থাকায়। একবার জঙ্গল থেকে বিরজু একটা হরিণের বাচ্চা ধরে এনেছিল। মুনিয়া ওটাকেই ছেলের মত পুষত। ডাক্তারবাবুও ওদের ভালবাসতেন।

হরিণের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে করম ঝোরা ঝর্ণায় জল আনতে যেত মুনিয়া। বিরজু ওকে বারণ করত। ঝোরার লোনা জল খেতে সম্বর চিতল ভল্লুক সব জানোয়ারই আসে। মুনিয়া সন্ধ্যোবেলাতেও যেত। একদিন সন্ধ্যের সময় হরিণের বাচ্চাটাকে জল খাওয়াতে নিচে নামতেই অঘটন ঘটল।

উপরের জঙ্গল থেকে একটা চিতাবাঘ লাফিয়ে হরিণের বাচ্চাটার উপর পড়ল। মুনিয়াকে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে মেরে ফেলল। তারপর যা হয়। খবর পেয়ে লোকজন নিয়ে পাগলের মত ছুটে গেল বিরজু কিন্তু তখন সব শেষ।

সেই থেকে ধীরে ধীরে মাথা খারাপ হয়ে গেল বিরজুর। মাঝে মাঝে করমঝোরা ঝর্ণার কাছে গিয়ে মুনিয়ার মাম ধরে ডাকত। কখনও বা চিৎকার করে গান গাইত। তবে কারও কোনও ক্ষতি করত না। শুধু রাত্রে বাঘের ডাক শুনলে ওর পাগলামীটা বেড়ে যেত। একা ছুটে চলে যেত ঝোরার কাছে জঙ্গলের মধ্যে। এই ভাবেই

একদিন বিরজুকেও বাঘে মেরে ফেলল। ওর কাটা ছেঁড়া শরীরটা মাঠের পাশে বড় মহুয়া গাছের নিচে পড়েছিল।

আগেকার ডাক্তারবাবু অন্য জায়গায় বদলি নিয়ে চলে যাবার পর এখানে আর কেউ আসতে চায় নি। ডাক্তারবাবুর ঘর বন্ধ থাকলেও ঘরের মধ্যে কে যেন কাজ করে রাখত। চেয়ার টেবিল সাজিয়ে রাখত। মহেশ মাঝে মাঝে চাবি খুলে রামজীকে ধূপ-কাঠি দেখিয়ে ঘর বন্ধ করে রাখত। ডাক্তারবাবুদের কাজ করেই খুশি থাকতে চাইত মুনিয়া আর বিরজু।

মহেশটিরকের কথা শুনতে শুনতে হঠাৎই আমার মনে পড়ল কাল রাত্রে আসবার সময় ওই মাঠের কাছে মহুয়া গাছটার পাশেই দাঁড়িয়ে পড়েছিল বিরজু আর মুনিয়াও করমখোগা ঝর্ণার কাছে কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল। মহেশের কথাই ঠিক। ডাক্তারবাবুদের সত্যি ভালবাসত ওরা দু' জনে অন্ততঃ কাল রাত্রে জনমানব শূন্য রাস্তায় আমাকে তো বিপদের হাত থেকে উদ্ধারই করেছিল ওরা।

কথা বলা শেষ হল তিনুমামার। আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। তিনুমামাই আবার বললেন, এত বছর কেটে গেছে কিন্তু সেদিন রাত্রের ঘটনাগুলো এখনও আমাকে মাঝে মাঝেই ভাবিয়ে তোলে। সে সব সূত্রে সমাধান আমি সেদিনও পাইনি—আজও জানি না।

ভাল্লাগেনা

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

বাড়ির পাশে মস্ত মাঠ, হাতে লাটাই ঘুড়ি
ঘুড়ির পেছনে ছুটতে গিয়ে সকাল যেত চুরি।
পুকুর পাড়ে ভাঙা কুঁড়ে, মাথায় তেঁতুল গাছ
দিনের বেলাই চড়ুইভাতি, রাতে ভূতের নাচ।
মাথায় আকাশ নীল মাখানো পায়ে নদীর ঢেউ
রাত দুপুরে কয়টা কুকুর করতো হঠাৎ ঘেউ।
গাছের মাথায় মেঘ বানাতো, সিংহ এবং পাহাড়
ঢেউ তির তির নৌকো হাঁটে পালের সে কী বাহার।
গুটি গুটি মটরশুটি পা জড়াতো, আর
কইতো কথা মিষ্টি দোয়েল গান শুনিয়ে তার।
আজ কেন তার মুখখানা ভার বড়ই থমথমে
ভাল্লাগেনা ভাবছি বসে শহর এ দমদম-এ।

রজনীবাবু ধরা পড়লেন

বাণীব্রত চক্রবর্তী



রজনীবাবু এবার পুজোয় কোনও গল্প লিখবেন না। এবারে তিনি একটু বিশ্রাম নিতে চান। তিনি কোনও কালে অবশ্য প্রচুর পরিমাণে লেখেন না। বছরে বড় জোর দশ বারোটি গল্প লেখেন। তবু এবার পুজোয় তিনি একটাও গল্প লিখবেন না বলে ঠিক করেছেন।

বছরে দশ বারোটার মধ্যে পুজোর সময় তাঁকে কমপক্ষে ছ' সাতটা গল্প লিখতে হয়। বাংলা ভাষা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে রজনীবাবু তো অপরিচিত নন। বিশেষত যারা ভূতের গল্প পড়তে ভালবাসে তাদের কাছে রজনীবাবুর নাম অজানা নয়। কেবল ভূতের গল্প লিখে একজন লেখক কী ভীষণ জনপ্রিয় ও বিখ্যাত হতে পারেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বয়ং রজনীবাবু।

এত খ্যাতি এবং অফুরন্ত রোজগার হওয়া সত্ত্বেও রজনীবাবু পনেরো বছর আগে যে ভাবে জীবন যাপন করতেন এখনও তাঁর জীবনধারা সেই রকম। কালীঘাটের আদি গঙ্গার ধারে তাঁর সেই বাড়িটি একই রকম। একই রকম তাঁর কাজের লোক হরি।

শুধু গল্প লেখা থেকে বিরত থাকলে চলবে না। সেই সঙ্গে তাঁকে অজ্ঞাতবাস থাকতে হবে। কলকাতায় থাকলে সম্পাদকেরা তাঁকে তিষ্ঠতে দেবেন না। লিখব না বলে তিনি যতোই ধনুক ভাঙা পণ করুন না কেন সম্পাদকেরা কি সেটা মেনে নেবেন? রজনীবাবুকে বাদ দিয়ে রোমহর্ষক পুজো সংখ্যা গুলি কী করে প্রকাশ হবে। আর যদি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় তা হলে সেসব পুজো সংখ্যা কে আর গাঁটের কড়ি খরচা করে কিনবে? অতএব রজনীবাবুকে অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে।

তিনি একবার ভেবেছিলেন লুকিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং সম্পাদকদের সরাসরি জানিয়ে দেবেন কেন তিনি এবারের শারদীয় সংখ্যায় কোনও গল্প লিখবেন না।

এই ব্যাপারটা নিয়ে তিনি একা একা অনেক ভেবেছেন।

রজনীবাবুর এই যে এত নাম ডাক, এত জনপ্রিয়তা, সর্বোপরি এমন বিপুল চাহিদা, কেন ?
তাঁর প্রতিটি গল্পে এমন নতুনত্ব থাকে, যা পড়ে পাঠক সত্যিই চমকে ওঠে। গল্পের ভিতর দিয়ে লেখক পাঠকের মনের মধ্যে কেমন সূক্ষ্ম কৌশলে ঢুকে পড়েন। লেখায় তিনি এমন একটা পরিমণ্ডল রচনা করেন যা যে কোনও বয়সের পাঠককে অদ্ভুত একটি আচ্ছন্নতার ভিতর ডুবিয়ে দেয়। তাঁর গল্প যদি কেউ একবার পড়তে শুরু করে তাহলে গল্পটি শেষ না করে ছাড়তে পারে না।

রজনীবাবু ভেবে দেখেছেন এখন তাঁর কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। যদি তিনি বিশ্রাম না নিয়ে লিখতেই থাকেন তাহলে তাঁকে অদূর ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হবে। বিপদটা তাঁর লেখক জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। এই মুহূর্তে তিনি যদি কিছুদিনের জন্যে কলম না থামান তবে তাঁর সুনামে ভাঁটা পড়বে। তাঁর জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবে। যে নতুনত্বে পাঠকেরা চমকে ওঠে, তারাই তখন বলবে, নাহ্, রজনীবাবুর লেখায় যেন তেমন আর ধার নেই। এখন তাঁর লেখায় কিছুটা একঘেয়েমি এসে যাচ্ছে। একদিন যাঁর লেখা পড়ে শিউরে শিউরে উঠতাম, তাঁর লেখা পড়ে আর তো তেমন বোধ হচ্ছে না।

মধ্য-পঞ্চাশ অতিক্রান্ত রজনীবাবু দূর দৃষ্টি দিয়ে এসব ছবি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। তাই রজনীবাবু এখন কিছুদিন বিশ্রাম নিতে চান।
সম্পাদকদের সরাসরি এই ব্যাপারটা জানালে কোনও কাজ হবে কি ? পরীক্ষা করতে দোষ কোথায়। এইসব ভেবে রজনীবাবু প্রথমেই ফোন করেছিলেন কিঙ্কর বর্মনকে। বাংলা ভাষায় 'অমানিশা'র মতন আর দ্বিতীয় কোনও গল্পের পত্রিকা নেই। অমানিশার সম্পাদক কিঙ্কর বর্মন অতি সজ্জন, অমায়িক।
কিন্তু ফোন করে কোনও ফল হল না। বরং ফলটা যে উল্টো হয়ে যাবে রজনীবাবুর এমন আশঙ্কা হল।

বর্মন মশাই তো রজনীবাবুর কথা শুনে আগে এক চোট হেসে নিলেন। তারপর বললেন, "আর হাসাবেন না রজনীবাবু। আর হাসাবেন না। ওসব পাগলামি রাখুন। হ্যাঁ, ভাল কথা, রবিবার সকালে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি।" এইটুকু বলে বর্মন মশ ই ফোন রেখে দিয়েছিলেন।

রবিবারের সকালে কি বর্মনমশাই রজনীবাবুর বাড়িতে এসেছিলেন ? তা রজনীবাবুর জানা নেই। রবিবার সকালে রজনীবাবু ট্রেনে। তিনি অজ্ঞাতবাসে চলেছেন। সঙ্গে তাঁর কাজের লোক হরি।
রবিবার সকালে ছুটন্ত ট্রেনে বসে বর্মন মশাইয়ের কথা মনে পড়েছিল। ঘড়িতে তখন সকাল দশটা। হয়তো এখন বর্মন মশাই কালীঘাটের আদিগঙ্গার ধারের বাড়িটার দরজায় কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতন দাঁড়িয়ে আছেন। দরজায় একটা পেল্লাই তালা

ঝুলছে। আলিগাড় তালা। রজনীবাবু ট্রেনের সিটের উপর গা এলিয়ে সিগারেট টানতে টানতে বর্মন মশাইয়ের মুখটি ভাবছিলেন।
ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে।

॥ দুই ॥

সন্ধেবেলায় ট্রেন এসে থামল মতিপুরে। উত্তর প্রদেশের ছোট একটি স্টেশন মতিপুর। এখানে ট্রেন দাঁড়ায় ঠিক তিন মিনিট। স্টেশনটি ভারী শান্ত। নির্জন।
উত্তর প্রদেশে ভ্রমণ পিপাসুদের জন্যে যে সব বিখ্যাত জায়গা আছে তা থেকে মতিপুর একেবারে আলাদা। এখানে টুরিস্টদের ভিড় নেই।
রজনীবাবু ও হরি ছাড়া ঐ ট্রেনে থেকে আর কেউ মতিপুরে নামে নি। সঙ্গে মাল পত্র বেশি নেই। স্টেশনের বাইরে একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়েছিল। রজনীবাবু হরিকে নিয়ে তাতে উঠলেন। তারপর টাঙ্গাঅলাকে বললেন, "তোফা বাগ।" টাঙ্গা চলতে শুরু করল।
হরির মুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ওর মুখে খুশিও নেই, আবার স্বস্তির ভাবও নেই। হরি রজনীবাবুকে চেনে। রজনীবাবুর কাছে তার চাকরির রজত-জয়ন্তী গত বছর পূর্ণ হয়েছে। বাবুর সঙ্গে থেকে থেকে সেও একধরনের নির্বিকার ঔদাসীন্য অর্জন করেছে।
কুড়ি মিনিট বাদে টাঙ্গা একটা খুব পুরনো অট্টালিকার সামনে এসে দাঁড়াল।
রজনীবাবু টাঙ্গা থেকে নামলেন। মালপত্র নিয়ে হরিও নামল। ভাড়া আর বকশিশ নিয়ে টাঙ্গাঅলা সেলাম ঠুকে চলে গেল।
জায়গাটা বেশ নির্জন। যদিও এটা বড় রাস্তা। বিচ্ছিন্নভাবে স্ট্রিট লাইটগুলি জ্বলছে। রাস্তার দুপাশে প্রাসাদোপম বাড়ি। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির ভিতরে বাগান। বাড়িগুলি খুব পুরনো। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এইসব বাড়িগুলিতে কেউ থাকে না। বেশির ভাগ বাড়ি অন্ধকারাচ্ছন্ন। দু' একটা বাড়িতে মিট মিটে আলো জ্বলছে।
এসব বাড়িগুলির দিকে তাকালে মনে হয় এখানে মানুষ থাকে না। এগুলি যেন পরিত্যক্ত হানাবাড়ি।
এমন পরিবেশে রজনীবাবু ছাড়া আর কাকেই বা মানায়!
রজনীবাবু পকেট থেকে একটা পেন্সিল টর্চ বার করে, বাড়িটার লোহার গেটে আলো ফেললেন। লোহার গেটের দু'পাশে লতানে গাছের ঝাড়। তিনি টর্চের আলো ফেলে কী যেন খুঁজছিলেন। পাতার ঝাড় সরিয়ে এবার যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে গেলেন। পাথরের ফলকটির দিকে তাকিয়ে রজনীবাবুর মুখে যে হাসিটি ফুটে উঠল

সেটি আবিষ্কারকের হাসি। ফলকটিতে উর্দু ভাষায় যা লেখা ছিল তার মানে বুঝতে তাঁর অসুবিধে হল না। তিনি উর্দু জানেন।

টর্চ নিবিয়ে নিশ্চিন্ত মুখে হরির দিকে ফিরে বললেন, "এই বাড়িটারই নাম তোফা বাগ।"

লোহার গেট ঠেলে রজনীবাবু বাড়িটার ভিতরে ঢুকলেন। আবার তাঁকে টর্চ জ্বালতে হল। পিছনে পিছনে মালপত্র নিয়ে হরি। টর্চের আলোতে পায়ে চলা পথ দেখা গেল। দু'পাশে গাছপালার জঙ্গল।

রজনীবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে হরির দিকে ফিরে বললেন, "সাবধানে। টর্চের আলো দেখে দেখে এগিয়ে চল।" তারপর আপন মনে বিড় বিড় করে বললেন, "তোফা বাগ এখন জঙ্গল হয়ে গেছে।"

কলকাতায় বসে রজনীবাবু যখন সাময়িক ভাবে কিছুদিনের জন্যে লেখা স্থগিত রাখার কথা ভেবেছিলেন তখনই তাঁর মনের ভিতর অজ্ঞাতবাসের পরিকল্পনাটি জন্ম নিয়েছিল। তবু কলকাতা তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি সম্পাদকদের কাছে নিজের মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। সম্পাদকদের উপরে তাঁর আস্থা ছিল। তিনি ভেবেছিলেন যদি তাঁদের এই না লেখার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন তাহলে হয়তো তাঁরা সেটা বুঝবেন। তাই তিনি প্রথমেই অমানিশা পত্রিকার সম্পাদককে ফোন করেছিলেন। অমানিশার সম্পাদক কিঙ্কর বর্মনের উপর তাঁর আস্থা ছিল সবচেয়ে বেশি। বর্মন মশাই কেবল সজ্জন আর অমায়িকই নন, বিবেচকও বটে। কিন্তু সেখানে তিনি যে ফল পেলেন তাতে তাঁর কলকাতায় থাকার ভরসাটা উবে গেল। তাই আর অন্য কোনও সম্পাদককে ফোন করার সাহস পেলেন না। তখনই তিনি মনে মনে ঠিক করে ফেললেন তাঁকে অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে।

রজনীবাবু অজ্ঞাতবাসে যাবেন। কিন্তু কোথায়?

অজ্ঞাতবাসে যেতে হলে এই জুলাই মাসেই যেতে হবে। কেননা শারদীয় সংখ্যার লেখার তাগাদা এখন থেকেই শুরু হয়। তা-ছাড়া এবছর পুজোও খানিকটা এগিয়ে এসেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে পুজো। অতএব রজনীবাবু ভাবতে বসলেন কোথায় তাঁর অজ্ঞাতবাসের ঠিকানা হবে। ভাবতে ভাবতে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কোথায় যাবেন? মনের ভিতর অনেকগুলি জায়গার কথা ভেসে উঠেছিল। পুরী, বোম্বে, গোয়া, দিল্লী, মাদ্রাজ এমনকি এই বাংলার কোনও কোনও গ্রাম। কিন্তু এতগুলি জায়গার মধ্যে কোনও জায়গাই তাঁর মনঃপূত হচ্ছিল না। এইসব বিখ্যাত জায়গায় কেউ কি অজ্ঞাতবাসে যায়? এমন কি বাংলার নিভৃত গ্রামও তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয় সেটা রজনীবাবু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। এইসব জায়গায় তাঁর পরিচিত মানুষের অভাব নেই। সব জায়গাতেই তাঁর অনুরাগী আছে। তাই এইসব জায়গাগুলিতে নিরাপত্তার যথেষ্ট অভাব আছে।

সম্পাদকদের চোখকে তিনি ফাঁকি দিতে পারবেন না। তাঁরা ঠিক রজনীবাবুকে খুঁজে

বার করবেন। সম্পাদকদের অসাধ্য কিছু নেই ? তখন তাঁকে বাধ্য হয়ে কলম ধরতে হবে। তাই রজনীবাবু মনে মনে সেইরকম একটা জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে তিনি যথার্থ অজ্ঞাতবাসে থাকতে পারবেন। যেখানে তাঁর অনুরাগী কিংবা পরিচিত মানুষের ভিড় নেই। যে জায়গা বিখ্যাত পরিচিত মানুষের ভিড় নেই। যে জায়গা বিখ্যাত নয়। বিখ্যাত জায়গায় সব সময়ই মানুষদের ভিড় থাকে। সেখানে অনেকেই রজনীবাবুকে চিনে নিতে পারে তাদের কাছ থেকে কলকাতায় খবরটা চাউর হয়ে যেতে কতক্ষণ। তাহলে কি আর সম্পাদককুল চুপ করে বসে থাকবেন ?

কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি ? যেখানে তাঁর অজ্ঞাতবাসকাল নির্বিঘ্নে কাটবে বিশ্রাম হবে। এই নিয়ে ভাবতে ভাবতে তাঁর মতিপুরের কথা মনে পড়েছিল। মতিপুরে তিনি কোনও দিন যাননি। অথচ কতকাল আগে বেঞ্জামিন তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

বেঞ্জামিন ভট্টাচার্য। রজনীবাবুর ছেলেবেলার বন্ধু। আসলে ওর নাম কুমুদ ভট্টাচার্য। স্কুলে ওকে সবাই বেঞ্জামিন বলতো। কুমুদকে এই নামটা অবশ্য হিস্ট্রির সুধন্য বাবুই দিয়েছিলেন।

কুমুদ ছিল অদ্ভুত ধরনের ছেলে। তার মাথায় অহর্নিশ নানারকম প্ল্যান ঘোরে। নতুন কিছু আবিষ্কার করার প্ল্যান।

বড় হয়ে রজনীবাবু যখন মার্গারেট কাজিন্‌স্‌ এর বেন ফ্র্যাংকলিন অফ ওল্ড ফিলা-ডেলফিয়া বইটি পড়েছিলেন তখন বুঝেছিলেন সুধন্যবাবু কুমুদের নাম কেন বেঞ্জামিন রেখেছিলেন।

স্কুলের নিচু ক্লাসে বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানতেন না। কুমুদের মাথায় অহর্নিশ নানারকম প্ল্যান ঘোরে। নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করার প্ল্যান। সেগুলি আবার কিছুটা উদ্ভটও বটে। স্কুলের সকলে ছেলেটার এই খেয়ালের কথা জানতো। এমন কি মাস্টার মশাইরা পর্যন্ত। এই সব দেখে শুনে সুধন্যবাবু এক-দিন কুমুদকে বলেছিলেন, "তোমার নামটা পাল্টানো দরকার। একবার ভাবছি টমাস আলভা এডিশন আর একবার ভাবছি বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন। বলো তো কোন নামটা তোমার পছন্দ।" কুমুদ সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, "বেঞ্জামিন নামটা স্যার।"

সেই থেকে কুমুদ হয়ে গেল বেঞ্জামিন।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। রজনীবাবু বেঞ্জামিনকে ভুলে গিয়েছিলেন। হঠাৎ বছর পাঁচেক আগে বেঞ্জামিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দেখা হয়ে গেল একেবারে নাটকীয় ভাবে।

সেবার রজনীবাবু বেনারস বেড়াতে গেছেন। বছরের গোড়ার দিকে। শীতকাল। উঠেছেন গোধুলিয়ায় জয়পুরিয়া হাউসে। হরি তো আহলাদে আটখানা। জয় বাবা বিশ্বনাথ বলে মন্দিরে মন্দিরে মাথা ঠুকছে।

রজনীবাবু বিকেলবেলার দশাশ্বমেধ ঘাটের চাতালে চুপ করে বসে থাকেন। বেশ লাগে। সন্ধ্যে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাড়ে। তখন রজনীবাবু উঠে পড়েন।

বেনারসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান। গঙ্গা থেকে দূরে সরে এলে শীতটা কম লাগে। বিশেষ করে শহরের ভিতরে চলে এলে তো কথাই নেই।

শহরে খুব ভিড়। বড় রাস্তায় মানুষের ভিড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল রিক্‌শা, টাঙ্গা, মোটর, অটোর ভিড়। রজনীবাবুর বেশ ভালো লাগে। বড় রাস্তা ছেড়ে কখনও কখনও গলিতে ঢুকে পড়েন। সরু ঘিঞ্জি গলি। গলির ভিতর ঘুরতে ঘুরতে মনে হয় তিনি কলকাতাতেই আছেন। কালীঘাটের মুখার্জি পাড়া লেনের ভিতর দিয়ে হাঁটছেন। খালি পায়ে ভক্তের দল পুজো দিতে যাচ্ছে। পান্ডারা মানুষের হাত ধরে হিড় হিড় করে টানছে। রজনীবাবুর মনে হয় এটা তো কালীঘাটের গলি। ভক্তেরা কালী মন্দিরে পুজো দিতে যাচ্ছে।

এসব বছর পাঁচেক আগেকার কথা। এখন যদি উনিশশো সাতাশি হয় তবে সেটা বিরাশি সালের কথা। উনিশশো বিরাশির গোড়ার দিক।

এইভাবে বেনারসে তাঁর দিনগুলি কাটছিল। বেনারস ছেড়ে চলে আসার আগের দিন বিশ্বনাথের গলিতে সন্ধ্যেবেলায় মানুষের ভিড়ে তাঁর সঙ্গে একজন ভদ্রলোকের মাথা ঠুকে গেল। রজনীবাবু রেগে গিয়ে ভদ্রলোকের কড়া একটা কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। ভদ্রলোকের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। ঐ ভদ্রলোকও রজনী বাবুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। ঘিঞ্জি স্যাঁতসেঁতে গলিতে জনস্রোত। বিশ্বনাথের মন্দিরে ঘন্টা বাজছে। মানুষের হই চই, পান্ডাদের চিৎকার, এমনকি এর মধ্যে কাশীর বিখ্যাত ষাঁড়ও ঢুকে পড়েছে। এ সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে দুটো মানুষ দুজনের দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন।

অবশেষে দুজন দুজনকে চিনতে পারলে এবং পরস্পর পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এই ভাবে বহুকাল বাদে রজনীবাবুর সঙ্গে বেঞ্জামিনের দেখা হয়ে যায়। কিন্তু গল্প হয়নি। দুবন্ধু মিলে অনেকদিনের জমানো পুরনো কথা বলে হাল্কা হতে পারেন নি। রজনীবাবু তার পরের দিন কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। আর বেঞ্জামিন তো আধঘন্টা বাদেই বেনারস ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

কোনও কথা হয়নি। বেঞ্জামিন বন্ধুকে বলে গেলেন, "একবার আমার কাছে চলে আয়। অনেক গল্প জমে আছে।"

একটা জর্দার দোকানের আলোয় বেঞ্জামিন রজনীবাবুর ডায়ারিতে মতিপুরের ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, "অবশ্যই আসতে হবে।"

রজনীবাবু তাই অজ্ঞাতবাস কাটাতে বন্ধুর কাছে এসেছেন। ট্রেনে বসে তিনি যেমন ভেবেছিলেন তেমন এখনও ভাবলেন, বেঞ্জামিন কি আমার টেলিগ্রামে পেয়েছে?

পায়ে চলা পথ ফুরিয়ে এলে কয়েকটা ধাপ পাথরের সিঁড়ি। সেগুন কাঠের সাবেক কালের বিশাল দরজা।

দরজার সামনে এসে রজনীবাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর পাশে হরি। মালপত্র গুলি দরজার সামনে নামিয়ে রেখেছে।

রজনী বাবু ভাবলেন বেঞ্জামিন কি এখনও এই তোফা বাগে থাকে? মাঝখানে পাঁচটা বছর পেরিয়ে গেছে। চিন্তিত মুখে রজনীবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। কিন্তু এক মিনিটও পেরোয়নি হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল।

দরজার পাল্লা খুলে লণ্ঠন হাতে একটা বুড়ো এসে দাঁড়াল। বুড়ো লোকটির মুখে এতটুকু বিস্ময় নেই। বুড়োটা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, "আসুন। ভেতরে আসুন। বাবু আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

রজনীবাবু ঘুরে হরির দিকে তাকালেন। হরি নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রজনী বাবু বললেন, "নে মালপত্রগুলো ওঠা। বাড়ীর ভেতরে যেতে হবে।"

বুড়ো লোকটা বলল, "এখন ওগুলো ওখানে থাক। আমি পরে এসে নিয়ে যাব।"

হরি বলল, "এখানে থাকবে কেমন? চুরি হয়ে যাবে না?"

বুড়ো লোকটা মাথা নেড়ে বলল, "না সে ভয় নেই। আসুন আপনারা।

লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রজনীবাবু বুড়ো লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কি? তুমি বাঙালী বুঝি?"

লোকটা লণ্ঠন নিয়ে আগে আগে, পেছনে ওরা দুজন। ঘাড় না, ঘুরিয়ে লোকটা বলল, "আমার নাম বংশী। আমার দেশ বাংলাতেই বাবু।"

"কোথায়?" রজনীবাবু জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলেন না।

"আজ্ঞে, বর্ধমানের গোতানে।"

বাড়িটা যেমন বিরাট, তেমন প্রাচীন। রজনীবাবুর মনে হল এ বাড়িটা নির্ঘাত মুঘল আমলের। হয়তো সেকালে কোনও রইস আদমী এ বাড়িটা তৈরি করেছিলেন। তোফা বাগ নামটি রেখেছিলেন। তোফা বাগ শব্দটি আরবি ফার্সি মেলানো। বেঞ্জামিন চিরকাল অদ্ভুত। নইলে কোন এক মতিপুরে এ রকম বাড়িতে কেউ থাকে?

অন্ধকার। বংশীর হাতের আলোটা দুলছে। সেই আলোয় অন্ধকারের ভয়াবহতা আরও প্রকট।

একটা অন্ধকার ঘরের সামনে ওদের দাঁড় করিয়ে বংশী বলল, "যান। ঐ ঘরে যান। বাবু আছেন।"

তারপর লন্ঠন দুলিয়ে বংশী যে কোথায় চলে গেল তা ওরা বুঝতেই পারল না। রজনী বাবু দেখলেন তাঁর পারিপার্শ্বিক জুড়ে কেবল অন্ধকার। পাশে হরি। এবার তাঁর সামনে বন্ধ দরজা।

এবারও কি মুহূর্তের মধ্যে দরজাটা খুলে যাবে?

বেঞ্জামিন বরাবর এই রকম। সাধারণ থেকে আলাদা, উদ্ভট। তার মাথায় আবিষ্কারের

পাগলামি সর্বদা পাক খেত। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সেই রোগটা সারেনি এটা বুঝতে পেরে রজনীবাবু মনে মনে হাসলেন।

"বাবু দাঁড়িয়ে রইলেন যে।"

রজনীবাবু হরিকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বলা হল না। অন্ধকারের ভিতর একটা আর্তকান্না শোনা গেল। হরির নির্বিকার ভাবটা কেটে গেল। অস্ফুটভাবে 'বাবু' বলে রজনী বাবুর হাতটা মুঠোয় সে চেপে ধরে। রজনীবাবু বুঝতে পারলেন হরি আতঙ্কে থর থর করে কাঁপছে। আতঙ্কিত হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। এমন অজানা দেশে হানাবাড়ির মতো একটা অন্ধকার বাড়িতে ঢুকে একের পর এক যা ঘটছে তা সাহসী মানুষকেও বিচলিত করে। সব থেকে বড় কথা এই কান্না। কে কাঁদল? রজনীবাবু ভেবে পেলেন না এই মুহূর্তে কী করা উচিত। আবার যদি কান্না জেগে ওঠে হরি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না। এখন তো কাঁপছে। তখন জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে।

হঠাৎ চারিদিকে দপ্ দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল। সামনের দরজা খুলে গেছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেঞ্জামিন হাসছে।

আলো জ্বলতে তোফা বাগের চেহারাটা পরিস্কার ভাবে চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। অন্ধকারে বাড়িটাকে যে রকম ভয়াবহ মনে হয়েছিল তা কিন্তু নয়। বেঞ্জামিন বললেন, "আয় রজনী।"

বংশী মালপত্র নিয়ে বারান্দা দিয়ে আসছে।

বেঞ্জামিনের ঘরে ঢুকে রজনীবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি যেন বুঝতে পেরেছেন তাঁকে ভয় দেখানোর জন্যে বন্ধুবর এই সব ব্যবস্থা করেছিল। রজনীবাবুর জীবনে এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু যে বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘকাল বাদে দেখা আর যার আমন্ত্রণে এখানে আসা স্বয়ং সেই বন্ধু এরকম একটা কাঁচা ও বিরক্তিকর কাজ করতে পারে ভেবে রজনীবাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি রেগেও গেলেন।

ঘরে রজনীবাবু আর বেঞ্জামিন মুখোমুখি। বংশীর সঙ্গে হরি বারান্দা পেরিয়ে কোথায় যেন চলে গেল।

বেঞ্জামিন বন্ধুর ভারাক্রান্ত মুখ দেখে অবাক হলেন।

"কী হয়েছে তোর। অমন মুখ ভার করে আছিস কেন?"

"বেঞ্জামিন, তুই এমন রসিকতা করবি ভাবতে পারিনি।"

"কেন রে রজনী, কি রসিকতা করলুম আবার।"

"বাড়ি অন্ধকার করে রেখে এ কেমন আপ্যায়ন!"

"বাড়ি অন্ধকার করব কেন। পাওয়ার কাট হয়েছিল। এখানে ওটা হয়। কেন তোদের কলকাতায় তো লোডশেডিং হয়। হয় না?"

"বেশ সে না হয় বুঝলুম। তাহলে তুই অন্ধকারের মধ্যে কেমন করে বুঝলি আমরা এসেছি। আমরা তো দরজায় ঘা দিইনি।"

"বারে এই ঘর থেকে রাস্তাটা যে পরিষ্কার দেখা যায়। তোরা ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামলি স্পষ্ট দেখলুম।"

"তবে ঐ আর্তনাদটা? কান্নাটা?"

বেঞ্জামিন এবার হো হো করে হেসে উঠলেন, "কলকাতায় থাকিস। বুঝতে পারবি কী করে।"

"তার মানে?"

"বাগানের গাছপালার ভিতরে কোনও শকুনের বাচ্চা কেঁদে উঠেছিল আর কি।"

রজনীবাবুর মুখের মেঘ আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল। এবার মুখে বেশ পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল।

"বেশ। তাহলে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল? তোর এখানে দুদিন বিশ্রাম করা যাক। কী বলিস?"

"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। তা ছাড়া কলকাতা থেকে কাল আমার বড় ভায়রা ভাইও আসছে।"

"তাই নাকি?" খুশি খুশি মুখে রজনীবাবু একটা সিগারেট ধরলেন। বন্ধুর দিকে প্যাকেটটা এগিয়েও দিলেন। বেঞ্জামিন ঐ প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

বেঞ্জামিন সিগারেট টানতে টানতে বললেন, "সেদিন তোর টেলিগ্রামটা পেলাম সেদিনই ভায়রা ভাই ট্রাংকল করেছিল। মাঝে মাঝে কলকাতা থেকেও আমার খবর নেয়। বলল, ওর মন নাকি ভাল নেই।"

আমি বললুম আমার মন এখন খুব ভাল। শীঘ্র কলকাতা থেকে আমার এক পুরনো বন্ধু এখানে বেড়াতে আসছে। গড়গড় করে তোর নামটা বলতেই ভায়রা ভাই তো লাফিয়ে উঠল। বলল, আমিও মতিপুরে আসছি। আজ সকালে তার টেলিগ্রাফ পেয়েছি। কাল আসবে। তোকে নাকি সে খুব ভাল করে চেনে।"

"তোর ভায়রা ভাইয়ের কী নাম?"

"কিঙ্কর বর্মন। অমানিশা নামে একটা ভুতুড়ে পত্রিকা বার করে।"

রজনী বাবু লাফিয়ে উঠলেন।

"কী হল?"

রজনীবাবু আবার শান্ত হয়ে বসলেন।

সিগারেট টান দিতে দিতে বললেন, "কী আবার হবে। পুলিশ ছুটে আসছে। আসামীর পালাবার পথ বন্ধ।"

"তার মানে?"

বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে রজনীবাবু চোখ বুজে সিগারেট টানতে লাগলেন।

———

মোকাবিলা

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমি মেতেছি দারুণ খেলায়,
আমায় ডুবিয়ে দিতে পারবে কি কেউ
অবহেলায় ?
আমার যত কিছু সাধ-আহ্লাদ—
আমি বিন্দুতে পাই সিন্ধুর স্বাদ
সাধের ভেলায়।···

আমি আকাশ-গঙ্গা পাড়ি দিয়ে দিয়ে
কখন কোথায় পৌঁছুব গিয়ে
কেউ জানে-না ছাই—আমিই কি জানি তাই ?
আমি বাতাসের সাথে মিতালি পাতিয়ে
সুরেলা পাখির শিস্ দিয়ে দিয়ে
কাকে যে কখন দোলা দেব গিয়ে
কেউ জানে-না ছাই—আমিই কি জানি তাই ?
আমার সঙ্গে ঘোরেন ফেরেন
অলক্ষ্যে বীণাপাণি।

আকাশের নীল সামিয়ানা ঘেরা
পৃথিবী আমার ঘর
অন্ধকারে দীপ জ্বেলে দিতে
আমার সয়-না মোটেই তর
আমি অহংটাকেই ডুবিয়ে দিয়েছি
ভুলেছি আপন পর ;

আমি মেতেছি দারুণ খেলায়
জীবন-মরণ খেলাটা দেখাতে
নেমেছি মোকাবিলায়।···

———

দি গ্রেট ম্যাজিক্যাল সার্কাস অফ ঘটোৎকচ

ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী

আমার বন্ধু ইঞ্জিনীয়ার মিত্র সাহেবের বেকার ব্যায়ামবীর মাস্‌ল্‌ম্যান ছেলে সন্তু কেমন করে কলির ঘটোৎকচ হয়েছিল তার গল্প আগে একবার এক কিশোর পত্রিকায় লিখেছিলাম। এ বছর জানুয়ারী মাসে হঠাৎ মিত্র সাহেরে এক চিঠি এসে হাজির। প্রিয় ডাঃ বাগচী তোমার বুদ্ধি বলে বেকার সন্তু কলির ঘটোৎকচ হয়ে নাম কিনেছিল। সে নিজেই সার্কাস দল খুলেছে নাম দিয়েছে 'দি ম্যাজিক্যাল সার্কাস।'
সঙ্গে একখানা বিজ্ঞাপন দিলাম। সন্তুর চিঠি এই সঙ্গে দিলাম। ইতি তোমার মিত্র সাহেব।
সন্তু লিখেছে ডাক্তার কাকু বেকার বসে বাবার অন্ন ধ্বংস করতে করতে আপনারই বুদ্ধি-বলে আজ আমি ভারত বিখ্যাত। নতুন সার্কাস দেখাচ্ছি পাটনায়। অবশ্য আসবেন একদিন ইতি সন্তু। বিজ্ঞাপনে লিখেছে আপনারা সার্কাস দেখছেন বাল্যকাল থেকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক ধরণেরই খেলা। দি গ্রেট ম্যাজিক্যাল সার্কাসে আসুন যা কোনও দিন কল্পনা করেন নাই সেই সব খেলা দেখুন। সব শেষে আসবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলবান বীর কলির ঘটোৎকচ।
চিঠি পেয়ে চলে গেলাম পাটনা। সার্কাসের পাশের তাঁবুতে মিত্র শুয়েছিল, আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। সন্তু এল। আর একটু চেহারা ফিরেছে। ডেকে আনল ম্যানেজার রাজকুমার জ্ঞানসিংকে। মধ্য প্রদেশের কোন রাজবংশের ছেলে। সেই মূলধন জুগিয়েছে। মাঝারি ধরণের তাঁর কাজের লোকজন ছাড়া খেলোয়াড়দের সংখ্যা কমই। জন্তু জানোয়ার বলতে একটা হাতি। জিজ্ঞাসা করতে বলল এই দিয়েই জম জমাট, বেশী খেলোয়াড়ের দরকারই হয় না। যাই হোক আদর-আপ্যায়ন অনেক হল। দেখলাম তাঁবুর ভিতরে উপরে অনেক রংচঙ্গের আলো আর নানা যন্ত্রপাতি খাটান এমন কি দর্শকদের গ্যালারীর উপরেও শূন্যে নানা রকম আলো আর যন্ত্রপাতি ঝুলছে।
সার্কাস আরম্ভের প্রথমে দর্শকদের অভিবাদন জানাতে রিং এল সেই হাতী বেশ সাজান গোছান। মাত্র পাঁচজন পুরুষ খেলোয়াড় পাঁচজন মেয়ে দুজন বেঁটে-বোঁটে ক্লাউন। ম্যানেজার মাইকে ঘোষণা করল দর্শকগণ আমাদের খেলোয়াড় সংখ্যা দেখে হতাশ হবেন না এমন সব খেলা আমরা দেখাব যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সার্কাসে দেখান হয় না। অবশ্য দর্শকের সব আসনই ভর্তি ছিল।
প্রথমে একটা টেবিল এনে রিং-এ পাতা হল। তারপরে বাজনার তালে তালে একজন ক্লাউন একটা ক্যাশ বাক্স মাথায় করে নাচতে নাচতে এল। তারপর ঐ বাক্স টেবিলের

উপর রেখে তার ভেতরে রাখল তাড়া তাড়া নোট। আর একট ক্লাউন এসে বলল এখানে টাকা রাখছ চোর নিয়ে যাবে ত। প্রথম জন বাক্সে চাবি দিয়ে বলল চাবি আমার কাছে রইল। দ্বিতীয় জন তখন বলল চোর বাক্স শুদ্ধ উঠিয়ে নেবে। প্রথম ক্লাউন মন্ত্র পড়ে একগাছা সুতো বাক্সের উপরে রেখে বলল-মন্ত্র দিলাম। কেউ নিতে পারবে না।
দ্বিতীয় জন তখন এদিক ওদিকে চেয়ে দেখে বাক্সটা উঠাতে গেল। কিন্তু বাক্স তুলতে পারল না। বারকতক চেষ্টা করে বলল আরে বাপরে এ বাক্সের এত ওজন।
তখন ম্যানেজার ঘোষণা করল দর্শকদের মধ্যে যদি কেউ এই বাক্স উঠিয়ে নিতে পারেন তবে সব টাকা শুদ্ধ বাক্স তার হবে। দুচারজন দর্শক দৌড়ে রিংয়ে চলে এল। এসে চেষ্টা করল কিন্তু বাক্স উঠল না। দুজন পারল না আর কেউ এগোল না অপ্রস্তুত হবার ভয়ে। তখন সেই প্রথম ক্লাউন নাচতে নাচতে এল। এসে বলল কিরে তুই বলেছিলি চোর নিয়ে যাবে বাক্স দেখলি এই সুতোর ভারে বাক্সটা কি ভারী হয়েছে কেউ নিতে পারল না। এবার আমি এটা নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাই। এই বলে অনায়াসে বাক্সটা তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। সবাই অবাক হয়ে হাততালি দিল।

এরপরে চারজন খেলোয়াড় এল সবাই মাটির উপরে ডিগবাজী খেয়ে পা উপর দিকে দিয়ে দাঁড়াল। ব্যস ঐ অবস্থায় ওরা শূন্যে উঠতে লাগল। তারপর শূন্যেই কোনও অবলম্বন না নিয়ে চরজন দর্শকদের মাথার উপর দিয়ে এক চককর উড়ে আবার রিংএর মধ্যে এসে দাঁড়াল। এমন খেলা এ পর্যন্ত কোনও সার্কাসে দেখান হয় না। সবাই খুব হাততালি দিল।

এমন ধরণের খেলা দেখান হল সঙ্গে রংবেরঙ্গের আলোর বাহার। সার্কাসে প্রচলিত যে সব খেলা দেখান হয় তার একটাও এরা দেখাল না। শূন্যে সাঁতার দেওয়া, শূন্যে সাইকেল চালনা, এমনই সব শেষে ম্যানেজার ঘোষণা করল এবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলশালী কলির ঘটোৎকচ আসছেন। তিনি যে খেলাগুলো দেখাবেন তা যদি দর্শকদের মধ্যে কেউ দেখাতে পারেন তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তারপর ঝমঝম করে বাজনা বেজে উঠল রংবেরঙ্গের আলো চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। রিং-এর মাঝ বরাবর অনেকগুলো জবরজং আলোর বাক্সকে তাঁবুর মাথার দিক থেকে নীচের দিকে নামান হল।
কলির ঘটোৎকচ রিং-এ ঢুকল। বাঘছাল জাঙ্গিয়া বাঘছালের আধখানা গেঞ্জি ইয়া বড় গালপাট্টা গোঁফ চোখের চারপাশে মোটা লাল বর্ডার ঠোঁটে লাল রং মাথায় এক রংচঙ্গে ফেট্টি। মাসল্ ফোলাতে ফোলাতে রিং-এ ঢুকল। চারপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে সকলকে অভিবাদন করল। ঘোষণা হল কলির ঘটোৎকচ এবার বিশমণ ওজনের বারবেল মাথার উপরে তুলবেন। তিন চারজন গড়িয়ে গড়িয়ে প্রকাণ্ড চাকার মত বারবেল নিয়ে এল। তাতে লেখা আছে-বিশ মণ যে সার্কাসে যত বলবান লোকই থাক বিশ মণ ওজন কেউই তোলে না। ঘটোৎকচ হঠাৎ ওয়াফ ওয়াফ বলে দুটো লাফ দিল, দাঁত মুখ

খিঁচিয়ে বারবেলটা দেখল তারপর পিছিয়ে এসে এক লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে বারবেলের রডটাকে ধরল দুহাতে। ঝমঝম শব্দে বাজনা। আলোর চক্র। ব্যস এক ঝাঁকিতে অত ওজনের বারবেল তুলে ধরল মাথার উপরে। চারপাশে হাততালি। সামনে ঝুঁকে ঘটোৎকচ বারবেল ফেলে দিল সামনে। ঝনাৎ শব্দ করে বারবেল পড়ল মাটিতে গর্ত করে।

ঘটোৎকচ তোয়ালেতে হাত মুছে দাঁড়াল। এবার ঘোষণা হল। সব সার্কাসে আপনারা দেখেন হাতী বুকের উপরে নেওয়া হয়। কিন্তু হাতী কাঁধে করে তোলে এমন দেখেছেন কি? এবার দেখুন গ্রেট ম্যাজিক্যাল সার্কাসের কলির ঘটোৎকচের অপূর্ব খেলা হাতী কাঁধে নেওয়া। এ খেলা যদি আর কেউ পারেন তবে দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন। রিং-এ ঢুকল হাতী। সাজান সুন্দর করে, পেটের নীচে তক্তা আছে আড়াআড়ি আর পিঠের ওপরেও দুতিন খানা মোটা তক্তা পাটাতনের মত করে বাঁধা। তার সঙ্গে শিকল দিয়ে পেটের নীচের তক্তায় বাঁধা। তক্তাগুলোয় বেশ ছবি আঁকা। হাতী এসে শুঁড় তুলে ঘুরে ঘুরে অভিবাদন জানাল। ঝমঝম বাজনার তালে তালে ঘটোৎকচ রিং-এ এল। একটা পেট মোটা বোতল থেকে একটা ক্লাউন এসে লাল রং-এর কি পানীয় গ্লাসে ঢেলে দিল এক চুমুকে খেয়ে ফেলল। ঘোষণা হল ঘটোৎকচ আসলে হিড়িম্বা রাক্ষসীর ছেলে, তাকে ঠাণ্ডা রাখতে রক্ত খাওয়াতে হয়। এই মাত্র সে একগ্লাস রক্ত খেল, এইবার হাতী কাঁধে নেবে।

হাতীটা আড়াআড়ি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘটোৎকচ দারুণ গর্জন করে ওর পেটের নীচে ঢুকে নিচু হয়ে বসে পড়ল। দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে তক্তার দুদিকে দুটো আংটা ছিল তা ধরে ফেলল। সাংঘাতিক ঝমঝম বাজনা লাল নীল হলদে আলোর যন্ত্রটা উপর থেকে নেমে এল হাতীর চার হাত উপরে। ঘটোৎকচ ক্রমে দাঁড়াচ্ছে হাতীর চার পা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। ঘটোৎকচ সোজা হয়ে দাঁড়াল হাতী কাঁধে নিয়ে দুমিনিট থাকল আবার আস্তে আস্তে নীচু হয়ে বসে পড়ল। তারপর হাতীর পেটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল। মানুষের হাততালি আর থামতে চায় না। ঘটোৎকচ তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে এক লাফে রিং-এর বাইরে চলে গেল। ম্যানেজার বারবার নিজেদের সার্কাসের এই প্রশংসা করে। এবার ঘটোৎকচের শেষ খেলা ঘোষণা করল।

আবার যথারীতি বাজনা আলোর খেলা কয়েকজন মিলে একটা চাকা লাগান গাড়ী ঠেলে নিয়ে এল। তার পাশে রাখল একটা উঁচু কাঠের সিড়ি। ঐ গাড়ীতে চেপে বসল চার জন মানুষ। সবার মাথায় হেলমেট। গায়ে বর্মের মত পোষাক সেকালের রোমান যোদ্ধাদের মত। তারা বসলে গাড়ীর চারপাশের আংটায় শিকল লাগিয়ে এক সঙ্গে একটা বালার রিং-এ লাগান হল। তাতে রুমাল জড়ান হল।

ঘোষণা হল ঘটোৎকচ এই সিঁড়িতে উঠে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ঐ মানুষ শুদ্ধ গাড়ীতে উঁচু করবে। যথারীতি বাজনা আলোর মধ্যে ঘটোৎকচ রিংএ এল। এবার পোষাক বদল করে এসেছে। পরনে মানুষের হাত পা লাগান ঘাগরা, গলায় মাথার খুলির মালা

একেবারে রাক্ষস। এসে গর্জন করে সিঁড়ির উপরের তাকে দাঁড়াল। তারপর দুখানা লম্বা হাড় নিয়ে ঠক ঠক করে বারকতক বাজিয়েই নীচু হয়ে ঐ আংটা কামড়ে ধরল। কামড়ে ধরে আস্তে আস্তে সোজা হতে লাগল আর গাড়ীটা শূন্যে উঠতে লাগল। পুরোপুরি সোজা হয়ে দুমিনিট থেকে আবার নীচু হয়ে গাড়ীটা নামিয়ে দিল। দিয়েই এক লাফে নেমে ঐ মানুষগুলোকে ধরতে গেল। লোকগুলো গাড়ী থেকে নেমে রাক্ষস রাক্ষস করে দৌড় দিল। হার দুটো ঠকাঠক করে বাজাতে বাজাতে ঘটোৎকচ বেরিয়ে গেল। খেলা শেষ হল।

সমস্ত পাটনা শহরে দি গ্রেট ম্যাজিক্যাল সার্কাসের কথা। কেউ বলে ওটা আসল রাক্ষস, রোজ দুটো আস্ত পাঁঠা খায়, কেউ বলে মন্ত্র জানে। কিন্তু আসল রহস্যটা কি ধরতে পারলে তোমরা।

তবে বলে দিই। সমস্ত ব্যাপারটাই তড়িৎ চুম্বকের কারসাজী (Electro Magnet) আজকাল স্কুলেও তোমরা বিজ্ঞান পড়। তড়িৎ চুম্বকের ব্যাপারটা অবশ্যই জান। এক বা বেশী নরম লোহার শিক একত্র করে তার চারপাশে বিদ্যুৎ নিরোধক তার (Insulated wire) যদি অনেক প্যাঁচ জড়ান তার, তারপরে ঐ কয়েলে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ ছাড়া যায় তবে মধ্যেকার ঐ লোহায় শিকগুল শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। ঐ শিকের সংখ্যা এবং কয়েলে জড়ান তারের সংখ্যা যত বাড়বে চুম্বকও তত শক্তিশালী হবে। সোভিয়েত দেশে দেখেছি বড় বড় কারখানায় ঐ ধরণের চুম্বকের সাহায্যে বিরাট বিরাট ওজনের লোহার জিনিস তুলবার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানেও ঠিক তাই।

প্রথম খেলাটা অর্থাৎ টেবিলের উপরে ক্যাশ বাক্স। ঐ বাক্সটার তলায় লোহার তৈরী আর টেবিলের পাটাতনের তলায় ঐ তড়িৎ চুম্বক বসান আছে। ওটায় তড়িৎ প্রবাহ লেগে বাক্সকে এমন টেনে রাখে যে ওটা তোলা কারও সাধ্য হয় না। আবার প্রবাহ বন্ধ করলেই সব আগের মত।

ঘটোৎকচের বারবেল তোলাও তাই। মাথার উপর ঐ রংচঙ্গে আলোর যন্ত্রগুলি সব শক্তিশালী তড়িৎ চুম্বকের অনেকগুলি যন্ত্র। আলোর ছদ্মবেশ দিয়ে মানুষকে বুঝতে দেওয়া হয় না।

হাতীত চুম্বকে টানে না সেজন্য অন্যবুদ্ধি করা হয়েছে। হাতীর পিছে তক্তা বাঁধা আছে সব লোহার পাতে মোড়া তাছাড়া শিকলও লোহার। পেটের নীচে তক্তটাকে ঘটোৎকচের কাঁধে নেবার সরঞ্জাম হিসাবেই দেখা হয় আর ওটা ঠিক জায়গাতে রাখবার জন্য পিঠের তক্তা। কিন্তু আসলে চুম্বকের টানবার ব্যবস্থা।

মানুষ বোঝাই গাড়িটাও তাই একে লোহার গাড়ী লোহার শিকল লোহার আংটা তায় মানুষগুলোর লোহার বর্ম হেলমেট।

এই খেলার প্রথম বুদ্ধিটা দিয়েছিলাম আমিই। সে আগের কাহিনীতে বলেছি।

কিন্তু তোমাদের একটা কথা চুপি চুপি বলি। ঘটোৎকচের সার্কাস কলিকাতা এলে তোমরাত নিশ্চয়ই দেখতে যাবে কিন্তু আসল কথা ফাঁস করে দিয়ে ঘটোৎকচকে ফ্যাসাদে ফেলো না যেন। তাহলে ও কিন্তু আমাকে দোষ দেবে!

ডাক্তার আখতার

বাণী রায়

আমাদের ডাকতার,
নাম তার আখতার,
শুধু করে ঘরবার
রোগী দেখে না।
রোগী দেখে চলে যায়,
চাপা সুরে গান গায়,
রোগীর যে কিবা রোগ
তাতো বলে না।
আমাদের ডাকতার,
বেতো এক ঘোড়া তার;
চারপাশে ঢোকে নাল,
চিঁহি চিঁহি ডাক,
যদি কেউ নাই দেখে
পা ফেলে সে একে একে
কাজলী গরুর ডাবা করে দেয় ফাঁক,
তারপরে মার খেয়ে গাঁকগাঁক ডাক
ডাকতার আখতার বকে করে মাত,
অমনি সে বেতো ঘোড়া হয়ে পড়ে কাত,
তারপরে তোলা তাকে—
কেটে যায় রাত।
ডাক্তার আখতার
বিশ্রী স্বভাব তার,
খপ্‌খপ্‌ ধরে কোলাব্যাঙ,
রোগীরা মাংস চায়
ধরে পোড়ে ব্যাঙ গোলায়,
সে কথাটা করে না সে ফাঁক,
এই তার রীত বারমাস।

ডাক্তার আখতার
তিনি এক অবতার,
তবু তাঁরি পথ চেয়ে রোগীরা
হাঁপায়,
হাহুতাশে সব তারা
বসে থাকে জানালায়।
ওই বুঝি বেতো ঘোড়া
পথে দেখা যায়॥

———

সেদিন কই

জ্যোতিভূষণ চাকী

আয় কুটুম
যায় কুটুম
ঢেঁকি ঘরে চিড়া কুটুম।
ধান ভানা
চিড়া কোটা
মিঠা কথার ছিটা ফোঁটা
এ বউ হেলে
ও বউ ঢলে
শাঁখায়-নোয়ায় কথা বলে।
সেদিন কই
সেদিন কোথায় ?
সে দিন গেছে পুঁথির পাতায়।

———

আকাশেও আলো জ্বলে



সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কুট্টি শান্তিনিকেতনে গিয়ে প্রথম জানল আকাশে আলো জ্বলে। ও গিয়েছিল বাবা মার সঙ্গে শান্তিনিকেতন। ওখানে গিয়ে ওর ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল। প্রত্যেকের বাড়ীতে বাগান। বাগানে কত কি হয়েছে। কত রকমের ফুল। সাদা লাল হলুদ বেগুনী ফুলের কোনটারই ও নাম জানে না। কিন্তু দেখতে কি ভালই না লাগে। কুট্টি কলকাতায় জন্মেছে, কলকাতায়ই থাকে। কলকাতার ইস্কুলে পড়ে। ইস্কুলে যে কোন জামা পরে যাওয়া যায় না। তার আলাদা পোশাক আছে। প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষিকার জন্য আলাদা খাতা। ও সকাল বেলা ইস্কুল যায় ফের সেই বিকেলে। এসেই ছোটে পার্কে। সেখানে খেলার জায়গা নিয়ে নিত্যি মারামারি হয়। এত ছেলে খেলতে চায় অথচ পার্কটায় তো অত জায়গা নেই। ও যখন ফেরে খেলা সেরে তখন অন্ধকার হয়ে যায় আর ধোঁয়া ধোঁয়া দেখায় সব কিছু। ওর তাই ধারণা হয়েছিল যে রাত্রি নামলে আকাশ ধোঁয়াটে হয়ে যায়।

শান্তিনিকেতনে গিয়ে ও সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়াল। নরেশ জেঠুর বাড়ীতে গিয়ে পেয়ারা খেল, লেবু গাছ ভর্তি লেবু দেখে খুব খুশী মনে দুটো লেবু তুললো। জেঠু অসাধারণ ভাল লোক কিছুই বললো না। কলকাতায় লেবুর দাম অনেক তাছাড়া লেবু তো বাজারে সব সময় পাওয়াও যায় না। আর পেয়ারা আমড়া, চালতা আমলকী এসব গাছ ও দেখল আর কোন কোন গাছে ও ফলও দেখল। এসব জিনিস ও আগেও দেখেছে। কলকাতায় পেয়ারা বিক্রী হয় ঝুড়িতে। অন্য ফল বাজারে দেখা যায়। গাছের মধ্যে ফল ঝুলছে এ যে কি অসাধারণ শোভা কুট্টি আগে কখনো দেখে নি। চুয়াদির বাড়ী গিয়ে ও একদম অবাক হয়ে গেল। বাড়ীতে তিনটে গরু। যেদিন পুতুলদি আসে না সেদিন কখনো কখনো কুট্টি দুধ আনতে যায়। ওদের ওখানে একটা মিনি ডেয়ারী আছে। সেখানে গিয়ে কুট্টি লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। তারপর পয়সা দিয়ে একটা চাক্তি কেনে। আবার লাইন দেয়। তারপর সেই চাক্তিটা ফুটোর মধ্যে ফেলে দেয়। তার আগে দুধের বাসনটা একটা কলের তলায় বসিয়ে রাখে। চাক্তি ফেলা মাত্র দুধ বেরিয়ে আসে গল গল করে। ঠিক আধ লিটার হওয়া মাত্র দুধ পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কুট্টির এ কলটা খুব ভাল লাগে। জলের কল দিয়ে জলের বদলে

দুধ পড়ছে দেখতে দারুন লাগে। এ ছাড়া ও মাঝে মাঝে পুতুলদির সঙ্গে গিয়ে একটা তারের আর কাঠের খাঁচার সামনে দাঁড়ায়। সেটাও খুব মজার ব্যাপার। একটা কাগজ এগিয়ে দিলে তাতে সই করে একটা বোতল দুধ দিয়ে দেন, সেখানে যে সব মহিলা বসে থাকেন তাঁরা। খুব সুন্দর ব্যবস্থা। এ ছাড়াও কি কুট্টির দুধ আসে সাদা গুঁড়ো করা একটা জিনিস জলে গুলে। এসবই কুট্টি ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। চুয়াদির বাড়ীতে সব অন্যরকম। ভাবা যায় না! একটা পাটকিলে রঙের গরু তার একটা সাদা রংয়ের বাছুর। সেটা ভীষণ মিষ্টি দেখতে। আর কি লাফায়, কি দৌড়য়। সেই পাটকিলে রঙের গরুটার দুধ দুইয়ে নিল ঝুমরো বলে একজন। সেই দুধে কি ভীষণ ফেনা! আর সেই দুধ যখন জ্বাল দেওয়ার পর চুয়াদি খেতে দিল তার স্বাদই আলাদা। চুয়াদির মা খিঁচুড়ি করে ছিলেন। আর সর গালানো ঘি দিয়ে সেই খিঁচুড়ি আর তিলের বড়া খেল কুট্টি। তোমাদের জিব দিয়ে জল ঝরাতে চায় না কুট্টি। তবে যদি যাও শান্তিনিকেতন চুয়াদিকে একটু খোশামোদ করেও ও খিঁচুড়িটা খেয়ে এস। চুয়াদি খুব ভাল, খুব বেশী খোশামোদ করার দরকার হবে না। পারলে সুব্রতদার সঙ্গেও আলাপ ক'রো। তিনি পণ্ডিত মানুষ তাঁকে বেশী জ্বালাতন ক'র না। তিনি খুশী হলে তোমাদের যদি আকাশ ঝুরি আর আকাশ নিমের তফাৎ বুঝিয়ে দেন তাহ'লে তোমাদের ভালই লাগবে। তাছাড়া ধর ও বাড়ীর কমলালেবুর গাছটাও তোমরা দেখে এস।

কুট্টির আরও যেটা ভাল লাগল তা হ'ল ওখানে সাইকেল চালানোর মজাটা। সাইকেলটা যোগাড় হ'ল আরো এক জেঠুর বাড়ীতে। নাম খোকা জেঠু। বুড়ো মানুষদের নাম খোকা খুকু হলে খুব মজা লাগে। খোকা জেঠুর বাড়ীর প্রচুর আমড়া ফলেছে। খেতেও খুব ভাল! নিজের হাতে গাছ থেকে পেড়ে আমড়া খাওয়ার মজা এর আগে কুট্টি কখনো পায় নি। সুতরাং ওর খুব ভাল লাগল। এই সময়ই দেখল খোকা জেঠুর একটা সাইকেল আছে। ভীষণ খুশি হয়ে গেল কুট্টি, যখন জেঠু ওকে সাইকেলটা চড়তে দিলেন। কলকাতাতেও কুট্টির একটা সাইকেল আছে। কিন্তু সাইকেলে চড়ে কলকাতায় ঘোরা খুব মুশকিল। বাস ট্রাম মিনিবাস মোটর-সাইকেল, স্কুটার পাগলা সব পথচারী সবাইকে কাটিয়ে সাইকেল চালানো খুব কঠিন। শান্তিনিকেতনের রাস্তায় গাড়ী প্রায় নেই। সেখানে খুব আনন্দের সঙ্গে সাইকেল চালালো কুট্টি। অনেকক্ষণ ধরে চালালো। আরো হয়তো চালাতো তবে বাবা মার জন্য পারল না।

এইখানে একটা কথা বলে নিই। বাবা মা' রা সাধারণতঃ খুব অদ্ভুত প্রকৃতির লোক হন। তাঁদের ধারণা (১) তাদের ছেলে বা মেয়েকে চুরি করার জন্য বিশ্বের সব ছেলে ধরারা ওঁৎ পেতে আছে। কুট্টির স্কুলে একটা ছেলে পড়ে। নাম তার কুশল। এরকম খাস্তা কচুরী মার্কা ছেলে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। ওকে কোন লোক যদি পরিপূর্ণ পাগল না হয় তাহলে চুরি করবে না। অথচ ওর বাবা মাও বিশ্বাস করেন যে তাঁদের ছেলে চুরি যেতে পারে (২) বাবা মায়ের দ্বিতীয় ধারণা তাঁদের ছেলেমেয়েরা একটু সুযোগ পেলেই মাথা ফাটিয়ে বসবে কিংবা হাড়-গোড় ভাঙ্গার ব্যবস্থা করবে।

[এ গল্পের পক্ষে খুব জরুরী না হলেও বলে রাখতে দোষ নেই যে বাবা-মারা সাধারণত মনে করেন যে তাঁদের ছেলে বা মেয়ে যথেষ্ট পড়াশোনা করে না। এ ব্যাপারটা কুট্টি বোঝে না। ওদের স্কুলে ওদের ক্লাশেই সাতটা সেকশনে ২৮০ জন ছেলে পড়ে। তাদের প্রত্যেকের বাবা-মা আশা করেন তাঁদের সন্তান প্রথম হবে। কুট্টি ভাবে এই ৫৬০ জন বাবা মা নিজেরা যদি সব সময় প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অন্য স্কুলের ছেলে-মেয়ের মা-বাবা বা নিশ্চয় খুব খারাপ ছেলে-মেয়ে ছিলেন]

সুতরাং বাবা-মা পই পই করে বললেন দূরে যাবি না। কাছে কাছে থাকবি। কোন দুর্ঘটনা বাধাবি না। কুট্টি দেখেছে বাবা মার কথা—বড়দের কথা বলাই ভাল-সব সময় প্রতিবাদ না করে মেনে নেওয়াই ভাল। বাবা যখন সাইকেল-রিকশায় চড়েন সব সময় ওপরের ঢাকনাটা খুলে নেন। বলেন হাওয়া পাওয়া যায়। কুট্টি কথাটা সত্যি বলে মেনে নেয়। মা যখন চড়েন তখন সব সময় ঢাকনাটা উঠিয়ে নেন। নইলে রোদ লাগবে। কুট্টি মেনে নেয়। কোন অশান্তি হয় না। এরই জন্য কুট্টি এখনো মেনে নিল। ও সাবধানে চলবে, ছেলেধরার মতো লোকেদের ধার কাছ দিয়ে ও যাবে না। এর ফল মারাত্মক হয়েছিল। আর এক মামাকে দেখে ও সাইকেল থেকে নেমে উল্টোদিকে আবার সাইকেল চালিয়েছিল। ও জানত না উনি তার মামা। একদম ছেলেধরারা যেমন দেখতে হয় বলে ওর ধারণা মার মামা একদম সেরকম দেখতে। পরে যখন ওদের বাড়ী গিয়েছিল, উনি বলেছিলেন ভুল্টি, এটি তোর ছেলে? আজ সকালে তো আমাকে দেখে উল্টোদিকে সাইকেল চালালো খুব জোরে জোরে। সে এক বিদিকিচ্ছিরি ব্যাপার। মা কিছুতেই কুট্টির কথা বিশ্বাস করেন নি। বাবা খুব জোরে যদি না হাসতেন তাহলে ব্যাপারটা একটু কম বিচ্ছিরি হত। শান্তিনিকেতনে বুড়ো লোক একটু বেশী।

যাই হোক চুয়াদির বাড়ী থেকে ওরা যখন বেরোল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। বাবা মা চুয়াদি এত গল্প করছিল যে ওদেরও খেয়াল ছিল না যে রাত্রি এত হয়ে গেছে। কুট্টির বাবা-মা এসে উঠেছিলেন একটা ভারী সুন্দর বাড়ীতে। চারদিকে গাছপালা একটা কুয়ো। সুন্দর ছোট্ট বাড়ী। সেই বাড়ীর একখানা ঘরে ওঁরা ছিলেন। বাড়ীটার সামনে বসার জায়গাটা খুব সুন্দর। সেই বারান্দায় বসে কুট্টি আকাশের দিকে তাকিয়ে একদম অবাক হয়ে গেল। একি সুন্দর ঝকঝকে আকাশ। আর সেই আকাশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অগুণতি কে যেন আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। এরকম আকাশ কুট্টি আট বছরের জীবনে কখনো দেখে নি। মাথা উঁচু করে কুট্টি আকাশ দেখতে লাগল। ওর বাবা বললেন "কিরে ঘুমোতে যাবি না? সারাদিন এত হুড়োদস্যি করলি। এখন ঘুমো।" মা অনেক বেশী জোরের সঙ্গে বললেন এখানে জ্বর টর বাধালে হাসপাতালে ভর্ত্তি করে দেব। আসলে হাসপাতাল জায়গাটা শ্রীমান কুট্টি খুব বেশী পছন্দ করে না মা জানে। কুট্টি তাই উপায় না দেখে শুতেই গেল।

তখন কত রাত হবে কুট্টি বলতে পারে না। ওর ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙেই ওর আকাশটার কথা মনে পড়ল। বাবা মা দুজনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। কুট্টি পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল। আকাশটা আরো যেন সুন্দর হয়েছে। কলকাতায় ও চাঁদের আলো দেখেছে। কিন্তু তারার আলোয়ও যে দেখা যায় সে সম্বন্ধে ওর কোন ধারণা ছিল না। ও বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল। এক সময় ও রাস্তায় এসে পড়ল। হাঁটতেই লাগল।

ওর বোধ হয় ভূতে পেয়েছিল। নতুন জায়গা ও রাস্তা ভাল চেনে না। বাবা মা কি ভাববেন উঠে পড়লে, এ সব কোন কথাই ওর মনে রইল না। ও হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাঁধানো রাস্তা শেষ হয়ে গেল। ও এসে পড়ল একদম ফাঁকা মাঠে। মাঠ নয় উঁচু নীচু এবড়ো খেবড়ো একটা প্রান্তর। ও সারাদিনে খোয়াই এর কথা অনেক বার শুনেছে। এই বোধ হয় সেই খোয়াই। আগেই বলেছি সেদিন বোধ হয় কুট্টিকে ভূতে পেয়েছিল। ও ঘুরল অনেক। আকাশটাও ওর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল। এক আকাশ ভর্তি তারাও ঘুরল। ওর খুব ভাল লাগছিল।

কিন্তু ভাল লাগাটা হঠাৎ উঠে গেল। ওর মনে পড়ল ও কোন রাস্তায় এসেছে সেটা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। ওপরে আকাশ আর নীচে এবড়ো খেবড়ো মাটি এ ছাড়া ও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কেউ কোথাও নেই। কেউ ওকে রাস্তা চিনিয়ে দেবে না। কুট্টির সারা দেহ জুড়ে ভয়ের কাঁপুনি এল? কাজটা ও ভাল করে নি। ওর হঠাৎ মনে হ'ল ওর কোনদিন আর বাবা-মা কারুর সঙ্গে দেখা হবে না। ভয় ছেড়ে এবার কান্না এল। ও কি আর কোনদিন ক'লকাতা ফিরতে পারবে? কোনদিন স্কুলে যাবে? পার্কে খেলা করবে? সব গুলোতেই ওর মন উত্তর দিল না-না-না। ওর মনটা দমে গেল। বাবা কি করবেন? মা খুব কাঁদবে। দাদু পাগল টাগল হয়ে যাবে। তবে তীর্থ বোধ হয় ওর সাইকেলটা নিয়ে যাব।

এই সব যখন ওর মনের মধ্যে খেলা করছে তখন হঠাৎ ওর কানে ভেসে এল। কে জানি খুব জোরে খোলা গলায় গাইছে। অন্ধকার সেই প্রান্তরে সেই গান শুনে ওর লোম গুলো সব খাড়া হয়ে গেল। লোকটি তার দিকেই এগিয়ে আসছে। গানের কলি গুলি এবার কুট্টির কানে এল। 'নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া। মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে!' এবার আরো কাছে আসতে ও দেখল একজন বিশাল লোক। মানুষ এতবড় হয় ও দেখে নি। ওর মনীন্দ্র পিশে খুব লম্বা চওড়া কিন্তু এ লোকাট মনীন্দ্র পিশের চেয়ে অনেকটাই বড়। ভদ্রলোক ততক্ষণে গানের প্রথম লাইনে ফিরে এসেছেন। 'আজি যত তারা তব আকাশে সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।' কি সুন্দর গান। কি সুন্দর গলা। কুট্টি দুবার তাঁকে ডাকল। উনি কিছুই শুনতে পেলেন বলে মনে হ'ল না। উনি গেয়েই চললেন 'দিকে দিগন্তে যত আনন্দ ছড়িয়াছে এক গভীর গন্ধ আমার চিত্তে মিলি একত্রে তোমার মন্দিরে উদাসে।' এ গান কুট্টির মনে হ'ল আজকের রাত্রের জন্যই লেখা হয়েছিল।

হঠাৎ কুট্টির খেয়াল হ'ল। এই তো ওর বাঁচবার পথ। ও সেই বিশাল মানুষটিকে পিছনে পিছনে চলতে লাগল। আর সেই আপন ভোলা গায়ক মাঝে মাঝেই 'আজি যত তারা তব আকাশে' এই লাইনটায় ফিরে ফিরে আসছিলেন। ভদ্রলোক গাইতে গাইতে চলেছেন অন্ধকার প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে এক সময় উনি রাস্তায় এসে উঠলেন। তখনো গাইছেন 'আজি কোনোখানে কারেও না জানি শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,' আর কুট্টি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে গান শুনতে শুনতে চলেছে। হঠাৎ একটা গাছের কাছে এসে জায়গাটা একটু বেশী অন্ধকার হয়ে গেল। আর সেই গানও থেমে গেল। কুট্টি ছুটে বেরিয়ে এল। গায়ককে ধরতে হবে। না সে গায়ক নেই। ও অনেক ছুটলে কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। শান্তিনিকেতনের আকাশে তখন ভোর হচ্ছে। আর পাখীর দল ডাকতে সুরু করেছে। শান্তিনিকেতনে কত পাখী। আর তাদের ডাকের বাহারই বা কি? ভোরের আলোয় বাড়ীগুলি দেখা যাচ্ছে! কুট্টি দেখল সেই গায়ক তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেছেন।

বাবা-মা ওকে বাগানে দেখে বললেন কি রে ভোরবেলাই উঠে পড়েছিস্। কুট্টি কিছু বললো না। কি বলবে কেই বা বিশ্বাস করবে? তাছাড়া সারা রাত মাঠে ঘুরেছে শুনলে বাবা মাই কি খুব খুশী হবেন?

কুট্টি কাউকে এই গল্প বলে নি। তবে একদিন একটা আসরে সবাই গান গাইছিল। কুট্টি ওই গায়কের মুখে শোনা গানটা শুনিয়েছিল—'আজি যত তারা তব আকাশে।' মা খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন। "এ গান তুই কোথা থেকে শিখলি" বাবারা অতশত নজর করে না। তাই বাবা অন্য কোন কথা পেড়েছিলেন। কুট্টিকেও কিছু বলতে হয় নি।

গায়কী পুতুল

কৃষ্ণ ধর

ছিল পুতুল, দেখতে পুতুল
নাম ছিল তার মিষ্টি তুতুল
আবার তাহার বাহারি চুলগুচ্ছ।
ডাকলে পরেই দিত সাড়া
গানের সুরে মাতায় পাড়া
কোথায় লাগে লতার গলা, তুচ্ছ !
টপ্পা-ঠুংরি খেয়াল গানে
ওস্তাদেরা সব হার মানে
মানতে হবে ঘরানা তার উচ্চ।
পুতুল না সে, দেখতে পুতুল
খুকুর নামই মিষ্টি তুতুল
অবাক তাহার বাহারি চুলগুচ্ছ।

শরৎ

সুমিতা সামন্ত

শরৎ জাগে পাতায় পাতায়
শরৎ জাগে ঘাসে,
শরৎ লাগে বনের মাথায়
শরৎ লাগে কাশে।
শরৎ নাচে ফুলে ফুলে
শরৎ নাচে ফলে,
শরৎ আছে নদীর কূলে
শরৎ আছে জলে।
শরৎ ভাসে মেঘে মেঘে
শরৎ ভাসে আলোয়,
শরৎ হাসে আকাশ দেগে
শরৎ হাসে কালোয়।
শরৎ সাথে সবাই বাঁচে
শরৎ সাথে ঘুরে,
শরৎ মাতে প্রাণের কাছে
শরৎ মাতে দূরে॥

অধিকার

নসরত শাহ



প্রতিক বাস থেকে নীলখোলা স্টেশনে নামে। চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়া আয়নার মত জ্বল জ্বল রোদ। বুড়ো বট গাছের ছায়ায় শান বাঁধান ঘাটে এসে দাঁড়ায়। পাশ দিয়ে কুল কুল বয়ে যাচ্ছে, একটি শান্ত শীতল জলাধার। কাঠের নড়বড়ে পুল পার হয়ে সেই পথ ধরে এগোয়। মজা পুকুর, মঠ, মন্দির ও ঝোপ জঙ্গল নিয়ে দুপাশের পরিবেশ বেশ নির্জন। তবু দু'একটা বনপাখির শিসে চমক ওঠে। শহর ছেড়ে গ্রামে থাকার ইচ্ছে প্রতিকের দীর্ঘ দিনের, সে আশা পূর্ণ হতে চলেছে। তাই মনের ভালবাসা হাওয়ায় বিভিন্ন কল্পনা ভেসে বেড়াচ্ছে।

আরও কিছুটা এগিয়ে দেখতে পায়, দু' পাশে রোদে পোড়া তামাটে ফসলের ক্ষেত। পথের ডান পাশ ধরে একটা খাল চলে গেছে অনেক দূরে। খালে তেমন পানি নেই। তবু কিছু লোক গর্ত খুঁড়ে অনেক কষ্টে পানি জমাচ্ছে। তারপর কলস ভরে তা তুলে জমিতে ছড়াচ্ছে। অন্য একটা দৃশ্য চোখে পড়তেই প্রতিক যেন হোঁচট খায়। একটা ছেলে লাঙ্গলের ফলার মুঠি চেপে ধরে আছে। জোয়ালের একদিকে একটা হাড় জির জিরে গোরু অন্যদিকে আরও একটি গোরুর পরিবর্তে মধ্যবয়সী একজন মানুষ হাল টেনে জমি চষছে। 'মানুষ এখানে পশুর মতন!' কথাটি অস্ফুট স্বরে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রতিককে থমকে দাঁড়িয়ে কিছু বলতে দেখে, লোকটা চাষ থামায়। কাঁধ থেকে জোয়াল ফেলে উঠে দাঁড়ায়। দরদরিয়ে ঘামছে। অমানুষিক পরিশ্রমের ভেতরও হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করে, কাউরে খুঁজতাছেন?

প্রতিক ওর বিষয় এড়িয়ে বলল, বাঙিলা ভোট স্কুলটা কোন দিকে?

এই পথে পশ্চিমে গিয়া, ডাইন দিকের পরথম পোল পার হইলে ইশকুল। তা ওইখানে কি কাজে যাইবেন?

আমি ওই স্কুলে মাস্টার হয়ে এসেছি।

লোকটা এবার ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, তৈয়ব তগো ইশকুলের নোতুন স্যার। তাড়াতাড়ি গিয়া ছালাম কর।

ছেলেটা দৌড়ে এসে টুপ করে প্রতিককে ছালাম করে। প্রতিক একটু বিব্রত বোধ করে। স্যার হিসাবে কোন ছাত্রের প্রথম ছালাম। কি বলবে অনুমান করতে পারে না। তবে সম্মানের ভেতরে যে বেশ প্রশান্তি আছে তা অনুভব করে। ছেলেটা উঠে দাঁড়িয়ে লুঙ্গির মাল কোচা ছেড়ে বলল, চলেন স্যার আপনারে ইস্কুলে লইয়া যাই। আর ব্যাগটা আমার হাতে দ্যান।

বলেই ব্যাগটা একরকম জোর করে প্রতিকের হাত থেকে কেঁড়ে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে দেয়। প্রতিক ওকে অনুসরণ করে বলল, তুমি আর হাল চষবে না?

এ বেলার মত মোর কাম শ্যাষ। এহন বড় চাইংগাগুলা কোদাল দিয়া বাবা একলাই ভাঙতে পারবে

তোমার বাবা জোয়ালে ছিল কেন?

খরায় খ্যাত কোলা শুকাইয়া সব ঘাস পুইর‍্যা গ্যাছে। তাই খাইতে না পাইয়া হালের একটা গোরু মইরা গ্যাছে। কেউ নিজেগো চাষ খুইয়া একটা গোরু ধার দিতে চায় না। গোমস্তার কাছে গোরু কিনতে কর্জ চাইলে কয়, তগো ওই জমিটুকুও বন্ধক রাখ, তাইলে দিমু। কপাল দোষে গরীব হইলে তাগো কেউ সাহায্য করতে চায় না, তাই বাবা নিজেই গোরু হইল।

তুমি স্কুলে যাও না? না-কি স্কুল বন্ধ।

ইশকুল এক রকম বন্ধের মতই। ছাত্ররা সবাই প্রায় খ্যাত কোলায় কাম করে। স্যারেরাও বহুত সময় নিজেগো কামে ব্যস্ত থাহেন। আমিতো আইজ ইশকুলে রওনা হইছিলাম। বাবা কইল, বাজান মুই আর একলা লারি না। পড়া-ল্যাখায় চাষা ভূষগো পোষায় না, আগে প্যাডের খাওন জোগাড়ের দরকার। আইজকা খ্যাতে ল, যে দিন অপসর পাবি, হেই সব দিন ইশকুলে যাবি।

তৈয়বের কথা শুনে প্রতিকের বুকের মধ্যে এক টুকরো গোপন দীর্ঘশ্বাস জমা হয়। কথা বলতে বলতে ওরা স্কুলের আঙিনায় চলে এসেছে। এ স্কুল শহরে দেখা স্কুলের মত ঝকঝকে তক তকে নয়। মাঠের মধ্যে টিনের লম্বা টানা দো-চালা ঘর। ব্যাড়া ভাঙা, চালের দু'এক স্থান থেকে বোধ হয় টিন উড়ে গেছে। পাঁচটি ক্লাশের প্রত্যেক-টিতে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। উপরের ক্লাশে ক'খানা বেঞ্চ, বাকি সকলে কেউ চট, কেউ বা ছনের মাদুরে বসা। বইগুলি জীর্ণ। শ্লেট আর তালপাতা ও কলা পাতায় কাঠকয়লা গোলান কালিতে বাঁশের কঞ্চির কলমের সাহায্যে লিখছে। দু' একজনার খাতাও রয়েছে। দু ক্লাশে শিক্ষক নেই। এক ক্লাশে পণ্ডিত মশাই থেকেও বেত হাতে ঘুমোচ্ছেন। পাশের ক্লাশে একজন শিক্ষক বোর্ডে অংক করে বোঝাচ্ছেন। অন্য ক্লাশটিতে শিক্ষক অশুদ্ধ উচ্চারণে চেঁচিয়ে সাতের ঘরের নামতা মুখস্ত পড়াচ্ছেন। প্রধান শিক্ষকের কামরা খালি। দপ্তরি সামনের টুলে বসে নাক ডাকছে।

'হেড স্যার কোথায়?' বলতেই লোকটা বিরক্তির সঙ্গে হাঁউসি দিয়ে চোখ মেলে তাকায়।

তৈরবকে ধমকের সুরে কিছু বলতে মুখ খুলেছিল প্রায়, ঠিক তখন পেছন থেকে 'মোজাহার মিঞা এরকম দপ্তরির কাজ করলে তো চলে না ! থার্ড ঘণ্টা দেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে প্রায় দশ মিনিট তুমি ফাঁক দিয়ে ঘুমোচ্ছো ! আর তোমারইবা দোষ দিই কি করে !' কথাগুলি বলতে বলতে যে শিক্ষক ক্লাশে অংক করাচ্ছিলেন তিনি এসে সামনে দাঁড়ান। 'বললেন, হেড স্যার উপ জেলা অফিসে গেছে। সরকার থেকে স্কুল মেরামতের টাকা এসেছে, তার কাগজ-পত্তর তৈরী করে ফিরবেন। কিন্তু আপনি ?

আমি ডি ডি পি আই অফিসের মাধ্যমে এই স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরী নিয়ে এসেছি। আমিও ছ মাস হল জমি বিক্রি করে নগদ পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে বেকারত্ব থেকে এই স্কুলের চাকুরীতে ঢুকেছি। তৈরবকে পেলেন কোথায় ?

ওর সঙ্গে পথে দেখা ও-ই চিনিয়ে নিয়ে এল।

'তা তৈরব, তুইও শেষ পর্যন্ত ক্ষেত খামারে কাজ শুরু করে দিলি। তোর বাবাকে বলিস, পড়া লেখা শেখা থাকলে ভবিষ্যতে তুই-ই জমিতে আরও ভাল চাষ দিতে পরতি। চলুন, ওই গাছের ছায়ায় বাতাসে গিয়ে বসি।

ভদ্রলোককে প্রতিকের বেশ আন্তরিক মনে হয়। তৈরব কোন কথা বলে না। চুপ চাপ মাথা নীচু করে স্যারদের সঙ্গে গাছের ছায়ায় চলে আসে। প্রতিক বলল, অন্যান্য স্যাররা কোথায় ? আর সকল ছাত্রদেরই বুঝি ওর মত অবস্থা ?"

হ্যাঁ বলতে গেলে ছাত্র শিক্ষক সকলেরই একই অবস্থা। সবই হচ্ছে অভাবে। এই সমস্যাটা যদি সত্যিকারের হত তাহলে কোন দুঃখ ছিল না।

তাহলে ?

'সকলে চেয়ারম্যান, গোমস্তা, তালুকদারদের ওপর নির্ভরশীল। তাই উঁনারাই সকলের চোখের সামনে কৃত্রিমতার ঠুলি এঁটে রেখেছেন। কেউ কেউ বুঝলেও কিছু করবার নেই, তাহলে মিথ্যার ফাঁদে ফেঁসে যাবে।

তাই বলে ছাত্ররা অশিক্ষিত থেকে দুষ্ট হবে, শিক্ষকরা অলস হবে, আর কৃষকরা গোরু হবে। এমনতর সমস্যাতো চলতে পারে না।

এতটুকো কথা শুনেই মনের মধ্যে ক্ষোভ জমিয়ে, প্রথমেই অত উত্তেজিত হবেন না। গ্রামের সকলের ভাব সাব আগে বুঝতে চেষ্টা করুন, তাহলে সব ব্যপার চোখের সামনে পরিস্কার হয়ে যাবে।

যেমন ?

উঁনারা গ্রামেরই কিছু লোকদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে প্রয়োজনে সাধারণ মানুষ-দের মাথায় লাঠি ভাঙ্গাচ্ছে। আর উঁনাদের সন্তানেরা শহরের কিণ্ডার গার্ডেন থেকে শিক্ষিত হয়ে আগামীতে এখানেই নতুন সামান্ত হয়ে আসছে। কিংবা গ্রামের মানুষ বস্তি ছেড়ে শহরে যাবে সেখানেও উঁনাদের প্রতিষ্ঠিত মিল কল-কারখানা কিংবা বাসা বাড়িতে কাজ করতে হবে।

প্রতিক মনের ভেতর যেন ভাঙনের সুর শুনতে পায়। অনুভব করে ব্যপক পরিবর্তনের প্রয়োজন মনকে আরও দৃঢ় করতে হবে। শুরুতেই দুর্বল হলে চলবে না। ছাত্রজীবনে পার্টি করা আর গ্রামগুলির নিদারুণ সমস্যা আলাদা জিনিস। কিছুক্ষণ চুপচাপ ভেবে বলল, স্যার আপনার মত খোলা মনের মানুষ এ গ্রামে দু'চারজন পেলে সব সমস্যার সুন্দর সমাধান খুঁজে নেওয়া যাবে।

কি রকম?

'স্কুল মর্নিং করে দিলে ছেলেরা দশটার পর ক্ষেতে কাজে যেতে পারবে। ওদের বাবা মায়েদেরও সন্ধ্যের পর অক্ষর জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কি করে অল্প জমিতে অধিক ফসল ফলান যায়, তা বই পড়ে বলে দেওয়া যাবে। সকলকে একত্রিত করে সমবায় পদ্ধতি চালু করে দিলে, ভূমিহীনরাও তাহলে সমান সুযোগ পাবে। ফলে আলগুলি ভেঙে দিলে জমির পরিমাণও বেড়ে যাবে। শিক্ষকরা একাত্ম হলে স্কুল ঠিক ঠিক ভাবে চলবে। এবং আমরা নিজেরাই সরাসরি শিক্ষা অফিস ও সমিতির সাথে যোগাযোগ করে নেব। কাজেই আমরা সংগঠিত থাকলে কেউ চেষ্টা করলেও আমাদের ফাঁদে ফেলতে পারবে না।

'তা হলে তো আমাদের সকলকে আত্মকেন্দ্রীকতা ছেড়ে চিন্তা চেতনায় অভিন্ন হতে হবে।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছেন। আমাদের ধীরে ধীরে নিবিড় ভাবে গ্রামবাসীর মধ্যে কাজ চালাতে হবে। এবং সঠিক পথ খুঁজে সমস্যার মূল কেন্দ্রে আঘাত হানতে হবে। অবশ্য এসব পরিবর্তন হুট করে সম্ভব নয়।

কিছু বাধা-বিঘ্নও আসবে সে জন্য হতাশ হলেও চলবে না। আর একটা কথা, অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, তা আদায় করে নিতে হয়।

তৈয়ব এতক্ষণ মাথা নীচু করে ওদের সব কথা মন দিয়ে শুনছিল। ও বলল, স্যার, আমি ছোট তাই আপনাদের সব কথার মর্মার্থ না বুঝলেও এতটুকু বুঝেছি যে আপনারা শহর থনে আইলেও আমাদের ভাল চাচ্ছেন। আর এজন্য নির্বিঘ্নে গ্রামের সকল মানুষের সহযোগিতা পাবেন।

তৈয়ব এখনই জীবনের টান পেড়নে, স্বপ্ন ছেড়ে বাস্তব নিয়ে ভাবতে শিখেছে। ওর কথায় যেন চৈত্রের মেঘের দিনেও জলাশয় থেকে হিজল ফুলের ঘ্রাণ ভেসে আসে। প্রতিকও অনুভব করে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করতে এসে কিছু ভাল কাজের ক্ষেত্রের সন্ধান পেয়ে গেল। অংক স্যার বললেন, "স্যার এখানে টিকে থাকাটাই ঝুঁকি পূর্ণ হবে। তবু পদক্ষেপ ফেললে অন্তত পিছিয়ে যাব না। তা যাই হোক আপনার তো এখন পর্যন্ত থাকার জায়গা ঠিক হয়নি চলুন আমার সঙ্গে থাকবেন।

প্রতিক মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে তৈয়বকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবং তৈয়বের হাত থেকে ব্যাগটা এবার নিজেই নিয়ে নিল। ওকে বলল, আগামী দিন থেকে তুমি নিয়মিত ক্লাশ করতে শুরু করবে। আমি তোমার বাবাকে তোমার ব্যাপারে বলবো।

তৈয়ব মাথা নীচু করে বলল, 'ঠিক আছে স্যার। বাবাকে আপনার কথা আমিই বলবো। গ্রামের সেই পথে আস্তে আস্তে ওরা অংক স্যারের বাড়ির দিকে চললো।

ফসলের ফয়সালা

সুধা চট্টোপাধ্যায়

ভোজন রসিক গণেশবাবু,
বাজার করেন রোজ।
এইটি যে তাঁর নিত্য কর্ম,
করেন সুখে ভোজ।
তাঁকে দেখেই আনাজগুলো,
নড়ে চড়ে ওঠে।
আমাকে নাও, আমাকে নাও,
বাক্য তাদের ছোটে।
ফুলকপি যে বলল-আমি
বাজার করি আলো।
ভোজন রসিক জন যে আমায়,
তাইতো বাসে ভালো।
আলু, পটল, কুমড়ো বেগুন
সবই নেবেন তাই,
সবকটিকে ভোজন-পাত্রে,
তাঁর যে পাওয়া চাই।
লাফিয়ে আলু বলল জোরে,
চোখ করে তার গোল,
আমি নইলে ব্যঞ্জনেতে,
পড়বে যে সোরগোল।
বেগুন বলে আগুন হয়ে
কে বলে গুণ নাই ?
নিমন্ত্রিতের পাতে আমি
সবার আগে যাই।
উচ্ছে বলে পুচ্ছ তুলে,
রসটা আমার তিক্ত,
ফেল্‌না আমি নই তবুও
একটুও নয় রিক্ত।

লাল টুকটুক মোচা কয়।
ফুলিয়ে দুটি গাল,
রংয়ে রসে তুলবো তুফান,
আমায় আগে ডাক্।
মৎস্য কন্যা বলে-শোনো,
আমিই ভোজের সার,
আমার লাগি বঙ্গবাসীর,
তৃপ্তি রসনার।
লঙ্কা, হলুদ, তেজপাতা, আর,
মশলাপাতির গরম।
তাইনা দেখে গণেশ বাবু
হলেন একটু নরম।
সব কটিকে কিনে নিয়ে,
ভরেন যে তাঁর ঝুলি।
মধুর হাসি হাসেন তিনি,
শুনে তাদের বুলি।

করিমপুরের ঝঞ্ঝাট

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়



করিমপুরের মোড়ে বাসটা যখন আমাদের নামিয়ে দিল, বিকেল তখন চারটে। চারদিকে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। ফাঁকা চায়ের দোকানের সামনে খান কতক সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে। নাঃ, কেউ আসেনি আমাদের রিসিভ করতে।

সামনের একটা ভ্যানে চেপে বসলাম পা মুড়ে। ভ্যান চলতে শুরু করেছে। মামা বললেন,—ব্যাপার কি বল্ তো? অরুণ চিঠিতে লিখলো, ও থাকবে স্টাণ্ডে।

—তাই তো! ডাক্তার বক্সী তো কথার খেলাপ করার লোক নন।

ভ্যান চালক এই সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। বললো,—বাবুরা কি ডাক্তারবাবুর ওখানে যাবেন?

—হ্যাঁ, ডাক্তার বক্সীর বাড়ি।

ডাক্তার বলতে গোটা তল্লাটে ঐ একজনই।—চালক জানায়: কিন্তু ডাক্তারবাবুর এখন নাওয়া খাওয়ারই সময় নেই! সারাদিন হেথা হোথা দৌড়ে বেড়াচ্ছেন! কী যে সব ঝঞ্ঝাট বেধেছে এখানে। রোগবালাই দাঙ্গা-হাঙ্গামার একেবারে অস্থির গাঁগুলো।

—সে কী!

আর বলেন কেন?—হাওয়া আড়াল করে বিড়ি ধরাল চালক: রোগও কি এক রকম? কারও মাথা ধরা, গা বমি, কারও আবার যতো চুলকুনি বেরিয়েছে হাতে পায়ে।

শুধু কি রোগ,—খেদের সঙ্গে চালক বলে চলে: তার সঙ্গে আবার শুরু হয়েছে লাঠা-লাঠি মারামারি। এই তো গত পরশু জঙ্গীর দুপারের জেলেদের সে কী দাঙ্গা! দুজন ওখানেই খতম।

কেন? কেন?—মামা-আমি দুজনেই চমকে উঠি।

আর কেন?—চালক বিষণ্ন ভাবে মাথা নাড়ে: ব্যাপারটা ঘটেছে মাছ ধরা নিয়ে। এপারের জেলেদের কথা হলো, ওপারের জেলেরা নাকি এপারের এলাকা থেকে রাত-

বিরেতে মাছ ধরে নিয়ে যাচ্ছে! ওপারের ওদের কথা ঠিক উল্টো, এপারের জেলেরাই চোর!

ডাক্তার অরুণ বক্সী বাড়ির বাইরের ঘরে বসেছিলেন। সামনে জনা পাঁচেক ভদ্রলোক। সবারই মুখ অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তার ছাপ সেখানে। আমরা ঢুকতেই হৈ হৈ করে এগিয়ে এলেন ডাঃ বক্সী,—আরে, জগু এসে গেছিস! ছিঃ ছিঃ কী কাণ্ড! তোদের আনতে বলে আমি নিজেই—ছিঃ ছিঃ। আর কি বলবো, যা শুরু হয়েছে এখানে—মাথা খারাপ হবার যোগাড়। বোস্, বোস্, বলছি সব।

তারপরেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার। স্থানীয় এম. এল. এ., পঞ্চায়েত প্রধান, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রমুখ সকলেই এলাকার মানী ব্যক্তি। বন্ধুরও পরিচয় করালেন বক্সী বেশ গর্বের সঙ্গে 'বিখ্যাত বিজ্ঞানী' ইত্যাকার বিশেষণে।

ইতিমধ্যে চা এসে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে এম, এল, এ, মদনবাবু পুরোনো কথার খেই জুড়লেন,—যা বলছিলাম গতকালই তো এখানে এসেছিল 'দৈনিক খবর'-এর রিপোর্টাররা। এলাকা ঘুরে জেলেপাড়ার লোকজন, পঞ্চায়েত মেম্বার সবার ইণ্টারভিউ নিয়ে গেছে। বললো শিগগিরই রিপোর্ট বেরুবে। আর তার মানেই চিত্তির! কাগজে ফলাও করে দেবে, 'শান্তিরক্ষার এম, এল, এ-র ব্যর্থতা।' উঃ কী যে করি। এ ঝঞ্ঝাটের সমাধান কি ভাবে হবে।

প্রধান শিক্ষক বললেন,—চলুন আরেকবার বরং দুপারে জেলেপাড়ায় যাই ওদের ভাল ভাবে বোঝাতে হবে।

ম্লান হাসলেন মদনবাবু—বোঝানো তো হয়েছে। অবিশ্যি আরেকবার নিশ্চয়ই যাওয়া যেতে পারে। আসল কথা কি জানেন স্যার, পেটের আগুন বড় সাংঘাতিক। মাছ না ধরলে খবে কি! হপ্তাখাখানেক বোধহয় চুলোই ধরছে না জেলেপাড়ার।

আমি একটু বলবো এ ব্যাপারে?—সবিনয়ে বললেন জগু মামা।

নিশ্চয়ই।—মদনবাবু বললেন ঃ তবে ঘটনা সব জানেন কি?

কিছু কিছু।—জগু মামা বলেন ঃ আসার পথে সাইকেল ভ্যানের ছেলেটির কাছে মোটামুটি শুনেছি। আচ্ছা, অরুণকে বলছি, তুই এখানকার রোগগুলোর কোন উৎস পেয়েছিস কি?

নাঃ।—মাথা নাড়েন বক্সী ঃ এই রোগগুলোর সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার কি জানিস, ওষুধ দিলে খানিক কমছে। কিন্তু দুতিনদিনের মধ্যে ধকধক করে বেড়ে উঠেছে। এই এলাকায় পার্থেনিয়াম জাতের কোন বিষাক্ত আগাছা গজিয়েছে কিনা, মাঠঘাট চষে ফেলে তাও খুঁজেছি। কোন হদিস পাই নি।

আচ্ছা!—জগু মামাব ভ্রু কুঞ্চিত ঃ নদী এখান থেকে কতদূর?

—একদম কাছেই। বড় জোর মিনিট পাঁচেক।

—চল্ না, একবার ঘুরে আসি।

ছোট্ট নদী জলঙ্গী। এপার ওপার দেখা যায়। টলটলে জল, বহু গভীর অবধি দেখা

যায়। গরমের সন্ধ্যেতে নদীতে বহু মানুষ স্নান করছে, কাপড় কাচছে, সাঁতার কাটছে।

পাড় ধরে আমরা কজনে হাঁটছি। হঠাৎ মামা নদীর কাছে নেমে গেলেন। একটা কালচে জলঝাঁঝি টেনে তুললেন। নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর বললেন,—একটা শিশি দিন। জলে ভরে এটাকে নিয়ে যাবো।

তুই কি এটাকে বিষাক্ত মনে করছিস ?—ব্যগ্রকণ্ঠে বক্সী বললেন।

সিওর না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলা ঠিক না।—মামা বললেন ঃ আচ্ছা একটা কথা। এ এলাকায় কোন কলকারখানা বসেছে কি ?

না-না। চাষী-জেলেদের গাঁ, কারখানা-টানা নেই।—এম, এল, এ বললেন।

জলঝাঁঝিটাকে জল ভর্তি শিশিতে ভরে এগোতে এগোতে বললেন মামা,—হ্যাঁ, একটা কাজ ইমিডিয়েটলি করতে হবে। আপনারা আজকালকের মধ্যে এলাকার ঘুরে ঘুরে সক্কলকে জানিয়ে দিন, কদিন কেউ যেন নদীর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখে। গ্রামের পুকুর-ডোবাতেই দু-একদিন কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে নিক।

পরের পরদিন সন্ধ্যেবেলা। কলকাতা থেকে আমার আনা রিপোর্ট দেখেই মামা প্রায় লাফিয়ে উঠলেন,—পাওয়া গেছে। যা সন্দেহ করছিলাম, ঠিক তাই বলছে রিপোর্টে।

কী কী পাওয়া গেছে ?—সবাই দারুণ উদ্‌গ্রীব।

পাওয়া গেছে, নদীর জল ভীষণ দূষিত।—মামা বললেন ঃ গতকাল কালচে জলঝাঁঝিটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়। কেমিক্যাল টেষ্ট করে দেখা গেছে, জলে মিশে আছে ফিনাইল মারকারি নামের এক ভয়ংকর ক্ষতিকর বস্তু। ফিনাইল মারকারির গুণের শেষ নেই। ঐ রোগগুলোর উৎস তো সে বটেই, নদীর মাছের উধাও হবার কারণও সে। বিজ্ঞান বলে, বেশী পরিমাণে শরীরে মিশলে ফিনাইল মারকারিতে মানুষেরও মৃত্যু হতে পারে।

কিন্তু ঐ মারকারি না কি যেন বললেন,—এম, এল, এ মদনবাবু উত্তেজনায় ঘন ঘন সিগারেটে টান দিচ্ছেন ঃ ঐ দ্রব্যটি আমাদের নদীতে এলো কি করে ? তবে কি কউ শয়তানি করে মিশোচ্ছে জলে ?

উহুঁ।—মামা মাথা নড়লেন ঃ মিশোচ্ছে না, নিয়মিত ভাবেই ওটি মিশছে। আমি হলফ করে বলতে পারি, এই নদীতেই অদূরবর্তী কোন কারখানার গারবেজ বা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। আপনারা অবিলম্বে সেই খোঁজটাই নিন।

পরদিন দুপুরবেলা। হাঁফাতে হাঁফাতে মদনবাবু তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত,—পাওয়া গেছে ! কারখানা !

—কোথায় ?

—বর্ডারের কাছে। পদ্মা থেকে বেরিয়ে জলঙ্গী যেখানে বাংলাদেশ হয়ে ভারতে ঢুকেছে, খবর পেলাম সেখানেই হালফিলে নিউজপ্রিণ্ট কাগজ তৈরির একটা কারখানা চালু হয়েছে।

চ—ম—ৎ—কা—র !—মামা টেবিল চাপড়ে বললেন : অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেল। কাগজের কল থেকেই ফিনাইল মারকারি সবচেয়ে বেশী বেরোয়। অবশ্য আর যা যা বেরোয় সেগুলোও কম ক্ষতিকর নয়।

রহস্য ভেদ তো হলো।—গম্ভীর কণ্ঠে বললেন বক্সী : কিন্তু ঐ বস্তুটিকে ঠেকানো যাবে কি করে ?

সবাইকেই চেষ্টা করতে হবে এবং এখুনি।—মামা বললেন : আমরা কালই ফিরছি কলকাতায়। বেড়ানো মাথায় থাক, সে পরে হবে। মদনবাবুও চলুন। এই রিপোর্ট এর ভিত্তিতে ওনাকেই সবচেয়ে বেশী চেষ্টা করতে হবে, যাতে সরকারকে দিয়ে অবিলম্বে ঐ কারখানার আবর্জনা নদীতে ফেলা বন্ধ করা যায়। আমিও দেখি, কদ্দুর কি করতে পরি !

উরিব্বাস্ ! জল থেকে এত্ত সব ঝঞ্ঝাট !—হেডস্যার বলে ওঠেন।

হবেই তো, জলের প্রতিশব্দই তো জীবন।—জগুমামা ম্লান হেসে বলেন : অথচ এটাই আমরা ভুলে গেছি। এখনো যদি আমাদের ঘুম না ভাঙে, তাহলে দেখবেন এমন দিন আসছে যখন গঙ্গার পবিত্র জলেই মারা যাবে মানুষ। আরে মশাই আমাদের যত ভাল ভাল কথা সব সভা সেমিনারে, কাজের কাজ হয় কতটুকু ?

শান্তির স্বপক্ষে

দেবী রায়

আড়ি আড়ি আড়ি
তাদের সঙ্গে আড়ি
যারা চায় ট্যাক্সি
যারা চায় না—
স্কুলবাড়ি।
যুদ্ধ যুদ্ধ যুদ্ধ
দেখতে চাই না—
তাদের মুখ,
এমন কি ওদের
গুষ্টি শুদ্ধ !
মানুষকে যারা—
বানিয়েছে মুক
কিংবা, অন্ধ কালা
এক বুদ্ধ !

কৌতুক

মণিকা ঘোষাল

॥ ১ ॥

প্লাম্বার বাইধর এক সাহেবর বাড়ী কাজ করছে। শেষ হতে আরো ক'দিন লাগবে। বাইধর দু'চার আখর ইংরাজী জানে। তবে ওর নিজের ধারণা, খুব ভালই জানে।
কাজে যেতেই সাহেব বললেন, নট টুডে, কাম টুমরো।
বাইধর বলল, নো স্যার, আই নো কাম টুমরো। আই কাম থুটমরো।

॥ ২ ॥

বটুকনাথ একগাদা খাম-পোষ্ট কার্ড কিনে বগলদাবা করে বাড়ীমুখো হ'ল। পথে নন্দর সঙ্গে দেখা হতে নন্দ শুধালো : কি রে বোটুকে এত এত পোষ্টকার্ড খাম কিনেছিস— ব্যাপার কি? তোর বিয়েটিয়ে নাকি রে? তাই নেমন্তন্ন চিঠি লিখবি বুঝি?
—হে-হে, বিয়ে করে বোটুকে ফাট্‌কা খেলতে যায় না। একেবারে পাক্কা বিজনেসের ব্যাপার। তোরা চেয়ে দেখবি বোটকার কেরামতি।
সে কিরে খুলে বল না।—নন্দর উৎসুক প্রশ্ন।
বটুক : যুদ্ধের বাজারে কত ফকির বাদশা বনে গেছে। তো সে সব সোনার দিনের নাগাল তো পেলাম না যে লোহা ধরে রেখে সোনায় দাঁড় করাব। কাগজ কিনে রেখে রাতারাতি বাদশা হব জন্মালামই তো কত পরে। তবে বড়ই আফশোষ হচ্ছে রে, যদি আরো কিছু টাকা পেতাম তো—
বাধা দিয়ে নন্দ : কি যে টিপে টিপে কথা বার করছিস, ভাল্লাগে না।
বটুক : তবে শোন, কাগজে পড়লাম, খামের দমে বেড়ে এক লাফে পঞ্চাশ পয়সা হবে আর পোষ্টকার্ডের দশ থেকে পনেরো। তাই এই তক্কে আমি ঝপ করে বেশ কিছু কিনে ফেললাম আগের দামে। ব্যস যেই না দাম বাড়বে তখন আমায় পায় কে। ঝেড়ে ছেড়ে দেব সব বাড়তি দামে। হিসেব করে দেখ, রাতারাতি কত লাভ।

———

খোকনের প্রশ্ন

হরেন ঘটক

প্রশ্ন করে ছোট্ট খোকন
জড়িয়ে ধ'রে মা'কে,
বল্‌না মাগো, রাত্রিবেলা
সূয্যি কোথায় থাকে ?

ভোরে উঠেই দেয় সে পাড়ি
সুদূর আকাশ-পথ,
টুকটুকে লাল পোষাক প'রে
চেপে আলোর রথ !

গড়গড়িয়ে যায় সে চ'লে
অস্তাচলের পার,
পথের ধূলায় তাই কি মলিন
রঙিন-পোষাক তার ?

দিনের শেষে নয় কেন তা
মলিন দেখায় অত ?
এসব নিয়ে প্রশ্ন মনে
জাগছে কত শত।

একটা কথা আমায় মাগো
কওনা তুমি খুলে,
ফরসা কি তা যায় না করা
ধোপার কাছে ধু'লে !

———

ক্রিকেট মানে

সুধীন্দ্র সরকার

ক্রিকেট মানে ঝিঁঝি পোকা,
আসল ক্রিকেট কোনটা ?
প্রশ্নটা তো খুবই সোজা
যে কেড়ে নেয় মনটা।
ক্রিকেট মানে চড়ুইভাতি
খাচ্ছে মাঠে সারাক্ষণ।
—কে বলেছে ? ক্রিকেট মানে
ব্যাটে বলের আক্রমণ ?
ক্রিকেট মানে শীতদুপুরে
রোদ পোহানো সঙ্গী,
—ব্যাটস্‌ম্যানেরা মারেন যখন—
জবরদস্ত ভঙ্গী !
ক্রিকেট মানে টুপি এবং
সোয়েটারে মাঠ ভর্তি।
—মারকুটে ব্যাট দেখলে পরে
মেজাজ সবার ফুর্তি !
ক্রিকেট মানে, না বুঝে কেউ
হাততালি দেয় জোরসে।
—বাম্পারেতে ব্যাটস্‌ম্যানেরা
দেখেন চোখে সর্ষে !
ক্রিকেট মানে খুন-খারাপি
বোলারগুলো ভাম্পায়ার !
—বেয়াদবির শাস্তি দিতে
আছেন তুজন আম্পায়ার।
ক্রিকেট মানে দামি টিকিট,
মিলবে না তাও ফক্কা !
—বিনি-পয়সায় কে দেবে বল—

সেঞ্চুরি আর ছক্কা ?
ক্রিকেট মানে অফিস কামাই
কাজকম্ম বন্ধ।
—সবার সঙ্গে খেলা দেখায়
কী আর এমন মন্দ ?
ক্রিকেট মানে মারদাঙ্গা
বাড়ে বুকের স্পন্দন !
—আরেব্বাবা ! রাজার খেলা
ভ্রাতৃপ্রীতির বন্ধন !
তোর কথাটাই নিচ্ছি মেনে
করিস আমায় মাফ রে,
টিকিট একটা দিস কিন্তু
সামনে বিশ্বকাপ রে।

ছোট্ট দুটি টেংরা পুঁটি

মোহিনী মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট্ট দু'টি টেংরা পুঁটি এক পুকুরে বাস
গভীর জলে বেড়ায় খেলে কেবল বারো মাস।
ছোট্ট দুটি টেংরা পুঁটি বুকে খুশীর বান
গাইতো সুখে তবলা ঠুকে টপ্পা-গজল গান।
ছোট্ট দু'টি টেংরা পুটি করলো মনে ঠিক
দিল্লী যাবে বোম্বে যাবে ঘুরবে চারিদিক।
ছোট্ট দু'টি টেংরা পুটি হাওড়া টিশান ধায়
ইস্টশেনে মিষ্টি কিনে পেটটি ভরে খায়।
ছোট্ট দু'টি টেংরা পুটি এদিক ওদিক চায়
লোক গমগম ঐ ঝম্ ঝম্ রেলগাড়ীটা যায়।
ছোট্ট দুটি টেংরা পুটি উঠলো ট্রেনে যেই
হায় কি কপাল মুখ ভয়ে লাল রেলের টিকিট নেই।
ছোট্ট দুটি টেংরা পুটি দেখতে গিয়ে দেশ—
লোকের ঠেলায় ঘোর অবেলায় পায়ের চাপেই শেষ।

টান

তরুণ বন্দোপাধ্যায়



টুটুলের বাবা হরষিত ঘোষাল, নাকাসি গ্রামের নতুন পোস্ট মাস্টার।

এ তল্লাটে নাকাসি গ্রামের যথেষ্ট নামডাক। বেশ কয়েক ঘর বর্ধিষ্ণু পরিবারের বাস। হরষিত বাবুও কিছুদিনেব মধ্যেই আচার-ব্যবহরে সবার প্রিয় হয়ে গেলেন।

আমার গল্প অবশ্য হরষিত ঘোষালকে নিয়ে নয়, ঐ পোস্ট অফিসের ডাকহরকরা, মণিলালকে নিয়ে।

পোস্ট অফিসের টিনের চালের ঘরটার পেছনেই হরষিত বাবুর ফ্যামিলি কোয়ার্টার। কোয়ার্টার বলতে অবশ্য একটা পাকা ঘর, আর তার সামনে এক চিলতে বারান্দা। তবে রাংচিতার বেড়া দেওয়া মাটির উঠোন আছে অনেকখানি। সেখানেই টুটুলের যত লম্ফ ঝম্ফ।

শুধু বিকেল হলেই সব কাজ ফেলে টুটুল এসে দাঁড়াতো বেড়ার ধারে। চেয়ে থাকতো দূর মেঠো পথের দিকে, কখন ডাকহরকরার বর্শায় বাঁধা ঘণ্টার ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ শুনতে পাবে।

টুটুলকে দেখতে পেলেই মণিলালের একটা ঘণ্টা জোরে জোরে বাজতো। টুটুলও দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়তো তার কাঁধে। তবে সাহস ছিল না, ঐ অবস্থায় বাবার সামনে হাজির হওয়ার। অফিস ঘরের সামনেই নেমে পড়তো হুড়মুড় করে। মণিলালের তখন সে কি হাসি! চুপি চুপি বলতো,—খোকাবাবু তাড়াতাড়ি এসো। আজ রাতে তোমায় একটা দারুণ গল্প শোনাবো।

পোস্ট অফিসের অফিস-ঘরেই মণিলাল রাতে শুতো। আর সামনের রকের এক কোণে তোলা-উনুনে রুটি সেঁকতো।

কে যেন টুটুলকে বলেছে, 'কাল রথ, সদরে রথের মেলা বসবে।'

সেদিন রাতে টুটুল মণিলালকে বললো,—ডাকহরকরা, রথ দেখেছো?

জরুর দেখছি!—বেলুন সুদ্ধ হাতটা ওপর দিকে লম্বা করে মণিলাল বললো: আমার দেশে অ্যাত্তো উঁচু লোহার রথ আছে।

—ও রথ নয়। তুমি যেখানে চিঠি আনতে যাও, সেখানকার রথ।

—সে খুব ছোট রথ!

—হোক ছোট, আমাকে নিয়ে যাবে?

মণিলাল ডান হাতের তর্জনীটা নিজের গলায় ঘষে দিয়ে বললো,—তাহলে বড়বাবু আমাকে একদম 'কুচ্'।'
টুটুল মণিলালের বড় মেলব্যাগটা দেখিয়ে বললো,—কেন, ওটার ভেতরে করে!
সঙ্গে সঙ্গে মণিলালের আবার সেই দিলখোলা হাসি।
পরের দিন সকাল থেকেই টুটুল আনমনা। আজ ঘুম ভেঙে উঠতেও দেরি হয়ে গেছে। তার ওপর স্কুল ছুটি বলে, বাবা পড়ালোও অনেকক্ষণ ধরে। ডাকহরকরার সঙ্গে আর দেখাই হয় নি।
বিকেল হতেই টুটুল গিয়ে দাঁড়ালো বেড়ার ধারে। কিন্তু সন্ধ্যে হতে চললো ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ আর শুনতে পায় না। রাস্তায় যাকেই দেখতে পায় জিজ্ঞেস করে,—তোমরা কেউ ডাকহরকরাকে দেখেছো?
সবাই দুদিকে ঘাড় নাড়ে। অর্থাৎ—না।
শেষ পর্যন্ত বেশ খানিকটা রাতে ডাকহরকরার ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। তবে অনেক আস্তে আস্তে, আর ছন্দহীন? ততক্ষণে টুটুলের পড়াশোনার পাট চুকে গেছে। প্রকৃত পক্ষে তখন তার গল্প শোনার সময়। আবছা অন্ধকারের মধ্যেই টুটুল ছুটে যায় উঠোনের ধারে।
—ডাকহরকরা, এত রাত হলো? কখন থেকে আমি তোমার কথা ভাবছি।
টুটুলের চিবুকটা ধরে মণিলাল হাসি হাসি মুখে বলে,—তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।
—কি-ই-?
—আগে আমার কাঁধে এসো।
—আগে দেখাও, না হলে উঠবো না।
ভয় দেখানোর ছলে তখন মণিলাল গলাটা ভারি করে কেটে কেটে বলতে থাকে,—সারা গা-টা ধবধবে সাদা, চোখদুটো টকটকে লাল, থপথপ করে লাফিয়ে চলে!…না না কাল সকালে দেখাবো। এখন তুমি ভয় পাবে।
এমন সময় পেছনে ভারি চটির শব্দ। গম্ভীর গলায় হরষিত ঘোষাল বললেন,—কি ব্যাপার মণিলাল, এত দেরী? কত লোক ডাকের জন্য অপেক্ষা করে করে ফিরে গেছে জানো?…কি হলো চুপ করে আছো কেন? কথার উত্তর দাও।
মণিলাল নিরুত্তর।
চাঁদের আলোতে টুটুল পরিষ্কার দেখতে পেলো, রাগে বাবা অল্প অল্প কাঁপছে।
—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন? যাও, ঘরে যাও।—টুটুলকে সরিয়ে দিয়ে হরষিতবাবু দু-পা এগিয়ে এলেন মণিলালের দিকে।
—কিছুদিন যাবত লক্ষ্য করছি, তোমার কাজে একদম মন নেই। ভীষণ কুঁড়ে হয়ে গেছ। এ রকম লোক দিয়ে আর যাই হোক, জনসেবা হয় না। এ কাজে সময়ের একটা হিসেব আছে।…হরষিত বাবু আদেশের সুরে বললেন: তোমাকে আর কাজ

করতে হবে না, তুমি দেশে চলে যাও। আমি সদরে লিখছি নতুন লোক পাঠানোর জন্য।

মণিলাল তখনো নিরুত্তর। মাথা নিচু করে উঠোনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

হরষিতবাবু আর কথা না বাড়িয়ে গট্ গট্ করে ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

গ্রামের সবাই জানতো হরষিত ঘোষাল একজন একনিষ্ঠ সরকারি কর্মচারি। কিন্তু তা বলে এক কথায় যে ডাকহরকরার চাকরি খেয়ে নেবে, এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি।

পরদিন সকালে আর কেউ ডাকহরকরার ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পেলো না। এমন কি চোখের দেখাও দেখতে পেলো না। পোস্ট আপিসে গিয়ে দেখে, ঘরের এক কোণে দাঁড় করানো রয়েছে ঘন্টা-বাঁধা বর্শাটা। আর তার পাশেই দেওয়ালের হুকে ঝুলছে পাগড়ি আর বেল্টটা। হরষিত ঘোষাল গম্ভীর মুখে নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছেন। সবার মনে তখন এক চিন্তা, তাহলে কি সত্যিই ডাকহরকরা বাকাসি গ্রাম ছেড়ে চলে গেল? এখন আমাদের কি হবে? কবে নতুন ডাকহরকরা আসবে?

তা সে যাক্‌গে, উত্তর যথাসময়ে পাওয়া যাবে। এখন হরষিত ঘোষালের কোয়ার্টারের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে, হাঁটুতে মুখ ঠেকিয়ে চুপ করে বসেছিল টুটুল। কাল রাত থেকে মনটা খুব খারাপ। এমন সময় হঠাৎ চোখে চোখ পড়লো, পা টিপে টিপে ডাকহরকরা এগিয়ে আসছে তার দিকে। হাতে একটা ছোট থলি।

—খোকাবাবু দেখবে না? কাল তোমার জন্য মেলা থেকে কি এনেছি? —কথাটা শেষ করেই মণিলাল ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে আনলো একটা সুন্দর ফুটফুটে খরগোসের বাচ্চা।

মুহূর্তের মধ্যে টুটুলের শরীরে যেন আনন্দ আর উচ্ছ্বাসের ঝর্ণা বয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো খরগোসটার দিকে। তারপর কি ভেবে খানিকটা অভিযোগের সুরে মণিলালকে বললো,—ডাকহরকরা, তুমি ভারি বোকা! কাল তুমি বাবাকে বললে না কেন যে মেলায় গিয়েছিলে। আসলে আমার জন্যই তো তোমাকে শাস্তি পেতে হলো।

—বড়বাবু যদি তোমায় বকেন?

—দূর বোকা! পড়াশোনা করলে বাবা আমাকে একদম বকে না। —হঠাৎ সুর পাল্টে আবদারের গলায় জিজ্ঞেস করলো— ডাকহরকরা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাবে?

—তা কি হয় খোকাবাবু? তাহলে আমার পিঠে উঠবে কে?

ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে খানিকক্ষণ পরে টুটুল বললো,—তাহলে তুমি এক কাজ

করো। আমি যতক্ষণ না ডাকি তুমি কোথাও লুকিয়ে থাকো। কেউ যেন না দেখতে পায়। দেখো, আমি ঠিক বাবার মত পালটাবো।

সেদিন টুটুল আর স্কুলে গেল না। খেলোও না ভাল করে। সারা সকাল মুখ ভার করে শুয়ে রইলো খাটের ওপর। চোখদুটো জল ভেজা, ছলছলে। টুটুলের মা বার বার জিজ্ঞেস করেন,—কিরে শরীর খারাপ ?

টুটুল কোনো উত্তর না দিয়ে বালিসে মুখ গোঁজে।

মাথাটা আলতো করে তুলে ধরে মুখের কাছে মুখ এনে মা আবার জিজ্ঞেস করেন,—বাবা বকেছে ?

—না।

—তাহলে কি হয়েছে ?

কাঁদো কাঁদো গলায় টুটুল বললো,—বাবা ডাকহরকরাকে দেশে চলে যেতে বলেছে।··· সে আর কোনদিন আমায় কাঁধে নিতে আসবে না।

টুটুলের মা একটা স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলে কর্তার পক্ষ সমর্থন করেন,—তা সেই বা কি রকম লোক! শুধু শুধু অতো দেরি করলো!

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে, ভাঙা ভাঙা গলায় টুটুল বললো,—শুধু শুধু নয় মা, ডাকহরকরা কাল রথের মেলা থেকে আমার জন্যে একটা খরগোসের বাচ্চা নিয়ে এসেছে। তুমিই বলো, ছুটে ছুটে আসলে থলির মধ্যে বাচ্চাটা মরে যাবে না ?

—ওমা, তাই নাকি! কোথায় খরগোসের বাচ্চা ?

টুটুল মাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল উঠোনের এক কোণে। সেখানে একটা ঝোড়া উল্টোনো অবস্থায় পড়েছিল। সেটা তুলতেই ফুটফুটে বাচ্চাটা থুপ্ থুপ্ করে লাফিয়ে এসে টুটুলের পায়ের বুড়ো আঙুলে মুখ ঠেকালো।

দুপুরে খেতে এসে হরষিত ঘোষাল স্ত্রীর মুখ থেকে সব কিছু শুনলেন। কান খাড়া করে টুটুল তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সব শুনে-টুনে হরষিত বাবু বললেন,—তা মণিলাল কি বোবা নাকি; চুপ করে রইলো কেন ?

—না, ও ভেবেছিল আসল কথা শুনলে তুমি যদি টুটুলকে বকো টকো!

নিঃশব্দে কয়েক গ্রাস খাওয়ার পর হরষিত বাবু নরম সুরে বললেন,—কাল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মানি-অর্ডারের আশায় অফিস বন্ধের পরও অনেকক্ষণ বসেছিল। নিশ্চয়ই খুব প্রয়োজন ছিল টাকার। মণিলাল ঠিক সময় এসে পড়লে টাকাটা হয়তো দিয়ে দিতে পারতাম।

টুটুলের মা বললেন,—সবই তো বুঝলাম, এদিকে ছেলেটা যে কেঁদে কেঁদে সারা।

হরষিত বাবু ঈষৎ অভিমান মেশানো গলায় বললেন,—তা হতচ্ছাড়া মণিলালটাই বা গেল কোথায় ? আজ সকালেও তো আমার কাছে একবার আসতে পারতো।

এরই অপেক্ষায় ছিল টুটুল। ঘর থেকে বেরিয়ে এক ছুটে গিয়ে হাজির হলো বেড়ার

ধারে। তারপর চিৎকার করে ডাকতে লাগলো,—ডাকহরকরা! ডাকহরকরা! শিগ্‌গির এসো। বাবা তোমায় ডাকছে...।

আমার গল্প এখানেই শেষ। এর পরেরটুকু উপসংহার। ঘোষাল দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছেন। একটু পরেই আবার পোস্ট অফিসে যাবেন। ওদিকে মণিলাল মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। কাঁধে বসে টুটুল। তার মাথায় ডাকহরকরার পাগড়িটা।

দূর পাহাড়ে

সুচিত্ত চক্রবর্তী

দূর পাহাড়ে
তখন দুপুর বেলা
বাতাস এসে
করছে কত খেলা।
মাঝে মাঝে
আসছে ভেসে গান
ঝাউ-এর বনে
এ কার কলতান?
হুহু হুহু
বায়ুর তালে তালে
দুলছে পাখি
গাছের সরু ডালে।
কৃষ্ণচূড়া
ফুটে আছে দূরে
খবর পেয়ে
ভ্রমর এলো উড়ে।
পাহাড় থেকে
ঝরণা ধারা বয়
স্বপ্নপুরী?
তাই তো মনে হয়।

নিজেকে নিয়ে টামু

দেবব্রত মল্লিক



ঘরের পূবে প্রকাণ্ড এক জানালা। তাতে রয়েছে নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত লম্বা লম্বা গরাদ। এই জানালার একটা নাম আছে। বাড়ির লোকেরা সবাই বলে টামুর জানালা। টামু নামের অপভ্রংশ।

দিনের প্রায় বেশির ভাগ সময় টামুর কাটে পূব জানালার পাশে। ওর নাকি এখানে বসে থাকতে ভীষণ ভাল লাগে। ও এখানে বসে বসে আকাশ দেখে। বাতাসের বেগ অনুভব করে। গান গায়। ঘুরে বেড়ায়।

টামু প্রতিদিন আবিষ্কার করে পৃথিবী তার সাজ পালটায়। সে যত দেখছে ততই বিস্ময়ে অভিভূত। মনে মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব করে। ও কাউকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারে না সে কথা।

দু একবার যে সে চেষ্টা করেনি তা নয়। কিন্তু যখনই কাউকে বুঝিয়ে বলতে গেছে। তার ফল হয়েছে উল্টো। সে'ও বুঝতে চেষ্টা করেই নি ববং হেসেছে। উপেক্ষা করছে। অবজ্ঞা করে এমন ভাবে কথা বলেছে—যেন টামু কিছুই বোঝে না। একটা বোকা ছেলে। পাগলের মত কথা বলে।

যতদিন যাচ্ছে টামু ততই অভিজ্ঞ হয়ে উঠছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই অনু-

ভব করতে পারছে সে কি চায়। তাই আজকাল প্রয়োজন ছাড়া অহেতুক কারো সঙ্গে বেশি কথা বলতে চায় না। এক কথায় টামু এখন নিজেকে অনেক গুটিয়ে নিয়েছে। অনেকটা শামুকের মত। উদাহরণটা মনে পড়ায় হাসি পায় টামুর। এই সেদিন ক্লাশে শামুকের ব্যাপারে বোঝাতে যেয়ে মাস্টার মশায় বলছিলেন।

গম্ভীর ভারী গলা স্যারের। জীবন বিজ্ঞান পড়ান। সুন্দর বোঝাতে পারেন। একবার ও'র ক্লাশে পড়া শুনলে সে বিষয় বাড়িতে এসে না পড়লেও চলে।

প্রাণিজগতে যে চব্বিশটি বিভাগ (পর্ব) আছে তার একটি উপপর্বের মধ্যে পড়ে শামুক। পর্বের বৈজ্ঞানিক নাম মোলাস্কা। বাংলা পরিভাষায় বলা হয় কম্বুজী। এর ছটি উপপর্বের মধ্যে একটি গ্যাস্ট্রপোডা বা শম্বুক। শামুক, শঙ্খ, কড়ি, স্লাগ ইত্যাদি ৩০,০০০ প্রজাতি নিয়ে বিরাট এই উপপর্বটি গঠিত। শামুক নোনা বা মিঠে জলে এবং স্থলেও বাস করে। স্থলের শামুকরা শাকাহারী। সামুদ্রিক শামুকেরা কিছু কিছু আছে মাংসাশী। এরা প্রধানত উভয়লিঙ্গী।

টামু এ কথাগুলো যত ভাবে ততই অবাক হয়ে যায়। কি বিচিত্র এই জগত। বিশাল এবং বিরাট। আর বৈচিত্র্যের কথা ভাবলে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়।

টী……টী……টী……

টামুর ভীষণ পরিচিত শব্দ। ও কোন কিছু না দেখে বলতে পারে এখন পেয়ারা গাছে টিয়াপাখিটা এসেছে। ও আসার পর থেমে চারদিকে শব্দ করে জানান দিয়ে দেয়। অনেকটা রাজকীয় ভাব আছে। টামু জানতো না টিয়া পাখির গলার আওয়াজ এরকম।

মা একদিন শব্দ শুনে টামুকে জানালা দিয়ে দেখিয়েছিল। সেই থেকে টামু প্রায় প্রতি দিন দেখতে পায়। হয় সকালে না হয় বিকেলে।

—এগুলো বলটিয়ে?

—দেখ দেখ কি সুন্দর সবুজ রঙ মা!

—আর ঠোঁট দুটো? মা কথার সঙ্গে যোগ করে।

—সত্যি অদ্ভুত! টামু বিস্মিত হয়ে যায়।

ততক্ষণে টিয়া পাখিটা গাছের ডালে বসে একট পেয়ারা ঠোকরাতে শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ করে গাছের দিকে তাকালে কেউ পাখিটাকে নজরই করতে পারবে না। ওর শরীরের রঙের সঙ্গে গাছের পাতার রঙ মিলে মিশে একাকার হয়ে রয়েছে।

—কি অদ্ভুত এই প্রকৃতি আর তার প্রাণিজগত?

একা একাই টামু শব্দগুলো উচ্চারণ করে।

এই পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশে সবাই আমরা মিলেমিশে বাস করছি।

প্রত্যেক প্রাণীরই জন্মাবার পর প্রয়োজন একটা থাকার জায়গা। অর্থাৎ জায়গাটা হওয়া প্রয়োজন পরিবেশ, যেখানে দরকার মত খাদ্য পাওয়া যাবে এবং মানিয়ে চলার মত অন্যান্য জীব বাস করে। আবার প্রতেক প্রাণীই বাস করে তাদের স্বাভাবিক বাসস্থানে।

অথচ এই স্বাভাবিক বাসস্থান একটাই সেখানে আমরা রয়েছি, রয়েছে অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের প্রাণী এবং উদ্ভিদ। প্রত্যেকেই যে যার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে চলেছি। এই জীবজগতের সঙ্গে জীবদের বাস করার জায়গা কিংবা পরিবেশের সম্পর্ক ও বিভিন্ন জৈবিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং এর ফলে যে যৌথ বসবাস নীতি তৈরী হয়েছে—তাকেই বলা হয় বাস্তব্য বিদ্যা অথবা ইকোলজি।
এইটুকু বলার পর মাষ্টারমশায় হাসতে হাসতে প্রশ্ন করেন।
—তোমরা কেউ বলতে পারো এই ইকোলজি শব্দটা এসেছে কিভাবে?
ক্লাশ শুদ্ধ সবাই চুপচাপ। হঠাৎ এক কোন থেকে হাত তুলল প্রবীর।
—বল? মাষ্টার মশায়ের মুখ হাসি হাসি।
—ওটা গ্রীক শব্দ স্যার।
—ভেরী গুড। গ্রীক শব্দটা কি?
প্রবীর মাথা নাড়িয়ে জানিয়েছিল। ও আর কিছু জানে না।
এরপর মাষ্টার মশায়ই বলতে শুরু করেছিলেন,—ইকোলজি এসেছে গ্রীক শব্দ অয়কোন থেকে গ্রীক ভাষায় যার অর্থ গৃহ বা বাস্তু।
আজ দুপুরে টামু একটু শুয়েছিল। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। টামু দেখেছে বাড়িতে থাকলেই এ ঘটনা ঘটে। ইস্কুলের দিনগুলোতে কিন্তু এমন হয় না। তখন কোথায় ঘুম। সাত মাইল দূরে দিয়ে পালিয়ে চলে যায়। এবারের পুজোটা অনেক আগেই শুরু হয়ে যাচ্ছে। অক্টোবর মাসের পয়লা তারিখ থেকেই।
এ বছরের সবকিছুই কেমন আগে আগে শুরু হয়ে যাচ্ছে। বর্ষা আসার আগেই এমন বৃষ্টি হল ঃ সব কিছু ভেসে ছারখার। শহর গ্রাম গঞ্জ চারদিক জলে থৈ থৈ। এখনো জল রয়ে গেছে উত্তরবঙ্গে মুর্শিদাবাদে এবং নদীয়ার কিছু কিছু অঞ্চলে। ঐ সমস্ত অঞ্চলের মানুষজনের কি দুর্ভোগ। অথচ কারোই তেমন ভাবে কিছু করার নেই। সবই প্রাকৃতিক।
টামু দেখেছে দুপুরে ঘুমিয়ে উঠলে পরে শরীরটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করতে থাকে। বিশেষ করে শীত আসি-আসি করছে এ সময়গুলোতে আরো বেশি। ঘুম থেকে ওঠার পর মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে। এই মুহূর্তে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই টামুর চোখদুটো বিস্ময়ে অভিভূত। বিকেলের এই পশ্চিম আকাশে কে যেন গাঢ় লাল রঙের আবির ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। অপূর্ব এক দৃশ্য। হয়তো টামু আকাশের এমন রঙ এর আগে ও দেখেছে কিন্তু আজকের আকাশ যেন একটু অন্য রকমের। একটু বেশি ধরণের রাঙানো।
আচ্ছা সূর্য এই লাল রঙ কোথায় পায়? সূর্য ত লাল নয়?
অনেকদিন আগে একবার মনে হয়েছিল টামুর এ প্রশ্ন। উত্তর জানা হয়নি। মনে মনে ঠিক করে নিল কাল জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেই হবে। একটা টিকটিকি জানালার ঠিক ওপরে ওঁত পেতে অনেকক্ষণ বসে আছে। হঠাৎ করে তাকালে মনে হয় যেন একটা

ছবি! নিশ্চল। নিথর। এক জায়গায় ওরা দাঁড়িয়েও থাকতে পারে। পাঁচ মিনিট দশ মিনিট ওদের কাছে কিছু নয়। তারপর সাদা দেওয়ালের ওপর হঠাৎ করেই এঁকে-বেঁকে উধাও হয়ে যায়। টাম্ন ওদের আর খুঁজে পায় না।

এখনো জানালা দিয়ে তাকালে পশ্চিম আকাশে লাল রঙের ছটা দেখা যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার। সম্পূর্ণ পৃথিবী নয়, পৃথিবীর এ অংশ এখন হয়ে থাকবে আলো বিহীন।

টাম্ন জানালার পাশ থেকে উঠে এসে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালো। পুজোর আর তিন দিন মাত্র বাকি। দেখতে দেখতে তাও এক সময় শেষ হয়ে যাবে। দশমীর ঠিক চারদিন পর লক্ষ্মীপুজো। অর্থাৎ পাঁচ দিনের দিন বাঙালীর ঐতিহ্যময় সেই কোজাগরী পূর্ণিমা।

কালো-ধলো

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

একটা ছিল কালো বিড়াল,
একটা ছিল ধলো,
ধলোটা খুব অহংকারী
এবং বড় খলও।
নাক সিঁটকে বলে 'কালো,
রঙ কালো তোর গায়ের,
লেজটাও তোর নয় বাহারে,
বাজে গড়ন পায়ের।
অন্ধকারে ঘুরলে, তোকে
উপায়টি নেই চেনার,
বেচতে গেলে করবে না কেউ
গরজ—তোকে কেনার।'
কালো বলে, 'সাদায়-কালোয়
তফাৎ যতই রাখিস,
আমার মতন তুই ও তো সেই
'মিয়াঁও' বলেই ডাকিস!'



অন্য ভুবনের পরী

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

পরী আরও একলা হয়ে পড়ল, লিটা মারা যাওয়ার পর। নেই সেই উচ্ছ্বলতা, প্রাণ চঞ্চলতা। পরী ক্রমশঃ তার একটা নিজস্ব জগৎ গড়ে নিয়েছে যেন। সেই জগতে কারো যাওয়ার ক্ষমতা বোধ হয় নেই। আজ কয়েক মাস ধরে পরীকে হাসতে কেউ দেখেনি। তার সেই নিজস্ব জগৎটা বাড়ীর অন্যান্যদের কাছে রহস্যই থেকে গেছে। অবশ্য কেউ রহস্য ভেদ করার, তাকে জানবার, তার জগতে ঢুকবার চেষ্টা করেনি, এক ছোট কাকা আশীষ ছাড়া।

লিটা ছিল একটা স্প্যানিয়েল জাতের কুকুর। পরীর খুব আদরের ছিল। খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল দুজনের। দুরন্ত পরী খুব শান্ত হয়ে গিয়েছিল। লিটা ছাড়া পরী এক মুহূর্তও থাকতে পারত না। সেই লিটাকে গুলি করে মেরে গিয়েছিল ডাকাতরা। তারপর থেকেই পরী ক্রমশঃ বদলে যেতে থাকে। সারাক্ষণ শুধু ডুবে থাকে বইয়ের মধ্যে।

পরীর এই বদলে যাওয়া ব্যাপারটা আশীষ কিছুটা আঁচ করেছিল। পরীকে লিটার প্রভাব মুক্ত করার জন্য নাচের স্কুলে ভর্তি করে দেয়। অবশ্য পরীর দুই দিদিকেও এর আগে অন্যভাবে 'প্রগতিশীল' করার চেষ্টা করেছিল। তারা দুজনেই এখন কাঁচকলা দেখিয়ে প্রথম অক্ষরটি মুছে দিয়েছে। গতিশীল হয়েছে হিন্দী সিনেমার

ভক্ত হয়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য দেখা গেল অন্য ফল, পরী পড়াশুনার সঙ্গে নিবিষ্ট মনে করে নাচের অনুশীলন। আশীষ নানা রকম বই পড়তে শেখায়। মজার মজার গল্প বলে। নতুন নতুন কমিকস্‌ এনে দেয়। পরী একমাত্র আশীষের সঙ্গে মনের কথা বলে একটু আধটু। কিন্তু পরীর মুখে হাসি কই? পরী কী হাসতেই ভুলে গেল নাকি?

না হাসলেও, মিশ্র পরিবেশের মধ্যে থেকেও পরী তৈরী হ'তে থাকল সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে। ববি আর বন্যা পরীর দুই দিদি, যাদেরকে একবার আশীষ গান শেখাবার আর সাঁতার শেখাবার অপচেষ্টা করেছিল। ববি আর বন্যা যখন 'গভীর' মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ দুড়দ্দাড় শব্দে কিংবা পা টিপে টিপে গিয়ে টিভির সামনে বসে। ভগবান দাসের গোয়েন্দা গিরি দেখে কিংবা আদালতের সওয়াল-জবাব। অথবা অলস দুপুরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যখন বাড়ীর বড়রা পরচর্চায় পঞ্চমুখ হয়, আর পরীর দিদিরা [স্কুল না থাকলে] পরমানন্দে তা গলাধঃকরণ করে চরম আহলাদিত হয়। পরী তখন বইয়ের পাতায় কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে কিংবা এক মনে করে নাচের অনুশীলন।

পরীর এই যে একটা সহজাত মেধা। এটা অনুভব করে আশীষ। পরীকে নিয়ে যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে। নানা রকম জ্ঞানের কথাও বলে পরীর নরম মনটাকে কৌতূহলী করে তোলে। পরীর মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করে। চেষ্টা করে পরীর নিজস্ব জগৎটাতে একটু উঁকি মেরে দেখার। অবশ্য তার জন্য ভোগান্তি কম হয় না। যেমন একদিন সাত সকালেই পরী চুপি চুপি আশীষের বিছানায় এসে ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করে,—'কাকু আমাকে একবার ফেলুদার কাছে নিয়ে যেতে পারবে?' একে সদ্য ঘুম ভাঙ্গা অবস্থা, তার এই প্রশ্নাঘাত স্বভাবতই হকচাকিয়ে যায় আশীষ, তবু মুখে হাসি এনে বলে—

'—কেন, ফেলুদাকে আবার কি দরকার পড়ল?'

'—না, এমনিই আসলে কি জান, লিটা-কে যারা মেরে ফেলেছে ফেলুদা তাদের ধরে দেবে, শাস্তি দেবে।'

'—আচ্ছা, আগে আমি জিজ্ঞেস করে আসব, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।'

'—আসলে তুমি নিয়ে যাবে না, আমি জানি কেউ আমাকে নিয়ে যাবে না।' ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিল পরী।

আশীষ বুঝতে পারল পরীর চোখে এখন জল। শত চেষ্টা করলেও এখন মুখ খুলবে না। আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে গেল।

আশীষ জানে মনের মতো কিছু না হলেই পরীর অভিমান। তার ২।১ দিন কথা বন্ধ। এবার ওর মনের আন্দাজ মতো কিছু করতে হবে, তবেই আবার কথা বলবে, এটা নতুন কিছু নয়।

সেইদিন বিকেলেই আশীষ অনেক ভেবেচিন্তে ফেলুদা সিরিজের "টিনটোরেটার যীশু"

বইখানা কিনে এনে বলল, '—এই দ্যাখো ফেলুদা এখন হংকং গেছেন একটা ছবি উদ্ধার করতে। ফিরে না এলে কি করে দেখা করবে?' পরী বইটা উল্টে-পাল্টে দেখে গম্ভীর ভাবে বলল, '—কবে ফিরবে কিছু জান?'

'—না, সে রকম কিছু খবর নেই, তবে বিদেশে গেছেন কিনা, একটু দেরী তো হবেই। তার ওপর যারা ছবিটা যারা চুরি করেছে। তারাও আবার বেশ শক্তিশালী। অত সহজে এবার কিস্তী মাৎ হবে বলে তো মনে হয় না। তারপর ধর, ওরা যদি ছবিটা অন্য দেশে চালান করে দেয়, তখন তো ফেলুদা-কেও আবার দৌড়তে হবে—

'—হুঁ তুমি থামতো, ফেলুদার হাত থেকে চলে যাওয়া অত সোজা নয় বুঝলে?'

'—না, তা নয়, সেটা বুঝলুম, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে'—আশীষকে কথা শেষ না করতে দিয়ে পরী বইটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে বলে—'ব্যাপারটা আমিই পড়ে দেখে নিচ্ছি।' ব্যাস, এইবার বই শেষ না করে কোন কথাবার্তা আর নয়, তা নিশ্চিত।

এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। যত দিন যাচ্ছে আশীষের ভাবনাও তত বেড়ে যাচ্ছে। প্রাণপণ পরীকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছে। পরী আগে কখনো চিড়িয়াখানা দেখেনি। তাই আশীষ ভাবল, যে চিড়িয়াখানায় নানা রকম জন্তু-জানোয়ার দেখলে হয়তো ভাল লাগবে, খুশী হবে। ঠিক করল এক ছুটির দিনে চিড়িয়ানায় যাবে।

জিজ্ঞাসা করল, '—পরী চিড়িয়াখানা দেখতে যাবে?'

পরী জিজ্ঞাসা করল, '—কি আছে?'

উৎসাহ ভরে আশীষ এক নিঃশ্বাসে যত জন্তু-জানোয়ারের নাম মনে পড়ল, মন্ত্রের মতো আওড়ে গেল। বাঘ, সিংহ থেকে শুরু করে নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত কিছুই বাদ দিল না, পরী চোখ বড় বড় করে তা শুনে গেল। একটু বাদে বেশ চিন্তা ভাবনা করে জিজ্ঞাসা করল, '—তারা কি সব ছাড়া আছে?'

আশীষ বলল '—হ্যাঁ, না, ছাড়াই আছে, তবে লোহার বেড়ার মধ্যে। তবে বেশ শক্ত বেড়া।' আসলে আশীষ তৈরী ছিল যে প্রশ্নটা হয়তো হবে জন্তু জানোয়ার নিয়েই, এরকম প্রশ্নটাতো আশা করে নি তাই সামাল দিতে একটু হিমসিম খেয়ে যায়।

'—ঠিক আছে যাব।' পরী বলে।

এক ছুটির সকালে আশীষ পরীকে নিয়ে চলল চিড়িয়াখানা দেখাতে।

প্রথমে দেখল বিভিন্ন রকম নাম না জানা সব পাখি। তাদের কিচির-মিচির শব্দে শিশির ভেজা সকালটা বেশ আশীষের ভাল লাগছিল। তারপর বাঘ, গণ্ডার, সিংহ, জিরাফ, কুমীর আরও অনেক কিছুই দেখল, আশীষ যতই কী ভাল, কী সুন্দর করে পরী ততই গম্ভীর হয়ে যায়। উচ্ছ্বাস তো দূরের কথা। আশীষ হয়তো ভাবল খিদে পেয়েছে। আইসক্রিম খাওয়াল। তারপর জিজ্ঞাসা করল '—পরী ভাল লাগছে?'

'—আচ্ছা, এরা কী সবাই টারজানের বন্ধু?' আশীষের তো ভীরমি খাওয়ার অবস্থা। সামলে নিয়ে বলল—

'—হ্যাঁ।'

'—সব্বাই ?'

'—হ্যাঁ, প্রায় সবাই। কেন ?'

'—বাঃ তাহলে এদের যখন আনল, তখন টারজান কিছু বলে নি ?'

'—না। আসলে জানতে পারে নি।'

'—তাহলে চুরি করে এনেছ বল ?'

'—কী আশ্চর্য চুরি করবে কেন!'

'—বারে, টারজানকে না বলে তার বন্ধুদের ধরে নিয়ে এল, তাহলে চুরি করা হল না ? আর ওদের ধরে আনলেই বা কি করে, জানি ওদের কোন বিপদ হলেই টারজান ঠিক জানতে পারে। আর টারজান যত দূরেই থাকুক না কেন, ওদের এসে উদ্ধার করে। তাহলে ওদের আনল কী করে ?'

আশীষ না শোনার ভান করে, হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কারণ এখন নাকি অনেক বেলা হয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। এখুনি বাড়ী ফিরে না গেলে বাড়ীর সবাই খুব ভাববে। পরী বলল 'বাড়ী যেতে পারি যদি আমাকে চারটে পাখি কিনে দাও।' হাঁফ ছেড়ে বাঁচল আশীষ। তার তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা।'

বলল'—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয় সামনের রবিবারেই হাতিবাগান থেকে কিনে এনে দেব।'

সামনের রবিবার আসার আগেই পরী অন্ততঃ ছ'বার তাগাদা দিয়ে 'চারটে' পাখির কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। বাধ্য হয়েই আশীষ রবিবার হাতিবাগান গেল। কিন্তু বাজার একেবারেই ফাঁকা। আবার পুলিশী ধর-পাকড় চলছে। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে, পাখি ধরা এখন বে-আইনি। আশীষের তো মাথায় হাত! 'কি সর্বনাশ কি হবে এখন ?' অনেক খোঁজাখুঁজির পর, বেশ চড়া দামে একটা ছেলের কাছ থেকে দুটো মুনিয়া আর দুটো টিয়াপাখি কিনে গলদঘর্ম হয়ে ফিরে এল। দু হাতে দুটো খাঁচা দোলাতে দোলাতে।

পরী প্রথমে খুব গম্ভীর হয়ে পাখিগুলো দেখতে লাগল। আর আশীষ প্রামাদগুণতে লাগল। কে জানে হয়তো জিজ্ঞেস করে বসবে যে, 'টারজানকে বলে এনেছি কিনা!' কোন কল্পনার রাজ্যে যে বাস করে কে জানে। আশীষ মুখ খুলল,—'পরী পছন্দ হয়েছে ?' প্রশ্ন শুনে পরী শূন্যে তাকাল, কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। এমন কি এগুলো কি পাখি সে সম্বন্ধেও কোন কৌতূহল নেই! এমন সময় হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল, দুটো খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বলল,'—যা, তোরা তোদের টারজান বন্ধুর কাছে ফিরে যা, তোদের চুরি করে ধরে রেখেছে, এই ফাঁকে তোরা পালিয়ে যা, টারজান খুব কষ্টে আছে। মানুষগুলো খুব খারাপ বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে দেয় না।' এই বলে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিল। পাখিগুলো প্রথমে যেতে চায়নি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে মিট-

মিট করে দেখছিল, শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই উড়ে গেল, টিয়াগুলো তাড়াতাড়িই আকাশের বুকে ভেসে গেল, মুনিয়া দুটো প্রথমে বারান্দার রেলিং-এ তারপর ফুরফুর করে উড়ে গেল ছাদের দিকে। আর তাদের উড়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে পরী আনন্দে ছোট ছোট হাতে তালি বাজাতে বাজাতে হাসতে হাসতে বলতে লাগল—'কী মজা কী মজা ওরা আবার ওদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলবে, দেখ দেখ কী সুন্দর উড়ছে পাখিগুলো কী সুন্দর কী সুন্দর। ডাকছে কী সুন্দর।' বহুদিন পরে পরীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে মুখের রেখা ভেঙ্গে আশীষও হাসতে লাগল। পরীর এক অন্য ভুবনের মধ্যে এই প্রথমবার যেন ঢুকে পড়লো।

———

মূর্তিমান

সরল দে

মনের সুখে দিব্যি আছি
বিশাল বটবৃক্ষে,
এ রাম ছি ছি নাচ দেখিয়ে
করব কেন ভিক্ষে।
লম্ফনে কেউ কোথাও আছে
আমার সমকক্ষ ?
পূর্বপুরুষ নিয়েছিলেন
তাই শ্রীরামের পক্ষ।
কৃত্তিবাসী রামায়ণের
কাণ্ড আছে সপ্ত,
পড়তে পড়তে রক্ত আমার
হয় এখনও তপ্ত।
রাগলে কি আর রক্ষে আছে,
ল্যাজ দেখেছ লম্বা ?
দাও দিকিনি একটা ছুটো
সিঙ্গাপুরী রম্ভা।
ঠাণ্ডা হবে মেজাজখানা
হলে উদর পূর্তি
বুড়ো আঙুল দেখাও যদি
ধরব নিজ মূর্তি

———

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর



সন্তোষ কুমার অধিকারী

প্রায় দুপুর রাত। আর তখনই বাইরের দরজায় কড়া বেজে উঠল।

নির্জন ষ্টেশনের ধারে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলে বাস করে শুধু সাঁওতাল আর ধাঙ্গর। তবু ষ্টেশনের গা ঘেঁষে একটি বাগানবাড়ী। বাগানটা বিরাট ; বাড়ীটা ছোট্ট এক-তলা। খান তিনেক মাত্র ঘর, তার একটায় থাকেন বাড়ীর যিনি মালিক। সামনে বসার ঘর, আর একটা অতিথির জন্যে। পেছনে রান্নাঘরের পাশেই শোয় ভৃত্য অভিরাম।

শব্দে দুজনেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এতরাতে কে কড়া নাড়ে। ডাকাত নয়ত। অভিরাম তার বাঁশের লাঠিটা শক্ত করে ধরে' উঠে এল। কিন্তু ততক্ষণে তার মনিব দরজা খুলে ফেলেছে।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে এক নারী। তার ময়লা ও ছেঁড়া কাপড়ের দিকে তাকানো যায় না।

কান্নায় দুই চোখে জলের ঢল নেমেছে। দরজা পেয়েই সে উপুড় হ'য়ে পড়ল ভদ্র-লোকের পায়ে।

—আমার মরদকে বাঁচা বাবু।

—কি হয়েছে ?

ততক্ষণে অভিরাম এসে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটার কথা থেকে সে যা বুঝল, তা হলো—তার স্বামীর কলেরা হয়েছে। ঘরের মধ্যে তাকে একা রেখে মেয়েটি ছুটে এসেছে দেওতার কাছে। দেওতা যদি যায় এখনই, তাহলেই বাঁচবে তার স্বামী।

অভিরাম ধমক দিল মেয়েটিকে—পাগল নাকি ? এই দুপুর রাতে বাবু যাবে মেথর পাড়ায় ? কলেরা রুগীর কাছে ? যা যা এখন ভাগ। সকালে বাবুর কাছে···

তার মুখের কথা মুখেই রইল। বাবু ততক্ষণে ওষুধের বাক্সটাকে বগলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। মেয়েটাকে বললেন, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

অগত্যা অভিরামও চলল সঙ্গে। সারারাত সেই মেথর পল্লীতে কলেরা রুগীর সেবা করে সকালে বাড়ী ফিরলেন তিনি। মুখে আনন্দের হাসি। রুগী বেঁচে উঠেছে।

ইনিই হলেন বিদ্যাসাগর। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যার সাগর ত' বটেই ত দয়ারও সাগর। রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন, ক্ষীরের সাগর।

জায়গাটার নাম কার্মাটার ; কার্মাটার স্টেশন। বিহার সরকার নাম বদলিয়ে করেছে বিদ্যাসাগর স্টেশন। স্টেশনের পূর্বদিকে কিছু ভদ্রলোক থাকলেও, বিদ্যাসাগর পশ্চিম দিকে সাঁওতাল পল্লীর পাশে তাঁর বাগান ও বাড়ী তৈরী করিয়েছিলেন।

তাদের মানুষ বলে কেউ মনে করত না। জমির আলু, ফল মূল বাজারে বিক্রি করে আর বনের পাখি ও সজারু মেরে কোন রকমে দিন কাটাত বনের মানুষেরা। রোগ হলে চিকিৎসা হ'ত না। তাদেরই মধ্যে এসে তাঁর বিশ্রামের জন্য ছোট্ট একটা বাড়ী তৈরী করালেন বিদ্যাসাগর। আর সেই অসহায় মানুষগুলির চিকিৎসার জন্যে নিজেই শিখলেন হোমিওপ্যাথি। তাঁর সেই বাগানবাড়ীতে ধাঙর আর সাঁওতালদের রোজ যাওয়া আসা।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও খুব গরীব ঘরের ছেলে। পিতা ঠাকুরদাস কলকাতায় আট টাকা মাইনের চাকরি করতেন। গ্রাম বীরসিংহ থেকে কলকাতা—এই বাহান্ন মাইল পথ হেঁটেই চলে যেতেন ঠাকুরদাস, ঈশ্বরচন্দ্রও। ঠাকুমা দুর্গা দেবী হাতের তকলিতে সুতো কাটতেন। সেই মোটা সুতোয় কাপড় বুনিয়ে নিয়ে সেই কাপড় পড়তের ঈশ্বর। সেই যে বালক বয়সে হাতে কাটা সুতোর মোটা ধুতি আর ফতুয়া পড়ে তিনি স্কুলে যেতে আরম্ভ করেছিলেন, অনেক বড় হয়েও সেই মোটা ধুতি আর ছাড়েন নি।

অনেক বড়ই হয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য আর মেধা দেখে তাঁকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেডপণ্ডিত করেছিলেন ওই কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সায়েব।

সেখান থেকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল। এই পদ তখন সায়েবদের জন্যেই বাঁধা ছিল। শুধু কি সংস্কৃত কলেজ? বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারের ভারও তিনি মাথায় তুলে নিয়েছিলেন। তার জন্য তাঁকে ঘনঘন যেতে হত সায়েবদের কাছে। ছোটলাট হ্যালিডের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

হ্যালিডে একদিন তাঁকে বললেন—আমার কাছে রাজা মহারাজা যেই আসুক, সকলেই ড্রেস পরে আসেন আপনার জন্যে দুসেট ড্রেস করিয়ে রেখেছি। এটা আপনাকে উপহার দিলাম।

পরের দিন পাল্কিতে লাটভবনে এলেন বিদ্যাসাগর। লাটসায়েবের দেওয়া নতুন ড্রেস পরে এসেছেন তিনি।

হ্যালিডে ভারি খুশী। কিন্তু তাঁর করমর্দন করেই বললেন বিদ্যাসাগর—এই আমাদের শেষ দেখা।

—কেন, কেন? চমকে উঠলেন ছোটলাট হ্যালিডে।

—আপনি ড্রেস উপহার দিয়েছেন, না পরে এলে আপনাকে অপমান করা হয়। কিন্তু আমার দেশের লোক এই হাতে-কাটা সুতোর মোটা কাপড়ই পরে। তা' না প?র এলে

আমিও ত' দেশের মানুষের কাছ ছেকে আলাদা হয়ে যাবো। তা পারবো না। তাই বলছিলাম, আপনার কাছে আর আসা হবে না।
বিস্মিত হয়ে গেলেন হ্যালিডে। বহুলোক তাঁর কাছে আসে। সকলেই বিশিষ্ট ও গুণী মানুষ। কিছ এমন কথা ত' কেউ বলেনি।
—আপনি আপনার নিজের পোষাকেই আসবেন—হ্যালিডের কথা। অন্যথায় চাকরিটা তখনই ছাড়তে হত বিদ্যাসাগরকে।
চাকরিটা শেষ পর্যন্ত ছাড়তেই হলো তাঁকে। তখনকার দিনে, ১৮৫৮ সালে পাঁচশো টাকা মাইনে পেতেন তিনি। কিন্তু চাকরি করে টাকা রোজগার করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন দেশের সাধারণ, অশিক্ষিত ও দুঃস্থ মানুষকেও শিক্ষার আলোক সবল করে তোলা। ঘরের মেয়েদের জন্যে তিনিই প্রথম একটার পর একটা বিদ্যালয় স্থাপন করে গিয়েছেন।
গ্রামে গ্রামে নিজে গিয়ে স্কুল খুলেছেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার শিক্ষার জন্য তখন মুক্ত হাতে টাকা খরচ করতে রাজি নয়। বিরোধ বাধল শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে।
সঙ্গে সঙ্গে চাকরি ছেড়ে দিলেন তিনি।
কিন্তু ততদিনে তিনি মানুষের বুকের মধ্যে আসন পেতেছেন। যে দেশে বাংলা শিক্ষা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই দেশের শিশুদের জন্যে তিনি লিখলেন বর্ণপরিচয়। যে দেশের মানুষ একটা চিঠি লিখতে হলে ফারসি, উর্দু বা ইংরাজীতে লিখত, তাদের জন্যে তিনি তৈরী করে দিলেন বাংলা গদ্য। যে সমাজে বালিকাদের রাস্তায় বার হওয়াও কলঙ্কজনক ছিলো, সেই সমাজের মেয়েদের শিক্ষার জন্যে তিনি বেথুনের সঙ্গে গড়ে তুললেন 'হিন্দু ফিমেল স্কুল'। আর যে দেশে শূদ্র ও আদিবাসীদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছিল, সে দেশে সকল মানুষের জন্যেই তিনি গড়ে দিলেন শিক্ষার আঙিনা।
বিদ্যাসাগর পাঠশালা খুলেছিলেন গাঁয়ের কৃষক, চাষা ও আদিবাসীদের জন্যে। তাদের মাইনে দিতে হত না। বইও কিনতে হত না।
কিন্তু এই লোকটিকে সেদিন আমরা সহ্য করতে পারছিলাম না।
কলকাতায় কিছু বড় লোক, যাঁরা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তারাই ঠিক করলেন একদিন, বিদ্যাসাগরকে শেষ করে দিতে হবে।
তাঁদের একজন বললেন,—গরীব বামুনের ছেলে, না হয় কিছু বিদ্যেই পেটে আছে, সায়েবদের সঙ্গে মিশে সমাজটাকে গোল্লায় দিল!
আর একজন বললেন,—হিন্দুঘরের বিধবা, তা হলই বা পাঁচ বছর বয়েস, সে বেধবা ত? তার আবার বিয়ে দিচ্ছে? ধর্ম নেই নাকি?
তাঁরা কলকাতার দুই বিখ্যাত গুণ্ডাকে ঠিক করলেন সেই ছাব্বিশ সাতাশ বছরের দুর্বৃত্ত বিদ্যাসাগরকে মারতে।
কলেজ থেকে ফিরতে তাঁর রাত হত। তাঁর বাবা ঠাকুরদাসের, কানেও পেঁাছেছিল সে কথা, যে ঈশ্বরকে মেরে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ঠাকুরদাস শ্রীমন্ত নামে এক লাঠিয়ালকে রাখলেন তাঁর পেছনে।
বিদ্যাসাগর হঠাৎ জেনে ফেললেন একদিন যে, তাঁকে মারার চেষ্টা চলেছে। আর সেই গুণ্ডাদের কাছ থেকেই জানতে পারলের তাঁদের নাম যারা তাঁকে মারতে চায়।
একদিন রাত্রে একা তিনি হাজির হলেন তাঁদের একজনের বাগানবাড়ীতে—গুণ্ডার দরকার কি? আমি একাই এসেছি। এসো আমাকে মারো।
যারা গুণ্ডা লাগিয়েছিল তারা এসে তাঁর পা জড়িয়ে ধরল।
রামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—ও ক্ষীরের সাগর, ওর বুকের সবটাই সোনা।
বীরসিংহ গ্রামেই থাকতেন জননী ভগবতী দেবী। সারা জীবনটা ত' দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছেন। এখন তাঁর মনে ইচ্ছে হয়েছিল বাড়ীতে দুর্গোৎসব করার।
ইচ্ছেটা হয়েছিল এই জন্যে যে, তাহলে বীরসিংহ এবং পাশের গ্রামের মানুষগুলি একটু আনন্দের মুখ দেখবে কয়েকদিনের জন্যে। বিদ্যাসাগর জানতে পেরেছিলেন মায়ের মনের কথা। মাকে লিখলেন—
—মাগো, এখন আমার হাতে দুর্গাপুজো করার মতো টাকা আছে। তুমি হিসেব করে আমায় জানালে, আমি টাকা পাঠিয়ে দেব।
মায়ের আনন্দ আর ধরে না। গাঁয়ের গরীব মানুষগুলোর কথা ভাবলেন—যারা পেট পুরে খেতে পায় না, শীতে গায়ে দেওয়ার একটা জামা বা চাদর যাদের জোটে না, তাদের কথা। তারপর লিখলেন,
—যে টাকাটা তুমি আমাকে দিতে পারবে, সেই টাকা দিয়ে গাঁয়ের লোকেদের জন্যে কম্বল আর চাদর নিয়ে এসো। ওদের মুখে হাসি ফুটলে আমার দুর্গাপুজো করার চেয়ে অনেক বড় পুণ্য হবে।
মায়ের চরিত্র পেয়েছিল পুত্র। বর্ধমানে মুসলমান পাড়ায় ম্যালেরিয়ার মহামারী। বিদ্যাসাগর নিজে গিয়ে বসেছেন সেই গ্রামে। ওষুধ আর পথ্য বিলিয়েছেন দরিদ্র মানুষগুলির মধ্যে। দুর্ভিক্ষের সময়ে নিজে ছুটে গিয়েছেন মানুষের সেবায়। তিনি দান করতেন, জানতে পারত না তাঁর পাশের লোক।
এত কোমল, এত দয়ালু তাঁর মন, অথচ বজ্রের মতো শক্ত হয়ে উঠতেন কেউ যদি আঘাত করত তাঁর মর্যাদায়। তাঁকে ত্যাগ করেছিল তাঁর বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন। তবু ঐরাবতের মতো মাথা উঁচু করে তিনি এগিয়েছেন তাঁর পথ ধরে। কেউ একচুলও নড়াতে পারেনি তাঁকে তাঁর চিন্তা থেকে। বাপ-মাকেই একমাত্র দেবতা বলে জেনেছেন। বলেছেন, ওই আমার বিশ্বেশ্বর আর অন্নপূর্ণা। অন্য কোন দেবতার কাছে আমি যাই না।

* * *

সেই কার্মাটারের সাঁওতালদের কাছে আমি গিয়েছিলাম চার বছর আগে। দেখলাম, তাঁর নাম শুনেই মাথা নিচু করল অশিক্ষিত আদিবাসীর দল। বললো,—ও ত দেওতা ছিল। সে দেওতা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে।
বিদ্যাসাগর চলে গিয়েছেন আজ থেকে ছিয়ানব্বই বছর আগে। তবু দারিদ্র ও অশিক্ষিত মানুষের মনে তিনি দেবতা হয়েই বেঁচে আছেন।

শ্রাবণ বেলায়

কবিতা মুখোপাধ্যায়

আকাশ পারে মেঘ জমেছে ভারী
নরম ছায়া নামছে জগৎ বেড়ে,—
আজকে আমার খাঁচার টিয়াটাকে
ভাবছি আমি এবার দেব ছেড়ে।
ওই যে দেখ দু'চার ফোঁটা জল
কানায় কানায় পূর্ণ আকাশ হ'তে
পড়ল এসে মেঘের ছায়ায় ভেজা
ধুলোর গড়া আমার গাঁয়ের পথে।
শ্রাবণ বেলা আকুল হয়ে আসে
বৃষ্টি বুঝি পাগল হয়ে এল ;
কল্পনারা মেঘের ভাঁজে ভাঁজে
আপন মনে কোথায় ভেসে গেল !
মাটীর সোঁদা গন্ধ ভরা হাওয়া
বনের মাঝে উঠল দেখ মেতে,—
ভাবছি, আমার বন্দী টিয়াটাকে
শেকল খুলো অজকে দেব যেতে।
বৃষ্টি এবার ক্লান্ত হ'ল বুঝি
ফাটল ধরে কাল মেঘের বুকে,
দীঘির জলে কাঁপন হ'ল সারা
বাদল বাউল ঘুমিয়ে পড়ে সুখে।
জাগল মেঘে তরুণ হাসির মত
স্বর্গ ছোঁওয়া হালকা সাদা আলো ;
ভাবছি, আমার খাঁচার টিয়াটাকে
শেকল খুলে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল ॥

শেষের গল্প

বিশ্বপ্রিয়



এক যে ছোট গাঁ…

নাম ছিল তার মউঝুরি। সবাই বলে,—বাঃ! অমন গাঁয়ের নেই জুড়ি। যেমন খাসা নাম, তেমনই ছিমছাম।

ঐ গাঁয়েরই পাশে ছবির মতই সে এক ছোট নদী, ঢেউ—ছলছল কেমন তরল প্রাণ ঢালা উচ্ছ্বাসে, তিরতিরিয়ে বইতো নিরবধি।

পায়ে বাঁধা জল-ঘুঙুরে তার, বাজতো শুধু—ঝুর্‌-ঝুর্‌-ঝুর্‌…সকল বাঁধন ছিন্ন করার কেমন সে এক মন কাড়া সুর।…

সেই সুরেতে মেতে, আপন আবেগেতে নদী নাকি থাকতোও ভরপুর।

তাই হয়তো পাহাড় ভেঙে নেমে—ঘর পালানোর ইচ্ছে নিয়ে, শত বাধার জট এড়িয়ে—কি এক ঘোরে ছুটতো জোরে—চল্‌তি পথে একটুও না থেমে।

শুধু কি তাই?

জানে সবাই, সকাল-বিকাল, রাত কি দুপুর তেমন কোন ক্লান্তিও নাই। ওর প্রকৃতির কর্ম-ধারাই এমনি নাকি ভয়াল-মধুর!

তার ফলে রোজ আগ বাড়িয়ে—হাট-বাট-মাঠ সব ছাড়িয়ে, ধেয়েই যেত দূর হতে দূর।

…ঝুর্‌-ঝুর্‌-ঝুর্‌—ঝুর্‌-ঝুর্‌-ঝুর্‌!

নদীর মতি, কালের গতি—
দুটোই নাকি অবাধ অতি।

তাই মানা নাই কারো শাসন। তেমন কোনই বজ্র-আঁটন, খাটেও নাকো ওদের প্রতি। দুটোই নির্বিকার।

সাজানো সংসার, তিলে তিলে গড়ে তোলা—যা কিছু সব আর, খেয়াল ঝোঁকে এক পলকে করতো ভেঙে সব ভাচচুর।

ওই যে নদী, চপল মতি!

এমনই ওর সচল গতি, চোখ দেখে হত মনে : কি যেন এক প্রয়োজনে, ওকে বুঝি ডাকছে সমুন্দুর।

হয়তো বা তাই হবে।

নইলে কে আর কবে, অমন করে দূরের ডাকে, ঘর ছেড়ে আর ছেড়ে মাকে—ছুটতো অমন তবে ?

যেহেতু ওর ঘর ছাড়া মন, জন্ম হতেই উধাও কেমন। সেই কারণে তাই, ওর জীবনে মায়ার বাঁধন, ভালবাসার অনুশাসন তেমন কিছুই নাই।…

হলে কি হয় ?

নদীতো নয় আদপে খুব শান্ত। মউঝুরি গাঁ'র মানুষে তার মেজাজটুকু জানতো।

জানতো মানে এই :

পিছু-টান তো নেই ?
কাজে কাজেই ছুটতো নদী—
বিরাম-বিহীন নিরবধি
আপন গরজেই।

এদিকে এক বিষাদ বকুলগাছ।…

ঘর-পালানো নদীর কিনারায়, উদাস হয়ে থাকতো খাড়া ঠায়। বুঝি না তার কি যে হ'ত মন, তাই সে আবার যখন তখন, শাখায়-পাতায় জাগিয়ে কাঁপন-উদাস হয়ে ভাবতোও সাত-পাঁচ।

ভাবনা কিসের, নিজেই কি তা' জানে ?

জানলে পরে বুঝতো বটে ঘামিয়ে মগজ সঠিক অনুমানে…বেড়ির মত শিকড়-জটে, তার নিয়তি অনড় অতি মাটির মায়া-টানে—নিবিড় করে কেন তাকে বেঁধেছে এইখানে।

তবু বকুল, মহা-চটুল নদীর গতি দেখে—ঝাঁক্ড়া মাথা ঝেঁকে, সকাল-সাঁঝে মাঝে মাঝে বাঁধন ছাড়া পেতে, উঠতো কেমন মেতে।

নয়তো আবার ঝোড়ো-হাওয়ার দম্‌কা ছুটে গেলে—আকাশ মুখো বিশ হাত দিয়ে মেলে—খ্যাপার মতন জুড়তো তা-থৈ নাচ। এমনই তার মনের ধরণ-ধাঁচ।

তাও যদি না—তেমন সুযোগ পেলে, কূল বরাবর এগিয়ে এসে—অমনি কেমন এক নিমেষে সব ফোটা ফুল, দারুণ চটুল নদীর স্রোতে ঢেলে—তখন আবার উজার করে মন, নদীর সঙ্গে করতো আলাপন।

হয়তো ছিল বুকের ভেতর
ঠাঁই বন্দীর জ্বালা,
ফুল ঝরিয়ে—তাই সে দুখের
গাঁথতো কথামালা।…

ওতেই নাকি আভাষ যেত পাওয়া, এই কথা তার বলতে শুধু চাওয়া :

নদী—নদী—নদী—
একটু থামো যদি
আমিও পারি তোমার সঙ্গে যেতে—
জল তরঙ্গে খুশির রঙ্গে মেতে,
রঙ্ ঝিলমিল
আসমানি নীল :
দূর সিন্ধুর শীতল ছোঁয়া পেতে।

নদী তাকায় নাকো পিছু। দেয় না জবাব কিছু। তার ফলে সে বয়ে যেতে যেতে—প্রাণ আবেগে থাকতো সদাই মেতে।···

যতই কেন সাধো তাকে, নদী কি সেই কথা রাখে?

না—না, তার থম্‌কে থামার ইচ্ছে তেমন হ'তনা আর কারোর কোন ব্যাকুল ডাকে। তাই সে স্রোতের পাকে, কি যেন কোন টাঁকে—ভাসিয়ে নিত পাড়ের মাটি, উড়ন-ঝুরণ কুটোকাটি, শুক্‌নো পাতা-ফুল। নাই মোটে ভুল, হতাশ বকুল, তার জীবনের শুধতে মাশুল—বিষাদ ভারে নদীর পাড়ে শুধুই খাড়া থাকে।

খাড়া থাকার কারণ, ওর যা জীবন ধারণ, সেই নিয়মের গণ্ডী টুটে—তেমন ভাবে কোথাও যেতে ছুটে আদৌ উপায় নাই। জন্ম থেকেই তাই, এক নাগাড়ে নদীর ধারে রয় বাঁধা এক ঠাঁই।

ব্যাপার দেখে—দূরের থেকে মৌটুসী এক পাখি, সহসা এক ফাঁকে এগিয়ে এসে নাকি, বসে বকুলশাখে, শুধায় সেদিন তাকে,—

বকুল মাসি—বকুল মাসি, সদাই দেখি রও উদাসী। কি যে তোমার ক্ষোভের হেতু, যায় না বোঝা কিছু। অসম্ভবের স্বপ্ন নিয়ে—নাহক শুধু মন তাতিয়ে খ্যাপার মত মেতে—চাইছো ছুটে যেতে, জাত যাযাবর বাউণ্ডুলে নদীর পিছু পিছু।···

নদীর কাজ, নদী করে
তাই সে চলে ছুটে—
তুমি কেন অমন করে
মরছো মাথা কুটে!
কি হতাশে থাকো বিভোর
কিছুই বুঝি নাকো,
তুমিও কি ঘর-পালানোর
স্বপ্ন-ছবি আঁকো?

প্রশ্ন শুনে বকুল জানায়—শিহর তুলে শাখায়-পাতায় :

—সত্যি বলতে বাছা, ব্যর্থ আমার বাঁচা। কারণ, জন্ম ভরে, হৃদয় উজার করে—ফুল ফোটানোর ছন্দে মেতে এই যে সুবাস ছড়াই, তাতেই নাকি আনন্দেতে বিভোর থাকে

সবাই। বিনিময়ে জীবন আমার, বন্দী-ব্যথার বয় মহাভার। সে ভার থেকে আসান পাওয়ার সুযোগ কোথা পাই? তাই শুধু গোমড়াই।

শেষে সে ফের আপন মনে কয়ঃ

আমার কাছে নদীই বরাভয়। এই বিষয়ে ভুল কোন নাই, নদীকে তাই ডাকি সদাই হৃদয় ও মন ঢেলে। মূলের মাটি ধর্সিয়ে দিয়ে—আমায় যদি যায় সে নিয়ে, তবেই মুক্তি মেলে। নয়তো আমার নাই কোন ছাড়—এই জীবনের বেড় থেকে আর, ভাব গতিকে ওটাই মালুম হয়।

মৌটুসী কয়,—

অযথা নয়, তোমার আকুলতা। তবু বলার কথা, কেউ কখনো এই দুনিয়ায় চিরটা কাল ধরে, মাটি-মায়ের বাঁধন মায়ায় থাকে নাকো পড়ে।...সময় হলে সকলকে হয় যেতে, সেই অসীমের চরণ ছোঁয়া পেতে।

তাই তো বলি লাভ কিছু নাই—
নাহক ভেবে মরে।
আর ক'টা দিন থাকতে যদি
পারোই ধৈর্য ধরে,
মুক্তি তোমার মিলবে ঠিকই ঃ
চাইছো যেমন করে।

এই না বলে মৌটুসী যায় ফিরে, বনের কোনে আপন ছায়া-নীড়ে...জ্বালিয়ে আশার প্রদীপ আবার বকুল গাছের অশান্ত-মন ঘিরে।

অলীক নয় তার ঐ বচন। হঠাৎ ক'দিন পর, মেঘে মেঘে সাজলো কখন সারা দিগম্বর। তারই ফাঁকে চোখ ধাঁধিয়ে—বাজও হাঁকে বুক কাঁপিয়ে, সরবে—কড়—কড়—!

তখন মেঘের ঝুঁটি ধরে, উড়িয়ে ধুলি মুঠি ভরে, শনশনিয়ে বন দাপিয়ে ছুটলো খ্যাপা ঝড়। সেই সঙ্গে বৃষ্টিধারাও নামলো—ঝর্—ঝর্।...

প্রলয় জাগা সেই দাপটে, উঠলো নদী ফুলে—কাল কেউটের মত ফুঁসে—কুটিল ফণা তুলে ঃ জড়-বন্দী জীবন ধারার নিয়ম-রীতি ভুলে।...সর্বনাশা ছোবলে তার, সাধ্যি কার, পায় সে পার?

পায় নাও পার কেউ।

উথাল-পাথাল ঢেউ, তাই না যখন আগিয়ে এসে—হানলো আঘাত অবশেষে সজোরে দুই কুলে। অমনি তখন বান জাগলো, ভীষণ রকম টান লাগলো—বকুল গাছের মূলে।

ফলে তারই ফলে, আঁটিসাঁটি পাড়ের মাটি খসলো তলে তলে। তা'তেই বকুল কাতরে উঠে—মুখ থুবড়ে পড়লো লুঠে অগাধ নদী-জলে।

তখন—তখন—তখন,
নদী কি আর করে ?
সাগর-মুখী চললো ছুটে—
তাকেই বুকে ধরে।…
ঢেউ দোলাতে দুলে দুলে—
বকুলও সব দুঃখ ভুলে,
দূর অজানায় দিল পাড়ি :
কেমন খুশি ভরে।
এই জগতের সকল মায়া
কাটিয়ে চিরতরে।

তাই না দেখেই বুঝি মনে : এই নিয়তি সব জীবনে এমনি ভাবেই ঘটে। অনড়-প্রায় অমন করে রয় না কেউ-ই বটে, চির-জীবন আপন ঘরে জড়িয়ে মায়া জটে।…

ঠাঁই-বদলের পালা এলে—প্রাণের খেলা শেষে, সকলে ধায়—মুক্তি আশায় উধাও নিরুদ্দেশে।…

বকুলও তাই অবশেষে মহাকালের টানে—অবাধ স্রোতে চললো ভেসে—দূর অসীমের পানে : এই ভাবে তার জীবন ধারার খেলা অবসানে।

সুকুমার রায়

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

সহজ ভাবে পড়লে পরে
হয় যে মনে আপাতত,
তাঁর ছড়াতে নেইকো তেমন
অর্থ কোন চাপা তত !
তাঁর ছড়াতে শুধুই আছে
সহজ সরল হাসির খোরাক
পড়লে পরে যায় পালিয়ে
মনের যত দুঃখ ও রাগ !
তাঁর ছড়াতে লুকিয়ে আছে
আসলে তো অর্থ গূঢ়,
একটুখানি ভাবতে জানলে
মন চলে যায় অনেক দূরও !!

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

অসিত চৌধুরী



কলেজ স্ট্রীটের দিকে একটা বই কিনতে এসেছিলাম হঠাৎ পিঠে হাত পড়তে চমকে পিছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম আশিস। অনেকদিন পরে দেখা হলো, সেই কবে ইউনিভার্সিটি ছেড়েছি তারপর বলতে গেলে আর দেখা হয় নি। নানা কথাবার্তা বলার পর জিজ্ঞেস করলো, "কি করছিস বলতো?"

বললাম "কিছুই করছি না তেমন, দুচারটে টিউসানি, তা তুই তো শুনেছি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে জয়েন করেছিস।"

আশিস বললো "ঐ আর কি একটা সামান্য মাষ্টারির কাজ। তা তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো। তোর রমেশকে মনে আছে রমেশ চোপড়া আমাদের সঙ্গে পড়তো। ওর সঙ্গে আমার এখনো যোগাযোগ আছে। ও কদিন আগে আমাকে একটা চিঠি দিয়েছে তাতে লিখেছে যে ওদের ইউনিভার্সিটিতে একটা প্রজেক্টেতে একজন রিসার্চ ফেলো দরকার। ও এখন সাগরেতেই আছে। মনে হচ্ছে ঐ প্রজেক্টেই কাজ করছে। যদি তুই যাসতো ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিস। ঠিকানাটা, তা তুই এক কাজ কর চিঠিটা আমার কাছেই আছে, রেখে দে ওতে ওর ঠিকানাটা পাবি।"

আমি চিঠিটা ওর কাছ থেকে নিলাম। আশিস বললো ওর একবার যাদবপুরে যেতে হবে দিদির সঙ্গে দেখা করতে। ও একটা বাস ধরে চলে গেল।

আমি পর দিনই রমেশকে একটা চিঠি লিখলাম কি প্রজেক্ট, কি কাজ ইত্যাদি খবর দিতে। কদিন পরেই ওর কাছ থেকে জবাব এসে গেল। বায়ো টেকনোলজি ডিপার্টমেণ্টে প্রঃ পাঠকের সঙ্গে কাছে কাজ করতে হবে I. C. M. R এর একটা প্রজেক্ট। জুলজি পড়বার সময় প্রঃ পাঠকের নাম শুনেছিলাম। ও আরও লিখেছে যে প্রঃ পাঠকের সঙ্গে কথাগুলি বলে ও ব্যবস্থা পাকা করে নিয়েছে, আমি যেন শিগ্গিরই চলে আসি। কি ভাবে আসতে হবে বিস্তারিত ভাবে লিখে দিয়েছে।

বাড়ীতে প্রথমে একটু আপত্তি উঠেছিল, সামান্য টাকার ফেলোসিপের জন্য অতদূরে যাওয়া

ইত্যাদি। সেটা পরে ঠিক হয়ে গেল। চলে এলাম, ওখানে পেঁছে জায়গাটা বেশ ভালো লেগে গেল! একটু খোঁজ করে রমেশকে পেয়ে গেলুম। অনেকদিন পরে দেখা, দেখে খুব খুসি হোলো। ভাবেইনি যে আমি আসবো। হোষ্টেলে ওর ঘরেই উঠলাম, একটু বিশ্রাম নিয়ে চা টা খেয়ে দুটোর সময় গেলাম প্রঃ পাঠকের সঙ্গে দেখা করতে। প্রঃ পাঠককে দেখেই বেশ ভালো লাগলো। মোটা সোটা ধবধবে ফর্সা, সাদা লম্বা দাড়ি টাক মাথা। ভারি মিষ্টি করে কথা বলেন।

জিজ্ঞেস করলেন "কি নিয়ে কাজ করবে ঠিক করেছ?"

আমি বললাম "A· T. P নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আছে।"

উনি বললেন, "তা বেশ, তবে ওটা নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে, এখানো হচ্ছে নতুন কি আর করবে। ক্লোনিং কর। জানো যাকে কলম কর বলে। ওটা নিয়ে বোটানিষ্টরা অনেক কাজ কয়ছে। প্রাণী জগতে ক্লোনিং একটা নতুন সাবজেক্ট, ভারি ইণ্টারেস্টিং। উদ্ভিদ এর যেমন প্রাণীদেহ তেমন অজস্র কোটি কোষ তৈরী অবশ্য কোষ গুলো বিভিন্ন রকমের। তাহলেই প্রাণীর একটা কোষের মধ্যে তা সেটা যে ধরণেরই হোক না কেন, সেই প্রাণীর সমস্ত বৈশিষ্টই ঘুমন্ত অবস্থাতে রয়ে গেছে। তোমরা হয়তো শুনে থাকবে স্টুয়ার্ড বলে একজন উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ক্লোনিং পদ্ধতিতে বেশ কিছু ফল মুল, একটা খাদ্য ফল থেকে অতিক্ষুদ্র কয়েকটি কোষ নিয়ে, তৈরী করতে সমর্থ হয়েছেন। একটা জিনিষ তোমরা মনে রাখবে জীবনের সুরুতে উদ্ভিদ ও প্রাণী কিন্তু আলাদা ছিল না, 'একই জিনিষ থেকে ওদের সৃষ্টি। ক্রমশঃ বিবর্তনের ফলে দুটো আলাদা হয়ে গেছে। তাহলে যদি উদ্ভিদের বেলাতে ক্লোনিং পদ্ধতি সফল হয় আমার ধারণা, ধারনা কেন, দৃঢ় বিশ্বাস প্রাণীদের বেলাতেও তা সফল না হবার কোনও কারণ নেই।

"আমার যতদুর জানা আছে পৃথিবীর নানা জায়গাতে ক্লোনিং নিয়ে খুব কাজ হচ্ছে তবে ভারতবর্ষে কেউ করেছেন বলে আমার জানা নেই। যতো পাবে এ সম্বন্ধে বই-পত্তর রিসার্চ-পেপার যোগাড় করো। পড়। আমি যতটুকু পারি সাহায্য করবো তবে ব্যাপারটা আমার কাছেও নতুন। আমি নিজেও একনো কিছু কিছু গবেষণার কাজ করি।

"যাই হোক তোমরা কাজ আরম্ভ করে। তোমাদের পড়াশুনো করার পর প্রথম ও প্রধান কাজ হবে ল্যাবোরেটারিটা সাজিয়ে গুজিয়ে নেওয়া ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে নেওয়া। টাকার অভাব হবে না।"

বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে এর মধ্যে আমার। ল্যাবোরেটারীটা বেশ গোছগাছ করে নিয়েছি। কাজও সুরু করে দিয়েছি। প্রফেসর পাঠক মাঝে মধ্যে নিজেই চলে আসেন আমাদের কাছে। একদিন কথায় কথায় বললেন দেখ "কোষগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা আর তাদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করার জন্য তোমাদের একটা মিডিয়া তৈরী করতে

হবে। যে প্রাণীর কোষ নিয়ে কাজ করবে সেটা মিডিয়ার মধ্যেই বৃদ্ধি পাবে অবশ্য যদি সেই কোষকে ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগিয়ে তুলতে পারো।”

“বহুদিন ধরে আমরা নানা রকমের মিডিয়া তৈরী করে নানা প্রাণীর কোষ নিয়ে চেষ্টা করে যদি কোনও রকম আশার আলো দেখতে পারছিনা। মিডিয়া হিসেবে অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন, মিথেন মাঝে মধ্যে টাইটানিয়াম অক্সাইড বা আরও বহু রকমের রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে একটা দ্রবন তৈরী করে কাজ করছি, কার্বনডাইঅক্সাইড ও নুন জল তো আছেই কিন্তু কাজ হচ্ছে না” হতাশ হয়ে পড়লাম।

একদিন প্রঃ পাঠক আমাদের তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। বললেন, “কানে আসছে তোমরা নাকি বড্ড হতাশ হয়ে পড়েছ? দেখ হতাশ হয়ে পারলে চলবে না। এমনও হতে পারে যে তোমরা এখন হয়তো পারছো না, হঠাৎ দেখলে কিছু পেয়ে গেছো। আমি তোমাদের আগেও বলেছি ব্যাপারটা আমার কাছেও নতুন। আমি নিজেও ভীষণ চেষ্টা করছি অবশ্য এখনো কিছু করে উঠতে পারি নি। তবে একটা কথা পরিষ্কার কোষের নিউক্লিয়াজ একবার যদি সাইটোপ্লাজম থেকে (মানে শ্বেত অংশ থেকে) R, N. A মারফৎ সংকেতটা পেয়ে যায় তাহলে কোষের বৃদ্ধি আটকানো যাবে না। এটা ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়েই হবে।

“এখন একবছর মতন কাজ করার পর একটা জিনিস আমার কাছে পরিস্কার যে ক্লোনিং করে কিছু শসা বা আপেলের কোষ দিয়ে, গাছ ছাড়াই, কেবলমাত্র কোষবৃদ্ধি একটা পুরো শস্য বা আপেল তৈরী কর। সম্ভব হয় তাহলে প্রাণীদের বেলায় যা নিশ্চিত ভাবে সম্ভবপর। একটা খরগোস বা গিনিপিগের ত্বকের কিছু কোষ নিয়ে যথাযথ দ্রবনের মধ্যে রেখে তাদের বিভাজন করে অন্ততঃ পক্ষে শতকরা পঁচাত্তরটি ক্ষেত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ খরগোস বা গিনিপিগ সৃষ্টি করা সম্ভব। কাজ করেই যাচ্ছি।”

অনেকদিন পর আবার একদিন আমাদের তার ঘরে ডাকলেন। বললেন, “চল তোমাদের আমার ল্যাবরেটারিতে একটা জিনিস দেখাব তবে তোমাদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে যা দেখেছ তা কোনদিন কারও কাছে প্রকাশ করবে না।” আমরা তার ঘরের সঙ্গে লাগানো একটা ঘরের মধ্যে এলাম এটাই ওনার গবেষণা করার জায়গা। একটাজায়গাতে পর্দা দিয়ে দিয়ে ঘেরা, উনি পর্দাটা সরালেন। যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমাদের সামনে দশ বারোটা ট্রে। তিনটে ট্রেতে একেবারে অবিকল একরকম দেখতে একেবারে সদ্যোজাত দশটি পুরুষ শিশু। ভালো করে লক্ষ্য করলাম, দেখলাম তাদের মধ্যে প্রাণের কোনও লক্ষণ নেই। কি ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। এরা কে? মৃতই বা কেন? সবগুলো একরকম দেখতে কেন?

প্রফেসর পাঠকের কথাতে সম্বিত ফিরলো।

এর পর তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, “আমি তো তোমাদের ক্লোনিং নিয়ে কাজ করতে বললাম। এদিকে নিজেরও আমার এ ব্যাপারে খুব কৌতুহল ছিল। আমি নিজেও তোমাদের লুকিয়ে নানা ধরনের দ্রবনের মধ্যে বিভিন্ন প্রাণীর কোষ রেখে পরীক্ষা

নিরীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। আমি আমার পিওন রামলালকে বলে রেখেছিলাম যে তোমাদের ঘরের প্রতিটি ট্রে পরিস্কার করার আগে আমাকে যেন দেখিয়ে নেয়। এটা করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে যদি তোমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে এমন কিছু ট্রেতে পাই। এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস সব জিনিষ খুঁটিয়ে না দেখে নষ্ট না করতে দেওয়া। রোজই দেখি, একদিন হঠাৎ যেন মনে হলো একটা ট্রেতে দেখলাম পাটকিলে রং-এর চার পাঁচটা অতি ছোট দানা মতন যেন কিছু নজরে আসছে। প্রথমে অতটা গুরুত্ব দিইনি। পরে অতি সাবধানে ওর মধ্যে থেকে একটা দানা তুলে নিয়ে স্লাইডে রেখে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেখলাম কয়েক হাজার জীবন্ত কোষ আর ওগুলো অতি দ্রুত বিভাজন হচ্ছে। আর একটা দাগ নিয়ে আবার দেখলাম, ঐ একই ব্যাপার। ট্রের সঙ্গে ট্যাপ লাগানো ছিল তাতে দ্রবনের উপাদানগুলো কি মাত্রাতে ব্যবহার করা হয় তা বিষদভাবে লেখা ছিল। ওটা আমারই নির্দেশ ছিল তোমাদের কাছে। ট্রে থেকে বেশ খানিকটা দ্রবন অন্য একটা ট্রেতে নিয়ে বাকিটা ঐ দানাগুলো সুদ্ধ রেখেদিলাম। ঐ ধরণের আরও কিছু দ্রবন ভালোভাবে তৈরী করে একটা স্টেরাইল ব্লেড দিয়ে হাতের খানিকটা চামড়া কেটে নিয়ে দশ বারোটা অত্যন্ত ছোট ছোট অংশ করে কতগুলো ট্রের মধ্যে দ্রবন শুদ্ধ ফেলে দিলাম। কদিন পরে একটা ট্রে পরীক্ষা করে দেখলাম কোষগুলো খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে যে ওরা একটা আকার নিচ্ছে। আজ ন মাস পূর্ণ হলো, সকালে দেখলাম তিনটে জীবন্ত প্রঃ পাঠক, যদিও অতি ক্ষুদ্র।"

"নিজের ঘরে ফিরে এলাম অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম। তারপর সনীশ্চর করে ল্যাবরে-টারিতে এলাম দ্রবনের ফরমুলাটা নষ্ট করে ফেললাম, ট্যাপটা বার্নারে পুড়িয়ে দিলাম। সমস্ত দ্রবন বেসিনে ফেলে দিলাম। কোনোও রকম সূত্র রাখলাম না যাতে করে ঐ মিডিয়ামটা আর তৈরী না করা যায়। চোখের সামনে দশটা প্রঃ পাঠকের মৃত্যু হোলো। তোমরা ভাবছো প্রঃ পাঠক পাগল। তা নয়, তোমরা জানো তোমাদের মতন আমার মতন সরলমনা বৈজ্ঞানিকরা একদিন আণবিক শক্তি আবিষ্কার করেছিলেন। ভেবেছিলেন এর শক্তি কাজে লাগিয়ে শান্তির সময় বহু কাজ এ শক্তিকে বহু কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু বাস্তবে কি হলো? মনুষ্য মারার জন্য আণবিক ক্ষমতা ব্যবহার হোলো আরও বাপকভাবে ধ্বংসের জন্য এর ব্যবহার হচ্ছে বা হবে। এ ক্ষেত্রেও যে মানুষ লক্ষ লক্ষ সৈন্য লক্ষ অপরাধে চোর ডাকাত গুন্ডা তৈরী করবেনা তার নিশ্চয়তা কি? সেইজন্য ওটা অংকুরে বিনাশ করাই উচিত কাজ মনে করলাম।" এবারে তোমাদের কিছু বলবার আছে?"

আমরা বললাম "না, তবে একটা আবিষ্কার এভাবে নষ্ট করে ফেলাটা···"

উনি আমাদের কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, "যে আবিস্কার ভবিষ্যতে মানুষের অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে সেটা নষ্ট করে ফেলাই উচিৎ।"

হাবার ভূত দেখা

শ্রীকাঞ্চন



এক হাবার শখ হয়েছে, ভূত দেখবে। কিন্তু দেখতে চাইলেই কি দেখা যায় ভূত! না, ভূত দেখা যাওয়ার ভূতপূর্ব হলেও, মানে ভূতের পূর্বে যা ছিল, কিন্তু ভূত? ভূতেরাই বরং দেখে, দেখতে পেলেই আর কথা নেই—।

রাতদিন ঘ্যানর ঘ্যানর দিদিমার কাছে—ও দিদিমা ভূত দেখাবে, ভূত দেখব। বেচারা দিদিমা এখন ভূত পায় কোথা? একি ছেলের হাতের মোয়া, না বাজারে কিনতে পাওয়া যায় ভূত যে যা হোক করে পয়সা জমিয়ে-টমিয়ে একখানা ভূত কিনে আনবে বাজার থেকে? তাছাড়া ভয়ের কথা, রাত বিরেতে তেনাদের নাম করতে নেই। দিন হলেই বা কি? ভূত! ওরে বাবা রে! কিন্তু কে শোনে কার কথা? হাবা ভূত দেখবেই।

প্রতিবেশীরাও যে বোঝায় না তা নয়, কিন্তু বেশী বোঝাতে চায় না। দশাসই চেহারা হাবার। কখন কি করে বসে। তাছাড়া হাবা তো, বিনি পয়সায় ফাই-ফরমাস খাটেই বা কে? হাবার কানে একবার তুললেই হল, ঠিক করে দেবে সে। তাই তাকে বেশী ঘাটায় না।

আর ভূত যে দেখবে হাবা, ভূত কি এ তল্লাটে আছে? তাদেরও শান্তি নেই। পিল-পিল করে ভূতপূর্বরা এসে জঙ্গল-টঙ্গল কেটে বিরাট বিরাট ইমারত বানিয়ে ফেলছে না? খালি জায়গা, পড়ো বাড়ী-টাড়ী কিচ্ছু নেই। তারা থাকবে কোথায়? তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে তারা। হাবার আর ভূত দেখা হয় না। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখে সে আর দিদিমার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে।

দিদিমার নাতি-অন্ত প্রাণ। তারও মনে দুঃখ নাতিকে একটা ভূত দেখাতে পারল না বলে। কত জনের কাছে বলেছেও। কিন্তু লোকে কি শোনো! ভূতের নাম শুনেই পালিয়ে যায়। লোকে বুড়ো হলে ঠাকুর দেবতার নাম করে, আর এই দিদিমা ভূত, ভূত করেই একদিন মরে গেল ফট করে। হাবা পড়ল আতান্তরে। কাজ-কম্ম শেখেনি, এখন তাকে খাওয়াবে কে? দিদিমা ছাড়া তিনকূলে আর কেউ নেই তো তার! দিদিমা থাকতে দুবেলা দুমুঠো তবু জুটত যা হোক। আর এখন—!

যা হোক দিদিমার জন্য কয়দিন কান্নাকাটি করেই গেল হাবার। প্রতিবেশীরাও আফশোস করল। কয়দিন খাওয়াল হাবাকে। কিন্তু রোজ রোজ খাওয়াবে কে? কাজেই লোকের ফাই-ফরমাস খাটে সে এখন, দুবেলা খেতে পায়। কিন্তু তাতে কি আর হাবার পেট ভরে? শরীরের জেল্লাও কমে গেছে। এভাবেই চলে তার আর দিদিমার কথা ভেবে কাঁদে।

এমনি একদিন এক প্রতিবেশীর ফরমাস মত ভিনগাঁয়ের ছুতোরের কাছ থেকে একটা উদুখল ও মুষল নিয়ে আসছিল সে। কাঁকালে উদুখল, কাঁধে মুষল, দশাসই চেহারা। দেখাবার মতই দৃশ্য বটে। ভর দুপুর বেলা। খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর। চারদিকে ধান ক্ষেত। আলের সরু চিলতে পথ দিয়ে আসছিল সে গাঁয়ের দিকে। খিদেও পেয়েছে খুব। সেই কোন ভোরে দুটি মুড়ি খেয়ে বেরিয়েছে সে।

হাঁটতে হাঁটতে মাঠের মাঝখানে যে বটগাছটা, তার নীচে এসে হঠাৎ সে দেখে কে একজন গাছের ডালে বসে পা দোলাচ্ছে। ঠিক রাস্তার উপর। তার নীচে দিয়েই তো যেতে হবে তাকে। দেখেই তো সে রেগে লাল। একে খিদে পেয়েছে, মন মেজাজ ভাল নেই তার মাথার উপর ঠ্যাঙ দোলান! চীৎকার করে উঠল হাবা, কে রে! ঠ্যাঙ দোলাচ্ছিস?

সঙ্গে সঙ্গে সড়াৎ করে ঠ্যাঙ দুটো উঠে গেল গাছের উপরে।

জবাব না পেয়ে সে গেল আরও রেগে। চীৎকার করে বলল, কি এত বড় আস্পর্দা! ইয়ার্কি হচ্ছে? নেমে আয়, নেমে আয় বলছি।

কিন্তু এবারও সে দেখতে পেল না কাউকে। সরসর করে পাতাগুলি নড়তে লাগল, উপর থেকে উপরে।

আসলে সে ছিল একটা জ্যান্ত গেছো ভূত। খাওয়া-দাওয়ার পর আয়েস করে গাছের ডালে বসে দোলাচ্ছিল পা। ইচ্ছে ছিল দুপুরে তার নীচে দিয়ে যদি কেউ যায় তাহলে সে তার ঘাড়ে চেপে বসবে। কিন্তু হাবা যে এমনভাবে চীৎকার করে উঠবে ভাবতে পারে নি সে। তাই সে ভয় পেয়ে উঠে গেল উপরে।

এবারেও হাবা কাউকে দেখতে না পেয়ে গেল আরও রেগে। চীৎকার করে বলল, ও-হ নামবি না? তেল হয়েছে? তবে দাঁড়া উদুখলে ছেঁচে তেল বের করছি। বলেই সে উদুখল ও মুষলটা মাটিতে রেখে মালকোচা মেরে যেই না বটগাছের ঝুরিতে হাত দিয়েছে ফ্যাট্ করে শব্দ হল একটা পাশে। থতমত খেয়ে হাবা তাকিয়ে দেখে কিম্ভূত মত কি একটা উপুর হয়ে পড়েছে মাটিতে।

আসলে ভয় পেয়ে ভুতটা সর সর করে উপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ হাত ফসকে টিকটিকির মত বুক জেবড়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। তাতেই শব্দ হয়েছিল ফ্যাট। ভূত বলেই রক্ষে, কিচ্ছু হয়নি তার। তারপর উঠে দাঁড়িয়েই দে দৌড় মাঠ বরাবর।

তাই দেখে হাবা চিৎকার করে উঠল, ওরে পালাচ্ছিস! দাঁড়া বলেই সে উদুখলটা

কাঁকালে, মুষলটা কাঁধে তুলে ছুটল ভূতটার পেছনে। ছুট ছুট ছুট। ভূতও ছোটে হাবাও ছোটে।
এদিকে ভুতটার হয়েছে জ্বালা, না পারে সে হাবার হাত ছাড়াতে, না পারে ছুটতে। ছুটবে কি করে? সে তো আর মেঠো ভূত নয়, গেছো ভূত। গাছ হলে না হয়—। তবুও প্রাণের দায়ে ছুটতেই হয় তাকে। এ মাঠ-ও মাঠ, খানা খন্দ পেরিয়ে ছুটছে তো ছুটছেই। একেক বার পিছন ফিরে তাকায় আর ছোটে। আর হাবাও এদিকে ছুটে আসছে। ছুটছে আর চীৎকার করছে, দাঁড়া রে, দাঁড়া রে, দাঁড়া। কিন্তু ভূত কি আর দাঁড়ায়? ছুটেই চলেছে সে।
ছুটতে ছুটতে কখন যে সে নদীর কাছে চলে এসেছে খেয়ালই নেই। নদীতে তখন ভরা জোয়ার। এক মেছো ভুত তখন পেট ভরে মাছ খেয়ে নদীর পাড়ে বসে রোদে গা গরম করছিল। গেছো ভূত ছুটতে ছুটতে এসে হোঁচট খেয়ে পড়বি তো পড় মেছো ভূতের পিঠে। ফলে এক ধাক্কায় দুজনে জড়াজড়ি করে ঝপাং—জলে।
মেছো সাঁতারে ওস্তাদ। হঠাৎ জলে পড়ে এক ঢোক জল খেয়ে তড়াক করে পারে লাফিয়ে উঠে গেছোর দিকে তাকিয়ে বলল, আরে গেছো দা না?
গেছো তো সাঁতারই জানে না। খাবি খেতে খেতে বলল, হ্যাঁ ভাই বাঁচাও॥
সঙ্গে সঙ্গে মেছো তাকে পাড়ে তুলে এনে বলল, কি হয়েছে গেছো দা?
গেছো বলল, পালাও, পালাও ভাই। তেল বের করতে আসছে।
কোৎ করে একটা ঢোক গিলে মেছো বলল, কে? কই? কোথায়? বলে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে হাবা আসছে ছুটে। কাঁকালে উদুখল, কাঁধে মুষল।
ওরে বাপ রে! বলে ছুটতে গিয়ে বলল, তুমি?
আমাকেও নিয়ে চল ভাই। বলে গেছো মেছোর হাত ধরল।
কি আর করে মেছো? গেছো তো সাঁতারও জানে না। তাই এক ঝটকায় গেছোর হাত ধরে বলল, চল। বলেই দুজনে হাত ধরধরি করে ছুটল নদীর পার দিয়ে।
হাবা চীৎকার করে বলে উঠল, ওরে, আর একটা জুটিয়েছিস? দাঁড়া। বলেই দ্বিগুণ বেগে ছুটতে লাগল তাদের পেছনে।
হাবাও ছোটে, ভূতও ছোটে। ছুটতে ছুটতে তারা এসে পড়ল একটা ঢিবির সামনে। চারদিকে কাশবন। ফুলে ফুলে সাদা হয়ে রয়েছে চারিদিক। ঢিবির নীচে একটা বিরাট গর্ত। ভূত দুটো এক লাফে সড়াৎ সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল গর্তে। সঙ্গে সঙ্গে হাবাও এসে উপস্থিত। গর্তে উঁকি দিয়ে সে বলল, ওরে গর্তে ঢুকেছিস? তবে দাঁড়া। বলে সেও উদুখল ও মুষল নিয়ে গর্তে লাফিয়ে পড়তেই সড়াৎ করে এসে পড়ল এক চাতালে। সামনে একটা প্রশস্ত রাস্তা। চারদিকে গাছপালা, কিন্তু কেমন যেন ধূসর-ন্যাড়া-পাতাটাতা কিছু নেই। পোড়া কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হাবার কি আর এতসব নজর আছে? গোঁ চেপে গেছে তার। ধরবেই ভূত দুটোকে। ভূত বলে

তো জানেও না সে। রাস্তা দিয়ে ভূত দুটোকে ছুটে যেতে দেখে সেও ছুটল তাদের পেছনে, কাঁকালে উদুখল, কাঁধে মুষল।
বাপের জন্মেও এমন বিপদে পড়েনি ভূত দুটো। পেছনে তাকিয়ে দেখে আর ছোটে প্রাণের দায়ে।
এটা ছিল ভূতের রাজ্য। ভূতং রাজা রাজত্ব করত সেখানে। রাজার কাছেই আশ্রয় নেবার জন্য ছুটছিল ভূত দুটো।
ভূতং রাজা তখন রাজদরবারে বসে শুনছিলেন ভূতোকীর্তন। রাজসভাসদেরা টিন, ক্যানেস্তারা, ভাঙ্গা হাঁড়ি, নারকোলের মালা ইত্যাদি বাজিয়ে কীর্তন গাইছিল।
এমন সময় "রাজামশাই বাঁচান, রাজামশাই বাঁচান" বলে হুড়মুড় করে এসে পড়ল ভূত দুটো রাজদরবারে। চৌকাঠে পা আটকে গেছো ভূত পড়ল উপুড় হয়ে আর মেছো ভূত ছিটকে গিয়ে পড়ল সিংহাসনের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে হাবাও হুংকার দিয়ে এসে পড়ল গেছোর পিঠে। উদুখল তার পিঠে চাপিয়ে মুষল দিয়ে চেপে ধরে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, এইবার এইবার এইবার—? গেছো ভূত চিঁ চিঁ করে উঠতেই হুংকার দিয়ে উঠল হাবা—এই চোপ্।
মুহূর্তে রাজদরবার ফাঁকা। চারিদিকে টিন, ক্যানেস্তারা, ভাঙ্গা হাঁড়ি, নারকোলের মালার ছড়াছড়ি। রাজামশাইও দিয়েছিলেন লাফ, কিন্তু পালাতে পারেন নি। সিংহাসনের হাতল ভেঙ্গে আটকে গিয়ে চিঁ চিঁ করছিলেন তিনি।
চিঁ চিঁ শুনে হাবা চীৎকার করে উঠল, চোপ। কে চেঁচায়? বলেই ওদিকে তাকিয়ে বলে, তুমি? তুমি কে?
এজ্ঞে—। রাজামশাই বললেন, এজ্ঞে রাজা।
রাজা? আবার চীৎকার করে উঠল হাবা।
এজ্ঞে না—আ—।
না—আ—? বলে মুষল দিয়ে উদুখলের ভিতর দড়াম করে ঘা লাগাল হাবা।
ওরে বাপরে! বলে চেঁচিয়ে উঠল গেছো।
রাজামশাই কি করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তবু ভূত তো, এক সময় হাসি হাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর এটাকে উদুখল দিয়ে চেপে ধরেছেন কেন?
ধরব না? লাফিয়ে উঠল হাবা। গাছের উপরে বসে মাথার উপর পা দোলান? বলে আমি মরছি আমার জ্বালায়। কবে থেকে একটা শখ ভূত দেখব, তা এখন পর্যন্ত পেলাম না।
রাজার ধড়ে যেন প্রাণ এল। হেসে বললের, কি বললেন? ভূত দেখবেন? তা এতক্ষণ বলতে হয়। এই তো যেটাকে চেপে ধরে রেখেছেন এটাই তো ভূত, গেছো ভূত।
এটা? হাবা খুশী হয়ে গেছোকে ছেড়ে দিয়ে বলল, এতক্ষণ বলেনি কেন?
ঝড়াৎ করে কেঁদে উঠল গেছো, সময় পেলাম কোথায়?

রাজা বললেন, হুজুর, আপনার সঙ্গে গেছোকে দিয়েই তো দিতে পারি। তার কথামত চললে সে আপনাকে বড়লোক করে দিতে পারে। নিয়ে যান না তাকে।

গেছো চিঁ চিঁ করে বলল, যদি মারধোর করে মহারাজ ?

না না, মারব কেন ? হাবা বলল, মারব না।

রাজামশাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আর পালিয়ে যাওয়া সব ভূত গুটি গুটি এসে হাবাকে ঘিরে নৃত্য করতে লাগল। হাবাও খুব খুশী, এত ভূত।

তারপর ভূতং রাজা হাবাকে খাতির-যত্ন করে গেছোকে সঙ্গে দিয়ে গর্তের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। হাবা মনের আনন্দে গেছোকে নিয়ে চলে এল বাড়ী।

বাড়ী আর কি, একখানা ভাঙ্গা কুঁড়ে। গেছো বলল, ইঁকি ? এখানে থাকেন আপনি ? ইস, কি কষ্ট।

হাবা ভ্রূ কুঁচকে বলল, কেন ?

না না, দাঁড়ান সব ঠিক করে দিচ্ছি। বলে গেছো করল কি, হাবার সম্বল থালা, ঘটি, বাটিখানা তার হাতে তুলে দিয়ে বলল, যান এগুলি বিক্রী করে ডাল, নুন, মশলা কিনে নিয়ে আসুন। দাড়ি-পাল্লাও আনবেন একখানা। দেখবেন কি কাণ্ডখানা হয়।

মজা লাগল হাবার। সে গেছোর কথামত জিনিষ আনতেই গেছো দাওয়াতে এগুলি সাজিয়ে হাবাকে বসিয়ে দিল বিক্রী করতে। কানে কানে বলে দিল কি করে কায়দা করে মাপতে হয় জিনিষ। বলে সে খদ্দের আনতে ছুটে চলে গেল। ভূত তো, খদ্দেরের কাঁধে চাপতে তার কতক্ষণ লাগে! ঠিক নিয়ে এল খদ্দের।

আর এদিকে হাবা বসে বসে করে বিক্রী। ঝড়াঝড় বিক্রী। একদিনেই সব শেষ। মেলা লাভ হল। পরদিন আবার। আবার বিক্রী, আবার লাভ। এই করে কিছুদিনের মধ্যেই সে ফুলে ফেঁপে ঢোল। একখানা বাড়ীও বানিয়ে ফেলল সে। বড় হল দোকানটাও। বিয়ে করল। ছেলেপিলে হল, তিন ছেলে। আরও বড় হল দোকানটা, আরও টাকা। ছেলেরাও বড় হল। নিজে তো পুব গাঁয়ে ছিলই, এখন ছেলেদের তিনটে দোকান করে দিল উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম গাঁয়ে বসিয়ে। রাজামশাইকে বলে আরও তিনটে ভূত নিয়ে এলো গেছো ছেলেদের জন্য। সাংঘাতিক দোকান করেছে এরা। বাপের ওজন ফাঁকিটা আর এরা দেয় না। বালি, কাঁকর মিশিয়ে ওজন ঠিক রেখেই বিক্রী করে। কিন্তু একদিন গেছো হাবাকে বলল, হুজুর, এখানে পড়ে থাকলেই হবে ? শহর বন্দরে যেতে হবে না ?

হাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, গেছো, সাধ কি যায় না ? কিন্তু পুত্র কই আর ?

কেন হুজুর ? গেছো বলল, পোষ্য নেন না। পোষ্যপুত্র কি পুত্র নয় ?

তা যা বলেছ। বলে হাবা খুশী হয়ে তার পরদিনই কয়েকজন পোষ্যপুত্র নিয়ে শহরে বন্দরে দোকান করে বসিয়ে দিল তাদের। গেছোও নিয়ে এল মেলা ভূত। সবার জন্য একটা করে। পোষ্যও বাড়ে ভূতও বাড়ে। ভূতং রাজাও খুশী ভূতের পুনর্বাসন

হচ্ছে বলে। এখন আর পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে না তো, তাই খুশী হয়ে গেছোকে একটা শিরোপাও দিলেন রাজা।

এদিকে পোষ্যপুত্ররা পুত্রদের মত জিনিষে বালি, কাঁকর মেশান কায়দাটা আর পছন্দ করল না। তারা সূক্ষ্মভাবে অন্য জিনিষ মিশিয়ে স্বাদ গন্ধ বজায় রেখে খাঁটি জিনিষ বিক্রী করতে লাগল। মেলা লাভ। বেজায় খুশী সবাই। হাবাও খুশী, ভূতও খুশী। তারা এখন দুই বেলা হাবাকে ঘিরে নেত্য করে ধিতাং ধিতাং। কান পাতলেই শোনা যায় নাচছে ভূতেরা, ধিতাং ধিতাং।



মা যে আমার ভারতবর্ষ

সলিল মিত্র

সোনা দেশের সোনার মাটি ভালোবেসে মাথায় তুলি,
তার ছোঁয়াতে উঠছে ফুটে সবুজ প্রাণের কুসুমগুলি।
নীল আকাশের অরূপ জ্যোতি নীল সাগরে ফোটায় হাসি,
উদাস মনে রাখালিয়া যায় বাজিয়ে বাঁশের বাঁশি।
বাঁশির সুরে কাঁপন লাগে সবুজ বনে বনান্তরে—
গিরিরাজের হিম ললাটে আলোর নিবিড় সোহাগ ঝরে।
মাটির মা-টি ভারতবর্ষ, তার কোলেতেই প্রাণ জুড়ালো,—
স্বপ্ন দিয়ে কতো কবি এই মাটিকেই বাসলো ভালো!
ভারতবর্ষ মা যে আমার, স্নেহের অাঁচল বিছিয়ে আছে ;
ভিন্ন ভাষা, সাজ পোষাকেও অভিন্ন সব মায়ের কাছে।
জাতি বিচার নেই তো কিছু, আমরা সবাই ভারতবাসী,
পরস্পরের দুঃখে কাঁদি এবং সুখে সবাই হাসি।
মায়ের পায়ে শুভ্র কমল অঞ্জলি দিই সবাই এসে,
মা আমাদের কোমল বুকে জড়িয়ে আছেন ভালবেসে!
ভারতবর্ষ মহান এ দেশ, তারই উদার বিশাল বুকে
বিশ্বভুবন বাঁধা আছে তৃপ্ত মধুর সহাস মুখে॥

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ফুল



গীতা দত্ত

এই পৃথিবীতে যত রকমের গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে "র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডি" ফুলটিও একটি মস্ত বড় আবিষ্কার।

তোমরা আশ্চর্য হবে শুনলে যে এই ফুলের পাপড়ির আয়তন হচ্ছে এক গজের মত বা প্রায় এক মিটারের মত। সমস্ত ফুলটির ওজন পনের পাউন্ড বা প্রায় সাত কিলোগ্রামের মত, এইজন্যই এই ফুলটিকে বিনাদ্বিধায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং অতি সুন্দর ফুল বলা চলে।

একজন বৃটিশ আবিষ্কর্তা, "স্যার টমাস স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফেলস", ১৮১৮ সালের ২০শে মে, সুমাত্রা দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে এই অদ্ভুত ফুলটিকে আবিষ্কার করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ডাঃ "জোসেফ আর্নল্ড"।

ডাঃ আর্নল্ড এই ফুলটির সম্বন্ধে বলেছিলেন যে,—এটি উদ্ভিদ্ জগতের একটি অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার।

এই দুজন আবিষ্কারকের সম্মানে, ফুলটির নাম রাখা হয়, র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডি। এটা যে শুধু সবচেয়ে বড় ফুল তাই নয়, দুর্লভ ফুলের মধ্যে একটি। সবচেয়ে রহস্যময় এই ফুলটি হচ্ছে জঙ্গলের পরগাছা। এর দেহে কোন শেকড় ও সবুজ অংশ নেই। জঙ্গলের ভেতর বুনো আঙুর গাছের শেকড় থেকে এই ফুল গজায়। আফিম বা পোস্ত গাছের বীজের মত খুব ছোট্ট বীজ থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে কুঁড়ি হয়ে ওঠে। এক একটি ফুলের কুঁড়ি ঠিক বাঁধাকপির মত দেখতে। কুঁড়ি থেকে ফুল হতে দীর্ঘ নয় মাস সময় লাগে। ফুলের পাপড়ি লাল রং-এর হয়, তার ওপর মাঝে মাঝে হলুদ রং-এর ছাপ থাকে। কতকগুলি হলদে ছাপ উঁচু হয়ে থাকে ঠিক ছোট ছোট টিউমার বা আবের মত। ফুলটি ফোটবার পর চারদিনের মধ্যেই শুখিয়ে যায়। সাধারণতঃ গলিত পচা মাংসভোজী মাছিরা হচ্ছে এই ফুলের রেণু বহনকারী। এই ফুলের গন্ধ পচা মাংসর মত। সেজন্য এই জাতীয় মাছিরা এই ফুলের গন্ধে লুব্ধ হয়।

র‍্যাফ্লেসিয়া আরনল্ডি ফুল সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জের কিছু অংশে জন্মায়। এই ফুলটিকে সংরক্ষণ করা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ, জঙ্গলের ভিতর কিছু অংশে চাষ আবাদ হচ্ছে ও কাঠের ব্যবসা গড়ে উঠছে।

সাধারণতঃ এই ফুল চওড়ায় হচ্ছে সাড়ে সাতাশ থেকে ছত্রিশ ইঞ্চি। বেসরকারী বিবরণ হচ্ছে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি অর্থাৎ উচ্চতায় হচ্ছে একটি পাঁচ বছরের শিশুর মত।

এক ধরণের বুনো আঙ্গুর গাছের প্রজাতি যার নাম টেট্রাস্টিগমা, সাধারণতঃ এই ফুলটি তার ওপরই জন্মায়। এই ফুল সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই অজানা রয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে এটাও একটা আশ্চর্য ঘটনা যে এই প্রজাতির আঙ্গুর গাছের সঙ্গে এই ফুলের সম্পর্ক কি করে তৈরী হল।

র‍্যাফ্লেসিয়ার বারটি প্রজাতি আছে। তার মধ্যে কিছু ছোট প্রজাতি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় দেখতে পাওয়া যায়। গত বিশ্বমহাযুদ্ধে দুটি প্রজাতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এই ফুল স্ত্রী ও পুরুষ দুরকমেই হয়।

১৯৮১ সালে সিঙ্গাপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন "টেট্রাস্টিগমা" আঙ্গুরের চাষ করতে আরম্ভ করল এবং সেই সময় র‍্যাফ্লেসিয়া ফুল চাষ করারও চেষ্টা করা হল। ১৮৫৪ সালের আগেও একবার এরকম চেষ্টা করা হয়েছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে মাছি ছাড়াও হরিণ, শুয়োরছানা, কাঠবিড়ালী এরাও এই ফুলের বীজ বহনকারী। এমন কি পিঁপড়ে ও উইপোকা জাতীয় পোকারাও এই ফুলে বীজ বহন করে। তবে এই র‍্যাফ্লেসিয়া ফুল আঙ্গুর গাছের কোন ক্ষতি করে না।

র‍্যাফ্লেসিয়ার স্থানীয় নাম হচ্ছে (Bunga Patma) বুঙ্গা প্যাটমা ; বুঙ্গা মানে ফুল ও প্যাটমা হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ "পদ্ম", কারণ প্রাচীনকালে এইসব দ্বীপপুঞ্জে কিছু হিন্দু সংস্কৃতি ছিল।

যেসব ভাগ্যবান লোকেরা এইসব দ্বীপপুঞ্জের জঙ্গলে এই ফুল দেখতে পায় তারা এই ফুলের গন্ধে নয় কিন্তু সৌন্দর্যে সম্পূর্ণ অভিভূত হয়ে পড়ে।



কুণ্ডুবাড়ির অতিথি



শ্যামলী বসু

হিরণ্ময় সুধীরকে কথা দিয়েছিল এবার পুজোয় ওদের দেশের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওদের ওখানে অনেকদিনের পুজো, প্রায় দুশো বছরের পুরানো। হিরণ্ময়ের পূর্বপুরুষেরা ওখানকার জমিদার ছিলেন। এখন অবশ্য জমিদারও নেই, আর শরিকদের ভাগাভাগিতে সাত টুকরো হয়ে গেছে ওদের দেশের সব সম্পত্তি। নেহাৎ দেবত্র সম্পত্তি কিছু আছে বলেই দোল দুর্গোৎসব এখনো হয়ে চলেছে।

এবার পুজোর পালা পড়েছে হিরণ্ময়ের জ্যাঠামশায়ের। তা হোক। সুধীরের কোন কষ্টই হবে না, জেঠিমা হিরণ্ময়কে খুবই ভালবাসেন, নিজের কোন ছেলেমেয়ে নেই তো ওঁর। সুধীরেরও ভাল লাগবে ওদের দেশে গেলে। সুধীর তো আবার খবরের কাগজে সেকালের দুর্গোৎসব কি সাবেকী পুজো—এইসব নিয়ে কাগজে লেখে। লেখার মালমশলাও হয়তো পেয়ে যাবে হিরণ্ময়ের দেশে গেলে।

চিঠিতেই নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল হিরণ্ময়। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় দেশের বাড়িতে ওদের দুজনের দেখা হবার কথা। সুধীর আসবে দুর্গাপুর থেকে, হিরণ্ময় আসছে কলকাতা থেকে।

বর্ধমান স্টেশন থেকে আরো দু-তিনটে স্টেশন পরে হিরণ্ময়ের দেশের বাড়ি। কলেজে পড়ার সময় থেকেই সুধীরকে সে অনেকবার বলেছিল দেশের পুজোর কথা, সুধীরের তখন সময় হয়নি। এবার কিছুটা লেখার তাগিদেই রাজী হয়ে গিয়েছিল সে। পুজো দেখাও হবে, সেইসঙ্গে লেখার মশলাও জুটে যাবে। যাকে বলে রথ দেখা আর কলা বেচা—দুই-ই হবে।

দুর্গাপুর থেকে বার দুয়েক বাস বদল করে সুধীর চলে এল হিরণ্ময়দের গ্রামে। বাস স্টেশনেই সে শুনল জংশন স্টেশনের আগে মালগাড়ি আর লোকাল ট্রেণে মুখোমুখি ধাক্কাধাক্কি লেগে ট্রেণ চলাচল বন্ধ। বাস থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে সুধীর কথা বলছিল ওখানকার দু-চারজন ভদ্রলোকের সঙ্গে।

তাদের মুখেই শুনল কথাটা। শুনে সুধীর একটু চিন্তিত হল। সর্বনাশ! হিরন্ময় যদি না পেঁছে থাকে, তাহলে তো মুশকিল হবে। ওর তো ট্রেণেই আসবার কথা। হিরন্ময় না এলে সুধীর কার কাছে উঠবে? কোথায় যাবে? কাউকেই তো সে চেনে না।

চায়ের দোকানেই এক বয়স্ক ভদ্রলোককে সে জিজ্ঞাসা করল 'কুন্ডুবাড়িটা কোনদিকে?' কোন কুন্ডু? পাঁচআনির জমিদার? তারা তো এখন অনেক শরীক?' চশমার ভিতর দিয়ে সুধীরকে আপাদ মস্তক জরীপ করতে লাগলেন ভদ্রলোক।

ভাগ্যি সুধীরের মনে পড়ে গেল হিরন্ময়ের বাবার নাম।—'আজ্ঞে, নগেন কুন্ডুর বাড়ি। ও'র ছেলে হিরন্ময়, আমার কলেজের বন্ধু।'

'ও নগেন কুন্ডু? তা তিনি তো আজ চার বছর সগ্‌গে গেছেন। এবার তো ও'র দাদার, মানে নবীন কুন্ডুর পালা। তা নবীন কুন্ডুর তো ছেলেপিলে নেই, ঐ ভাইপোই তার ওয়ারিশ।' এমন কত কথাই বকে চলছিলেন ভদ্রলোক। সব কথা সুধীরের কানে ঢুকছিল না।

—"এই বাস স্ট্যান্ড থেকে কুন্ডুবাড়ি কতদূর হবে?" সে প্রশ্ন করল।

—'এখান থেকে মাইলখানেকের মত। সাইকেলরিক্সা দেড় টাকা নেয়। তবে আজতো রিক্সা-টিক্সা কিছু মিলবে না বাপু। সব গেছে যাত্রা শুনতে। 'নদের নিমাই' যাত্রা হচ্ছে কিনা এখেনে—'

তা সাইকেল রিক্সা না পাওয়া যাক ক্ষতি নেই সুধীরের। সঙ্গে মালপত্রও বিশেষ কিছু নেই তো, একটা হালকা স্যুটকেশ আছে কেবল। সেটা হাতে ঝুলিয়ে, চায়ের দাম মিটিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুধীর। তারপর ভদ্রলোকের নির্দেশ মত পথে চলতে শুরু করে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

আকাশের গায়ে পঞ্চমীর চাঁদের একটুকরো ফালি। পথ চলে গেছে নদীর ধার দিয়ে, খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে। গাড়ি চলার পথ, তাই হাটতেও বিশেষ অসুবিধে নেই। হাওয়ায় ভাসছে ফুলের গন্ধ। অনেক দূরে ট্যাং-ট্যাং করে ঢাকের বাদ্য বাজছে। ঐদিকেই পুজো বাড়ি। খানিক এগিয়ে পথটা ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে। বাঁদিকের পথ দিয়ে এগিয়ে হিরন্ময়দের বাড়ি। সেইদিকে এগোল সুধীর। কিন্তু কেউ কোথাও নেই তো, দরজা জানলা সব বন্ধ। তার মানে হিরন্ময়টা এখনো এসে পেঁছায়নি। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকার বাড়িটাকে দেখাচ্ছে একদলা জমাট অন্ধকারের মত। আরে হিরন্ময়দের পুরানো লোক রামুদাদাই বা গেল কোথায়?

হাতের স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখে দুহাতে গেট চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সুধীর। এবার বেজায় রাগ হচ্ছে হিরন্ময়ের ওপর। এতখানি পথ এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে। বেজায় ক্ষিধেও পেয়ে গেছে। কোথায় হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করবে তা নয়, অন্ধকারে পথের উপর দাঁড়িয়ে থাকা।

সুধীর বার দুয়েক চেঁচিয়ে ডাকল—'রামুদাদা, ও রামুদাদা।' কেউ সাড়া দিল না। তার মানে রামুদাদাও যাত্রা শুনতে গেছে নাকি? হিরন্ময়ের চিঠি কি সে পায়নি?
এবার হিরণ্ময়ের ওপর আবার রেগে গেল সুধীর। রাগ হতে লাগল নিজের ওপরেও। হিরণ্ময়ের চিঠি পেয়ে এমন হুট করে না চলে এলেই হত। কি করবে সে এখন?
—'কে ডাকছ বাছা রামুর নাম ধরে?' অন্ধকারে বাগানের দিক থেকে শোনা গেল এক বয়স্কা মহিলার গলা। বাড়ির পিছন দিকের গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল লণ্ঠনের আলো। লণ্ঠন হাতে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন সাদা থান পরা এক মহিলা। আলোটা একটু উঁচু করে তুলে বললেন—'কে? কোথা থেকে আসছ?'
—'আজ্ঞে, আমি সুধীর। হিরণ্ময়ের বন্ধু। আমি আসছি দুর্গাপুর থেকে। আজকেই হিরণ্ময়েরও এসে পেঁাছবার কথা। জ্যাঠামশায়ের বাড়িতে পুজো—'

'ও, বুঝেছি। এসো, এসো—ভেতরে এসো। রামু গেছে যাত্রা শুনতে। তোমার চিঠি পায়নি বোধহয়। তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না, যতক্ষণ আমি আছি। এসো। কুণ্ডুবাড়ি থেকে অতিথি কখনো ফিরে যায়নি—এসো বাছা।'
স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে গেট ঠেলে বাগানের ভিতরে ঢুকল সুধীর। মহিলা আলো হাতে পথ দেখাতে দেখাতে আগে চললেন।
সুধীর একটু আশ্চর্য হয়ে দেখল উনি বাড়ির দিকে না গিয়ে, বাড়ির পিছন দিকে বাগানের পথ ধরে চললেন এগিয়ে। একবার পিছন ফিরে, যেন সুধীরের মনের কথা বুঝতে পেরে হেসে বললেন 'ও বাড়িতে নয়। আমি থাকি এই দিকে, বাগানের ভেতরে।'
গাছপালা ঢাকা ঘরখানা আবছা অন্ধকারে নজর পড়েনি সুধীরের।
হাতের লণ্ঠনটা ঘরের দাওয়ায় নামিয়ে রেখে বৃদ্ধা মিষ্টি হেসে বললেন, 'ঐখানে কুয়োতলা। যাও হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি।'
হাত মুখ ধুয়ে এসে দাওয়ায় বসল সুধীর। বৃদ্ধা একখানি পশমের আসন বিছিয়ে রেখেছিলেন সেখানে। আসনের সামনে বড় কাঁসার থালায় ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, বাটিতে ডাল, ধোঁকার ডালনা। খাবার মুখে তুলতেই মন ভরে গেল সুধীরের, এমন রান্না জীবনেও খায়নি সে। ঘর থেকে একবাটি ঘন ক্ষীর এনে বৃদ্ধা বসিয়ে দিলেন সুধীরের থালার পাশে। একটু হেসে বললেন 'আর দু খানা লুচি দিই—?'
খেতে খেতে সুধীরের হঠাৎ মনে হল, এরই মধ্যে এত রকম রান্নার আয়োজন কি করে সম্ভব হল। তারপর পরে মনে হল হয়তো বৃদ্ধা নিজের খাবারটাই ধরে দিয়েছেন ওর সামনে। ছিঃ ছি, কি লজ্জা।
খেয়ে উঠে হাত মুখ ধুয়ে এল সুধীর কুয়োতলা থেকে। মহিলা ওর হাতে দিলেন দু

টুকরো হরতুকি। এতক্ষণে সুধীরের খেয়াল হল মহিলা যে হিরণ্ময়ের কে হন—তা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি।
সুধীর প্রশ্ন করার আগেই বৃদ্ধা হেসে বললেন, 'আমি হিরণ্ময়ের ঠাকুমা হই। ওর বাবার পিসি। তাই শুনে প্রণাম করতে এগিয়ে গেলেন সুধীর। মহিলা পিছিয়ে গেলেন। স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'থাক, থাক, ভাই। ভালো হোক তোমার। যাও ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়। কোন চিন্তা নেই। কাল সকালেই হিরণ্ময় এসে পড়বে।'
ঘরের ভিতরে সেকেলে প্রকাণ্ড খাটে বিছানা পাতা। মশারি ফেলা। লণ্ঠনের শিখা কমিয়ে দিয়ে ঠাকুমা বললেন—'ঘুমোও, ঘুমিয়ে পড়।'
সারাদিন ক্লান্তির পর পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করে আর শরীর বইছিল না সুধীরের। শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল সে পরম নিশ্চিন্তে।

পরের দিন হিরণ্ময়ের ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভাঙল তার। চোখ খুলে সুধীর দেখল বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাছ পালার ফাঁকে রোদ্দুর এসে পড়েছে ওর মুখে। আর হিরণ্ময় ঝুঁকে পড়েছে ওর উপরে।
'—এ্যাই সুধীর, ওঠ, ওঠ। কখন এসে পেঁছিলি তুই। বাগানের ভেতরে গাছের তলায় শুয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিলি—?
এবার ধড় ফড় করে উঠে বসে সুধীর।
'ওমা, তাইতো। পিসিমার ঘর কোথায়?' শিউলি গাছের নীচে একটা পাথরের বেদীর ওপর শুয়ে আছে সে। সারা গা শিশিরে ভিজে গেছে। গায়ের ওপর শিউলি ফুলের চাদর বিছানা যেন।
হিরণ্ময়ের পাশে দাঁড়িয়ে বুড়ো মতন একটা লোক। সুধীরকে ধড় ফড় করে উঠে বসতে দেখে ফিস ফিস করে বলে উঠল 'পিসি ঠাকরুণের বেদীতে শুয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিল তোমায় বন্ধু। তাহলে কি—?'
সুধীর কিচ্ছু বুঝতে পারছিল না। দিব্যি ঘরে খাটে শুয়েছিল সে—এখানে কি করে এল?
'রামু দাদা আমার চিঠি পায় নি। কাল সারা রাত ধরে যাত্রা দেখেছে। এদিকে আমিও ট্রেনের গোলমালে আটকে পড়েছিলাম। তাই সময়মত এসে পেঁছতে পারিনি। ভাবছিলাম তোর কথা। কিন্তু তুই এই বাগানে, পিসি ঠাকুমার বেদীর কাছে এলি কি করে?'
'—উনিই তো আমার ডাক শুনে, পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এলেন।' ততক্ষণে ঘুমের ঘোর কাটতে শুরু করেছে সুধীরের। 'রাতের বেলা খাওয়ালেন কত যত্ন করে। নিজের ঘরে শুতে বললেন আমাকে—। কিন্তু আমি এই বেদীর ওপর এলাম কখন' কি করে?'
'পিসি ঠাকুমা তোকে নিয়ে এসেছিলেন বাগানের মধ্যে? ওঁর ঘরে? হিরণ্ময়ের গলার স্বরে বিস্ময় আর ব্যাকুলতা দুই-ই স্পষ্ট হয়ে উঠল।

'—হ্যাঁ। উনিই তো। তাতে এত আশ্চর্য হবার কি আছে রে?' সুধীরও ওদের বিস্ময় দেখে অবাক হয়ে যায়।' কি যত্ন করে যে আমাকে রাতে খাওয়ালেন। সে রান্নার স্বাদ এখনো মুখে লেগে আছে।

পিসি ঠাকুমা! তিনি তো মারা গেছেন পঁয়ত্রিশ বছর হল! তাঁকে তো আমি চোখেও দেখিনি রে। তবে বাবার মুখে শুনেছি তিনি খুব ভালো রান্না করতেন। গ্রামে কারো বাড়িতে খাওয়া দাওয়া থাকলে লোকে ওঁকে রান্না করার জন্য ডেকে নিয়ে যেত। সুধীয়ের বিস্মিত উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি দেখে থেমে গেল হিরণ্ময়। তারপর একটু থেমে থেমে বলতে লাগল—'বাবাকে উনি খুব ভালবাসতেন। এই বাগানেই তার ঘর ছিল। তাঁরই ইচ্ছায় বাগানের মধ্যে এইখানে পিসি ঠাকুমাকে দাহ করা হয়েছিল। তারপর এই পাথরের বেদীটা বাবা এখানে তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। হ্যাঁরে—তুই তাঁকে দেখলি? রান্না খেলি তাঁর হাতের?' উৎসুক গলায় প্রশ্ন করে হিরণ্ময়।

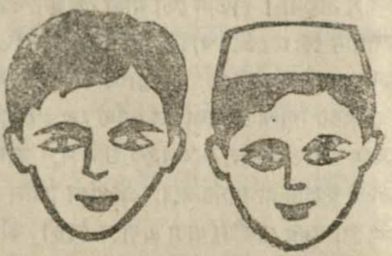
হিরণ্ময়ের কথা কানে যেতে গায়ে যেন কাঁটা দিল সুধীরের। সারারাত তাহলে কোথায় ছিল সে? আস্তে আস্তে চোখ ফেরাল সে পাথরের বেদীটার দিকে। দেখল একরাশ শিউলি ফুলে ছেয়ে আছে সেই বেদী। সকালের বাতাসে টুপটাপ করে ঝরে পড়ল আরো কটি ফুল।

আর সেইদিকে চেয়ে মন যেন ভরে উঠ্‌ল সুধীরের। মনে হল পিসি ঠাকুমার আশীর্বাদ ঝরে পড়েছে বাড়িটার উপর। আর একটুও ভয় করল না তার।

বিস্মিত হিরণ্ময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ গলায় সুধীর বলে উঠল—পিসি ঠাকুমা বলেছিলেন কাল যে কুণ্ডু বাড়ি থেকে কখনো অতিথি ফিরে যায় নি। সে কথা খুব সত্যিরে। কাল তো নিজেই দেখলাম।"

কাকাতুয়ার গল্প

স্বকুমার ভট্টাচার্য



বংকু বিমল কেষ্টবাবুর ঠিকানা হল বীরু ঘোষের চায়ের দোকান। বটতলার চকের ওপর একটা বিরাট বটগাছের নিচে দোকানটা। চারপাশে ছোট-বড় মাঝারি নানা দোকানদানি। বেশ বাজার বাজার মত জমজমাট জায়গাটা।

বীরু ঘোষের চায়ের দোকানটাও কম জমজমাট নয়। লোকজন সব সময়ই বাঁ দিককার বিরাট উনুনটাতে দিন রাত জল ফুটছে টগ্ বগ্ করে। ডান দিকে একটা দাঁড়ের ওপর বসে বড় সড় কাকাতুয়া। বেশ মজার জীব! নতুন পুরণো যে কেউ দোকানে ঢুকলেই বলে, আসুন, বসুন।

চা-খেতে খেতে খদ্দের হাসে। বলে, খুব পয়মন্ত পাখি। ওর দৌলতেই বীরু ঘোষের এত বাড়ন্ত।

—আর আমরা বুঝি ফালতু?

চেয়ারে বসে টিপ্পনি কাটে বংকুর দল। বক্তা সমঝে যায়। কেননা, বীরু ঘোষের সব খরিদ্দারই চেনে ওদের। কথায় সায় না দিলেই অনর্থ। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে-সে তো বটেই!

বিরক্ত বোধ করলেও বীরু ঘোষও কিছু বলে না। সাহসের অভাব। তিনটে নিষ্কর্মা বেকার সব সময়ই চেয়ার দখল করে আড্ডা দেয়। পঞ্চায়েত ভোট থেকে কমনওয়েলথ ইলেকশন পর্যন্ত বাদ যায় না ওদের আলোচনায়। সব জানে। শুধু জানেনা কাজকর্ম করতে।

সেদিন দুপুরে একটা অঘটন ঘটে গেল। বীরু ঘোষের সেই বিখ্যাত কাকাতুয়াটা নিখোঁজ হয়ে গেল দাঁড় থেকে। আপনা হতে চেন ছিঁড়ে, কি কেউ বদমাইসি করে খুলে দিয়েছে, কে জানে! মাথায় হাত বীরু ঘোষের।

খবর পেয়ে আশে পাশের দোকানদাররা ছুটে এল। দাঁড় খালি দেখে সবার মন খারাপ। নানা রকম পরামর্শ দিতে শুরু করল, কাকাতুয়াটা খুঁজে বার করার জন্য।

—এটা একটা কথা নাকি ? ওড়া পাখি, কোথায় হাওয়া হয়েছে কে জানে ! কোথায় খুঁজবে ?
সবাই তাকাল বংকুর দিকে। কিন্তু ওর কথার জবাব দিতে কারো মন চাইল না। কালি মন্দিরের পুরোহিত শিরোমণি ঠাকুর দাঁড়িয়েছিলেন সবার পিছনে। বললেন, কোথায় আর খুঁজবে বাবা। আশপাশের গাছপালায় একটু দেখ, ঠিক পেয়ে যাবে। যাবে কোথায়।
কথাটা মনে ধরল না বংকুর। বাঁধা পাখি ছাড়া পেয়ে কখনো ধারে কাছে থাকে ? তল্লাট ছেড়ে পালায় নিরুদ্দেশে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে, এমন সময় বীরু ঘোষ বলল, ঠিক বলেছেন ঠাকুর মশাই। যাবে কোথায় ? বিশেষ পায়ের অতবড় শিকল নিয়ে ?
—বলছ কি ? তাহলে তো আরো বিপদ ! কোথায় কোন গাছের ডালে শিকলটা জড়িয়ে গেলে একেবারে বন্দী দশা। দেখ দেখ, এখনি খোঁজ করা দরকার।
সকলেই নড়ে চড়ে উঠল। কাকাতুয়াটার খোঁজে ছড়িয়ে পড়ল চারধারে, জোড়া জোড়া চোখ গাছ গাছালির ডালপালায়, পুব-পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে হেঁটে চলল তারা। শুধু বংকু বিমল কেষ্ট, তিন সঙ্গী বসে রইল দোকানটায়। বীরু ঘোষ বলল, তোমরা একটু দেখলে পারতে ?
—দূর-দূর ! কোথায় দেখব ? ওই তো অত মানুষ খুঁজছে ? অলস বংকুর মুখে রাজ্যের বিরক্তি।
—তা ঠিক।
চুপ করে গেল বীরু। সে তো জানে, ওরা কেমন ! দু-হাতের চেটোয় মুখ ঢেকে মাথা নীচু করল বীরু। কাকাতুয়াটাকে প্রথম যেদিন এনেছিল, সেদিনকার কথা মনে পড়ল। কিনেছিল পীরপুরের মেলায়। সেদিন একেবারে মনে হয়নি, পাখিটা এমন বেঘোরে মরতে পারে ! ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তে মাথা নাড়ল বীরু। অস্ফুটে মুখ দিয়ে বের হয়ে এল,—নাঃ।
—কি হল, অমন বাচ্ছা ছেলের মত দেয়ালা করছ কেন ?
বংকুর এক সাগরেদ বাঁকাভাবে জিজ্ঞেস করল বীরুকে।
—দেয়ালা করব কেন, আপশোষ করছি। পাখিটা শেষ পর্যন্ত অপঘাতেই মরবে !
—কি করে জানলে ওটা মরবে ? বংকুর প্রশ্ন।
—না জানার কি আছে ? তাছাড়া শুনলে তো শিরোমণি ঠাকুরের মুখে।
—ওটা পুজুরি বামুনের ফালতু পণ্ডিতি। ও কথার কোন মানে হয় না।
—'উঁহু !' মাথা নাড়ল বীরু ঘোষ, "এমনিতেই দাঁড়ে বসে থাকতে থাকতে উড়তে ভুলে গেছে। তার ওপর পায়ে ঝুলছে শিকল। কুকুর বেড়াল শকুন কিছু একটা পিছু ধাওয়া করলে কি করবে ?
—উড়ে পড়বে।

—পড়বে ঠিকই, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে যেমনটি ওড়া দরকার তেমনটি কি পারবে? আর পারলেও, ধরো শিকলটা জড়িয়ে গেল কোন কিছুর সঙ্গে। তখন?
—তখন?
ভাবনায় পড়ল বংকু। সত্যিই তো, তখন? পিছন থেকে যেটা তাড়া করবে, সেটা তখন ঘটা করে চেপে ধরবে কাকাতুয়াটাকে। ঝুঁটি বাঁধা মাথা হেলিয়ে প্রাণের দায়ে চিৎকার ছাড়া আর উপায় থাকবে না। কিন্তু তাতে প্রাণ রক্ষা হবে কি? এবার বীরুর মতই মাথা নাড়তে লাগল বংকু। অস্ফুট বলল, নির্ঘাৎ অপঘাতে মরবে।
—আমিও তাই বলছি।
কিন্তু বীরুর একথা কানে গেল না বংকুর সে তখন অন্য কথা ভাবছে। কি ভাবে বাঁচানো যায় কাকাতুয়াকেটাকে। এক সময় উঠে দাঁড়াল। তিন সাকরেদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এই ওঠ। যে ভাবেই হোক ব্যাটাকে খুঁজে বের করতে হবে।
পরক্ষণেই কজন বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। ঠিক বিকেল না হলেও, সূর্য তখন অনেকখানি পশ্চিম আকাশের কাছাকাছি। পড়ন্ত রোদের আলোয় অলস নিস্কর্মাদের মুখ পুড়ে বেগুনি। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে দরদর। এগাছ ওগাছ, এপাড়া-সেপাড়া ঘুরে বেড়াল। খুঁজতে বাকি রাখল না কোথাও।
বিরক্ত বিমল। বলল, এই বংকা, আর না। দোকানে ফিরে চল। সে ব্যাটা নিশ্চয় ধরা পড়েছে।
—বলছিস?
—আর নাই যদি পড়ে, তুই আমি কি করব? দেখছিস তো সন্ধ্যে হয়ে গেল।
তা ঠিক, ভাবল বংকু। সত্যি সত্যিই তখন সন্ধ্যে নামছে। বট-অশত্থ শিরিষ-ছাতিমের ডালে ডালে তখন ঘর ফেরা হাজার পাখির কিচিরমিচির। ওদের মধ্যে কাকাতুয়াটা থাকলেও আলাদা ভাবে চিনে ওঠা দায়।
ওরা যখন বীরুর দোকানে ফিরল, তখন অন্ধকার। চোখ পড়ল দাঁড়টার ওপর। ফাঁকা, ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে বীরু বুঝল, চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি ওরা! বাকি সকলের মত বিফল হয়ে ফিরেছে। এই প্রথম সে প্রসন্ন চোখে তাকাল বংকার দিকে। বলল, পেলি না তো?
মাথা নাড়ল বংকু।
—"পাবি না জানতুম। নে বোস।"
তারপর যে লোকটা চা করছিল, তার দিকে তাকিয়ে বীরু বলল, জগু, বংকু-বিমল-কেষ্ট কে চা দে!
—ব্যাপার কি! আজ যে দেখছি দাতা কর্ন?
কেষ্ট বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে তাকাল বীরুর দিকে। বিরু কিছু উত্তর করার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল বংকু। কারো দিকে না তাকিয়ে বেরিয়ে গেল দোকান থেকে।

অন্ধকারের মধ্যেই শাদা চেহারার পাখিটাকে খ‍ুঁজে বেড়াল সে। বলা যায় না, যদি পাওয়া যায়? কিন্তু না, ঘোরাই সার হল। মন খারাপ করে বাড়ী ফিরল রাতে। খেতে বসেও রুচি হল না। শিকল পরা কাকাতুয়াটার কথা মাথায় ঘুরতে থাকল। মনে পড়ল বীরু ঘোষের মন্তব্য, দাঁড়ে বসে থাকতে থাকতে উড়তে ভুলে গেছে। তাঁর ওপর পায়ে ঝুলছে শিকল। শেষ পর্যন্ত অপঘাতে মরবে।

বিছানায় গেল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না। শেষ রাতে স্বপ্ন দেখল। ভারি অদ্ভুত স্বপ্ন। তার পায়ে একটা মজবুত শিকল। কোথা থেকে কেমন করে বাঁধা হয়েছে, জানে না। প্রচণ্ড অস্বস্তিতে সেটাকে সে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। হা ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। চুপ করে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, তখনি চোখ পড়ল বিমল আর কেষ্টর ওপর। দেখল তাদের পায়েও ওই একই ধরনের শিকল। ভারি অদ্ভুত তো! ব্যাপারটা কি? আশপাশের আরো দু-পাঁচজনের পায়ের দিকে তাকাল বংকু। কিন্তু ভাল করে ঠাহর পাবার আবার আগেই ঘুমটা ছুটে গেল তার।

ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপর উঠে বসল বংকা। গলা শুকিয়ে কাঠ। একটা ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল বাকি রাতটুকু। সকাল হতেই সে বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। সোজা হাঁটা দিল বটতলার চকের দিকে। গোলকুঁয়ার চকে বাঁক নিতেই চোখ পড়ল বীরু ঘোষের চায়ের দোকানটা! অনেক লোকের ভিড় সেখানে। সাত সকালে আবার কি হল? বংকুর চলা আরো দ্রুত হল।

কাছে গিয়ে দেখল, ভিড়টা আশপাশের দোকানদারদের। বিমল কেষ্ট তার আগেই হাজির সেখানে! চোখ পড়ল পাশের মরা পিয়ারা গাছটার ওপর। কাকাতুয়াটা মরে ঝুলে আছে একটা শুকনো ডালে। ঝুঁটি বাঁধা মাথাটা মাটির দিকে। শিকল বাঁধা একটা পা ঠেকে আছে ডালটায়।

শিরোমণি মশাই তখন কথা বলছিলেন, ওর পায়ের শিকলটা নিমিত্ত। আসলে ওর কাজ শেষ হয়েছে, তাই গেছে।

—বেড়ে বলেছেন ঠাকুর মশাই? ওর আবার কি কাজ ছিল? দাঁড়ে বসে দানাপানি খাওয়া? কেষ্ট বিদ্রূপ করল।

—তাই কি? ওর কি কোন কাজ ছিল না? ভেবে দেখতো, সমস্ত দিন ধরে কত মানুষকে আনন্দ দিয়েছে "আসুন বসুন" বলে? ওটাই ছিল ওর কাজ!

—জোর করে একটা কিছু বোঝালেই হল?

বিমল যোগ দিল কেষ্টর সঙ্গে। বংকুর কিন্তু ওসব কথা কানে যাচ্ছিল না। তার চোখ তখন সেখানকার সমবেত মানুষগুলির পায়ের ওপর। সে দেখছে সেখানকার প্রত্যেকের পায়ে একটা করে শিকল বাঁধা। প্রতিটি নড়াচড়ায় আওয়াজ উঠছে ঝম্‌ঝম্‌। অথচ কেউই সেটা টের পাচ্ছে না। *

---

* আফগানিস্থানের একটি গল্পের অনুসরণে।

কুণ্ডুবাবুর মুণ্ডু

রূপক চট্টরাজ

কুণ্ডুবাবু সদাই ঢোলেন
রক্তবর্ণ চক্ষে—
চেয়ার টেবিল সামনে পেলে
নেই বুঝি আর রক্ষে।
মিটিং কিংবা কাজের সময়
কিংবা ডিনার লাঞ্চে,
কুণ্ডুবাবুর মুণ্ডু যেন
মুহুর্মুহুঃ টানছে।
টেনে-টেনেই ঘাড়ের ওপর
রাখতে মাথা টান ক'রে
কুণ্ডুবাবু ব্যায়াম করেন
রাত বারোটায় চান করে।
রকম দেখে সবাই বলেন,
আচ্ছা এ দুর্ভোগ যে
কোবরেজ কি বদ্যি ডাকুন
পড়বে ধরা রোগ যে!
কুণ্ডুবাবু বলেন হেসে,
বুঝতে সবই পারি রে—
করব কী আর মানব দেহে
মুণ্ডু বেশি ভারী রে।

ঝকমারি

রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী



বাচ্চা মেয়েটা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কয়েকজন লোক তাকে ঘিরে একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছিল ; কিন্তু কোন উত্তর না পেয়ে কেবলই অস্থির হচ্ছিল।

দিনটা ছিল উৎসবের দিন। রথোৎসব। মাহেশের রথ দেখতে নানা জায়গা থেকে দলে দলে লোক এসেছে। লোকের ভিড়ে শ্রীরামপুর শহরটা গমগম করছে। দুপাশে রকমারি দোকান বসেছে। হরেক রকম মনোহারী আর খাবারের দোকান। সেখানেও লোকের ভিড়। রাস্তা চলা যায় না।

বাচ্চা মেয়েটাকে ঘিরে লোকের জটলা দেখে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল সমীরণ। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে মেয়েটার সামনে এসে দাঁড়াল। মেয়েটা তখনও কাঁদছে।...

বছর তিনেকের মেয়ে। রোগাটে চেহারা। তামাটে রঙ। চোখ দুটো কটা। কচি মুখখানা চোখের জলে একাকার।

সমীরণ সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটা কান্না থামিয়ে তার দিকে একবার তাকাল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে আবার হালকা সুরে কাঁদতে সুরু করল। ভিড়ের মধ্যে কয়েকটা লোক নানা রকম মন্তব্য করে যাচ্ছে। তাদের কথাগুলো শুনে সমীরণ বুঝে নিল, মেয়েটা দলছুট হয়ে বিপাকে পড়ছে। কিন্তু লোকগুলো এতক্ষণ কেবল বকেই চলেছে। কেউ বলছে, মেয়েটা যখন নিজের নাম ধাম কিছুই বলতে পারছে না তখন স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে তুলে দেওয়া ভাল। মেলায় তারা একটা মিসিং স্কোয়াড খুলেছে। ওখানে জমা দিলে ওরা নিশ্চয় ঠিকমত ব্যবস্থা নেবে। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন লোক সেই কথায় আপত্তি জানিয়ে বলেছে,—আরে না মশাই, মিসিং স্কোয়াড এখান থেকে অনেক দূর। কে দায়িত্ব নিয়ে ওখানে জমা দিতে যাবে ? তার চেয়ে এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা ভাল। মেয়েটার আত্মীয় স্বজন নিশ্চয় আশেপাশে খোঁজ খবর করছে। হয়ত এখুনি তারা এসে পড়বে।

আলোচনাগুলো মোটেই ভাল লাগল না সমীরণের। মেয়েটাকে আটকে রেখে লোক-গুলো অযথা সময় নষ্ট করছে। অগত্যা নিজে তৎপর হয়ে পুরুষ্ট গলায় বলে উঠল সে —'বাচ্চা মেয়েটাকে অযথা নিজেদের কাছে আটকে না রেখে পুলিশের হেফাজতেই রাখুন না, মশাই! ছেলেমেয়ে হারালে লোকে আগে থানায় খোঁজ খবর নেয়।

একজন বয়স্ক লোক কথাটা সমর্থন করে তখুনি বলে উঠল, 'উত্তম প্রস্তাব। আর কোন কথা নেই। মেয়েটাকে পুলিশের হেফাজতে রাখাই ভাল।'

আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করে সমীরণ তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে কোলে তুলে একাই থানার দিকে এগিয়ে চলল। মেয়েটা ততক্ষণে কান্না থামিয়েছে। রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে মেয়েটার জন্যে কিছু বিস্কুট আর লজেন্স কিনল সে।...

পুলিশ ফাঁড়িটা মাত্র কয়েক মিনিটের পথ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হল সমীরণ। থানা অফিসার বীরেশবাবু তাকে চেনে। এক ফুটবল প্রতিযোগিতার আসরে আলাপ হয়েছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। অফিস ঘরে ঢুকতেই সে দেখল, বীরেশ-বাবু একমনে কি যেন লিখছেন। ঘরে আর কেউ নেই। সেই ফাঁকে মেয়েটাকে কোল থেকে নামিয়ে একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিল সমীরণ। তারপর মেয়েটার হাতে বিস্কুট আর লজেন্সে প্যাকেটটা তুলে দিল।

—'কি ব্যাপার?' সমীরণের দিকে নজর পড়তেই প্রশ্ন করলেন বীরেশবাবু।

—'ব্যাপার তেমন কিছু নয়, প্রতি বছর রথের ভীড়ে যা হয়ে থাকে তাই। এই বাচ্চা মেয়েটা রথের ভীড়ে সঙ্গীদের দেখতে না পেয়ে রাস্তায় কাঁদছিল। নাম ধাম কিছুই বলতে পারে না। জিগ্যেস করলে শুধু কাঁদে। অগত্যা আপনার কাছে নিয়ে এলাম।

কথাগুলো শুনে ভদ্রলোক সমীরণের দিকে একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন,—'কখন এবং কোথা থেকে মেয়েটিকে নিয়ে এসেছ সেগুলো লিখে কাগজে একটা সই করে দিয়ে যাও।'

—'কেন?'

—'তাই নিয়ম।'

সমীরণ দ্বিরুক্তি না করে ভদ্রলোকের নির্দেশ মত কাগজে ঘটনা বিবরণ লিখে এবং সেই সঙ্গে নিজের নাম ঠিকানা উল্লেখ করে সই দিল। কাগজটা ফেরৎ নিয়ে বীরেশবাবু সেটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন।

—'তাহলে আমি এখন যাই', সমীরণ বলল।

—'কোথায় যাবে?'

—'বাড়ি। সেই যখন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। বাড়ির লোকেরা এতক্ষণ বোধ হয় আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে।'

—'তাতে কি হয়েছে? রথের দিন। শহরময় উৎসবের আনন্দ। আজকের দিনে অন্তত বাড়ির লোকেরা কেউ চিন্তা করবে না।'

'না, বেলা অনেক হল।'
'—এই ত সবে দুপুর। আমার ঘড়িতে মাত্র একটা বেজে কুড়ি মিনিট।'
—'আশ্চর্য, এখনও বলছেন বেলা হয়নি? দুপুরের চান খাওয়া বাকী। সেগুলো করব কখন?'
'বুঝলাম, কিন্তু এদিকের ব্যাপারটাও তো দেখতে হবে।'
—'মানে?'
—'ঐ বাচ্চা মেয়েটার কথা বলছি। এখন কেউ যদি ওকে নিতে আসে?'
—'আপনাদের জিম্মায় রেখে গেলাম। এর চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কোথায় থাকতে পারে? খবর পেয়ে মেয়েটাকে যদি কেউ নিতে আসে, অবস্থা বুঝে সেইমত ব্যবস্থা করবেন। আমি আমার কর্তব্য করেছি, এখন আপনাদের দায়িত্ব।'
—'সবই বুঝলাম। কিন্তু তোমার দায়িত্ব এখনও শেষ হয়নি। আরও কিছুটা বাকী আছে। তাই বলছি, কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে সেটুকু শেষ করে যাও।'
—'কি বলতে চান আপনি?' হঠাৎ এক প্রচণ্ড উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সমীরণ। ব্যাপারটা তার কাছে ক্রমশ যেন জটিল হয়ে পড়ছে। অথচ একটা সামান্য ব্যাপার। রথ দেখতে এসে একটা ছোট মেয়ে দলছুট হয়ে পড়েছিল। কর্তব্য হিসেবে তাকে উদ্ধার করে থানায় জমা দিয়েছে। তার পক্ষে আর কি করণীয় থাকতে পারে? অথচ থানা-অফিসার বলছেন, এখনও নাকি তার কিছুটা কর্তব্য বাকী আছে। চিন্তা করেও সেটা খুঁজে পেল না সে। তাছাড়া মাথায় কিছু আসছে না। সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। শরীরটাও ক্লান্ত।...
নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে সামনের একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল সমীরণ। বীরেন বাবুর দিকে চোখ পড়তেই দেখল, ভদ্রলোক স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ঠোঁটের কোনে এক চিলতে হাসি। এবার সমীরণকে শুনিয়ে তিনি বললেন, 'নিতান্ত নিরুপায় হয়ে তোমাকে আটক রেখেছে। দিনকাল বড় খারাপ। উপকার করতে গিয়ে মানুষ কত রকম বিপদে পড়ছে। কত যে অঘটন ঘটছে, ইয়ত্তা নেই।'
প্রত্যুত্তরে সমীরণ বলল, 'আপনার কথাগুলো কিছুই বুঝতে পারছি না। যদি বুঝিয়ে বলতেন, ভাল হত।'
বীরেশ বাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। মুখের চেহারাটা চকিতে বদলে গেল। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মেয়েটাকে থানায় পৌঁছে দেবার আগে তার গয়না-গাটি গুলো দেখে নিয়েছিলে ত?'
কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠল সমীরণ। মেয়েটার দিকে তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে নিল। বিস্কুটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ঝিমুচ্ছিল সে। অনেকক্ষণ কান্নাকাটি ক'রে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চোখ দু'টো মাঝে মাঝে ঘুমে বুজে আসছে। মেয়েটার গলায় রয়েছে একটা সরু রুপোর চেন। দু'হাতে একটা করে চিকন বালা। সেগুলো মনে হয় রুপার নয়, অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। জিনিষগুলো আগে লক্ষ্য

করেছিল সমীরণ ; কিন্তু বীরেশ বাবুর প্রশ্নটা তাকে যেন নতুন করে ভাবিয়ে তুলল। তবে কি ভদ্রলোক কোন কিছু সন্দেহ করছেন ? যাই হোক নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে শান্ত গলায়—উত্তর দিল সমীরণ,—মোটামুটি দেখে নিয়েছিলাম। মেয়েটার গায়ে এখন যে জিনিষগুলো দেখছেন, সেগুলোই ছিল।'

—'কি করে ধরে নেব, তুমি ঠিক বলছ। কোন প্রমাণ আছে ?'

—'বুঝেছি, আপনি বলতে চান আরও কয়েকটা গয়না ছিল। তাই থেকে আমি কয়েকটা সারিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ চুরি করেছি।'

—উত্তেজিত হয়ো না, সমীরণ। ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর। এ ধরনের ঝামেলা আজকাল প্রায় হচ্ছে। এখন যদি মেয়েটার কোন আত্মীয় এসে দাবী করে, তার গায়ে আরও কয়েকটা সোনার জিনিষ ছিল, তাহলে ঘটনা কোথায় দাড়াবে একবার চিন্তা করেছ কি ? আগেও এরকম ঘটনা ঘটেছে। সেজন্য তোমাকে আটকে রেখেছি, কারণ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী তুমি। মেয়েটিকে তুমিই থানায় নিয়ে এসেছ। সঙ্গে আর কোন লোক ছিল না। কোথা থেকে এবং কি ভাবে মেয়েটিকে এখানে নিয়ে এসেছ, জানি না। শুধু তোমার মুখের কথা ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই। আইন আদালতে মুখের কথার কোন দাম নেই। সুতরাং এক্ষেত্রে তোমাকে আটকে রাখা ছাড়া কোন উপায় নেই।'

বীরেশ বাবুর কথাগুলো শুনে সমীরণ মুষড়ে পড়ল। একটা সামান্য ঘটনা এরকম জটিল হয়ে উঠবে, ধারণা করতে পারেনি। যদি তা পারত, এখনই দায়িত্বটা একার কাঁধে নিত না। যাক, সেই চিন্তা করে এখন লাভ নেই। বিষণ্ণ মনে বীরেশ বাবুকে প্রশ্ন করল,—'আমাকে এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে ?'

—'মনে হয়, খুব একটা দেরী হবে না। মেয়েটার খোঁজে এখুনি হয়ত কেউ এসে পড়বে। বিকেল হয়ে এল। রথের মেলা প্রায় শেষ।'

—'ভাল কাজের ঝক্কি কতখানি, আজ টের পেলাম।'

—'ভাল কাজে চিরদিনই ঝক্কি থাকে। যাঁরা সমাজে ভাল কাজ করেন, তাঁরা সেটা জেনে শুনেই করেন। ঝক্কি ঝামেলা তাঁরা আমল দেন না। আমল দিলে, দেশে কোনদিন ভাল কাজ হত না।'

বীরেশ বাবুর মন্তব্যটা ভালই লাগল সমীরণের। ভাল কাজে কিছু না কিছু ঝক্কি ঝামেলা থাকেই। সহজ মনে সেটা মেনে নিলে কোন অসুবিধে নেই। কথাটা বার বার চিন্তা করে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সমীরণ। ক্লান্ত দেহটা চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে শান্ত হয়ে বসে রইল সে। বীরেশ বাবু ততক্ষণে নিজের কাজে মন দিয়েছেন। মেয়েটা ইতিমধ্যে চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অফিস ঘরে লোকজনের ভিড় নেই। শান্ত নিবিড় পরিবেশ।...

অসহ্য ক্লান্তিতে চোখ দু'টো কখন বুজে এসেছিল, টের পায়নি সমীরণ। হঠাৎ বাইরে কিছু লোকের চীৎকার চেঁচামেচিতে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলতেই দেখল,

একজন মাঝ বয়েসী লোক হন্তদন্ত হয়ে অফিস ঘরে ঢুকে কেবলই বলে চলেছে,—'কোথায় আমার মেয়ে,—আমার মা মণি কোথায় ?
লোকটার চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। কতকটা উদভ্রান্তের মত নিজের মেয়েকে খুঁজছিল সে। হঠাৎ এক সময় তার দৃষ্টি পড়ল মেয়েটার ওপর। চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে মেয়েটা তখনও ঘুমুচ্ছে। নিমিষে তাকে দু হাতে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল লোকটা। তারপর আদর সোহাগে তাকে অস্থির করে তুলল।
—'আপনার মেয়ে বুঝি ?' লোকটাকে প্রশ্ন করলেন বীরেশবাবু।
—'হাঁ। রথের মেলা দেখতে এসে এমন বিপাকে কোন বছর পড়িনি, মশাই। আগেও মেলা দেখতে এসেছি ; কিন্তু এরকম প্রচণ্ড ভিড় কখনও দেখিনি। এবার সঙ্গে আরও লোকজন এনেছি তবু সেই বিপাকেই পড়লাম। মেয়েটার হাত ধরে সাবধানে ভিড় ঠেলে এগুচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক আচমকা ভিড়ের ঠেলায় ছিটকে পড়লাম। বাচ্চা মেয়েটা তখুনি হাত থেকে ছিটকে পড়ল। তারপর পাগলের মত এখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সমস্ত দিনটাই মাটি, শেষে রাস্তায় একজনের কাছে খবর পেয়ে থানায় ছুটে আসছি।
—'মেয়েটা যে আপনার, কোন প্রমাণ আছে ?'
—'নিশ্চয়। মেয়েটার গলার চেনে একটা লকেট আছে। লকেটে তার নাম লেখা—'রিণ্টু।' কথাটা বলেই লোকটা তার মেয়ের গলার চেনটা জামার ভেতর থেকে বের করল। তারপর সেটা বীরেশ বাবুর চোখের সামনে মেলে ধরল। কথার জের টেনে লোকটা আরও বলল,—মেয়ের মা ও মাসীরা আমার সঙ্গে আছে। তারা সকলে বাইরে অপেক্ষা করছে। যদি অনুমতি করেন, তাদের এখানে হাজির করতে পারি। প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না।'
বীরেশ বাবু কোন মন্তব্য করলেন না। চেনটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন। রুপার একটা সরু চেন। নীচে একটা বড় লকেট। লকেটের ওপর মেয়েটার নাম লেখা।…
লোকটাকে উদ্দেশ্য ক'রে বীরেশবাবু বললেন, 'আপনার মেয়ের গয়না গুলো ঠিক ঠিক আছে কিনা দেখে নিন।'
—'সব ঠিক আছে, স্যার। কে আর ঐ অল্প দামের জিনিষগুলো নিতে যাবে ? মেয়েটাকে যে ফিরে পেয়েছি। এই কত ভাগ্য। আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ।
—'ধন্যবাদ আমাকে না দিয়ে ঐ ছেলেটিকে দিন, সমীরণের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করলেন বীরেশ বাবু। ঐ ছেলেটি আপনার মেয়েকে রাস্তা থেকে সযত্নে তুলে এনে থানায় জমা দিয়েছিল ধন্যবাদটা ওরই প্রাপ্য।'
ব্যাপারটা এতক্ষণ একমনে লক্ষ্য করছিল সমীরণ। লোকটা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। সমীরণের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে অজস্র আশীর্বাদ করল। তার চোখ দুটো তখন জলে ভাসছে।…

ছাড়া পেয়ে সমীরণ যখন বাড়ির দিকে রওনা হল, তখন বেলা প্রায় শেষ। রথের মেলা দেখে লোকেরা বাড়ি ফিরছে। রাস্তায় তখনও ভিড়। ভিড় ঠেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল সমীরণ। তার মনে তখন আনন্দের জোয়ার বইছে। এই আনন্দের স্বাদ অন্যরকম। উৎসবের আনন্দ এর কাছে কিছু নয়।

শরতের চিঠি

শৈলজা চৌধুরী

শরতের এই চিঠিখানি
শিউলি ফুলের বোঁটার রঙে জড়ানো,
পদ্মবনের ভোমরা কালো
গুণগুণানি গানের সুরে ভরানো।
ছবি কিছু দিলেম তুলে
নদীর চরে কাশের চামর দোলানো
নীল আকাশের সরোবরে
হালকা সাদা মেঘে মেঘে ভোলানো।
গাঁয়ের এ পথ আকাবাঁকা
ছায়ায় ঢাকা কোথায় গেছে কে জানে ?
একতারাটি নিয়ে হাতে
বৈরাগী যায়—মাতোয়ারা সে গানে।
ধানী রঙে ডুবিয়ে নেওয়া
শিশির কণার মুক্তো আখর ছাড়িয়ে
রামধনু রঙ টিকিট মেরে
দিলাম চিঠি ভালোবাসায় ভরিয়ে।

চন্দনা

লিপি রায়



আমার গল্প লিখতে বসে চন্দনার কথা মনে পড়ছে।

চন্দনা আমাদের বাসন মাজার ঝির আট বছরের মেয়ে। দেখতে শুনতে ভাল। কিন্তু চন্দনা ওর মার সংগে সেদিন কাজের বাড়ীতে আসে সেই দিনই সেই বাড়ীতে একটা হৈ হৈ রব শোনা যাবে। বাসনের মধ্যে থেকে রান্নার হাতাটা এই মেয়েটা নিয়ে পালিয়েছে। খোঁজ খোঁজ। কিছু দূরে রাস্তার ওপাশে বসে কতগুলি ছোট ছোট মেয়ের সঙ্গে দিব্যি হাতাটা নিয়ে খেলা করছে কাছে যেতে এক গাল হেসে বলবে আমি এটা নিয়ে পালিয়ে এসেছি খেলবো বলে। না বলে নিয়েছে, এটা যে মারাত্মক অন্যায় করেছে, সে ভাবই ওর মধ্যে নেই।

একদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ চোখে পড়ে চন্দনা সারা রাস্তায় সাধনা ঔষধালয়ের দাঁতের মাজনের কৌট থেকে গুড়গুলি ছড়িয়ে ফেলছে, কি ব্যাপার ? এরকম কৌট তো আমাদের দোতলার বাথরুমে আছে, মা দাঁত মাঝেন, সেটা ওর হাতে যাবে কি করে ? বিস্ময় প্রকাশ করলাম। বাথরুমে গিয়ে দেখি সত্যি সেটা নেই। ওর মা বাসন মাজছে, কোন ফাঁকে দোতলায় উঠে দিব্যি কৌটটা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে সারা রাস্তায় দুড় দুড়াতে চলেছে। উপরের বারান্দা থেকে মহা বিরক্ত হয়ে বললাম—এই চন্দনা ওটা নিয়েছিস কেন, দিয়ে যা। এক গাল হেসে বলল—নিয়েছি তো কি হয়েছে ? তোমাদের উপরে বাথরুম থেকে এনেছি, এটা নিয়ে আমি এখন খেলছি, পরে দেব! আমি অবাক হলাম, নিয়েছে বলে কোন ভয় নেই উল্টে আমায় চুপ করিয়ে দিল।

আরেক দিন দেখি আমার বাড়ীর সামনে প্রচণ্ড চেঁচামেচি। কি ব্যাপার বাড়ীর দু-তিনটে ছেলে এসে চন্দনার মাকে বলছে তোমার মেয়েকে জেলে পাঠাব এত বড় আস্পদ্দা আমাদের দোতলার ঘরে উঠে এসে ট্র্যানজিস্টার নিয়ে দিব্যি চলে যাচ্ছে, ভাগ্যিস আমরা দেখতে পেলাম। মা মেয়েকে চিৎকার করে বলল—কেন তুই ওদের বাড়ী গিয়ে রেডিও নিয়েছিলিস্ ? মেয়ে অবাক চোখে মায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মহা বিরক্ত হয়ে জবাব দিল-এনেছি তো কি হয়েছে ? খেলব বলে নিয়েছিলাম। মা মেয়েকে প্রচণ্ড মার-ধোর করল তারপর পায়ের সঙ্গে শিকল দিয়ে দরজার কড়ার সঙ্গে বেঁধে রাখল। শুনলাম শিকলটা সঙ্গে করে নিয়ে আসে যখন মেয়েকে সামলাতে

পারে না তখন পায়ে শিকল বেধে কাজ করে। পাশের বাড়ীর ছেলেটা শাসিয়ে গেল আর যদি এমন হয় মা মেয়ে দুজনকেই হাজত বাস করিয়ে ছাড়বো।

মা কপাল চাপড়াতে বসল—এ আমি কি কপাল করেছি হাড় জ্বালানি পাগলী মেয়ে আমার যা সব করল।

সাত বছরের চন্দনার কোন কথাও কানে গেল না। তার একটি মাত্র করুন প্রার্থনা—মা আর করব না আমায় ছেড়ে দাও।

মা হাউ হাউ করে চিৎকার করে কাঁদছে—তুই আমায় শেষে চোরের মা করবি?

চন্দনাকে দেখলে সব বাড়ীর কর্তাগিন্নীরা দূর দূর করেন, বলে—দেখ দেখ মেয়েটা এসেছে কি নিয়ে পালাবে। মুখ ঝামটা খেয়ে খেয়ে চন্দনা অভ্যস্ত।

সবাই দূর থেকে চন্দনাকে দেখতে পেলেই সতর্ক হয়ে জিনিস সামলায়, সবাই বিরক্তি প্রকাশ করে।

মাকে অভিযোগ করে—কাজে আস মেয়েকে না আনলেই তো পার। মা দুঃখ করে বলে ঘরে চেন দিয়ে বেধে এসেও তো শান্তি নেই হাতের কাছে যা পাবে ভেঙ্গে ফেলবে রাগের মাথায়। ও একটা পাগল মেয়ে ওকে নিয়ে আমার যত জ্বালা যন্ত্রণা।

বেশ কিছু দিনের জন্য আমি বাইরে গিয়েছিলাম তারপর বাড়ী ফিরলাম বাস থেকে নেমে রিক্সা করে আসছি হঠাৎ পিছন থেকে চিৎকার শুনি—দিদিমণি, দিদিমণি এসেছে, কি মজা, কি মজা, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছে চন্দনা রিক্সার পিছন পিছন। এক গাল হাসি। আমার আসায় ওর কি আনন্দ হয়েছে তা ওর হাসির মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

আমি অবাক বিস্ময় হয়ে গেলাম। যে চন্দনাকে আমরা সবাই দূর দূর করেছি কোনদিন মিষ্টি করে কথা বলিনি সেই চন্দনা আমাদের এত ভালবাসে।

মনে হল ছোট্ট চন্দনা আমাদের যে ভালবাসা দিল এ আমাদের জীবনে কারও কাছে পাব না। যে চন্দনা সবার কাছে পেয়েছে শুধু লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার, সে কিন্তু দিতে পার আন্তরিক ভালবাসা এ যে অনেক মূল্যবান সম্পদ।



নৈনি ও মাকড়সা

গৌরী ধর্মপাল

মাকড়সা ঘর বাঁধবে। রান্নাঘরে যেতে
ঠেঙা নিয়ে তেড়ে এল নৈনির মা।
শোবার ঘরে বেঁধে বেঁধে এলে গেছে।
ঊর্মিলাদি রোজই ঝুল ঝেড়ে দেয়।
চব্বিশ ঘণ্টাও কাটে না।
অত করে গড়া বাসা, বলে কিনা ঝুল!
মানুষের বুদ্ধির পাইনে কো কূল!
বাসা-ভাঙা লাগি তাও বিক্কিরি হয়!
ঝুলঝাড়া ঝুলঝাড়া বলে হেঁকে যায়।
ন্যায় নেই, দয়া নেই, নেই আদালত,
নোটিশ দেবে না, দেবে নাকো ফুরসৎ।
ভেঙে দেবে একঘেয়ে সব মেহনৎ॥
রেগে-মেগে তরতরিয়ে নেমে মাকড়সা
গেল অশথগাছে।
একটা যুৎসই কোন বেছে-বুছে নিয়ে
মুখের সুতোটি বাগিয়ে ঝুলে পড়বে—
কাঠপিঁপড়েদের সদ্দার এসে বললে,
বাসা বাঁধচ যে বড়? দলিল দেখাও।
মাকড়সা তো অবাক্—

কিসের দলিল? দলিল কিসের? কিসের দলিল শুনি?
কোয়েল টিয়া বুলবুলিয়া মাছরাঙা টুনটুনি—
পাতায় ডালে সবার বাসা, সবার আনাগোনা।
বলি গাছ কি তোমার কেনা?
ওহে গাছ কি তোমার কেনা?

কেঠোসদ্দার কিছু না বলে অশথের একটি জাল-পাতা বার করে বাড়িয়ে ধরলে।

মাকড়সা তো আর দলিল পড়তে জানে না। পাছে বিদ্যে ধরা পড়ে যায় তাই একবার দেখেই 'ও' বলে সুতো গিলে পাততাড়ি গুটিয়ে নেমে পড়ল গাছ থেকে।

*　　　*　　　*

মাকড়সা চলেছে যেদিকে আট চোখ যায়। চলেছে একে ওকে তাকে জিগ্যেস করতে করতে ভুল পথে ঠিক পথে বন-মার ঠাঁই। কেননা—

পড়ছে মনে মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানী গান—
গাছগাছালি পথপাথালি বন-মা সবার প্রাণ।
অন্ধকে দেন চক্ষু তিনি, বধিরকে দেন কান
জীবজগতের সব বিপদের তিনিই পরিত্রাণ।
সুখেও আছেন দুখেও আছেন, যে জান সন্ধান—
রাণীর রাণী অরণ্যানী বন-মা সবার প্রাণ॥'

আটদিন আটরাত চলে বনবিরিক্ষি পেরিয়ে মাঠ তেপান্তর ছাড়িয়ে গিরির কোলে নদীর কূলে বন-মার ঘরে মাকড় যেদিন পেঁছল, বন-মা সেদিন ঘুমুচ্ছেন। নমাসে-ছমাসে একদিন ঘুমোন মা, কখন উঠবেন কিছু ঠিক নেই। অপেক্ষা করা নিয়ম। এক এক পায়ে এক এক ঘণ্টা। মাকড়সা সাত ঘণ্টা দাঁইড়্যে দাঁইড়্যে শেষ পা-টা যখন বদলাচ্ছে, তখন কে যেন খুব কাছ থেকে বললে, আর কত তপিস্যে করবি রে? কী হয়েছে বল।

মাকড়সা দেখেই চিনলে—বন-মা।

শতকোটি প্রণামানন্তর নিবেদন মিদং বলে পেন্নাম করতে না করতেই সব দুঃখ গলে জল! মাকড়সার তখন যা হাসি পাচ্ছে! এই নিয়ে দরবার করতে এসেছে এঁর কাছে! যাই হোক বন্দরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে তো আর পারে না। কি ভাববেন উনি! সব খুলে বললে। উইভিং ক্লাসে রচনায় ফার্ষ্ট হত, ফার্ষ্ট টেস্টেই ফাস্টেস্ট! নাম ছিল লুতা বোনার্জি। মাস্টারমশায় উর্ণনাভ তুন্নবায়-দা কী ভালোই না বাসতেন। সেই থেকে সুরু করে নৈনিদের ঘরে-বারান্দায় ঝুলন্ত ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে এই উদ্বাস্তু পর্ব পর্যন্ত সব বেশ গুছিয়ে বললে।

শুনে বন-মার এক চোখে জল চিকচিক আট-চোখে হাসির ঝিকমিক, একটা রঙীন সুতোর বল ওর হাতে দিয়ে মা বললেন—

নৈনির পড়ার টেবিলের ওপরের দেয়ালটায় বাসা করিস। বড্ড লক্ষ্মী মেয়ে। তোকে কিচ্ছু বলবে না, বাসাভাঙা তো দূরের কথা।

তারপর আদর করে তিনটে নাম দিলেন সোনার জলে লিখে জরির মোড়কে দস্তখত এঁকে—

মাক'সা কামড়সা আর পাকড়মা।

তাপ্পর—

একে ঘুম দুয়ে খিদে তিনে তেষ্টা
জয় হবে, কানে কানে বলে শেষটা

আর একটা কী যেন বর দিয়ে-থুয়ে আলতো করে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—ঘর যা।
ঝুপ করে মাকড়সা এসে পড়ল নৈনির পড়ার টেবিলে জ্যামিতির খাতায় ত্রিভুজের মোল্দিখানটায় অষ্টদল পদ্মের মত।

নৈনি বললে, বাঃ।

সেই থেকে খুব সুখে আছে মাকড়সা। কোনোদিন নীল, কোনোদিন লাল, কোনোদিন কমলা, কোনোদিন আবার হাজার রঙা বাসা বাঁধে, ঘুরতে ঘুরতে নিজেই নিজের তারিফ করে বলে, বাঃ বাঃ বাঃ। সেই দেখে দেখে রং মিলিয়ে আসন বোনে সন্ধ্যাদিদি। পোকাপুকী খায় না মাকড়সা। খায় নৈনির আর নৈনির খুদে ভাই হৈনির কাপের তলায় পড়ে থাকা দশ মিলিলিটার দুধ—এবেলা ওবেলা।

মা যখন বলে, নৈনি, টেবিল পোষ্কার করলি না? নৈনি বলে, কি করে করব মা! মাক'সার জাল যদি ছিঁড়ে যায়?

মা বলে, তাই তো, সত্যিই তো, ঠিকই তো।

একদিন ভোরবেলা। ছোট কাঁটাটি আটের ঘর বড় কাঁটাটি বারোর ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে, এমন সময় দুমদুমাদুম দুমদুমাদুম। কাঁচা ঘুম ভেঙে নৈনি দৌড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখে কি—ওমা! এ যে সেই রূপকথার দেশের কাণ্ড! একটা লোক ঢোল পিটোচ্ছে দুমদুমান্দুম। আর একটা লোক মুখে শিঙে দিয়ে চীৎকার করে বোলচে—

রাজার হাতি পাট হাতি সেরা হাতি শ্বেত হাতি দুধে হাতি আলতা হাতি পাগলা হয়ে আগল ভেঙে পালিয়েচে। সাবধান সাবধান। ঘরে দোর দাও। দোকানে ঝাঁপ দাও। আটক-ফটক বন্ধ করো। আর যদি কারো সাহস থাকে তো পাগলা হাতিকে বেঁধে নিয়ে এস। খবরদার, মারা চলবে না কিন্তু। তাহলে গর্দান যাবে। দুম-দুমান্দুম দুমদুমান্দম চচ্চড়াচ্চড় ঝম্।

ব্যস। ইস্কুল কলেজ দোকান বাজার রেডিও টিভি সব বন্দো। শুধু খবরের কাগজের অপিস থেকে সকালে একবার দুপুরে একবার বিকেলে একবার পাগলা হাতির খবর দিয়ে একটা করে পাতা বেরোয়। তা সে পাতায় তো খালি হাতি ধরতে গিয়ে কজন জখম, কজন খতম—এই খবর।

একদিন নয়, আধদিন নয়, আট দিন ধরে ইস্কুল বন্দো, পড়াশোনা হচ্ছে না, নৈনির মনটা বড্ড খারাপ। কি আর করে? টেবিলে বসে বসে খালি দেশলাই দিয়ে রিক্সা বানাচ্চে, এমন সময়—

নৈনি!

নৈনি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে, জালের মধ্যে থেকে মুখ বার করে মাকড়সা। নৈনি তো অবাক! এসব কী হচ্চে কী!

ঢোল ডগরে দিচ্চে যা লোক, রাজার হাতি নিপাত্তা !
বাংলা ভাষায় কইচে কথা সেই দেয়ালের মাকড়টা !
মাকড়টা বলে কি। বলে কিনা—
—নৈনি, হাতি বাঁধবে ?
—আমি ?
—হ্যাঁ হ্যাঁ তুমিই।
—কি করে বাঁধব ?
—আমার এই জালের সুতো দিয়ে।
আরেকটু হলে চেয়ার থেকে পড়েই যেত নৈনি, মাকড়সা তত্তরিয়ে নেমে এসে মুখের সুতো দিয়ে ওকে চেয়ারের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে না ফেললে।
—দেখছ তো আমার সুতোর জোর ?
—দেখছি।
—তবে ?
পরের দিন নৈনি বুক ফুলিয়ে রাজার বাড়ি গেল। সঙ্গে সঙ্গে—নিজেই কাঠিম, নিজেই সুতো—মাকড়সা।
নৈনির কথা শুনে রাজা মশায় হা-হা করে হাসতে লাগলেন। হাসি আর থামেই না। শেষকালে অতিকষ্টে বললেন, অ খুকু, বাড়ি যাও, এ খেলনাও নয়, ছবিও হয়, সত্যি-কারের হাতি। তায় ক্ষেপেচে। বলে, হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে—এ—এ—এ—এ
কথা আর শেষ হল না। মুখে বাঁধন হতে বাঁধন পায়ে বাঁধন সিংহাসনের সঙ্গে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধা হয়ে ছটফট করতে লাগলেন রাজামশাই। তারপর সেপাই সান্ত্রী-মন্ত্রী এমেলে এম্পি সব্বাইকে বেঁধে ছেঁধে পাগলা হাতিকে এক প্রকাণ্ড বটগাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললে মাকড়সা। ফেলতেই কি আশ্চর্য শান্ত হয়ে আস্তে আস্তে শুঁড় দোলাতে লাগল হাতি! যেন এই অপেক্ষায় করছিল। তারপর শুঁড় বাড়িয়ে টপ করে নৈনিকে পিঠে তুলে নিল। শুঁড় তো আর বাঁধে নি মাকড়সা।
হাতি ধরা পড়লে খাওয়াবেন বলে চৌবাচ্চা চৌবাচ্চা ওষুধ বানিয়েছিলেন রাজবদ্যিমশায় চেলাদের দিয়ে পালকাণ্যের পুঁথি ঘেঁটে কুটে বেটে নাকে মুখে মুখোস এঁটে। সে সব গভীর গর্ত খুঁড়ে পুট পাকে পুড়িয়ে পুঁতে ফেলতে হল। ও সব ভয়ংকর ওষুধ জল বাতাসে মিশলে সারা দেশ পাগল হয়ে যাবে না ? বল ?
দেশময় খুশির ঘণ্টা বাজতে লাগল টুং টাং ঢং ঢং ঘং ঘং। হাতি শুঁড় বাড়িয়ে একে একে সব ছেলে মেয়েকে পিঠে বসালে। এক একজনকে তোলে আর সবাই মিলে হাত তালি দেয়। সে কি হৈ হৈ। গোউর বুড়ি তো এ নিয়ে গানই বেঁধে ফেললে একটা হামড়ে পড়ে তাতে সুর দিলে বাঁশবন ভোরের কোকিল আর ঢেউ-ভাঙা পদ্মাবতী। শোন নি বুঝি সে গান ? আচ্ছা, আরেক দিন শোনাব'খন।

রাজা মশায় বাঁকা হাসি তো আগেই সোজা হয়ে গেছিল। এখন একপাল ছেলেমেয়ে পিঠে হাতি এসে যখন বললে—নমস্কার, তখন সে বাজে আওয়াজ চৌচির হয়ে ফেটে গেল মন-জোড়া গোমড়া আকাশ, কেটে গেল সব কটা মেঘ, গুমোট গুমর সব কটা ফাঁস কুল কুল কুল করে বইতে লাগল হাসির নদী। হাসির গাঙে হাসির বাণে রাজসভা ভেসে গেল। হাসির নৌকোয় হাসির পাল তুলে হাসির দাঁড় বাইতে বাইতে হাসির গান গাইতে গাইতে সব্বাইকার ঘাড়ের ব্যথা পিঠ টনটন কোমর কন কন পায়ের যন্ত্রণা—সব মশা মাছি বোলতা ভীমরুল হয়ে উড়ে গেল লাখে লাখ ঝাঁকে ঝাঁক……

টাকা আর কী দেবেন ঐটুকু মেয়েকে, রাজামশাই নৈনিকে দিলেন একটি সোনার কথা-কওয়া হাঁটা-চলা পুতুল, একটি রুপোর টুং টাং গাড়ি, তাতে বাক্স কৌটো ভর্তি ভর্তি চকলেট খই-ভাজা আলুভাজা নিমকি ভাজা-মাংস চিলি-চিকেন মোগল পিঠে কাজুর বরফি—এইসব। মাকড়সাকে দিলেন গা-ভর্তি হীরে চুনি পান্নার কুচি আর খুদেলেখার ওস্তাদ যুগলকে দিয়ে আধ-মিলিমিটার মসলিনে সমোসংস্কৃতে লিখিয়ে একখানি সার্টিফিকিট।

সেই গাড়ি চড়ে ঝলমলে পোষাক পরে নৈনি যখন নাবল, তখন না বলে যাওয়ার জন্যে ভেবে মরা মা বকবেন কি, চিনতেই পারে না। দোরগড়াতে দাঁড়িয়ে ভাবচেন, কে মেয়েটি, কাদের মেয়েটি?

শুধু কি মা? কোণের ঘরে দাদা, মাঝের ঘরে বাবা, জলের কলসী কাঁখে সন্ধ্যাদিদি সব্বাই ভাবতে লাগল, আহা, মেয়েটি কে গো? আর উটি কী ওর মাথায় ঝকমক কচ্চে? পদ্মফুল?

অবিশ্বাস্য

অনিল কুমার বসু



আমার বয়স তখন ১৬/১৭। পূজার ছুটিতে মামাবাড়ী এসেছি। ছোটমামা আমাকে বেশ সাহসী বলেই জানতেন। একদিন বললেন, "মামু, আমার সাথে মাছ ধরতে যাবি ?"

বললাম—"কোথায় ?"

মামা বললেন—"কাঞ্চনপাড়ার খালে, কিন্তু একটু রাত হবে।

আমি এক কথায় রাজি।

ছোট মামা বয়সে আমার চেয়ে বছর আষ্টেকের বড়। কিন্তু খুব স্বাস্থ্যবান্, লম্বাও খুব। যাকে বলে দৈত্যাকৃতি চেহারা।

কার্তিক মাসে প্রথম। বর্ষার শেষে বিলের জল সব গড়িয়ে খালে গিয়ে পড়ছে। সেই জলের সঙ্গে যত সব কই, ট্যাংরা, পুঁটি, বেলে মাছ খালের জলে কিলবিল করছে। প্রতি বছরই বর্ষার পরে এই মাছ পাওয়া যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ছিটা জালে এই সব মাছ ধরেন। ভিড়টা দিনের বেলায়ই হয় বেশী।

একটা কোষ নৌকায় আমরা উঠে পড়লাম। সঙ্গে একটি ছিটা জাল ও বেশ বড় একটি ডুলা।

পূর্ববঙ্গে এই ধরণের বড় বড় ডুলা ব্যবহার করা হয় মাছ রাখার জন্য। মামা তাঁর পকেটে বিড়ি ও দেশালাই নিতে ভোলেননি। দু-বৈঠার ডিঙি ছোটে তাড়াতাড়ি। বাড়ী থেকে মাত্র দু-মাইল দূরে খাল। আমরা যখন পেঁছিলাম তখন সন্ধ্যে সাতটা হবে। ভাঁটায় জল গড়িয়ে খাল দিয়ে নামছে। মামা কাপড়-জামা ছেড়ে, গামছা পরে জাল কঁধে নিয়ে নিয়ে খালের পাড়ে নেমে পড়লেন। বললেন, "নৌকোটা এখানেই বাঁশ পুঁতে বেঁধে রাখ।"

আমি তাই করলাম তারপর তাঁর পিছনে মাছ রাখবার জন্য ডুলাটি নিয়ে নামলাম। প্রথম জাল ফেলে টেনে তুলতেই একটি ছোট কাছিম ও কিছু পুঁটি মাছ পাওয়া গেল। মামা বললেন—প্রথমেই অযাত্রা।”

দূরে আরও দু-একজন মাছ ধরছে জ্যোৎস্না রাত্রি, খাল দিয়ে আরও নৌকা যাতায়াত করছে। আমাদের জালে কিছু কিছু মাছ উঠছে। আমি তুলে ডুলায় রাখছি। ঘণ্টা দেড়েক পর মামা জিজ্ঞাসা করলেন, “ডুলা ভর্তি হয়েছে?”

আমি বললাম, “প্রায় ভর্তি হয়ে এসেছে।”

মামা বললেন, “আর আধ ঘন্টার বেশী থাকব না।”

শীতের রাত্রি, ঠান্ডাও বাড়ছে। আশেপাশে কোনও মাছ ধরা লোক আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পিছনে জনশূন্য মাঠ। নৌকাটি আমাদের থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে বাঁধা। কিছু পরে মামা বললেন, “ডুলাটি নিয়ে নৌকায় গিয়ে ওঠ, আমি শেষ খেপটা দিয়ে আসছি।”

মামার কথামতো আমি ডুলাটি অতিকষ্টে তুলে নৌকায় রাখলাম। কিন্তু আমার মনে হল ছায়ার মত কে যেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভয় পেয়ে মামাকে ডেকে বললাম, “মামা, শিগগীর চলে এস।”

মামা বললেন, “দাঁড়া, আর দুবার জাল ফেলব, কয়েকটি ভাল পোনা মাছ পেয়েছি।”

আমি ভয় পেয়ে মামার কাছে এগিয়ে গেলাম। যেতেই মামা বললেন, “পিছনে দেখ, কয়েকটা বড় পোনা মাছ রেখেছি।”

নির্মল জ্যোৎস্না রাত্রি, এদিক ওদিক তাকিয়ে মাছ দেখতে না পেয়ে মামাকে বললাম, “কোথায় পোনা মাছ?”

মামা রাগত ভাবেই বললেন, “এই তো দশ বারোটা পোনা মাছ ঐ জায়গায় রেখেছিলাম।”

আমি বলিলাম, “নেই তো!”

এবার মামাও যেন একটু ভয় পেলেন, বললেন, চল, আর জাল ফেলে কাজ নেই।”

নৌকার সামনে এসে জাল নৌকোয় রেখে বাঁশের খুঁটিটা তুলে মামা নৌকায় চেপে বসলেন। আমি বৈঠা তুলে নৌকা ছেড়ে দিলাম। কিছুদূর চলে আসতে মামা বললেন “ডুলার মাছগুলো ঠিক আছে তো রে!” আমি ডুলার দিকে তাকিয়ে ভীত স্বরে বললাম, “তাও নেই, তবে কাছিমটা আছে।”

মামার মুখে তখন আর কোন কোন শব্দ নেই, তিনি দ্রুত বৈঠা বেয়ে চলেছেন। *

---

*অবিশ্বাস্য হলেও ঘটনাটা সত্যি।

পাখি চেনো

পৃথা বল



কোকিল, ময়না, আর দোয়েল তিন জনেই খুব ভাল গান গায়। একদিন খুব সকালে তিন পাখিতে মিলে একটা বড় গাছের ডালে বসে বসে গান গাইছিল।
অনেকক্ষণ গান গাইবার পর দোয়েল কোকিলকে গান গেয়ে গেয়ে বললো, তোমার গলাটা ভাল ঠিকই, কিন্তু তুমি শুধু কুউউ—কু-উউ কু-উ-উ এই সুরেই গান গাও। অন্য আরও একটা নতুন সুর বেছে নাও না ভাই। তখন কোকিল কোন উত্তরই দিল না।
পাশেই অন্য আর একটা গাছে বুলবুলি পাখিদুটো সব শুনছিল। অবাক হয়ে একটু হেসে তারা নিজেরা বলাবলি করলো হু হু, কোকিল গুরু। গানের গুরু, গুরুকে আবার দোয়েল গানের সুর শেখাচ্ছে।
এতক্ষণ ময়না গুরুর পাশে বসে সব শুনছিল। এক ছুটে বুলবুলিদের কাছে গিয়ে গাছের ডালে ওদের একেবারে পাশে এসে বসলো,

শুনলিতো ভাই বুলবুলি
দোয়েল পাখির বুলিগুলি
গানের গুরু কোকিলকে
দোয়েল সুর শেখাচ্ছে।

—গানটা গেয়েই ময়না আবার বুলবুলিকে বললো যা ভাই বুলবুলি। তোর মিষ্টি কথায় মিষ্টিস্বরে বারণ করে দিয়ে আয় না! কোকিল গুরুকে আর যেন এমন কথা না বলে।
বুলবুলি বলে, তুমি ভাই চলে এলে কেন? কোকিল গুরু তো তোমারই গুরু! তুমি তো কোকিল গুরুর কাছ থেকেই গান শিখেছো, তোমার গান শুনলে সকলের প্রাণ জুড়ায়। তুমিই যাও দোয়েলকে বারণ করে ধমক দিয়ে এস। গুরুকে কেন এমন কথা সে বলে?
ওদিকে গাছের নিচে চড়াই আর ফিঙে খুব ঝগড়া করছিল। তাই দেখে কাকগুলোও কা কা করছিল।
কিন্তু কোন পাখিই কোনও পাখির কথা শুনলো না। কোকিলও গেয়ে চলেছে তার

নিজের সুরে। ঝগড়াটে পাখি চড়াইও ঝগড়া করছে কিচি—মিচি কিচি—মিচি করে। কাউকেই বারন করে ফল হবে না, একথা তো সকলেই জানে।
একটু পরে দোয়েল দেখলো, ময়ূর ভাইও পেখম তুলে নাচছে, কোকিলের গানের সঙ্গে সঙ্গে। কী সুন্দর ময়ূরের নাচ! সকলেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে!
কিন্তু দোয়েল আবার ফোড়ন কাটলো।—এ কি ময়ূর ভাই তুমি নাচছো? নাচবে তো ময়ূরী। ময়ূরী তো মেয়ে।
সকলেই জানে ময়ূর ময়ূরী দুজনেই নাচে। তবে ময়ূরের বিরাট পেখম আছে। পেখম তুলে যখন ময়ূর নাচে তখন ওর চেয়ে আর কাউকেই অত সুন্দর দেখায় না।
সকলেই রেগে গেল দোয়েলের কথায়, বলে ময়ূরের এত ভাল নাচও তোমার পছন্দ হয় না। সবেতেই পাকামো দোয়েলের। যার যা কাজ সকলেই ঠিকমত করছে। কেবল তুমিই করছো না। তুমি গায়ক পাখি, গান গাইছিলে, গান গাও গিয়ে, যাও। কে কি করছে অতসব তোমাকে দেখতে হবে না।
এতসব কথা বলে সকলে খুব করে ধমক দিল দোয়েলকে। ময়না বলে, সকলকে ডেকে সকলের সামনে আচ্ছা শিক্ষা দাও দোয়েলকে। সব পাখিদের ডাকো। ঐ যে, পুকুরপাড়ে মাছরাঙা পাখিরা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদেরও ডাকো। এতক্ষণ পরে কোকিল-গুরু উপর থেকে বললো, 'যে যার কাজ করো'। ছেলেপাখি মাছরাঙা ভোর হতেই মাছ ধরতে গিয়েছে। ওদের কাজের ব্যাঘাত করো না।
ওদিকে ভোরবেলা উঠেই খড়কুটো মুখে করে ব্যস্ত বাবুই আর টুনটুনি পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। গোলমাল শুনেই দেখলো সব পাখিদের ভিড় এখানে। সকলেই এখানে উপস্থিত ব্যাপার কী! বুলবুলি সেপাই পাখি। তাই বললো, তখন থেকে দেখছিলাম ভাই। ব্যাপার কিছুই না। সামান্য ঝগড়া। বাবুই তুমি এখানে দাঁড়িয়ে একটুও সময় নষ্ট করো না। তুমি তাঁতী পাখি তোমার সময়ের অনেক দাম, তোমার কাজ অনেক সুন্দর। শিগ্‌গীর তুমি তোমার বাসা তৈরী করো গিয়ে যাও।
ওদিকে ময়না গান গাইতে গাইতে টুনটুনিদের বললো,

দর্জিপাখি, দর্জিপাখি, কাজের সময় দিচ্ছ ফাঁকি?
এখনও কাজ অনেক বাকি।

টুনটুনিরা চলে গেল।
এবারে বেলা বেড়েছে। সকালের ময়লা সাফ করতে ঝাড়ুদারেরা এসে দেখে, এখানে এত ভিড় কেন? নিশ্চয়ই খাবার টাবার পড়ে রয়েছে। সবাই মিলে কা-কা-কা-কা করে সব পাখিদের সরিয়ে দিল ঝাড়ুদার কাকপাখির দল। যে যার গলায় ডাক ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল। তবে চিল শকুন ও সব ঝাড়ুদার পাখিরা তখন অনুপস্থিত ছিল। সব শেষে কোকিল গাছের খুব উপর থেকে কুউউ কুউউ করে ডেকে বললো, দেখলে তো? যার যা কাজ তাকে তাই করতে হবে, যার যা ডাক তাকে তেমনই ডাকতে হবে। আমি কেন একই সুরে ডাকি জানো না? আমি যে কোকিল।

"মৌ-সোনা"

শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায়

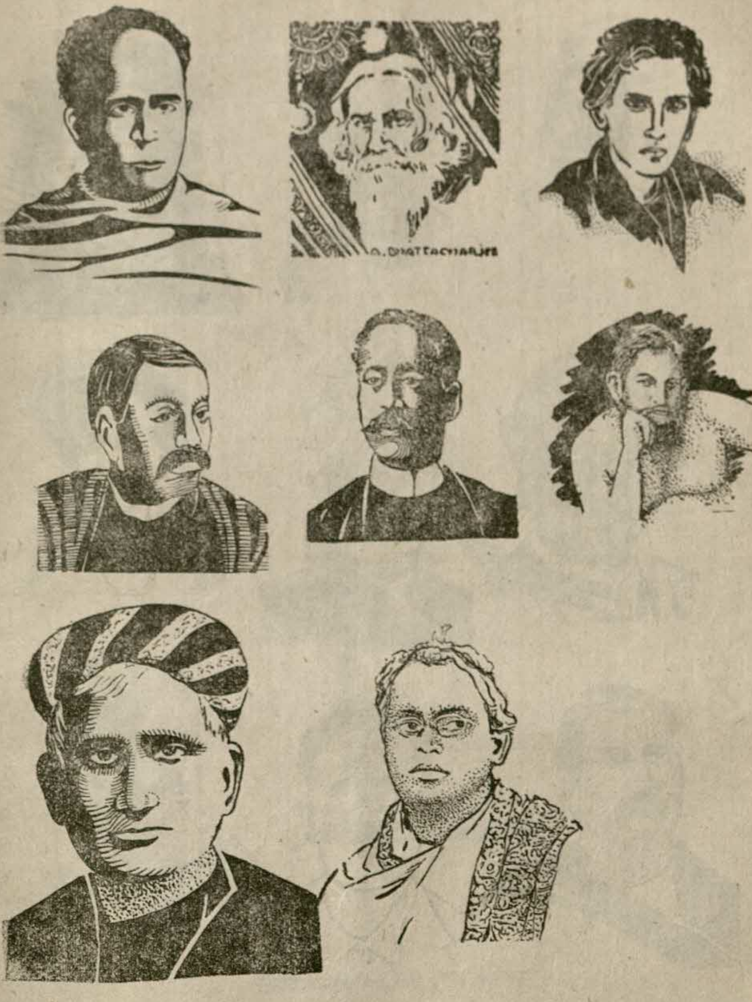
জংলা ছাপা শাড়ী পরে মৌ-সোনা ঐ যায়,
পূজোর বাদ্যি বেজে ওঠে এ পাড়ায় ও পাড়ায়।
পাশের বাড়ীর ডাকছে বৌ,
হেলতে দুলতে যাচ্ছে মৌ,
ঝুম্ ঝুমা ঝুম্ মলটা বাজে কচি কচি পায়।
মাথায় দুটো বেণী দোলে,
সোনার হারটি গলায় ঝোলে,
ঠাকুর দেখতে যাচ্ছে মৌ পাশের পাড়াটায়।
চলছে মৌ সোজাসুজি,
ভাবছে সবাই পুতুল বুঝি,
মৌ-কে তোরা দেখবি যদি চুপি সারে আয়।



লিমেরিক

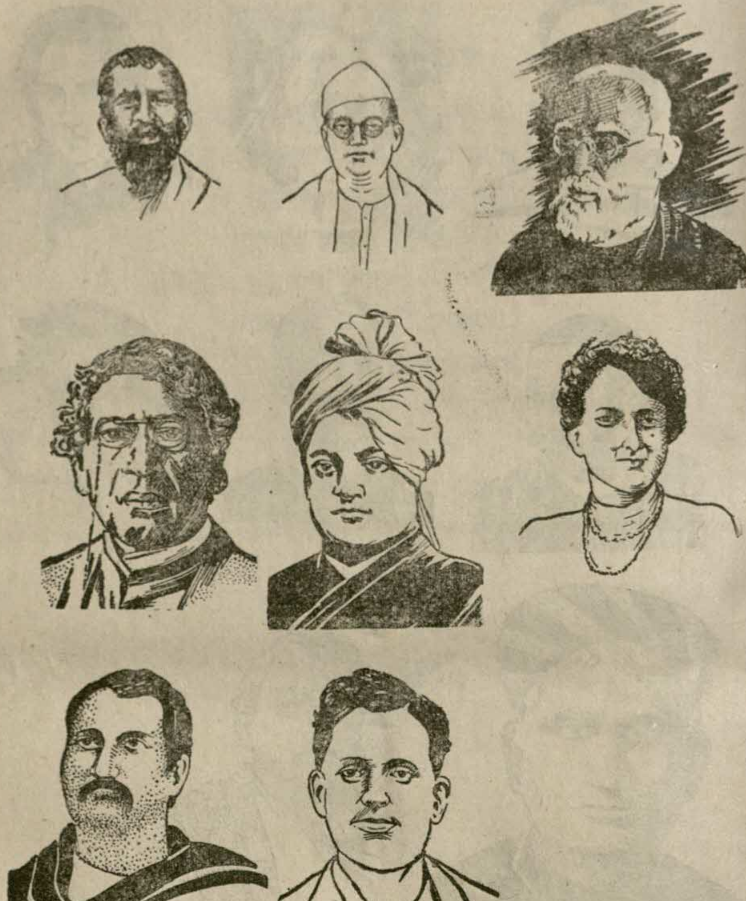
হান্নান আহসান

খাগড়ার খেদারাম ভেদারাম জানা
ফিটফাটে দিন যায় সাফ বাবুয়ানা।
বেলবট্ প্যান্ট চাই
আর চাই নেকটাই।
চুল ছাঁটে উড়ে গিয়ে একদম ঘানা।



উত্তর পাবে বই-এর শেষ পাতায়

স্মরণীয়দের চেন



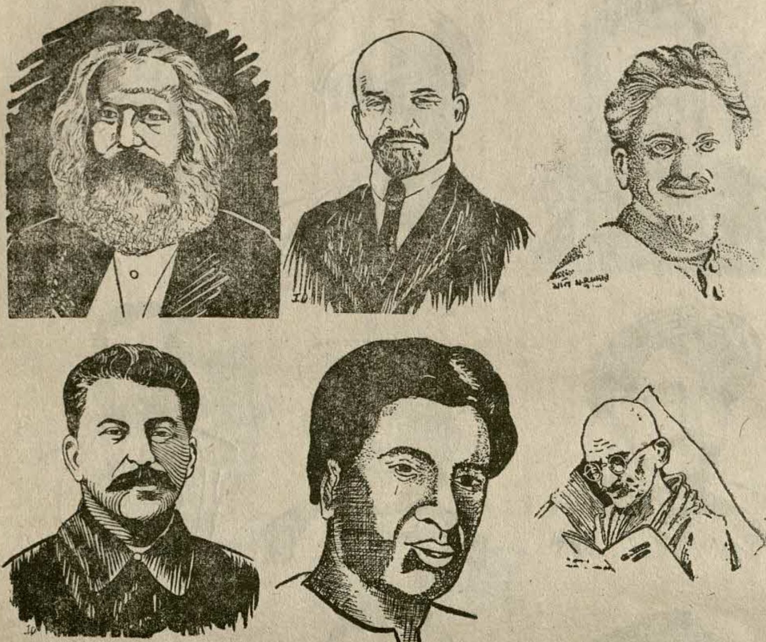
উত্তর পাবে বই-এর শেষ পাতায়

স্মরণীয়দের চেন



উত্তর পাবে বই-এর শেষ পাতায়

স্মরণীয়দের চেন



উত্তর বই-এর শেষ পাতায়

স্মরণীয়দের চেন

গুরু নানক



ইন্দিরা দেবী

পনেরো শতকের মাঝামাঝি। দিল্লীর বাদশাহী তখত্ তখন সুলতান বহলুল মোদীর দখলে। সুলতানীর গৌরব সূর্য তখন সে সময় অস্তমিত। এক কালের সেই বিশাল সাম্রাজ্য তখন ভাঙ্গনের মুখে। ভাঙ্গনের এই গতিরোধ করা বহলুল মোদী কিম্বা তার পরবর্তী বংশধরদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সে সব কথা থাক। আমরা তাঁর রাজত্বকালে একটি আশ্চর্য ঘটনার কথা বলছি।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক। বহলুলের রাজ্যলাভ ১৪৫১ খৃঃ। নানকের জন্ম তার ১৮ বছর পর ১৪৬৯ সালে। ধনী না হলেও মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে নানক। পরিবারের ভরণ-পোষণ চলতো কৃষি আর ছোটখাটো ব্যবসায়ের আয় থেকে। সামান্য লেখাপড়া শিখে নানক পৈতৃক ব্যবসায়ে যোগ দেবেন—এই ছিল বাবা কালু বেদীর একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই নানকের লেখাপড়া বিষয়ে এতটুকু ঝোঁক ছিল না। সামনে বই খোলা থাকতো, নানক অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখতেন খোলা আকাশ, মেঘের আনাগোনা, কিম্বা গ্রামের প্রান্তে যেখানে শুরু হয়েছে গভীর জঙ্গল সেইদিকে। গাছপালা বিচিত্র ফলমূল আর বিচিত্রতর পাখীর ঝাঁকএর দিকে। দেখতে দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো—বালকের কোন হুঁস থাকতো না। শেষ পর্যন্ত অনেক বকাবকি আর মারধোরের ভয় দেখানোর পর নানকের হাতে কিছু নগদ টাকাকড়ি দিয়ে ব্যবসা শুরু করার জন্য শহর অঞ্চলে কেনাকাটার জন্য পাঠানো হলো। কিন্তু টাকা হাতে পেয়ে গঞ্জে যাবার পথে সব তিনি বিলিয়ে দিলেন সর্বত্যাগী সাধু-সন্যাসীদের দান করে। সুতরাং ব্যবসায়ের রুজি রোজগারের থেকে সংসারের কিছু আয় হবে—বাবার এই আশা অপূর্ণই থেকে গেল।

মা বাবা দু'জনেই ভাবলেন ছেলের বিয়ে দিলে সংসারের প্রতি অনাসক্তি চলে যাবে। সুলক্ষণা পাত্রীর সঙ্গে যথাসময়ে নানকের বিয়ে হলো। কিন্তু অবস্থা একটুও বদলালো না। তিনি আগের মতই ঈশ্বর প্রেমে বিভোর। সংসারের প্রতি কোনো মোহই নেই তাঁর। শেষ পর্যন্ত সংসারের ছোট গণ্ডি ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন বৃহত্তর জগতের সাড়া পেয়ে। তাঁর সমস্ত চিন্তা জগৎ আচ্ছন্ন করে ছিল একদিকে ঈশ্বর অপরদিকে

মানুষ। দেশে তখন ঘোর অরাজকতা, মানুষে মানুষে প্রভেদের দেয়াল, ধর্মের নামে অধর্ম, পরস্পরের প্রতি হিংসা দ্বেষ, দুর্বলের প্রতি প্রবলের সদম্ভ অত্যাচার।
দুর্গম পথের যাত্রী নানক—অনির্দেশ্য তাঁর যাত্রা। সঙ্গে বিশ্বস্ত সঙ্গী ও অনুচর মর্দানা, ধর্মে মুসলমান কিন্তু নানকের একান্ত অনুগত। তার হাতে রবাব। মর্দানা গান ভালবাসতো। তার মধুর কণ্ঠ থেকে বার হয়ে আসা গান যে শুনতো, সব কাজ ভুলে সে তন্ময় হয়ে যেতো সেই প্রাণ মাতানো গানে। শুধুই কি সুর? গানের কথাগুলোও সমান প্রাণস্পর্শী। কথার রচয়িতা নানক স্বয়ং—কথা ও সুরের মণিকাঞ্চন যোগ।

সভ মহি জ্যোতি, জ্যোতি হৈ সোই
তিস দৈ চানভিসভ মহি চানন হোই
গুরুসাথী জ্যোতি পরগটু হোই।
জো তিসু ভাবৈ সু আরতি হোই।

অর্থাৎ সকল বস্তুর মধ্যেই ছড়িয়ে রয়েছে জ্যোতি। সে জ্যোতি, হে প্রভু, তোমারই প্রকাশ। তোমার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারকা। গুরু সাক্ষী তাঁর চরণতলে বসে অন্তরে ঘটেছে সেই জ্যোতির প্রকাশ, হে প্রভু, আমি বুঝেছি যা তোমার প্রীতি সম্পাদন করে তাই তোমার শ্রেষ্ঠ আরতি!
যখন যেখানে যান নানক, সেখানেই গড়ে ওঠে ভক্তের দল। কিন্তু কোনো এক জায়গায় এক নাগাড়ে বেশী দিন থাকতে রাজী নন তিনি। তাই প্রায় অবিরাম তাঁর পদযাত্রা। ক্রমাগত ঘুরতে ঘুরতে তারপর নানক এলেন সনদৈপুর শহরে। সেখানকার ধনী রইসরা তাঁকে অতিথি হিসাবে পাবার জন্য আগ্রহী। কিন্তু নানক বেছে নিলেন এক দরিদ্র ছুতোর মিস্ত্রির বাড়ী। মিস্ত্রির নাম লালু। শহরের বাইরে এক প্রান্তে তার ছোট কুঁড়ে। খবর পেয়ে দলে দলে বহু লোক নানকের দর্শনের জন্য আসতে লাগলো। তাদের আনা-গোনায় মুখরিত হয়ে উঠলো লালুর কুটির আর তার আশপাশ।
…শহরে বাস করতেন সুবেদারের ঘেওয়ান মালিক ভগো। তার অসাধারণ প্রতাপ, তিনিই যেন ক্ষুদে সুবেদার। এ হেন ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ না করে নানক লালু মিস্ত্রির মত এক দারিদ্রের বাড়ীতে অবস্থান করছেন জেনে মালিক ভগো রাগে অভিমানে ফেটে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী পাঠিয়ে তিনি দরবারে তলব করলেন লালু আর তার অতিথিকে। ভগো নানকের কাছে জানতে চাইলেন-সব বড় বড় সাধু সন্ন্যাসী ফকির যারা, তাঁরা এই শহরে আসেন, তাঁরা সকলেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তাঁদের যথাযোগ্য সেবার পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা করে রেখেছি, রেখেছি বহু অর্থ ব্যয়ে। কিন্তু আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ না করে এই নগণ্য মিস্ত্রির বাড়ীটি বেছে নিলেন কেন? এতে কি আমাকে অপমান করা হলো না? নানক তৎক্ষণাৎ প্রশ্নটির জবাব না দিয়ে মিষ্টি হাসি

হাসলেন। তাতে ভগোর রাগ আরো বেড়ে গেল। তিনি গলা চড়িয়ে বললেনঃ কথার জবাব দিন, জবাব না দিলে এখান থেকে আপনাকে যেতে দেওয়া হবে না। দেখছি আমায় চিনতে পারেননি এখনও।

এবার নানক জবাব দিলেনঃ চিনি বলেই তো আপনার আতিথ্য গ্রহণ না করে এই দীন দরিদ্র লাল্বর বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছি। ঐ লাল্বই আসল ঐশ্বর্যের মালিক, আপনি নন।

ভগো এবার আরো রেগে গেলেন। তাঁর ম্বখ থেকে কথা সরছিল না।

নানক বললেনঃ দেওয়ান সাহেব, আমি আপনাকে ব্বঝিয়ে বলছি, আপনার অতিথি-শালা থেকে কিছ্ব খাদ্য এখানে আনার ব্যবস্থা কর্বন।

তারপর লাল্বর দিকে তাকিয়ে বললেনঃ ভাই লাল্ব, আমার জন্য আজ এবেলা যা খাবার প্রস্তুত আছে বাড়ী গিয়ে সেই খাবার এখানে নিয়ে এসো।

কিছ্বক্ষণের মধ্যেই দ্ব' রকমের খাবার হাজির। মালিক ভগোর রন্ধনশালা থেকে এলো মালপোয়া, প্বরী, মিষ্টান্ন। লাল্বর বাড়ী থেকে এলো দ্ব' টুকরো আধপোড়া শ্বকনো র্বটি আর যৎসামান্য সবজি। ভগোর বাড়ীর খাবারের তুলনায় নেহাৎই বেমানান।

নানক প্রথমেই তুলে নিলেন ভগোর বাড়ীর পাত্র থেকে খাবারের কিছ্ব অংশ। হাতে নিয়ে সেগ্বলো তিনি নিঙরাতে শ্বর্ব করলেন। কি আশ্চর্য। সেই নিঙরানো খাবার থেকে ঝরে পড়তে লাগলো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত। তারপর লাল্বর বাড়ীর র্বটী হাতে নিয়ে নিঙরাতে শ্বর্ব করলেন। কী আশ্চর্য! যেই নিঙরানো শ্বর্ব করলেন তা থেকে বেরিয়ে এলো দ্বধের ধারা।

যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক। ভগো সঙ্গে সঙ্গে সাধ্বর পা জড়িয়ে ধরে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করলেন। নানক তাকে সান্ত্বনা দিয়ে লাল্বকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন সাময়িক আস্তানায়।

গরীবের রক্ত শোষণ করে ধনীদের ধন, ধনী লোকের দম্ভ অন্তঃসারশ্বন্য—সেদিন নানক তাই ব্বঝিয়ে দিলেন এই ঘটনার মাধ্যমে। অন্তরের উদারতা আর চরিত্রের বিশ্বদ্ধতাই মান্বষের আসল ঐশ্চর্য।

এই ছিল নানকের বাণী।

মোটা-মুটি

লক্ষ্মণ কুমার বিশ্বাস

টালিগঞ্জের মোটা আর টালাপার্কের মুটি
বিয়ে হল দুটির।
সেই থেকে দুই মোটা-মুটি
ভালই ছিল মোটামুটি
খেয়ে-পরে জীবন কাটায়—মোটা-মুটির জুটি।
ভোজন রসিক মোটা এবং ভোজন রসিক মুটি
রুই কাত্‌লা মোটার প্রিয়, মুটির মটর শুঁটি—
মোটা এবং মুটি—
দিনের বেলায় ভাত খেত আর
রাতের বেলায় রুটি।
সেবার পূজোর আগে—
বললো মুটি মোটাকে তার বড়ই ভালো লাগে
কোথাও নিয়ে যেতে যদি
দেখতে পেতাম পাহাড় নদী
সংসারের এই ঘানি থেকে দুদিন পেতাম ছুটি।
বলেই মুটি ভীষণ খুশি হেসেই লুটোপুটি।
মোটার ছিল অঢেল টাকা, হাতেও অঢেল ছুটি।
বললো—'তা বেশ : চলো না-হয় মাইশোর বা উটি ;
রেল চলেছে গম্‌-গমা গম্‌
মুটির পায়ে মল ঝমা-ঝম্‌—
ঘুরল এ দেশ ঘুরল ও দেশ, অশ্বযানে উঠি ;
মোটা এবং মুটি।
কোথায় যেন ছিল পাথর মস্ত বড়
খাড়াই পথে ভয়েই মুটি জড়-সড়ো
হঠাৎ মুটি ছিট্‌কে পড়ে দাঁতপাটি ছিরকুটি।
বেড়ানর সখ মিটলো মুটির—
ফিরলো মোটা-মুটি।
সেই থেকে রোজ মোটার সাথে মুটি
পানের সাথে চুণ ঘসলেই বাধাতো খুন স্থুটি।
অবশেষে ভেঙে গেল মোটামুটির জুটি—
মোটা গেল টালিগঞ্জে—
টালাপার্কে মুটি।

একদিন যুগান্তরে

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়



পাহাড়ের বুকে, বুক ঘষে ঘষে, আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। সবাই নীরব। চারিদিকে মাঠ, তার মাঝ দিয়ে মাটির বুক ফুঁড়ে কখনো উঠে পড়েছে পাহাড়। টিলা। গাড়ির স্পীড একটু একটু করে কমে আসছে। বুকের ভেতরটা ধুকপুক করছে। উপরে উঠছি, উঠছি, উঠছি—কত, কত উপরে। ১000 ফুট ২000 ফুট আরও, গাড়ি এবার বেঁক নিল। ৩৮00' সরু পীচঢালা রাস্তা, সাদা রঙ দিয়ে পথ নির্দেশ আঁকা। কত নীচে পৃথিবী,—যে রাস্তা দিয়ে বাসটা এসেছে, মনে হচ্ছে সেটা পেছনে পড়ে আছে এক মৃত অজগরের মত।

ধীরে, অতি ধীরে গাড়িটা এগোচ্ছে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক কালো পাথরে গড়া দরজাটা। বড় বড় চৌকো চৌকো কালো পাথরে গড়া। কত আগেকার এ দরওয়াজা। কত যুগের বোবা সাক্ষ্য ওরা। ওদের মধ্যে যেন এক অশরীরী ভাব। একটু একটু করে কালো দরওয়াজার গহ্বরে আমরা ঢুকে যাচ্ছি—যাচ্ছি—যাচ্ছি। ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম। কানে এসে বাজল এক প্রচণ্ড জন কোলাহল। একসঙ্গে এগিয়ে আসছে অনেক অনেক সৈন্যদল, তালে তালে পা ফেলে, পালে পালে। পাহাড়ের বুকে বুকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাদের ভারী পায়ের শব্দ। তার সঙ্গে আসছে বাদ্যকারের দল। প্রত্যেকটি পাথর যেন কেঁপে উঠছে। ওরা আসছে, ওরা আসছে—একে একে, দুয়ে দুয়ে, ওরা আসছে দৃপ্ত পদক্ষেপে। গুম্ গুম্ গুম্ প্রচণ্ড কামানের শব্দ। চিৎকার করতে গেলাম, গলার স্বর আটকে গেল। ঠিক এই সময় গাড়িটা ব্রেক কষে ঘোৎ করে থেমে গেল। একটা দোলুনি। চোখ খুলতে দেখি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে এক প্রকাণ্ড চত্বরে।

একে একে নেমে এলাম গাড়ি থেকে। সুন্দর বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছাদিত পথ। সুন্দর ঝক-ঝকে সাজানো চারদিক। নানা জাতের গাছ।—"সাহাব" চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালাম। চোখে পড়ল এক বিচিত্র মানুষ। মানুষ কি! লম্বা দশাশই চেহারা। বেশ ফরসা এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গায়ে এক অদ্ভুত পোশাক। অনেকটা জোব্বা জাতীয়, ওতে আবার চুমকির কাজ। অনেকটা মিউজিয়ামে রাখা রাজা মহা-

রাজাদের পোষাকের মত। চোখের পানে তাকালাম—থমকে গেলান—উঃ কি বরফ শীতল চোখ।
চোখ মেলে চারদিকটা দেখলাম—এ একটা আস্ত পাহাড়—তার উপরেই আমরা উঠে এসেছি অনেক পাহাড়, পাহাড়ে পথ পার হয়ে।
—গাইড লাগবে সাহাব ?
উঃ তাহলে এ পার্থিব ব্যক্তি। তবুও ওর গলা শুনে মনে হল ও যেন কথা বলছে গুহাভ্যন্তর থেকে। দূরাগত সেই ধ্বনি। আমি কিছু বলার আগেই সে আমার ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে চলল। সামনের দিকে। কোনও কথা বলল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত আমি চললাম ওর পিছু পিছু।
সামনেই পড়ল এক বিশাল মন্দির, পাথরে গড়া দ্বার পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম, চারিদিকে পাথরে গড়া দেওয়াল। ঠাণ্ডা পাথরের মেঝে। সামনের দ্বার পার হয়ে ভেতরে দেবী মূর্তি। আস্তে আস্তে ভেতরে ঢুকলাম। অন্ধকার, উঃ কি নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোলের ছেলেও যেন দেখা যায় না, শুধু দূরে, সামনে জ্বলছে এক উজ্বল আলো, শিখা জ্বল জ্বল করে। দেওয়াল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছি। সমস্ত স্থানটা জুড়ে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ভাব। হাতে লাগছে ঠাণ্ডা দেওয়াল, ভেতরে জ্বলছে ছোট্ট প্রদীপ—আর দেবীর কপালের ঐ হীরক খণ্ড।—"সাহাব"—গম্ভীর কণ্ঠ জানিয়ে দিল তার অস্তিত্ব।
পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ একটা ঝোড়ে হাওয়া যেন আমার কানের পাশ দিয়ে চলে গেল। যেন বলে গেল—দূর হ, দূর হ—হঠ যা হঠ যা! ভয়ে ছুটে বার হয়ে এলাম!—"সাহাব" ওঃ সেই ভারী অস্তিত্ব।
দূরে শহর, যেন পটে আঁকা ছবি। ডানদিকে একটি বড় পাহাড়, পাহাড়ের সামনেই একটি ছোটখাট গুহা। এগিয়ে গেলাম পায়ে পায়ে, গুহার দিকে। সামনের একটা পাথরের আসন, ছোট্ট জানালা।—এ ধর্মের স্থান, মহাত্মা শনক মুনির আসন।" গম্ভীর গলা, যেন মনে করিয়ে দিল আমি এরকম স্থানে অপাংক্তেয়, আবার বার হয়ে এলাম অভিভুতের মত। (১)
ঘুরতে ঘুরতে যে জায়গাটায় এসে দাঁড়ালাম সেখানে চারদিকে ঘেরা বাগান—পাশ দিয়ে নেমে গেছে কতগুলি সিঁড়ি নিচের দিকে। গুনতে পারলাম না যে কত দেওয়ালে লেখা টিপুর গুপ্ত সিঁড়ি। সামনে দোতলা বাড়ি তার গায়ে লেখা—টিপুর গ্রীষ্মাবাস। হাতে একটা হাত ঠেকল। চোখ ফিরিয়ে দেখি সেই গাইড। চোখে তেমনি স্থির দৃষ্টি। দেহ তেমনি স্থির। নিথর। কণ্ঠ তেমনি নীরব। হাতটা তুলল, হাত

(১) জায়গাটার নাম নন্দীগ্রাম ছিল। বাঙ্গালোর থেকে ৭৫ মাইল। সারা মহীশুর জুড়েই টিপুর স্মৃতি। সেদিন ওঁর স্মৃতিমাখা মহীশুরে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি শহীদদের প্রতি। আমিও, আমিও তাই সমান পাপী। গল্পটি এরই ফলশ্রুতি।

বাড়িয়ে দিল, ধরল আমার হাতটা উঃ কি ভীষণ ঠাণ্ডা, মনে হলো যেন হঠাৎ একটা ভীষণ বিস্ফোরণে আকাশ বাতাস সব কেঁপে উঠল।
দু হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম। কোথায় যেন চলেছি, কোথায় কত দূরে—এ আমি যেন সে আমি নই, অন্য কেউ—কে আমি—এই আমি! চলে গেছি অন্য যুগে। (২)

* * *

দূরে ইংরাজ শিবির থেকে ভেসে আসছে উগ্র চিৎকার। হিপ হিপ হুররে। সঙ্গে বিলাতী ব্যাণ্ডের আওয়াজ—রুল ব্রিটানিয়া রুলস দি ওয়েভস—হিপ হিপ হুররে।
সাজান রাজসভা। সিংহাসনে বসে সুলতান টিপু, এক পাশে দেওয়ান, আদেশের অপেক্ষায়। এপাশে, ও পাশে শান্ত্রী।—"দেওয়ান সাহেব।"
—হুজরত।
বাপজানের ইন্তেকাল হওয়ায়, ফিরিঙ্গিরা ভাবছে লড়াই শেষ, মহীশূর সিংহ পরাস্ত, পরাভূত। না, তা হবে না। লড়াই আবার হবে।
—কিন্তু হুজরত, মাঙ্গালোরে আমরা সন্ধি করেছি।
আমরা করি নি ফিরিঙ্গীরা করেছে ইউরোপের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে। অবশ্য এতে আমাদের কারোই তেমন লাভ বা ক্ষতি হয়নি, সে কথা নয়। ওদের আমি দোস্ত ভাবতে পারি নি, পারব না। দেখা যাক এ যুদ্ধের ফল কি।
—কিন্তু হুজরত, পেশোয়া, নিজাম, ওরা তো ইংরেজ পক্ষে, এ ভাবে যুদ্ধ করা কি ঠিক হবে।
—হবে, হবে—সুলতান টিপু মাথা নীচু করেনি, করবে না।
দরবার শেষ হলে, দেওয়ান সেদিন বাড়ি ফিরল শেষ রাত্রেই। অত্যন্ত ধীরে সন্তর্পণে। একবার এগোয় আবার দেখে পেছন ফিরে কেউ আসছে কিনা। বড় চতুর টিপু। হা—হা—হা।
পা টিপে টিপে চলেছে দেওয়ান, আঁধার ঘন ঘুট ঘুটে। বুক কাঁপছে। ওই বুঝি কেউ দেখে ফেলল। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে দাঁড়ায়।
পুরনো ভাঙা বাড়ি! এখানে ওখানে বালি খসে পড়েছে। আস্তে আস্তে সিঁড়ি পার হতে লাগল। চেনা পথ, তবুও অন্ধকারে পা বেধে যাচ্ছে।—"বাপজান।" থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে দেওয়ান—কে! কোন?"
—সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে বড় ছেলে ইমাম। ঘন আঁধারেও ওর দুটো চোখ জ্বলছে, জ্বল জ্বল করে।
—কি করছ বাপজান।
—কি—কি করেছি, কি করছি।
—অনেকক্ষণ ধরে ওরা বসে—

(২) স্থান ঘটনা ও গাইড চরিত্র-পোষাক সত্য। নামবার সময় ওই আমাদের পথ দেখিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসে।

—ওরা, ওরা মানে কে—কে—

—নিজাম আর পেশোয়ার লোক।

মাথাটা নীচু করে দেওয়ান জামার খুঁটটা খুটতে থাকে। পাশ কাটিয়ে সরে যেতে চেষ্টা করে।—"বাপজান—" দৃঢ় পেশীবদ্ধ হাত দুটো দিয়ে সিঁড়ির মুখটা আটকে দাঁড়ায় ইমাম।

—উপায় নেই, অনেকটা এগিয়ে এসেছি। আর পেছোতে পারব না। কি জবাব দেব ওদের যে জবান দিয়েছি।

—খোদার দরবার থেকে যখন এত্তেলা আসবে তখন কি জবাব দেবে বাপজান?

কোন উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল দেওয়ান দেওয়াল ঘরে। ওপরে তিনজনকে দেখা যাচ্ছে। বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছে গলার শব্দ।

ভোরের আর দেরী নেই খুব বেশি। ঘণ্টা দুই তিন পরেই শোনা যাবে আজান ধ্বনি। তার আগেই ওদের ফিরতে হবে, নইলে বিপদে পড়ে যাবে ওরা।

সেদিনও ধরা পড়ে গেল দেওয়ান ইমামের কাছে। রাতের অন্ধকারেই ফিরছিল পিছনের দরজা দিয়ে সমস্ত আলোগুলো নেভানো। কি অন্ধকার। তবুও চলেছে, বিড়ালদের দৃষ্টি চোখে নিয়ে—বাপজান—। থমকে দাঁড়াল দেওয়ান ভীতগলায় উত্তর দিল— "এ যুদ্ধ। আমি কি করব।"

—এ যুদ্ধ নয় বাপজান, এ বেইমানি।

—খবরদার ইমাম।

গর্জে উঠল দেওয়ান। 'আমার উপর খবরদারি আমি বরদাস্ত করব না যাও।'

মাথা নীচু করে ইমাম সরে গেল।

* * *

পতনের এ কি পূর্বাভাষ! হায়দারের স্বপ্ন কি শেষ হয়ে যাবে? না—না। আর একবার দেখতে হবে দেখা করে। খবর পাঠানো হল মুন্সিকে। তারপর ডাকলেন টিপু তার নিজের দূতকে।

সবার অলক্ষে রাতের অন্ধকারে খত নিয়ে দূত দ্রুত চলে গেল। লক্ষ্য ফরাসী শিবির।

শেষ চেষ্টা। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। সব দেখল, শুনল দেওয়ান। তারও শেষ চেষ্টা।

দূত চলে গেছে। সারা পৃথিবী সেদিন ঘুমিয়ে পড়েছিল। জেগেছিল শুধু দরিয়া দৌলতাবাগের ঘরটি। জেগে আছেন টিপু। আর একজন···সে, দেওয়ান। ঠায় দাঁড়িয়ে। লক্ষ্য—কোথায় কোনদিকে যায় সওয়ার দুজন।

রাতের অন্ধকারে ছুটে চলেছে একটা কালো ঘোড়ার পিঠে এক সাওয়ার। পরনে তার পোষাক খুব লক্ষ্য না করলে বোঝা যায় না। সে ছুঠে চলেছে-দূরে

ইংরাজ শিবিরে। সুলতানের পাঠানো ছকের নকল তার হাতে। অনেক ধন—অনেক। চলেছে দেওয়ান
ইংরাজের কুট রাজনৈতিক বুদ্ধির কাছে হেরে গেল টিপু। তবু জীবন দিয়ে চেষ্টা করল হায়দারের স্বপ্ন রক্ষা করতে হলনা—পারল না। ছিন্ন শির তার পড়ে রইল—মাটিতে। সফল হল না হায়দারের স্বপ্ন।

—বাপজান।

—কে?—

—বেইমানি করে সুলতানকে হারালে। ফিরিঙ্গী জিতে গেল।—বিফল হল হায়দারের স্বপ্ন!

—না, আমি বেইমানি করিনি, এ, যুদ্ধ। হ্যাঁ, এ যুদ্ধ।

না, এ বেইমানি।—ইতিহাস তোমাদের ক্ষমা করবে না বাপজান। সুলতান হবে শহীদ—তোমরা হয়ে থাকবে বেইমান—বিশ্বাসঘাতক—যুগ যুগ ধরে। শহীদের প্রতি করলে বেইমানি।

* * *

চমকে উঠল নন্দী হিলের উপর দাঁড়িয়ে কে যেন বলল—"তোমরা বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতকতা করেছ শাহীদদের সঙ্গে—"। কথা কে বলল।—"সাহাব" কে! ও তুমি! সেই গাইড। সামনে দাঁড়িয়ে। এ কে! গাইড-না-সেই স্বপ্নে দেখা ইমাম!

—"সাহাব, চারটে বেজে গেছে। বাস চলে গেছে।"

"—আঁ তবে যাব কি করে।"

"—ভয় নেই, টিপুস ড্রপের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা আছে।"

একমুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ছোঁড়া ময়লা জোব্বা পরণে। লোকটি এগিয়ে চলেছে।

সারা দেহ মন কেমন যেন এক আচ্ছন্ন ভাব। তবুও চলেছি, সামনের ঐ লোকটি—মানুষ! ১০০, ২০০, ৩০০-সিঁড়ির পর সিঁড়ি পার হয়ে নেমে আসছি। এক একবার বসতে চেষ্টা করছি, একটা ঠাণ্ডা হাত আমায় টেনে তুলেছে, ৫০০, ৬০০, ৭০০ শেষে ১০০০, ১৫০০—"না, আর পারি না নামতে। আমায় একটু বসতে দাও।—

—দেরি হলে চিকবালপুরমের বাস চলে যাবে।

ওঃ। এ কি আমার পাপের শাস্তি! এখনও কি শেষ হয় নি। কিন্তু কে শোনে! ও স্থির পায়ে নেমে চলেছে—কি নাম তোমার, ইমাম? দাড়াও।" চিৎকার করি ও দাঁড়ায় না। ২০০০ সিঁড়ি হয়ে গেল আর কত—কত দূরে পৃথিবী। ও কি একটুও থামবে না! পা যে চলছে না, ভারী হয়ে আসছে।

নীচে দু ধারে গভীর খাদ। রাতের ছায়া এগিয়ে আসছে, পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। ও নামছে—নামছে—নামছে—তবুও নামছে।

—ইমাম, একটু দাঁড়াও আমি আর পারছি না—
—সাহাব এসে গেছি।—
২৫০০ সিঁড়ি শেষ, বসে পড়ি পথের ধুলোয়, চোখ বুজে আসে।—
চোখ খুললে দেখি—সামনে আমার ব্যাগ, গাইড নেই।
পয়সা না নিয়ে ও চলে গেল!



আনন্দ

দীপ্তি দাশগুপ্ত

শরতের ভোর
শিশির শিশিরে
লিখে যায় যার কথা,
বনে বনান্তে
পাখিদের গানে
শোনা যায় যে বারতা,
পদ্ম কলিরা
যার কথা বলে
পদ্ম দীঘির জলে,
সাদা মেঘগুলি
যে কথাটি নিয়ে
নীলাকাশে ভেসে চলে,
সে তো 'আনন্দ',
শুধু আনন্দ,
প্রিয় আনন্দ, জানি ;
শরৎ-আলোয়
দেখা যাবে যার
দীপ্ত আননখানি।



জয়ন্তীয়াদের দেশে

মুক্তিপদ চৌধুরী

খাসি, জয়ন্তীয়া ও গারো। মিষ্টি নামের তিনটি পাহাড়।

পুরণো আসামের এই তিনটি পাহাড় নিয়ে নতুন রাজ্য মেঘালয়। এখন অবশ্য আর নতুন নেই। দেখতে দেখতে সতেরটা বছর কেটে গেছে। মেঘালয় এখন পরিচিত নাম। আমি যাচ্ছি জোয়াই। জয়ন্তীয়াদের আপন দেশে। মেঘালয়ের রাজধানী শিলং থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল অর্থাৎ চৌষট্টি কিলোমিটার দূরে। পূব দিকে চুয়াল্লিশ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। এই পাহাড়ী পথ দিয়ে আজকাল আসামের কাছাড় জেলার সদর শিলচর পর্যন্ত সরাসরি বাসে যাওয়া যায়। শিলং থেকে শিলচর বা করিমগঞ্জ যাওয়ার জন্যে আর গুয়াহাটি আসার প্রয়োজন নেই।

মেঘের দেশে এই তিন পাহাড়ী খুদে রাজ্যটিকে পাঁচটি জেলায় ভাগ করা হয়েছে। সর্ব পশ্চিমে পশ্চিম গারো পাহাড় থেকে শুরু করে পূর্ব গারো পাহাড়, পশ্চিম খাসি পাহাড়, পূর্ব খাসি পাহাড় ও সর্ব পূর্বে জয়ন্তীয়া পাহাড়। জেলাসদরগুলোর নাম যথাক্রমে তুরা, উইলিয়াম নগর, নংস্টয়েন, পিনং ও জোয়াই, সবই পাহাড়ী শহর।

সৌন্দর্য জলবায়ু ও আড়ম্বরে অবশ্যই শিলং সবার সেরা। যে জন্যে এক সময় সাহেবরা আদর করে এই শহরটির নাম দিয়েছিলেন; পূব দেশের স্কটল্যান্ড। উচ্চতা বিশেষে ঠান্ড গরম ও গুরুত্ব অনুযায়ী জায়গাগুলোর আধুনিকতা ও আড়ম্বরে ফারাক থাকলেও, আমার কাছে মেঘালয়ের প্রতিটি জায়গাই সুন্দর। তাই যখনই শিলং আসি কাজের ফাঁকে প্রতিবারই কাছাকাছি কোনও না কোনও জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি।

স্থানীয় বাসে চড়েছি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মতই এই পাহাড়ী অঞ্চলের বাসেও প্রায় সব সময় ভিড় লেগে থাকে। অবশ্য দূর পাল্লার রিজার্ভড সীটওয়ালা বাসগুলো ছাড়া। যখন সীটে প্রথম বসলাম, অত ভিড় ছিল না। এমন কি বাসটি স্ট্যান্ড থেকে ছেড়ে আসার সময়েও না। শহরের আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু পথে যখন বাসটা হামাগুড়ি দিয়ে এগুনোর কায়দায় ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে, অল্প সময়ের মধ্যে ভিতরটা যাত্রীর ভিড়ে ঠাসা হয়ে গেল। কলকাতার ম্যাকসি ও মিনিবাসের মত জোয়াইয়ের এই মিডি বাসটার কণ্ডাকটার ও হেলপারও সমানে চিৎকার করে যাত্রীদের আহ্বান করছে, এতবার শিলংয়ে এসেও খাসিয়া ভাষাটা ঠিক বুঝতে পারি না। তবু মনে হল, চিৎকার করে ওরা বলছে, বাসটা একেবারেই খালি। যদিও ভিতরে আর পা ফেলার জায়গাটুকুও নেই।

বাসের মধ্যে সব জোরা সীট, অর্থাৎ মাত্র দুজন যাত্রীর বসার জায়গা। কিন্তু প্রায় সব সীটে তিনজন যাত্রী গাদাগাদি করে বসে। আমার পাশের সীটে বসেছিল একটি ফুট-ফুটে চেহারার খাসিয়া ছেলে। বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে, পরণে স্কুলের পোষাক। কোলে ছোট চামড়ার সুটকেশ। তাকে আমার দিকে একটু ঠেলে দিয়ে আড়াই তিন ইঞ্চির মত জায়গা বের করে এক মধ্য বয়সী ভদ্রমহিলা নিশ্চিন্ত মনে বসে তাম্বুল চিবোচ্ছেন। আসাম ও মেঘালয়ে তাম্বুল খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি। এক ফালি পান পাতা, নরম চুন ও কাঁচা সুপারি। এরই নাম তাম্বুল।

শিলং শহরেও বাসের চেহারা প্রায় একই রকম। শহরটি প্লেটো বা মালভূমির উপরে বলে একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত থেকে নিয়মিত বাস চলাচল। পৃথিবীতো দূরের কথা, ভারতেরই সব পাহাড়ী শহর দেখার সুযোগ পাইনি! তবে অনেকের কাছে শুনেছি, পৃথিবীর অসংখ্য পাহাড়ী শহরের মধ্যে মাত্র দু চারটে শহরেই স্থানীয় অধি-বাসীরা দু চাকা সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়ান। মেঘালয়ের শিলং এই দু চারটে শহরের একটা। আমি অবশ্য আর এক পাহাড়ী শহরে শুধু দুচাকা নয়, তিন চাকা সাইকেলও চলতে দেখেছি। নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে। তবে শিলং ও কাঠ-মাণ্ডুর মধ্যে ফারাক হল, প্রথমটি মালভূমি ও দ্বিতীয়টি উপত্যকা।

পাশে বসা ছেলেটির সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ করে ফেলেছি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। শিলংয়ের এক ইংলিশ মীডিয়াম স্কুলে পড়ে ও হোস্টেলে থাকে। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র হলে কি হবে, খাঁটি বিলেতী সাহেবের মত ইংরেজী উচ্চারণ ও কথা বলার সময় দু কাঁধে ঘন ঘন ঝাঁকুনি। অ্যামেরিকান সাহেবের কায়দায় ইয়েস শব্দের পরিবর্তে ইয়া ইয়া। জোয়াইয়ে মা বাবা থাকেন। তাঁদের কাছে যাচ্ছে। স্কুলের ছুটিতে নয়। দিদিমাকে দেখতে। স্কুলের ফাদারের কাছে মায়ের টেলিফোন এসেছিল। তিনি হোস্টেলের ইনচার্জ ব্রাদারের কাছে খবর পাঠান। সঙ্গে লোক পাঠিয়ে ব্রাদার ছেলেটির বাসে চড়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। দেরি না করে এই সকালের বাসেই। কথার ফাঁকে

মাঝে মাঝে চার্চ দেখে দেখে ছেলেটিকে দুচোখ বন্ধ করে বুকে আঙ্গুল দিয়ে ক্রস আঁকতে দেখে বুঝলাম, সে ক্রীশ্চান।

বাসটার গতি বেড়েছে। শহর ছেড়ে কিছুটা দূরে আসার পর। দুপাশে পাইন, ফার ও ওক গাছের জঙ্গল মাঝে মাঝে রোডডেনড্রন ও অর্কিড ফুলের মেলা। আগে শিলং শহরের মধ্যেও যেখানে সেখানে এরকম বনফুলের হাট চোখে পড়ত। জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় গাছ আগাছা পরিস্কার করে বাড়ি, অফিস ও দোকান তৈরী হচ্ছে। তাই ওয়ার্ড লেক, পার্ক, বটানিক্যাল গার্ডেন ও দু চারটি বাংলোর সাজানো বাগান ছাড়া শহরের আর কোথাও এরকম সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। তবে শিলং থেকে একটু দূরে, অর্থাৎ দশ থেকে বার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করতে পারলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ব সমারোহ দেখতে পাওয়া যায়। সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নাচতে নাচতে নেমে আসছে জলপ্রপাতের ফেনা মাখানো জলস্রোত। এই দৃশ্য একটা নয়, বেশ কয়েকটা। এলিফ্যাণ্ট ফলস, বিশপ ফলস, বিডন ফলস, স্প্রেড ঈগল ফলস ও সুইট ফলস ছাড়াও আর বহু নাম।

এই সফরে জোয়াইয়ের পরিবর্তে চেরাপুঞ্জি যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। আগে দুবার গিয়েছি কিন্তু দুবারই চেরাপুঞ্জিতে বৃষ্টি পাইনি। অথচ বৃষ্টি পড়ায় বহুকাল ধরেই চেরা-পুঞ্জির স্থান বিশ্বে প্রথম। শিলং থেকে পঞ্চান্ন কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমের এই শহরটি বাংলা দেশের উত্তর সীমান্ত ঘেঁষা। শীতের সময় বৃষ্টি পড়ে না। শুধু মেঘ আর যেন কুয়াশা। মাওসামাই গুহা আর ফান্টনরেম জলপ্রপাত দেখার জন্যে ওখানে অনেকে বেড়াতে যান।

বাসের অধিকাংশ যাত্রীই খাসিয়া। গারোদের আলাদা ভাবে চেনায় অসুবিধে না হলেও খাসিয়া ও জয়ন্তীয়াদের মধ্যে চেহারার কোনও ফারাক নেই। ভাষাও প্রায় এক। মেঘালয় রাজ্যের জন্ম হওয়ার আগে খাসি ও জয়ন্তীয়া পাহাড় নিয়ে শুধু মাত্র একটি জেলা ছিল। সদর দপ্তর শিলং।

আমার সহযাত্রী কিশোর ছেলেটির তার নিজের রাজ্য, পাহাড়, নদী, মানুষ, ভাষা ও আরও নানা বিষয়ে জ্ঞান আছে জানতে পেরে আমিও তার কাছ থেকে কিছু জেনে নিলাম। আর মজা পেলাম সব চেয়ে বেশি, জয়ন্তীয়া পাহাড়ের প্রাচীন রাজাদের গল্প শুনে। বিশেষ করে জোয়াই যাচ্ছি। এমনিতেই জয়ন্তীয়াদের গল্প শোনায় আমার আগ্রহ বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

বহুকাল আগে জয়ন্তীয়া পাহাড়ের একটা হ্রদের তীরে কুঁড়েঘরে এক জেলে বাস করত। বেচারা একে গরীব, তায় আবার হ্রদে জাল ফেলে সবদিন মাছ পেত না। একদিন জালে কোনও রকমে একটা মাছ ধরা পড়ল। খুব খিদে পাওয়ায় সে ভাবল, এই মাছটা আর বিক্রি না করে নিজেই পুড়িয়ে খাবে। মাছটাকে ঘরের মধ্যে রেখে কাঠ জোগাড় করতে গেল। ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তার মনে হল যেন ভিতরে কেউ

আছে। বাঁশের কঞ্চি ও লতাপাতা দিয়ে তৈরী ঘর ও ঘরের দরজা। উঁকি দিলেই ভিতরের সবকিছু দেখা যায়।
দরজার ফুটো দিয়ে ভিতরে উঁকি মেরে দেখে তাজ্জব ব্যাপার! চোখ ছানাবড়া নয়, দইবড়া গয়ে গেল।
কুঁড়ের মধ্যে রাজকন্যার মত ফুটফুটে সুন্দর একটি মেয়ে সব কিছু অগোছাল জিনিসকে গুছিয়ে রেখে ঘর আলো করে পিঁড়িতে বসে আছে। জেলের মাথাটা দরজায় লেগে গিয়ে শব্দ হতেই সুন্দরী মেয়েটি অদৃশ্য। তার জায়গায় সেই মাছটা পড়ে আছে। জেলের সন্দেহ হল। ঘর থেকে বেরনোর সময় মাছটাকে সে মাটির সরার মধ্যে রেখে গিয়েছিল। পিঁড়ির উপর এল কি করে?
জেলে আর মাছটাকে না মেরে সরাভর্তি জলের মধ্যে জিয়িয়ে রাখল।
এই ভাবে দিনের পর কিন কাটে। জেলে বাড়ি থেকে বেরোলেই মৎস্য কন্যা তার সব জিনিস গুছিয়ে রাখে। ঘর পরিষ্কার করে। জেলে বাড়ি ফিরলে, আবার মাছ হয়ে যায়। একদিন মৎস্যকন্যা জেলের কাছে ধরা পড়ে গেল। জেলের অনুরোধে তাকে বিয়ে করে আর নিজের রূপ পাল্টে ফেলত না। সুন্দরী মেয়ের চেহারা বজায় রেখে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার দেখত। জেলেও খুব খুসি।
যথা সময়ে মৎস্যকন্যার দুটি সন্তান হল। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে।
জেলের কুঁড়েঘরে সুখ শান্তি যেন আর ধরে না। মৎস্যকন্যাকে বিয়ে করেছে বলে আর মাছ না ধরে চাষবাসে মন দিয়েছে।
একদিন বাড়ি ফিরে জেলে তার বৌকে দেখতে পেল না। ফুটফুটে ছেলে মেয়ে দুটি খেলা করছে। কুঁড়েঘরের চারপাশ খুঁজে শেষে জেলে হাজির হল সেই হ্রদটার তীরে। মৎস্যকন্যা চুপচাপ বসে আছে, জলের দিকে চেয়ে। জেলে কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখতে তার বৌ আমার মাছ হয়ে এক লাফে জলের মধ্যে ঢুকে গেল। মনের দুঃখে যখন জেলে তার কুঁড়েঘরের দিকে ফিরে আসার জন্যে মুখ ঘুরিয়েছে, পিছন থেকে মৎস্যকন্যার কথা শুনতে পেল। দুঃখ কোরো না। তোমার ছেলে একদিন রাজা হবে।
জয়ন্তীয়া পাহাড়ের উপজাতি সম্প্রদায় এক সময় মৎস্যকন্যার এই ফুটফুটে সুন্দর ছেলেটির মধ্যে রাজলক্ষণ দেখে তাকেই তাদের রাজা করেছিল।
তার মেয়েটির কি হল? প্রশ্ন করলাম।
দু কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে আমার সহযাত্রী কিশোর বন্ধু বলল, সে আবার যাবে কোথায়? রাজার কাছে থেকে গেল। বোন ভাইকে ছেড়ে কি যেতে পারে?
সামনের সীটে স্যুট টাই পরা এক খাসিয়া ভদ্রলোকও আমার সহযাত্রীর গল্প উপভোগ করছিলেন। কিশোরটির গল্প শেষ হতে বললেন, খাসি জয়ন্তীয়াদের রাজ পরিবারে নিয়ম অনুযায়ী রাজার ছেলে রাজা হতেন না। পরবর্তী রাজা হতেন রাজার বোনের ছেলে মানে ভাগ্নে।

খাসি জয়ন্তীয়াদের সাধারণ পরিবারে সব কিছু ভার মায়ের উপর। মায়ের পর সম্পত্তি ও সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে হয় মেয়েকে।
পিটার অর্থাৎ আমার সহযাত্রী ছেলেটির দিদিমা তাদের সংসারের কর্ত্রী। তাঁর পর কর্ত্রী হবেন পিটারের মা। পিটারের মায়ের পর পিটার নয়। তার ছোট বোন রোজী।
পিটারের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ায় জোয়াই পৌঁছে একটু সমস্যায় পড়ে গেলাম। পিটারের মা বাবা ও দিদিমা আমাকে অন্য কোথাও থাকতে দিলেন না। তাঁদের বাড়িতেই উঠতে হল। পিটারের সঙ্গে আমিও খুসি হলাম, তার দিদিমা সুস্থ হয়ে গিয়েছেন বলে। আর উপরি পাওনা পেলাম পিটারের বাবার কাছ থেকে। তাঁর জিপে চড়িয়ে আমাকে জোয়াইয়ের কাছাকাছি জায়গাগুলো ঘুরিয়ে দেখালেন। পিটারও সঙ্গে ছিল। নারতিয়াংয়ের প্রাচীন মনলিথ বা বড় পাথর কেটে তৈরী উঁচু স্তম্ভ, আক্রমণের সময় রাজ-পরিবারের মানুষদের লুকিয়ে রাখার জন্য জয়ন্তীয়া রাজাদের তৈরী সিন্দাইয়ের গুহা ও সবশেষে থাডলাস্কেইন হ্রদ। জোয়াই আসার সময় এই হ্রদটার পাশ দিয়েই এসেছি।
হ্রদের তীরে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি। পিটার ছুটে এসে বলল, তোমাকে সেই মার্মেডের গল্প বলেছিলাম। দিদিমা বলেন, আবার মাছ হয়ে গিয়ে সে এই লেকটাতেই লাফিয়ে পড়েছিল।

ইচ্ছে

অরুণজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়

ধূসর মাটির জন্যে আমার
ইচ্ছে করে লাফিয়ে নামার
বৃষ্টি হয়ে, বুকের ওপর
পড়তে ঝরো ঝরো।
সবুজ ঘাসের বনাত পেতে
পাতার বাহার সাজিয়ে দিতে
ভালবাসা কুড়িয়ে নিতে
ইচ্ছে করে আরো।



দুর্জয় ভিলা

নির্মলেন্দু গৌতম

কার্ডখানার ওপর আমিও ঝুঁকে পড়লুম সঙ্গে সঙ্গে। দামী আইভরী কার্ড। ইংরেজীতে নাম ঠিকানা লেখা। দেবেশ্বর জোরে জোরেই নাম ঠিকানা পড়ে ফেললো। মিঃ বি. টি. মুখোটি, দুর্জয় ভিলা, জলা পাহাড়, দার্জিলিং।

কার্ডখানা ভালো করে একবার দেখে নিয়েই মিঃ বি. টি. মুখোটির দিকে তাকিয়ে শুধালুম, 'আপনার পুরো নামটা ?'

দাড়ির ফাঁকে ঝক্ ঝক্ করে উঠলো সাদা দাঁতগুলো। মাথার টুপিটা দস্তানা পরা ডান হাতে ভালো করে চেপে নিয়ে বললেন, 'পুরো নামটা কাউকে বলি না। নামটা আমার একেবারে পছন্দ নয়।'

'পাল্টে নিলে পারতেন!' দেবেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বললো।

'পারতুম। কিন্তু দিদিমার দেয়া নাম যে।' অসহায় দেখালো বি. টি. মুখোটির মুখ।

'তাহলে অবশ্য পাল্টানো উচিত নয়।' গম্ভীরভাবে আমি বললুম।

আমার সমর্থন পেয়ে বি. টি. মুখোটি খুশী হলেন। তারপর দেবেশ্বরের ডানহাতখানা মুঠোয় ধরে বললেন, 'যাক গে, আগামীকাল সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে আসছেন। হোটেল ছেড়ে দিয়ে আমার বাড়িতে থাকতেই হবে আপনাদের।'

'নিশ্চয়ই। এমন নেমন্তন্ন আজকাল কেউ করে? করে না। আপনি যখন করেছেন, তখন নিশ্চয়ই যাবো।' দেবেশ্বর উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠলো।

আমিও উচ্ছ্বসিত গলায় বললুম, 'তাছাড়া আপনার মতো এমন মহৎ লোক পাওয়াও যায় না আজকাল।'

আমার কথা শুনে অমায়িক ভাবে হাসলেন বি. টি. মুখোটি। গাড়ির গতি কমে আসছে। ঘুম স্টেশন আসছে নিশ্চয়ই। উঠে দাঁড়ালেন বি. টি. মুখোটি। হাত বাড়িয়ে দেবেশ্বরের কাছ থেকে একটা চকোলেট নিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন, 'আমি এবার উঠছি। আমায় তো আবার ঘুমে নামতে হবে।'

'দার্জিলিং পর্যন্ত যদি একসঙ্গে যেতে পারতাম তাহলে ভারি ভালো লাগতো।' দেবেশ্বর বললো দুঃখিত গলায়।

'কিন্তু ঘুমে যে আমার জরুরী কাজ। কাজটা তেমন জরুরী না হলে আপনাদের সোজা আমার বাড়িতে নিয়েই তুলতুম।'

বলে একটু হেসে চকোলেটটা মুখে পুরে দরজার দিকে পা বাড়ালেন বি. টি. মুখোটি।

বি, টি, মুখোটি তাকালেন আমার দিকে। হেসে বললেন, 'চলি।'

দেবেশ্বর আর আমি দুজন হাত তুললুম সঙ্গে সঙ্গে। এবার বি, টি, মুখোটির হাসিটা যেন ভারি করুণ মনে হলো আমার। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে না পেরে সত্যিই ভদ্রলোক দুঃখিত হয়েছেন। স্পষ্টই বুঝতে পারলুম আমি।

গাড়ি থামলো ঘুম স্টেশনে।

দরজাতেই দাঁড়িয়েছিলেন বি, টি, মুখোটি। গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেলেন।

দেবেশ্বর মুগ্ধ গলায় বললো, 'এমন লোক পাওয়া যায় আজকাল!'

'কখখনো পাওয়া যায় না। পাওয়া যেতে পারে না।' আমি বললুম।

'আমরা তাহলে যাচ্ছি বি, টি, মুখোটির বাড়িতে।' দেবেশ্বর বললো।

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই যাচ্ছি। এমন একটা সুযোগ ছাড়া যায়!'

দেবেশ্বর আর কিছু না বলে কার্ডখানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকলো।

আমি ঝুঁকে পড়লাম সেদিকেই।

আজকেই, কয়েক ঘণ্টা আগে দার্জিলিঙে উঠবার ছোট্ট ট্রেনের কামরায় বি, টি, মুখোটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমাদের।

দার্জিলিঙের ছোট্ট গাড়ি তখন সোনাদা স্টেশন থেকে ঘুমের দিকে চলতে শুরু করেছে।

চলন্তি গাড়ীতেই ছুটতে ছুটতে এসে উঠেছিলেন বি, টি, মুখোটি। চাপ দাড়ি, দামী উলের টুপি, আর একটা দামী ওভারকোটে কেমন যেন দেখাচ্ছিলো তাকে। গাড়িতে বসবার কোনো জায়গাই ছিলো না বলতে গেলে। দেবেশ্বর আর আমি কোনরকমে তাকে একটুখানি জায়গা করে দিয়েছিলুম। সেই সঙ্গে দেবেশ্বর একটা চকোলেট দিয়েছিলো তার হাতের মুঠোয়। ব্যস, তখন থেকেই একটানা কথার ফুলঝুরি ঝরতে শুরু করেছিলে বি, টি, মুখোটির মুখ থেকে।

একরাশ কথা বলে হঠাৎ কি মনে হতে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'দার্জিলিঙ পর্যন্ত যাচ্ছেন নিশ্চয়ই? বেড়াতে, না কাজে?'
'বেড়াতে।' দেবেশ্বর বলেছিলো।
'কোথায় উঠেছেন?'
'হোটেলেই উঠবো ঠিক করেছি।'
'হোটেলে? হোটেলে কেন?' প্রায় লাফিয়েই উঠেছিলেন বি, টি, মুখোটি।
আমি অবাক হয়ে বলেছিলুম, 'তাহলে কোথায় উঠবো?'
'আমার বাড়িতে।'
'আপনার বাড়িতে?' কথাটা শুনে বুঝি খানিকটা চমকে উঠেছিলো দেবেশ্বর।
অমায়িকভাবে হেসেছিলেন বি, টি, মুখোটি। তারপর বলেছিলেন, 'আপনার আমায় বসতে দিয়েছেন কষ্ট করে, হোটেলে থেকে আপনাদের কষ্ট করতে দিলে আমার অপরাধ হয়ে যাবে।'
বলে একটু থেমেছিলেন বি, টি, মুখোটি। আমাদের কিছু বলতে না দিয়ে ফের বলেছিলেন, 'আমায় আজ একটু ঘুম স্টেশনেই নামতে হবে। কাল দুপুরে আমি ফিরবো দার্জিলিঙে। আপনারা বিকেল বিকেল নিশ্চয়ই চলে আসবেন আমার বাড়িতে। আমি গাড়ি পাঠিয়ে আপনাদের জিনিসপত্র সব আনিয়ে নেবো।'
'কিন্তু—' দেবেশ্বর কিছু বলতে চেয়েছিলো।
বি, টি, মুখোটি দেবেশ্বরকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'কোনো কিন্তু-টিন্তু শুনতে চাই না আমি। আপনারা যাচ্ছেনই। এ নিয়ে আর কোনো কথাই বলতে চাই না আমি।'
দেবেশ্বর আমার দিকে তাকিয়েছিলো।
আমি ইশারায় বলেছিলুম, 'এ নিয়ে কথা বলবার আর দরকার কি?'
দেবেশ্বর থেমে গিয়ে অন্য কোনো কথা সম্ভবতঃ ভাবতে শুরু করেছিলো। ঘুমের কাছাকাছি ট্রেন এসেছে কিনা আমি জানালায় চোখ রেখে বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।
'এই যে আমার কার্ড। এতেই আমার নাম আর ঠিকানা আছে।' কথাটা শুনেই আমি ফিরে তাকিয়েছিলুম।
বি, টি, মুখোটি তার ওভারকোটের পকেট থেকে তখুনি এই চমৎকার কার্ডখানা বের করেছিলেন। তারপর সেখানা এগিয়ে দিয়েছিলেন দেবেশ্বরের দিকে।
সেই কার্ডখানাই এখন দেবেশ্বর দেখছে। আর কোনোদিকে যেন খেয়াল নেই দেবেশ্বরের।
ঘুম স্টেশন থেকে ট্রেন চলতে শুরু করলো দার্জিলিঙের দিকে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে স্টেশনটাকে একটুখানি দেখে নিলুম।
দেবেশ্বর কার্ডখানা আমার চোখের সামনে তুলে ধরে আস্তে আস্তে বললো, 'এরকম মানুষ আজকাল খুঁজে পাওয়া যায় না, কি বলো?'

'এমন মানুষ নিজেরাই খোঁজ দিয়ে যায়। খুঁজতে গেলে তাদের পাবে না।'—আমি বললুম অবলীলায়।

বড়ো করে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে দেবেশ্বর বললো, 'আজকে আমার সে কথাই মনে হচ্ছে।'

বলে একটা চকোলেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে দেবেশ্বর বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো উদাসভাবে। বোধহয় বি, টি, মুখোটির মুখখানা ভাবতে শুরু করেছে দেবেশ্বর।

আমিও চকোলেট চিবুতে চিবুতে বি, টি, মুখোটির মুখ আর পুরো নাম—এ দুটো নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকলুম।

॥ দুই ॥

দার্জিলিঙে এসে যে হোটেলে আমরা উঠলুম, সেটা ভালোই।

কিন্তু দুর্জয় ভিলার কথা ভেবে হোটেলটাকে ভালো লাগাতেই পারলুম না।

যেভাবে নেমন্তন্ন করেছেন বি, টি, মুখোটি, তাতে বাড়িটা রীতিমতো বড়ো সড়োই হবে মনে হচ্ছে। নাহলে অমনিভাবে কেউ নেমন্তন্ন করে?

রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম দুর্জয় ভিলার। দারুণ রকমের স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই ঘুম ভাঙলো।

দেবেশ্বর ঘুম থেকে উঠে পড়েছে আগেই।

আমায় উঠে পড়তে দেখেই দেবেশ্বর বললো, 'বেশ চমৎকার ঘুমিয়েছো মনে হচ্ছে।'

'আরো চমৎকার ঘুম হতো যদি ঘুম ভাঙতেই দেখতুম দুর্জয় ভিলায় আমি শুয়ে আছি।' আমি বললুম।

'দুর্জয় ভিলাতে তো আজ রাত থেকেই ঘুমোবো।' দেবেশ্বর বললো।

আমি বললুম, 'স্বপ্নে আজ রাত থেকেই আমার ঘুমোনো শুরু হয়েছে।'

'তুমি দুর্জয় ভিলার স্বপ্ন দেখেছো বুঝি?' খুশী হয়ে উঠলো দেবেশ্বর।

'দুর্জয় ভিলার স্বপ্ন দেখতে দেখতেই আমার ঘুম ভেঙেছে।' আমি বললুম।

দেবেশ্বর এক মুহূর্ত আমার দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে বললো, 'দুর্জয় ভিলাকে কি রকম দেখলে বলো তো?'

আমি স্বপ্নে দেখা দুর্জয় ভিলাকে ভেবে নিলুম একবার। তারপর বললুম, 'বিরাট বাড়ি। বাইরে চমৎকার ফুল বাগান একটা। আমাদের যে ঘরটাতে থাকতে দিয়েছেন বি, টি, মুখোটি সেটা রীতিমতো মোজায়েক করা। দুদিকে দুখানা মেহগিনির খাট। ছাদ থেকে ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে—'

'আমার স্বপ্নে দেখা দুর্জয় ভিলাকে অবশ্য অন্য রকম। একেবারে রাজপ্রাসাদের

মতো। ছাদের ওপর কাঁচের চমৎকার একটা ঘরে আমাদের জন্য সব ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বড়ো বড়ো সব তাকিয়া পাতা সেখানে। মেঝেয় দারুণ দামী জাজিম।' দেবেশ্বর আর বলতে পারলো না।

'তাহলে কোন্‌টা যে ঠিক দুর্জয় ভিলা, কে বলবে?' আমি বললুম।

দেবেশ্বর বললো, 'আজ বিকেলে আমরা নিজেরাই দেখে নেবো।'

কথাটা বলে খুশীতে একটা গান গাইতে শুরু করলো দেবেশ্বর।

আমি চোখ বুজে একবার দেখে নিলুম স্বপ্নে দেখা দুর্জয় ভিলাকে। বি, টি, মুখোটির দাড়ি-অলা মুখখানাও ভেসে এলো চোখে।

আনন্দে সমস্ত শরীরে আমার কাঁটা দিয়ে উঠলো।

সকাল আর দুপুর দুর্জয় ভিলাতে যাবার খুশীতেই ফুরিয়ে গেলো। মাঝখানে ম্যালের দিকটা একবার শুধু ঘুরে এলুম দুজন।

বিকেল হতে হতেই আমি আর দেবেশ্বর বি, টি, মুখোটির দেওয়া কার্ডখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বেরিয়ে পড়েই আমার দিকে একটা চকোলেট এগিয়ে দিয়ে দেবেশ্বর বললো, 'বি, টি, মুখোটি নিশ্চয়ই এতোক্ষণে এসে পড়েছেন।'

আমি বললুম, 'না এলে আমরা না হয় অপেক্ষা করবো দুর্জয় ভিলার সামনে।'

অবশ্য বি, টি, মুখোটি নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন।' দেবেশ্বর বললো।

'যেভাবে নেমন্তন্ন করেছেন, তাতে এতোক্ষণে দুর্জয় ভিলার গেটে এসে তার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।'

দেবেশ্বর আমাকে সমর্থন করলো। বললো, 'ঠিকই বলেছো।' বলে জোরে হাঁটতে শুরু করলো দেবেশ্বর।

চোখের সামনে আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পেলুম, দুর্জয় ভিলার গেটে দাঁড়িয়ে আছেন বি, টি, মুখোটি। আমাদের দেখেই লাফিয়ে উঠেছেন খুশীতে।

ফের আমার সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

আমি দেবেশ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে হাঁটতে থাকলুম।

জলা পাহাড়ে পৌঁছুতে বেশী সময় লাগলো না। ভারি চমৎকার লাগছে আমার। বলতে গেলে মুগ্ধই হয়ে গেলুম। কিন্তু মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই। দুর্জয় ভিলার খোঁজ করতে হবে আমাদের।

বাড়িটা নিশ্চয়ই সবাই চিনবে। অন্ততঃ আমাদের মনে হলো।

একজন নামছিল ওপরের দিক থেকে। এখানেই সে থাকে বলে মনে হলো আমার। চুপি চুপি আমি কথাটা বলে ফেললুম দেবেশ্বরকে।

দেবেশ্বর একমুহূর্ত ভেবে শেষ পর্যন্ত তাকেই জিজ্ঞেস করলো, 'দুর্জয় ভিলাটা কোথায় বলতে পারেন?'

'দর্জয় ভিলা ?' লোকটি একটু যেন অবাক হয়ে শুধোলো।
দেবেশ্বর বললো, 'বি, টি, মুখোটির দর্জয় ভিলা ?'
চিন্তিত হয়ে উঠলো লোকটি। চারদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখলো। আস্তে আস্তে নড়তে থাকলো মাথাটা।
ঠিক তখুনি পেছনে আর একজন এসে দাঁড়ালো।
'কার বাড়ি খুঁজছেন ?' জিজ্ঞেস করলো সে।
'বি, টি, মুখোটির বাড়ি। দর্জয় ভিলা যে বাড়ির নাম।' দেবেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে ফিরলো।
আমি বললুম, 'আপনি চেনেন নাকি বাড়িটা ?'
'না, চিনি না। আমিও তো খুঁজছি সেই বাড়িটাই।' সঙ্গে সঙ্গে বললো সে।
দেবেশ্বর চিন্তিত ভাবে বললো, 'আপনাকেও কি নেমন্তন্ন করেছেন বি, টি, মুখোটি ?'
'নিশ্চয়ই। এই যে বি, টি, মুখোটি তার নাম ঠিকানা-অলা কার্ডও দিয়েছেন আমায়। আজ এই সময়েই আমায় আসবার কথা বলেছেন।' একখানা কার্ড বের করলো সে।
আমি অবাক হ'য়ে দেখলুম, হুবহু আমাদের কার্ডখানার মতোই একখানা কার্ড তার হাতে। সত্যি সত্যিই তাহলে বি, টি, মুখোটি তাকে কার্ড দিয়েছেন।
'কি জানি মশাই, ব্যাপারটা আমার কাছে রহস্যজনক মনে হচ্ছে।' বলে সেই ওপর দিক থেকে নেমে আসা প্রথম লোকটি হন্‌হন্‌ করে চলে গেলো। আমাদের কোনো কিছু বলবার সুযোগ পর্যন্ত দিলো না।
'তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত ?' আমি দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললুম।
দ্বিতীয় লোকটি বললো, 'আমাদের দুর্জয় উৎসাহে দর্জয় ভিলাকে খুঁজে বের করা উচিত।'
'নিশ্চয়ই উচিত।' দেবেশ্বর বললো।
আমি বললুম, 'কিন্তু ওই ভদ্রলোক যে বলে গেলেন, ব্যাপারটা রহস্যজনক।'
'তাহলে আমাদের সেই রহস্য উদ্ধার করতেই হবে।' লোকটি বললো হাতমুঠো করে। রীতিমতো উত্তেজিত সে।
দেবেশ্বর আমার দিকে তাকালো।
লোকটি বললো, 'নিন, চলুন—এগিয়ে যাই।'
দেবেশ্বর কি ভেবে যেন বললো, 'চলুন।'
পা বাড়াতেই হঠাৎ লোকটি তেমনি উত্তেজিতভাবে দেবেশ্বরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, 'একটা চকোলেট দিন তো।'
'চকোলেট ?' বলেই দেবেশ্বর চমকে ফিরে একেবারে ঝুঁকে পড়লো লোকটির মুখের সামনে।
সঙ্গে সঙ্গে জিভ কাটলো লোকটি। ফিক্‌ করে একটু হাসলো। তারপর বললো, 'বুঝতে পেরেছি। চকোলেট চাইতেই ঠিক ধরে ফেলেছেন !'

'তার মানে ?' আমি অবাক হয়ে শুধালুম।

দেবেশ্বর পকেট থেকে চকোলেট বের করতে বললো, 'ইনিই বি, টি, মুখোটি। দার্জিলিঙের বি, টি, মুখোটি ছাড়া কেউ জানে না আমার পকেটে চকোলেট থাকে। ট্রেনে তো অনেক চকোলেট খেয়েছেন উনি—'

'বি, টি, মুখোটি ? কিন্তু সেই দাঁড়ি গোঁফ, সেই ওভারকোট—' আমি বলতে চাইলুম।

সব-ব বাড়িতে। তবে কার্ড দু-একখানা সঙ্গে আছে। ওগুলো সব প্রেস থেকে ছাপিয়ে নিয়েছি। অবশ্য এখানে কেউ জানে না একথা।' বলেই হেসে ফেললো বি, টি, মুখোটি।

'কিন্তু হঠাৎ বি, টি, মুখোটি, দুর্জয় ভিলা, এসব করবার মানে ?' আমি ফের রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করলুম।

'ওটা একটা মজা। মাঝে মাঝেই দার্জিলিঙের ট্রেনে চেপে লোক বুঝে করি। মেকাপ! সে আমি নিজেই নিতে পারি। মানে নাটক করতুম তো! কেউ ধরতে পারে না। রোজ এসে দুর্জয় ভিলা খুঁজি তাদের সঙ্গে। খুঁজতে না চাইলেও উৎসাহ দিয়ে খুঁজিয়ে নি। নেহাৎ চকোলেট চেয়ে ফেলেছি ভুলে। তাই ধরে ফেললেন।

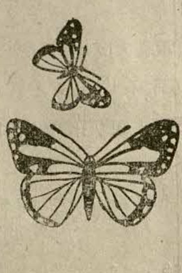
বলে একবার জিভ কাটলো বি, টি, মুখোটি। বললো, 'অপরাধ হলে মার্জনা করে নেবেন।'

আমি দেবেশ্বরের দিকে তাকিয়ে হতাশ গলায় বললুম, 'তাহলে সেই স্বপ্নটা ?'

'সেটাই একমাত্র সত্যি।'

বলে দেবেশ্বর পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে এগিয়ে দিলো বি, টি, মুখোটির দিকে।

আর কিছু না বলে আমিও একটা চকোলেটের জন্যে দেবেশ্বরের দিকে হাত বাড়ালুম।



এবার পুজোয়

কাজী মুরশিদুল আরেফিন

এবার পুজোয় কোথায় যাবে
দীঘায় না কি দার্জিলিং ?
কালিম্পংয়ে দেখতে পাবে
সাপের মাথায় তিনটে শিং।

সানদাখফু ঠাণ্ডা খুবই,
মংপু যাবে নাকি ?
দার্জিলিংয়ে না-যাও যদি,
যেতেও পারো টাকী।

তাও যাবে না ? বেশ তো চলো
এবার দেরাদুনে,
সঙ্গে নিও হাজার টাকা
নগদ গুণে-গুণে।

শিমুলতলায়, কাঁকরাঝোড়ে
কিংবা অমরনাথে
সবাই মিলে যেতেই পারো—
পয়সা কি নেই হাতে ?

নেপাল যাবে ? ভূটান যাবে ?
রিমবিকে না গ্যাংটকে ?
বিদেশে যেতে নেই যে মানা
ছুটতে পারো ব্যাংককে।

তাও যাবে না ? থাকগে তবে
মঙ্গলেতে গিয়ে
রকেট চ'ড়ে ফিরতে পারো
লম্বা পাড়ি দিয়ে।

যাদু-মোরগ



অজিতকুমার দাস

এক বুড়ি একা এক কুঁড়েঘরে বাস করে। তার আর কেউই নেই। ভিক্ষে করে সে দিন কাটায়। একদিন বুড়ি যখন ভিক্ষে করে বাড়ি ফিরছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে ওর কাঁধের ওপর বসল একটা মোরগ। বুড়ি মোরগটাকে নিয়ে গেল ওর ঘরে।

ঘোরাঘুরিতে বুড়ি খুবই ক্লান্ত, তেষ্টাও পেয়েছে তখন ওর খুব। কিন্তু জল খেতে গিয়ে দেখল কলসিতে জল নেই। গ্রামের এক ধারে আছে একটা কুয়ো। ঐ কুয়োরই জল পান করে সে! কিন্তু বুড়ি এক কলসি জল বয়ে আনতে পারে না। যতটুকু পারে ততটুকুই আনে। আর সেই জল দু'দিনের বেশি চলে না। কিন্তু কী আশ্চর্য; কলসিতে জল নেই—একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি দেখল কলসিটা কানায় কানায় জলে ভরে গেছে। খুবই অবাক হল সে। বুড়ি মনে মনে ভাবতে লাগল মোরগটার জন্যেই তা হয়েছে। নিশ্চয়ই মোরগটা যাদু জানে। বুড়ি মনে মনে আরও ভাবতে লাগল ওর আরও যে একটি কলসি আছে সেটা যদি মোরগের যাদুমন্ত্রে দুধে ভরে যেত, তাহলে ওকে আর ভিক্ষে করতে হত না।

কিন্তু কী আশ্চর্য; বুড়ি দেখল ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ঐ শূন্য কলসিটাও ভরে গেল দুধে। বুড়ি তাড়াতাড়ি ঐ দুধ পান করতে গিয়ে দেখল ঐ কলসীর দুধ তখনও বেশ গরম।

আনন্দে বুড়ির চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা জল। তারপর কিছুটা দুধ আর মুড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ল। মোরগটার চীৎকারেই সকালে ঘুম ভাঙল তার। বুড়ি বিছানায় উঠে বসতেই মোরগটা উড়ে এসে বসল তার কাঁধের ওপর।

মোরগটাকে দেখতে ভারি সুন্দর! ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে মোরগটা বুড়িকে বিদায় জানিয়ে উড়ে গিয়ে বসল কাঁটাগাছের বেড়ার ওপর। ঐ বেড়ার ভেতরেই বুড়ির ছোট্ট কুঁড়েঘর। যদিও মোরগের দৌলতে আগের চেয়ে বুড়ির অবস্থা এখন ভালো হয়েছে অনেক। তাছাড়া এতোদিন তো বুড়িকে তার কুঁড়েঘরে একাই থাকতে হত। এখন ও একজন সঙ্গী পেয়েছে। বুড়ি বাইরে গেলে মোরগটা এখন তার ঘর পাহারা দেয়।

মোরগটা বুড়ির উঠোনে নেচে নেচে বেড়ায়। বুড়ির এখন আর তেমন কোন অভাব নেই। ভিক্ষে করতে আর যায় না সে। মোরগটা রোজই শব্দ করে বুড়িকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। এমনকি, বুড়ির দুধ খাওয়ার সময় হলেই কোঁ—কোর্ কোঁ শব্দ করে।

বুড়ি মোরগের যাদুবিদ্যার ক্ষমতার কথা জেনেও কখনও তার অপব্যবহার করে না। বড়লোক হওয়ার কোন ইচ্ছে তার নেই। শুধু যতটুকু না হলে নয়, এমন জিনিসই মোরগটার কাছে চায় সে।

যেভাবেই হোক, কিছুদিনের মধ্যে সারা গ্রামের লোকের কাছে রটে গেল বুড়ির যাদু-মোরগের কথা। শেষে জমিদারের কানেও গেল কথাটা। জমিদার লোক পাঠিয়ে বুড়িকে কাছারি বাড়িতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সেই সঙ্গে তার মোরগটাকেও সেখানে নিয়ে যেতে বললেন।

কিন্তু বুড়ি কাছারিবাড়িতে গেল না। সে পেয়াদাকে বলল, 'আমার এই ছেঁড়া আর নোংরা কাপড় পরে কি করে জমিদারের সামনে হাজির হই বল।' জমিদার পেয়াদার কাছে একথা শুনে বললেন, এটা বুড়ির নিছক একটা অজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

শেষে জমিদার দেওয়ানকে বললেন, যে ভাবেই হোক বুড়ির মোরগটাকে ধরে আন। কিন্তু বুড়িতো আর সহজে মোরগটাকে দিতে রাজি হবে না। কারণ বুড়ি কম চালাক নয়। দেওয়ান তার প্রমান পেয়েছে আগেই। তাই বুড়ির মোরগটাকে নেওয়ার জন্যে এক ফন্দি আঁটল সে।

একদিন সকালে সে বুড়ির কুঁড়েঘরের কাছে গিয়ে চীৎকার করে বলতে লাগল, 'আগুন আগুন গ্রামে আগুন লেগেছে।' বুড়ি তা শুনতে পেল ঠিকই। কিন্তু সে চোখে ভালো দেখতে পায় না। তবু তাড়াতাড়ি মোরগটাকে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

এদিকে দেওয়ান চীৎকার করেই তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বুড়ির কুঁড়েঘরের কাছেই এক ঝোপে ঢুকল, যাতে বুড়ি তাকে দেখতে না পায়। আর বুড়িকে এগিয়ে যেতে দেখেই তার পিছু নিল সে। শেষে বুড়ি একটু অন্যমনস্ক হতেই মোরগটাকে নিয়ে সে দৌড়তে শুরু করল। তখন বুড়ি বুঝতে পারল গ্রামে আগুন লাগার কথাটা ডাহা মিথ্যে। আসলে তার মোরগটাকে নেওয়ার জন্যেই ওকথা রটিয়েছিল।

যাই হোক, মোরগটার জন্যে বুড়ির দুঃখ হল খুব। কিন্তু ও আর কি করে, মোরগটার দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেল।

এদিকে মোরগটাকে দেখে জমিদারের সে কি আনন্দ। কারণ তিনি আগেই শুনেছেন, এই মোরগটার জন্যেই বুড়ির ভাঙা কুঁড়েঘরে যেন চাঁদের আলো ফুটছে। এখন তিনি এই মোরগটাকে কাজে লাগাতে চান। মোরগটার যাদুমন্ত্র বলে প্রচুর উপাদেয় খাবার আনলেন তিনি। শুরু হল জমিদারের বাড়িতে ভোজ-উৎসব। এই উৎসবে

সমবেত হলেন বহু গন্যমান্য লোক।—এই খাওয়া দাওয়ার পর্ব কখন সারাদিন, কখন সারারাত ধরে চলতে লাগল। সকলেই জমিদারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
কিন্তু একদিন যখন জমিদার-বাড়িতে ভোজ উৎসব বেশ জমে উঠেছে, হাসির-ফোয়ারা উঠছে ঘন ঘন, এমন সময় হঠাৎ মোরগটা চীৎকার করে বলল, 'জমিদার লোভী, স্বার্থপর আর ঠক্।'

একথা শুনে রাগে জমিদারের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। নিমন্ত্রিত অতিথিরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। লজ্জায় জমিদারের মাথা হেঁট হল। তিনি যে এখন কি করবেন কিছুই ভেবে পেলেন না। কারণ মোরগের মুখ বন্ধ করা তো আর সোজা নয়। যাই হোক, একে একে অতিথিরা যখন চলে গেলেন, তখন জমিদার তাঁর লোকজনদের আদেশ দিলেন, 'বেয়াদব মোরগটাকে ধরে এক গভীর কুয়োয় ফেলে দাও।' জমিদারের নির্দেশে মোরগটাকে এক কুয়োয় ফেলা হল। জমিদারের ধারণা, মোরগটা আর কোন মতেই কুয়ো থেকে উঠতে পারবে না। জলে ডুবে মরে যাবে সে।

কিন্তু মোরগটা কুয়োর জলে ডুবে মরা দূরে থাক, সে এক নিমেষে ঐ কুয়োর সব জল শুষে নিল। কুয়োটা একেবারে শুকনো কাট হয়ে গেল। মোরগটা আবার এসে বসল জমিদার-বাড়ির বারন্দায় আর আগের মতোই চীৎকার করে বলল, 'জমিদার—লোভী, স্বার্থপর আর ঠক্।' তবু রক্ষে, অতিথিদের মধ্যে দু'-চারজন ছাড়া সকলেই তখন চলে গিয়েছেন।

জমিদার মোরগের কথা শুনে রেগে তো গেলেনই তাঁর রাগ আগের চেয়ে দ্বিগুন হল। এবার তিনি চাকরদের বললেন, 'মোরগটাকে ধরে আগুনে ফেলে দাও।' মোরগটাকে আগুনে ফেলা হল। কিন্তু তাতে ওর কোন ক্ষতি তো হলই না, সে 'যে কুয়োর জল পান করেছিল সেই জল আগুনে ঢালায় মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল আগুন। তারপর মোরগটা শুধু যে, আবার বারান্দায় ফিরে এলো তাই নয়, আগের মতোই চীৎকার করে ঐ একই কথা বলতে লাগল।

এরপর জমিদার, মোরগটাকে জব্দ করার এক নতুন কৌশল বের করলেন। তিনি তাঁর লোকজনদের বললেন, 'এবার ওকে ধরে সিন্দুকের ভেতর পুরে দাও। ঐ সিন্দুকে আছে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা। ঐ স্বর্ণ মুদ্রার চাপে আর অক্সিজেনের বাতাসের অভাবে নিশ্চয়ই মোরগটা মরে যাবে।'—কিন্তু বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে যখন সিন্দুকটা খোলা হল তখন মোরগটা ডানা নাড়তে নাড়তে বাইরে বেরিয়ে এলো।
জমিদার আর তাঁর লোকজনেরা খুবই আশ্চর্য হলেন যখন দেখলেন ঐ সিন্দুকে একটাও মুদ্রা নেই। সিন্দুক খালি। জমিদারের মাথায় যেন বাজ পড়ল। ওদের ধারণা মোরগটাই ঐ স্বর্ণ মুদ্রাগুলো খেয়ে ফেলেছে। জমিদার আশা করেছিলেন, মোরগটার যাদুবিদ্যার গুণে আরো ধনী হবেন। উল্টে তিনি হলেন নিঃস্ব।

কিন্তু এখন আর কি করার আছে তাঁর। যা হবার তো হয়েছে। তিনি রাগে ভৃত্যদের আদেশ দিলেন—'মোরগটাকে ধরে ওর গলা কেটে দাও। তারপর ওর মাংস রান্না করে আন, ঐ মাংস আমি খাব।'

মোরগটাকে মেরে ওর মাংস রান্না করে জমিদারের টেবিলে আনা হল। তিনি তা খেলেনও।

কিন্তু খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার জমিদারের পেটের ভেতর থেকে মোরগটা আগের মতোই চীৎকার করে বলতে লাগল 'জমিদার লোভী স্বার্থপর আর ঠক্।' শুধু কি তাই, মোরগের মাংস খাওয়ার পর থেকেই জমিদারের শরীর খারাপ হতে লাগল। কিছুদিন পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কারণ তিনি যা খেতেন মোরগ সেগুলো আর ওর পাকস্থলীতে পেঁছিতে দিত না। মাঝপথেই মোরগটা সেগুলো খেয়ে ফেলত।

জমিদারের চিকিৎসার জন্যে অনেক ডাক্তার-বদ্যি এলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই আর জমিদারের রোগ সারে না।

শেষে একজন ডাক্তার জমিদারকে বমি-করার ওষুধ খেতে দিলেন যাতে মোরগটা জমিদারের পেট থেকে উগরে বেরিয়ে আসে। সত্যিই জমিদারের পেট থেকে বের হল মোরগটা। আর বাইরে বেরিয়েই ডানা নাড়তে লাগল সে। জমিদারের অসুখও সেরে গেল।

জমিদার ঠিক করলেন মোরগটাকে ওর মনিবের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। কারণ ওর জন্যে উপকারের চেয়ে অপকারই হয়েছে তাঁর বেশি। মোরগ বুড়ির কুঁড়েঘরে গিয়ে চুপটি করে বসল। তারপর মুখ দিয়ে বের করতে লাগল সিন্দুকের সেই স্বর্ণমুদ্রা গুলো। বুড়ির আর কোন অভাবই রইল না। শেষ জীবনটা তার সুখেই কাটল।

[পোল্যাণ্ডের—উপকথা]

শরৎ মানে সেই ঋতু

আশীস মুখার্জি

শরৎ মানে ঘণ্টা ছুটির
মনটা উড়ু উড়ু,
শরৎ মানে কাশের বনে
হাওয়ার দোলা শুরু।

শরৎ মানে নীল আকাশে
মেঘের ভেলা ভাসা,
শরৎ মানে বৃষ্টি-মেঘের
বন্ধ যাওয়া আসা।

শরৎ মানে গুছিয়ে বেডিং
বেরিয়ে পরা দূরে,
শরৎ মানে খুশীর খেলা
সমস্ত মন জুড়ে।

শরৎ মানে মিষ্টি রোদের
সোনার আঁচল পাতা,
শরৎ মানে সবুজ ধানের
হলুদ রাঙা মাথা।

শরৎ মানে ঢাক কাঁসরের
ধ্বনি প্রতিধ্বনি,
শরৎ মানে সেই ঋতু, যে
শোনায় আগমনী।

———

স্মৃতি নির্ঝর



অরুণ কুমার দত্ত

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, মুষলধারে না হলেও রাস্তায় জল জমে গিয়েছিল। রাজ পথে ট্রাম চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লাইনের ওপর ট্রামগুলো পরপর সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ী বারান্দার নীচে কয়েকটা রোঁয়াওঠা কুকুর কুণ্ডুলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আর বাড়ীটার রকে বসে একজন ভবঘুরে তার ঝুলির ভেতর থেকে কি সব বার করছিল।

অফিস বন্ধ হয়ে গেলেও গাড়িবারান্দাওয়ালা ব্যাঙ্ক বাড়িটার ভেতরে আলো জ্বালিয়ে উচ্চপদস্থ দুজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী কাজ করছিলেন। তারা কথা বলছিলেন নিম্ন স্বরে, যদিও কারুর পক্ষে সে কথা জানার সম্ভাবনা ছিল না। বাইরের কোলাপ্‌সিবেল্‌ গেটটা বন্ধ করে দিয়ে রামবচন দাড়োয়ান একটা টুলের ওপর বসে ঝিমোচ্ছিল। তার রাইফেলটা দরজার পাশে কাৎ করে দাঁড় করান ছিল।

রতনবাবু, দরজাগুলো সব বন্ধ আছে তো? ব্যাঙ্ক ম্যানেজার গোপাল রায়চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ, বাইরের দরজা তো বন্ধই আছে। আর ওপাশের গলির দরজা ভেতর থেকে থেকে লাগান আছে। ক্যাসিয়ার রতন ভট্টাচার্য বলেন। ম্যানেজার গোপাল বাবু তার কাঁচাপাকা অবিন্যস্ত চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, টাকাগুলো বার করে গোনবার আগে তাও একবার ভাল করে দেখে আসুন। রতনবাবু উঠে গিয়ে আবার ফিরে এসে সিটে বসে বললেন,—সব ঠিক আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আসা ঝক-ঝকে নোটের বাণ্ডিলগুলো টেবিলের ওপর রেখে তারা দুজনে গুনতে লাগলেন আর নম্বরগুলো একটা লেজারবাবুকে লিখে রাখতে লাগলেন। মাসের গোড়ার দিকে অনেকেই টাকা তোলার জন্য নোটিশ দিয়েছে।

হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হতেই, ম্যানেজার চমকে পিছনে তাকালেন।—একি! এরা কারা? বলে তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন। কালো মুখোশ পরা চারজন লোক তখন তাদের ঘিরে ধরেছে। ম্যানেজার উঠতে যেতেই তাদের নেতা গম্ভীর গলায় বলে

উঠল, হাত তুলন, নড়বার চেষ্টা করবেন না। তার হাতের উদ্যত পিস্তলের নল দেখে ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার সন্ত্রস্ত হয়ে মাথার ওপর হাত তুললেন। তাদের দুজনের হাত বেঁধে ও মুখে রুমাল বেঁধে তারা নোটের বাণ্ডিলগুলো সঙ্গে আনা থলির ভেতর ভরতে লাগল। দারোয়ানের মৌতাতের আমেজটা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সে কাৎ করা রাইফেলটা ধরবার চেষ্টা করতেই, তার মাথায় একটা বাড়ি পড়ল। দারোয়ান একটা বিকট আওয়াজ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। পুরো পাঁচলাখ টাকাই আছে স্যার। দলের একজন মুখোশ পরা সহকারী নম্বর মিলিয়ে টাকাগুলো গুনতে গুনতে বলল। —দ্যাটস্ কারেক্ট্। লেট আস মুভ নাও। বলেই বাইরের দরজাটা খোলার আদেশ দিলেন দলপতি। তারপর চাপা গলায় বললেন, অ্যামবাসাডার গাড়িটা ওখানে পার্ক করেছে তো?—হ্যাঁ স্যার। আর একজন উত্তর দিল। তারা এগিয়ে যেতেই হাত পিছমোড়া বাঁধা অবস্থায় ম্যানেজার হঠাৎ পা লম্বা করে ল্যাঙ্ মেরে টাকার বাণ্ডিল ওয়ালা লোকটাকে ফেলে দিলেন। ব্যাপারটা দেখেই দলপতি পিস্তলের বাঁট দিয়ে গোপালবাবুর মাথায় সজোরে আঘাত করল। ম্যানেজার আর্তনাদ করে মাটিতে ঢলে পড়লেন।—আর দেরী নয়, তাড়াতাড়ি চল। দলপতির আদেশে ভূলুণ্ঠিত দারোয়ানকে ডিঙ্গিয়ে এক এক করে তারা চারজন সদর দরজা খুলে গাড়ীটাতে উঠল। এইবার দাড়োয়ান রামবচন এক কাণ্ড করে বসল। মাথার আঘাতে সে প্রথমে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। প্রাথমিক কনভালশন কাটবার পর বিশ্বস্ত অভিজ্ঞ ভোজপুরী দাড়োয়ানের জ্ঞান ফিরে এসেছিল। সে মাটিতে শুয়ে পড়ে, সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করে তার কর্মপদ্ধতি কি হওয়া উচিত, তাই ভাবছিল। এ সময় উঠলে বা চেঁচালে ডাকাতরা তাকে গুলি মারবে, সে সুপষ্টই বুঝতে পেরেছিল। গাড়ীটা স্টার্ট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে লাফ দিয়ে উঠে দরজার বাইরে এসে রাইফেল তাক করে গুলি ছুঁড়ল। চলন্ত গাড়ীটার পেছনের কাঁচ ঝন্ ঝন্ করে ভেঙ্গে গেল। আর পরক্ষণেই একটা করুণ আর্তনাদ বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে ভেসে এল।—ডাকু ঘায়েল হুয়া। বলে দাড়োয়ান সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল। গাড়ীটা কিন্তু তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল।

* * *

কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠিত নিউরো সার্জেন ডাঃ রূপেন গুপ্ত চেম্বার থেকে যখন তাঁর লোয়ার সারকুলার রোডের ফ্ল্যাটে ফিরলেন, তখন রাত সাড়ে দশটা। খাওয়া দাওয়া সেরে, সোফার ওপর এসে বসলেন। দূরদর্শনের পর্দায় তখন নাচ চলছিল। তাঁর ল্যাপ ডগ টেবি ডাঃ গুপ্তর কোলের ওপর এসে বসল। তাকে আদর করতে করতে ডাঃ গুপ্ত একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে পাশে বসা স্ত্রী গায়ত্রীকে বললেন, আজ চেম্বারে বেশী ভিড় ছিল না, তাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম। গায়ত্রীও ডাক্তার। সে প্যাথলজিস্ট। তারা নিঃসন্তান। বাড়ীতে চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। গায়ত্রী একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, জান, আজ রেডিওতে বলেছে মধ্য কলকাতার ব্যাঙ্কে একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে গেছে। মুখোশ পরে চারজন

ডাকাত অফিসের শেষে সদর ও পেছনের দরজা বন্ধ করে যখন ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ও ম্যানেজার টাকা গুনছিলেন, তখন তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে, পাঁচ লাখ টাকা লুঠ করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। অবশ্য ব্যাঙ্কের দারোয়ান রাইফেল চালিয়ে গাড়ীর ভেতরের কাউকে ঘায়েল করেছে। সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে রূপেন গুপ্ত শান্ত কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ একজন রোগীর কাছে চেম্বারে একথা শুনেছি।

এমন সময় ফোনটা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। গায়ত্রী গিয়ে ফোনটা ধরে ডাঃ গুপ্তকে বলল, ক্যালকাটা ক্যাকটাস্ নার্সিংহোম থেকে ডাঃ আমিন ফোন করেছেন। খুব জরুরি। এজন্যই বলে ডাক্তারদের স্ত্রীর কপালে সুখ লেখা নেই। এতরাত্রে আবার নার্সিং হোমে ছুটবে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গায়ত্রী বলে।

ফোনটা ধরতেই ওপর থেকে ডাঃ আমিন বললেন, ডাঃ গুপ্ত একজন রুগী অজ্ঞান অবস্থায় এইমাত্র নার্সিং হোমে এসেছে, অবস্থা সঙ্গীন। তার একমাত্র সঙ্গী বলছে, রোগী মিঃ অহিভূষণ চৌধুরী, বারুইপুরের জমির মালিক। ধানকাটার সময় দাঙ্গায় বল্লমের আঘাতে তার মাথা জখম হয়েছে। আমি একটা প্লাজমা ড্রিপ চালিয়ে দিয়েছি। এক্ষুণি আপনার আসা দরকার। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডাঃ গুপ্ত বললেন —আমার এ্যানাস্থেসিস্টরা তো কেউই এখানে নেই আর অপারেশনের সাহায্যই বা কে করবে?

—সে চিন্তা করবেন না। আমায় মেয়ে ফতিমা এ্যানাস্থেটিষ্ট। আর আমি আপনাকে অ্যাসিষ্ট করব। অপারেশন থিয়েটার সিস্টার অবশ্য নতুন এসেছেন।

ডাঃ গুপ্তর ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের চেম্বারের কাছে, বহুতল বাড়ীর মালিক আমিন সাহেবের নার্সিং হোমের চারতলায় অপারেশন থিয়েটারে ডাঃ গুপ্ত ধরাচুড়ো পরে যখন ঢুকলেন তখন পাশের বাড়ির ঘড়ি থেকে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজছে। রোগীকে পরীক্ষা করে ডাঃ গুপ্ত বললেন, এটা বল্লমের গর্ত নয়, বুলেটের গর্ত। পেছন থেকে এসে কানের ওপরের মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোবে এসে ঢুকেছে। কানের পাশের হাড় কেটে দেখা গেল, চারপাশে রক্ত জমে আছে। জমাট বাঁধা রক্ত বের করে দেবার পরই রুগীটা হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, ব্যাঙ্কে আমাদের আজকের এ্যাটেমপ্ট সাকসেস্ফুল, কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। সকলে চমকে উঠল।

ডাঃ গুপ্ত কি যেন চিন্তা করলেন। ডাঃ আমিনকে বললেন, আপনার টেপরেকর্ডার আছে তো? একবার এর কথাগুলো টেপ করুণ তো।—রোগীটা এভাবে চেঁচাল কেন স্যার? অপরেশন থিয়েটারের সিস্টার বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন। ডাঃ গুপ্তর সারা মুখে একটা পাতলা হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বললেন, দেখুন সিস্টার, কানের ঠিক ওপরে মস্তিষ্কের যে অংশটা আছে তার নাম টেম্পোরাল লোব।—জানি স্যার। সলজ্জ ভাবে হেসে সিস্টার বলেন।

—হ্যাঁ এবার আরও কিছু মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের কথা জানুন। আপনারা জানেন, মস্তিষ্কের ভেতরের কেন্দ্রগুলো শরীরের মন ও অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এই

টেম্পোরাল লোবের ভেতরে লিম্‌বাস নামে একটা অংশ আছে। লিম্‌বাস এ্যামিগ্‌ডালয়ড্‌ নিউক্লীয়াস ও হিপ্পো ক্যাম্পাস নামে দুটো অংশ দিয়ে গঠিত। সংবেদনশীল ও ভাবপ্রবণ স্মৃতিগুলোর কেন্দ্র হচ্ছে এই লিম্‌বাস। আমি মস্তিষ্কের এই অংশ চাপ দিতেই রুগী চেঁচিয়ে উঠল। বুলেটটা আমি দেখতে পাচ্ছি। এটা বার করে, চারদিকে জমে থাকা রক্ত পরিস্কার করে, আমি আবার পরীক্ষা চালাব। আজকের রোমাঞ্চকর ব্যাংক ডাকাতির রহস্যের কিনারা বোধহয় আমরা করতে পারব।

ততক্ষণে টেপরেকর্ডার এসে গেছে। বুলেটটা বার করতেই রোগী আবার চেঁচিয়ে উঠল, ক্যাশিয়ার রতন ভট্‌চার্য, তোমার বেইমানির সুযোগেই আমরা পেছনের খোলা দরজা দিয়ে ব্যাঙ্কে ঢুকতে পেরেছি। তোমার কথামত পুরো পাঁচলাখই পেয়েছি। তারপর কিছুক্ষণ নীরবতা। ডাঃ গুপ্ত জায়গাটা পরিস্কার করতে লাগলেন। চাপ পড়তেই···না, না মিথ্যা নয়···বেইমান রতন ভট্টাচার্য্য তোমাকে তুফান সর্দার ভাগের টাকা দেবে না। ওহ্‌ ওহ্‌ মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত···অসহ্য ব্যথা সব অন্ধকারে। ডাঃ গুপ্ত সামনের দিকে ফিরে বললেন—জানেন, আমেরিকার ডাঃ পেনফিল্ড এই টেম্পোরাল লোব ইলেকট্রোড দিয়ে উত্তেজিত করে দেখিয়েছেন, রোগীরা তার হারানো স্মৃতির কথা বলতে থাকেন। পরে অবশ্য সে সব কথা তাদের মনে থাকে না।

—ভারী অদ্ভুত তো। ডাঃ আমিন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।

—অদ্ভুত হলেও এটা নতুন ব্যাপার নয়।

ডাঃ গুপ্ত ডাঃ আমিনকে বললেন, এর যে সঙ্গী নার্সিং হোমে এসেছে তাকে বাইরে যেতে দেবেন না। আর পুলিশে এখনই খবর দিন।

অপারেশন শেষ করে সার্জেনস রুমে বসে যখন তারা চা খাচ্ছেন, তখন দারোয়ান এসে বলল, স্যার ওর সঙ্গের লোকটা চা খেতে গিয়ে আর ফেরে নি।

···সেকি অপদার্থের দল সব তোমরা। ডাঃ আমিন গর্জে ওঠেন।

লালবাজার থেকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের একজন অফিসার এসে সব শুনে চমৎকৃত ও বিস্মিত হলেন। টেপরেকর্ডারটা তারা নিয়ে গেলেন।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, রতন ভট্‌চার্যের বাড়ীতে গিয়ে তাকে লালবাজার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে আসা হল। তাকে জেরা করাতে, সব সে অস্বীকার করল। সে বলল, সব মিথ্যে কথা। তাহলে ডাকাতরা তাকে বাঁধবে কেন? আর পেছনের দরজাটা তারা কোনও উপায়ে খুলেছিল। লালবাজারে একটা পোর্টেবেল টেপরেকোর্ডারে ইতিমধ্যে ডাঃ আমিনের টেপটা টেপ করা হয়েছিল। রতনকে বলা হল ডাকাতরা ধরা পড়েছে। তাদের একজন পাশের ঘরে আছে সেই সব কথা বলেছে। শুনে রতনের মুখটা প্রথমে শুকিয়ে গেলেও সে সেকথা বিশ্বাস করল না। রতনকে তখন পাশের অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে টেপটা নিঃশব্দে চালিয়ে দেওয়া হল···"না না মিথ্যে নয়··· বেইমান রতন ভট্টচার্য···তোমাকে তুফান সর্দার ভাগের টাকা দেবে না।

রতন শুনেই রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জে উঠল। কে বেইমান? আমি না পঞ্চুদাস তুমি? আলো জ্বলে উঠল, টেপটা থামিয়ে দিয়ে পুলিশ অফিসার বললেন, আপনি ধরা পড়ে গেছেন রতনবাবু। একজন শিক্ষিত লোক হয়ে এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন আপনি নিজের ব্যাঙ্কের সঙ্গে, ছি ছি!

ঘরে বসা পুলিশ অফিসারের কথাশুনে রতন ভট্চার্য কেঁদে উঠল—আপনারা আমাকে মাপ করুন। সংসারে টাকার বড় প্রয়োজন ছিল। বাধ্য হয়ে আমাকে এই কাজ করতে হয়েছে। আমিই ব্যাঙ্কের পেছনের দরজা খুলে রেখেছিলাম,…কিন্তু পঞ্চুদাসের চেনা গলা আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম। এটাও কি আপনাদের সাজান ব্যাপার।

রতন ভট্চার্যকে সব বলা হল। শুনে সে হতবাক হয়ে গেল। এত কি সম্ভব!! রতনের কাছ থেকে পথনির্দেশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দল গাড়িয়ার স্টেশন রোডের একটা বাগানবাড়িতে হানা দিলেন। সেখানে বাকী তিনজন ডাকাতকে ধরা হল। তাদের কাছ থেকে পুরো পাঁচলাখ টাকার নোটই পাওয়া গেল। ক্যালকাটা ক্যাকটাস নার্সিং হোমের দারোয়ান তাদের একজনকে সনাক্ত করল। সেই পঞ্চুদাসকে নার্সিং হোমে পেঁছে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল!

এক হপ্তা পরে পঞ্চুদাস সুস্থ হলে সব খুলে বলা হল। সে বিশ্বাস করল ন। তখন টেপ বাজিয়ে তার পুরানো কথা শোনান হল। সে বজ্রাহত হয়ে গেল তারপর অনুতাপে ভেঙ্গে পড়ে বলল, ডাক্তারবাবু, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আমি অপরাধী, আমায় শাস্তি দিন। ডাঃ গুপ্ত বললেন অপরাধীর শাস্তি দেওয়া আমার কাজ নয়। সেটা যাদের কাজ তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর পুলিশ অফিসারকে ডাঃ গুপ্ত বললেন, পঞ্চুবাবুকে আপনি এখন পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন। তার শারীরিক বিপদের আশঙ্কা নেই। আরও বললেন, পঞ্চুবাবু আপনি সুস্থ হলে যথাযথ আপনার বিচার হবে। আমার কর্তব্য এখানেই শেষ।

গাভাসকার

শৈল শেখর মিত্র

উর্বশী কি স্বর্গ ছেড়ে
নাচছে মাঠের মাঝখানে,
ভিঞ্চি কি তার ফিনিসিং টাচ
দিচ্ছে তুলির শেষটানে,
তানসেন কি মল্লার গায়
ঝরছে সুরের আভাস তার !
আরে, না না—কভার ড্রাইভ
হাঁকায় সুনীল গাভাসকার।

ফুলটুসি

প্রবাস দত্ত

একটি মেয়ে ফুটফুটে খুব ; ফুলটুসি—
নাম যদি তার এমন তরো না-ই হবে,
বলতে পারো মন-ভরানো এই খুশি
ফুটবে ঘরের ফুল-বাগানে, ভাই, কবে ?
কেউ জানে কি ওই মেয়েটাই ফুল নাকি ?
সন্দেহ হয়, স্বপ্ন শুধুই—ভুল—ফাঁকি ?
তা' হলে দোল, খায় সে যখন, মা'র কোলে-
কোন কারণে ঘর ভরে তার সৌরভে ?
একটি পাখি মৌটুসি সে কার ডাকে
ভোর বেলা রোজ গান শুনিয়ে যায় তাকে ?
ফুলটুসি সে ফুলটুসি সে, ফুলটুসি—
একটি নামেই মানায় তাকে, তাই খুশি !

লোকটি

রমেশ দাশ



সে হাঁটছিল তো হাঁটছিলই। পথ আর কিছুতেই ফুরোয় না। কবে সে পথে বেরিয়েছিল, কোথা থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল, কোথায় সে যাবে কিছুই তার মনে নেই। সে শুধু হাঁটছে তো হাঁটছেই।

হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে, লোকটি কত বাঁকা নদী, সবুজ বন, সোনালি খেত, কত নীল পাহাড়, পুরোনো বট, ধু-ধু মরুভূমি, কত ছায়াভরা গ্রাম, পাখির কাকলি ভরা মৌমাছির গুঞ্জনভরা ফুলে ফুলে আলো করা কত বাগিচা (যা নিজে থেকেই হয়েছে) পেরিয়ে এলো।

ক্লান্ত হয়ে কতবার সে ঝরণার কাছে তার পুঁটুলিটি নামিয়ে রেখে আঁজলা পেতে জল খেয়েছে, গাছ থেকে পেড়ে কিংবা তলা থেকে কুড়িয়ে পাকা ফল খেয়ে খিদে মিটিয়েছে, তারপর গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ভাঙলে আবার সে চলা শুরু করেছে লাঠির ডগায় পুঁটুলিটা বেঁধে, পুঁটুলি শুদ্ধ লাঠিটা কাঁধে ফেলে।

একবার ভারী মজা হয়েছিল। খিদের জ্বালয়ে লোকটি একরাশ মহুয়া ফল খেয়ে ফেলেছিল। তারপর সে কী অবস্থা!

চলতে গিয়ে পা টলমল করছে, মাথা ঘুরছে বন্ বন্ করে। তখন সে পুঁটুলিটার ওপর মাথাটি রেখে সবুজ ঘাসের নরম গালিচার ওপর শুয়ে পড়লো। তখন ছিল শীতকাল। গাছপালা থেকে দিন-রাত্তির পাতা ঝরে ঝরে পড়ছিল। লোকটার ঘুম যখন ভাঙলো তখন সে অবাক হয়ে দেখে বসন্ত কাল এসে গেছে। সে বুঝতেই পারলো না কেমন করে এই কাণ্ডটা ঘটে গেল।

লোকটি চলছে তো চলছেই। চলাটাই যেন তার কাজ। কোন কিছুকে গ্রাহ্য না করেই সে চলেছে। কখনো সূর্য তার মাথার ওপর আগুন ঢেলে দিয়েছে, কখনো মেঘ বৃষ্টির ধারায় তাকে ভিজিয়ে দিয়েছে, কখনো বা উত্তুরে বাতাস তার হাড়ের ভেতর

কাঁপন জাগিয়েছে। কিন্তু তাতে কী? সেটাই তো সব নয়। তার চলার পথেই নীল আকাশে সাদা মেঘের বাহার আর সবুজ মাঠে কাশফুলের মাতন কি তাকে মুগ্ধ করেনি? মাঠ ভরা সোনালি ফসলের দিকে তাকিয়ে তার মন কি ঝলমলিয়ে ওঠে নি? সে কি ফুলে ফুলে গাছের ডাল ভরে যেতে দেখেনি? কোকিলের মিষ্টি গান শোনে নি সে?

চলতে চলতে লোকটা একটা একবার এক ভয়ংকর বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। সে বনের যেন শেষ নেই। সেখানে দিনের আলো ঢোকার রাস্তা খুঁজে পায় না সহজে। রাত্তিরের অন্ধকার ঘিরে আছে সারা বনটাকে। তারপর একটা গাছের তলায় বসতে না বসতেই লোকটা শুনতে পেল চারপাশ থেকে কারা যেন হাঁউ-মাউ-কাঁউ শব্দ করতে করতে ধেয়ে আসছে। সে দেখতে পেল আশেপাশের সব ঝোপে-ঝাপে কিম্ভূত কিমাকার সব ছায়া ছায়া মূর্তি তার দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলছে। সারা বন তোলপাড় হয়ে উঠেছে। ভয়ে লোকটার গলা কাঠ হয়ে উঠলো। সেই আলোয় বন থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পেয়েছিল সে। সেই আলো তার চোখে লাগা মাত্রই তার সমস্ত ভয় ঘুচে গিয়েছিল।

সে চলছে, চলছে, চলছে। কত বাঁকা নদীর কাজল জলে পা ডুবিয়ে, কত পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে, কত বন-অরণ্য ভেদ করে সে এগিয়ে চলেছে। কবে কোথা থেকে চলা শুরু করেছিল সেকথা সে ভুলে গেছে, কোথায় যে সে যেতে চায় তাও সে জানে না। শুধু জানে তাকে চলতেই হবে। তবে চলাটা তার বেশ ভালোই লাগে। পথে বিপদ-আপদ খানা-খন্দ কাঁটা-লতা আছে ঠিকই, কিন্তু সব কিছুকে তুচ্ছ করে চলাটা যে অনেক বেশি আনন্দের।

লোকটা বেশ কয়েকবার পথের ধারের সরাইখানায় আশ্রয় নিয়েছিল। সরাইখানাগুলো অদ্ভুত জায়গা। ঠুংরি—গজল, খানা পিনা, কত্থক-কথাকলি, আলোর রোশনাই, মিষ্টি মিষ্টি মুখ, মিষ্টি কথায় জম জমাট। তাকে ঘিরে কত লোক জমা হয়েছে সরাইখানাতে। কত খাতির করেছে তার। কিন্তু প্রত্যেক বারই একটা কাণ্ড ঘটেছে। কিছুক্ষণ পরে খানাপিনা মিটে গেছে, নাচ-গান থেমে গেছে, রোশনাই নিভে গেছে, যারা তাকে ঘিরে ছিল তারা তাকে ছেড়ে গেছে। প্রত্যেকবার, প্রত্যেকবার এটাই ঘটেছে। তাই লোকটা আর সরাইখানায় থাকতে চায় না।

পথ চলতে চলতে একদিন লোকটার দেখা হলো এক সন্ন্যেসীর সঙ্গে। কী রূপ, কী প্রশান্ত মুখখানি তাঁর! ঠিক যেন বুদ্ধের মতন। জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে তাঁর অঙ্গ থেকে। সন্ন্যেসী লোকটার সঙ্গে সঙ্গে কিছুক্ষণ চললেন। তারপর সন্ধ্যে নামলে দুজনে এসে বসলেন একটা কনক চাঁপা গাছের তলায়।

আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোর চারিদিক ভেসে যাচ্ছে। নদীর জলে রূপোর রঙ ধরেছে। মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বইছে। মধুর মধুর কথায় সন্ন্যেসী লোকটাকে বললেন—এগিয়ে যাও হে, কাঁধের বোঝাটা ফেলে দিয়ে এগিয়ে যাও।

সন্ন্যেসী চলে গেলেন। লোকটাও তার পথ ধরলে। হঠাৎ তার খেয়াল হলো—ঠাকুর যে বোঝাটা ফেলে দিতে বলেছেন। অমনি একে একে সে তার পুঁটুলির জিনিসগুলো ফেলে দিতে লাগলো। আশ্চর্য, যতই তার পুঁটুলিটা হালকা হতে লাগলো ততই তার মন উঠলো নেচে। শেষে সে তার পুঁটুলিটা ফেলে দিলে, তারপর তার লাঠিটা, এমন কি তার পায়ের নাগরা জুতোগুলো পর্যন্ত। এবার তার সারা মনটা কানায় কানায় ভরে উঠলো। নিজেকে ভারী হালকা মনে হলো তার। তার চলার গতি ভীষণ রকম বেড়ে গেল। শীত-গ্রীষ্ম জল-ঝড় কাঁটা-লতা কিছুতেই আর তার কোন কষ্ট বোধ হলো না। শুধু এক অদ্ভূত খুশিতে তার মনটা ভরে থাকলো।

সে ছুটে চললো, সে আর থামলো না। ছুটতে ছুটতে ছুটতে একদিন তার পথের শেষ খুঁজে পেল সে। সে দেখলো পথ এসে শেষ হলো যেখানে, সেখানে সব সময় রাশি রাশি ফুল ফোটে, ফুলের গন্ধে বাতাসে খুশির ঢেউ ওঠে। সেখানে অন্ধকার নেই, দুঃখ নেই, ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই। সেখানে আছে শুধু আনন্দ, আনন্দ আর আনন্দ।

সে দেখলো সেখানে যারা থাকে তারা যেন আলোর মানুষ। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে গেল কখন সে নিজেই তাদের মতো আলোর মানুষ হয়ে গেছে।

লোকটা হঠাৎ আবিষ্কার করলো—আরে, এই তো সেই জায়গা যেখান থেকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল। কী আশ্চর্য!

বুলানের মা

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়



আপনি এই সময়ে ? সাত সকালে হোস্টেলের গেটে অজিতবাবুকে দেখে দরোয়ান বেশ অবাক হল ।

—'বুলানকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই, আজই । কারণ…'

—'সে কী ।' কারণটা শুনে দরোয়ান চমকে উঠল ।

—হ্যাঁ, মাত্র একবেলার অসুখে…গ্রামের ডাক্তার, বদ্যি কেউই ঠেকাতে পারলেন না ।' অজিতবাবুর গলাটা কান্নায় জড়িয়ে এল ।

কিন্তু বুলানের যে পরীক্ষা চলছে ! আজই অবশ্য শেষ হবে !'

—'তাইতো ।' হঠাৎ আঘাত পেয়ে অজিতবাবু ভুলেই গেছলেন, বুলানের পরীক্ষার কথাটা । 'ভেবেছিলুম, বুলানকে নিয়ে সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরব । যাক্‌গে, পরীক্ষাটা না হয় দিয়েই নিক ? সন্ধ্যের বাসেই নাহয় ফেরা যাবে ।' অজিতবাবু নিজের মনেই বিড় বিড় করে উঠলেন ।

'সেই ভাল ।' দরোয়ানও প্রবোধ দিলেন অজিতবাবুকে । 'যা গেছে, তা তো আর ফেরার নয় । আমি বরং বুলানকে ডেকে আনি । তবে দেখবেন, আপনি যেন ভেঙ্গে পড়বেন না, ওর সামনে । খবরটা টের পেলে, ও আর কিছুতেই পরীক্ষা দিতে পারবে না ।'

'ঠিক !' দরোয়ানের কথাটা শুনে অজিতবাবু নিজের মনটাকে দৃঢ় করলেন ।

'বাবা তুমি ?' একটু পরের দৌড়ে এল বুলান ।

'কাছারীতে এসেছি, জরুরী কাজে । সেটা মিটিয়ে আজই তোমায় নিয়ে বাড়ি ফিরব ।' অজিতবাবুকে স্বাভাবিক ভাবেই উত্তর দিলেন । চেপে গেলেন আসল কথাটা । জানতে দিলেন না, কেন উনি সাত সকালে দৌড়ে এসেছেন বুলানকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে ।'

—'কিন্তু আমার তো এখন পরীক্ষা চলছে । আজই শেষে হবে । তারপরও তো স্কুল চলবে, আরো দশদিন । বুলান উত্তর দিল ।

—'সে আমি হেডস্যারের সঙ্গে কথা বলে নেব । তিনি নিশ্চয়ই আটকাবেন না

তোমাকে।' অজিতবাবুকে অমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে দেখে দারোয়ান হাঁফ ছাড়ল। ছুটির আগেই বাড়ি ফিরতে পারবে শুনে বুলানও খুশিতে ডগমগ করে উঠল। 'কাছারীর কাজ সেরে, হেডস্যারের অনুমতি নিয়ে আমি সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব। তুমি স্কুল থেকে ফিরেই রেডি থেকো। বাস ধরতে হবে, সন্ধ্যে ছটায়।' অজিতবাবু এগিয়ে পড়লেন।

বাসটা ছাড়তেই অজিতবাবু কেমন বিব্রত বোধ করলেন। এক মর্মান্তিক খবর বুকে চেপে রেখে সারাটা পথ ওকে স্বাভাবিক থাকতে হবে। বাড়ি পেঁছবার আগে কোন কারণেই বুলানের সামনে ভেঙ্গে পড়া চলবে না। ওকে বলা চলবে না, ওর ভাগ্যে কী চরম অঘটন ঘটে গেছে।

শীতের অন্ধকার পথ ধরে বাসটা ছুটে চলল। কী অসহ্য এই বাসজার্ণি। দুপাশের যত পথ-ঘাট যেন ভূতের রাজ্য। তার মাঝে এদিক ওদিক জ্বলে উঠছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী। কেঁদে উঠছে ভয়ার্ত পেঁচা, শেয়াল। ডাক ছাড়ছে গরু মোষেরা। এইখানকার মানুষজনদের এইভাবেই পেঁছতে হয় নিজের ঠিকানায়। এখানে না আছে রেলপথ, না অন্য কোন যানবাহন।

অজিতবাবু হাতঘড়িটা দেখলেন। রাত আটটা। আর একটু পরেই বাসটা পেঁছবে হৃদয়পুরে। রাতের বাসযাত্রীরা ওখানেই সেরে নেবেন ওদের নৈশভোজ। বুলান এখন ঘুমচ্ছে। বারবার হেলে পড়ছে ছেলেটা সামনের সিটের ওপর। হৃদয়পুরে পেঁছে অজিতবাবু ভাবলেন, বুলানকেও কিছু খাইয়ে নিতে হবে। সারাটা দিন পরীক্ষা দিয়ে ছেলেটা খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

একী! অজিতবাবুর চিন্তাকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে বাসটা হঠাৎ ছিটকে পড়ল পথের ধারে।···বুঝিবা কোন গভীর খাদে। আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বাসের যত যাত্রীদের আর্তনাদ। বাসের আলোগুলোও হঠাৎ নিভে গেল। তবে কী এক্সিডেন্ট হল নাকি! অজিতবাবুও ছিটকে পড়লেন তাল গোল পাকিয়ে বাসের কোণে। শুধু ওর মাথার ওপর জ্বলতে লাগল বাসের একটা আলো। টিমটিম করে।

'বাসের ভেতর জল কেন?' অজিতবাবু নিজের পায়ের তলায় জলের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলেন। তবে কী আমরা কোন জলায় পড়েছি?

কথাটা ভাবতেই অজিতবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। বুকটা ভয়ে কুঁকড়ে গেল। তিনি লক্ষ্য করলেন, ইতিমধ্যে বাসের অনেক যাত্রীই বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন। ছিটকে পড়েছেন সব এদিক ওদিক। শেষে আমিও কী ওদের মত বেহুঁশ হয়ে যাব নাকি? তারপর ডুবে যাব জলের গভীরে? কিন্তু বুলান কই? অজিতবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন, নিজেকে সজাগ রেখে বুলানকে খুঁজে বার করতে। ওর অনুসন্ধানী চোখ দুটো খুঁজে বেড়াতে লাগল বুলানকে।

'ওই তো বুলান!' দূরে একটা সিটের নিচে বুলানকে দেখে অজিতবাবু চমকে উঠলেন। রক্তমাখা মুখটা দেখে ছেলেটাকে মোটে চেনাই যাচ্ছে না। অজিতবাবুর

চোখের সামনে সব কেমন যেন নিভে আসতে লাগল···বাসের আলোটা ছুটতে ছুটতে কোথায় যেন দূরে সরে যেতে লাগল। বাসের আটকে পড়া কজন যাত্রীর আকুল চিৎকারে অন্ধকারটা যেন ভেঙ্গে পড়তে লাগল টুকরো টুকরো হয়ে।

'আলো জ্বালুন···আলো জ্বালুন'···বাসের ভেতরের আলোগুলো কেউ যেন জ্বেলে দিল···একী! কারা যেন চেঁচাচ্ছেন বাইরে থেকে? তবে কী আমাদের কেউ উদ্ধার করতে এলেন নাকি? বাসের বাইরে আঁধারের বুক চিরে অমন করে কজনকে চেঁচাতে শুনে অজিতবাবু উঠে দাঁড়ালেন। চেষ্টা করলেন, জানালার বাইরে তাকাতে। যদি কিছু দেখা যায়!

ঠিক, ঠিক। ওই তো, কারা যেন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাদের চিৎকার শুনে সত্যিই দেখছি কারা যেন এগিয়ে এসেছেন। অজিতবাবু দ্রুত নিজের পকেট থেকে টর্চটা বার করে জ্বেলে ধরলেন। আর তাই দেখেই বাইরের যত লোকজন ধুপধাপ লাফিয়ে পড়ল জলের মাঝে। অজিতবাবু বুঝতে পারলেন বাসটা ছিটকে পড়েছে একটা ছোট জলার ভেতর।

উদ্ধারকারীদের গলার আওয়াজ পেতেই, যারা জ্ঞান হারাননি তাঁরা সবাই চেষ্টা করলেন কোনরকমে বাসের দরজার দিকে এগিয়ে যেতে।

'একী! আপনারা পালাচ্ছেন কেন?' অজিতবাবু তাদের পালিয়ে যেতে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। আগে এদের উদ্ধার করুন। অজিতবাবু ওর হাতের আলোটা ফেলে দেখালেন, বাসের এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে কজন অজ্ঞান, অচৈতন্য মানুষ।

'—তাইত! আমরা বেরিয়ে গেলে এদের বাঁচাবে কে!' অজিতবাবুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাসের যে কজন তখনও সুস্থ ছিলেন, তারা সবাই লেগে পড়লেন। অজ্ঞান মানুষগুলোকে তারা একে একে বার করে তুলে দিলেন উদ্ধারকারীদের হাতে। তারা তাদের নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে লাগলেন পথের ধারে অপেক্ষমান একটি জীপে। অজিতবাবু বুঝতে পারলেন, ওটা পুলিশের গাড়ি! যথাসময়ে ওদের উদ্ধার করতে সবাই এসে পড়েছেন বুঝে উনি মনে মনে বেশ নিশ্চিন্ত হলেন। এবার বেশ সাবধানে উনি বুলানকেও তুলে দিলেন উদ্ধারকারীদের হাতে। তারপর উনি নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাস থেকে জলার মাঝে।

জলাটা তেমন গভীর নয়। অজিতবাবু ছপ্‌ছপ্‌ করে জল ভেঙ্গে এগিয়ে চললেন ডাঙ্গার দিকে। একী! জীপটা স্টার্ট করছে কেন? উনি যে এখনও বাইরেই পড়ে আছেন। অজিতবাবু দৌড়ে গিয়ে পুলিশ অফিসারের হাত দুটো চেপে ধরলেন। 'আমাকেও তুলে নিন স্যার···ওই আহতদের মাঝে আমার ছেলেটাও যে···'

'কিন্তু গাড়িতে যে তার জায়গা নেই। আপনারা বরং হেঁটে আসুন। আমরা আগে আহতদের পেঁাছে দিই হাসপাতালে। এই তো কাছেই।' পুলিশ অফিসার দ্রুত স্টার্ট দিলেন নিজের গাড়িতে। অজিতবাবুও সবার সঙ্গে হেঁটে চললেন হাসপাতালের দিকে। হৃদয়পুর হাসপাতাল এখান থেকে মাইল চারেক। লম্বা লম্বা পা ফেলে

সবাই ছুটে চললেন সেই দিকে। ভোরের আলো ফুটছে দেখে অজিতবাবু অবাক হলেন। কে জানে, কতক্ষণ ওই জলার মাঝে ওরা বন্দী ছিল।

—'গ্রামের ছোট হাসপাতালে সেরে উঠবে তো এইসব জটিল রোগীরা? অজিতবাবু হঠাৎ নিজের মনেই বলে উঠলেন।

—'তাই তো ভাবছি।' পাশের লোকটি উত্তর দিলেন। 'ওখানে না আছে তেমন ওষুধ বিষুধ আর না আছে ডাক্তার-নার্স।'

'আপনি জানলেন কী করে?'

ওর পাশের গ্রামেই যে আমার বাড়ি। তাইতো এমন ছুটছি হাঁকপাঁক করে। আমরা পেঁছে, ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করতে পারলে, তবেই যদি ওনারা পারেন এদের বাঁচিয়ে তুলতে। আহতদের ভেতর আমার বাবাও আছেন। কী যে হল। পরের স্টপেই আমার নামার কথা। আর তার আগেই···

হাসপাতালে পেঁছেই অজিতবাবু লক্ষ্য করলেন, সবাই কেমন যেন ব্যস্ত। দৌড়াদৌড়ি করছেন সবাই এদিক ওদিক।

—'আমার ছেলে? বুলান কই, বুলান?' অজিতবাবু প্রশ্ন করলেন দারোয়ানকে।

ছেলে? বয়স কত?'

'চোদ্দ।'

'আপনি দোতলায় দেখুন। ওপরের ওয়ার্ডে অমন একজনকে রাখা হয়েছে।' দারোয়ান উত্তর দিল।

'সে ভাল আছে? ডাক্তারবাবু দেখছেন তাকে?' অজিতবাবু ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'ডাক্তারবাবুরা এখন দেখছেন শুধু যত জটিল রোগীদের। আপনার ছেলে তো শুধু আঘাত পেয়েছে নাকে।' দারোয়াদ উত্তর দিল।

"সেকী! ডাক্তারবাবু এখনও দেখেনইনি বুলানকে!' কথাটা শুনেই অজিতবাবু দৌড়লেন দোতলায়।

'ওই তো বুলান।' ওয়ার্ডে পেঁছে দূরে বুলানকে শুয়ে থাকতে দেখে অজিতবাবু গিয়ে দাঁড়ালেন ওর পাশে।

'বাঃ, বুলান তো ঘুমচ্ছে! ওর চোখ মুখে তো দেখছি রক্তের কোন চিহ্নই নেই। কিন্তু কে ওর মুখটা অমন যত্ন করে মুছিয়ে দিল? ওয়ার্ডে তো কোন সিস্টারও দেখছি না! তবে? ছেলেটা কাল থেকে কিছু খায়নি। এবার ওকে কিছু খাওয়ানোর দরকার। 'বুলান, একটু দুধ খাবে?' কথাটা মনে হতেই অজিতবাবু ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। আদর করে প্রশ্ন করলেন।

'খেয়েছি।' বুলান উত্তর দিল ক্ষীণ স্বরে। 'মা দিয়েছে।'

'সেকী!' বুলানের উত্তর শুনে অজিতবাবু চমকে উঠলেন। ছেলেটা কী তবে ভুল

বকছে ? ওর মাথার নিচে দেখছি বালিশ নেই ! বুলান বালিশ ছাড়া শুতে পারে না।
অজিতবাবু এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলেন। যদি কোথাও পাওয়া যায় একটা বালিশ।
ব্যস্ত হয়ে উনি প্রশ্ন করলেন বুলানকে, 'একটা বালিশ দেব বাবা তোমায় ?'
'না।' বুলান আগের মতই উত্তর দিল। 'আমি এখন মায়ের কোলেই শুয়ে থাকব।'
'আশ্চর্য। এসব কী বলছে!' অজিতবাবু বুলান-এর উত্তর শুনে স্তম্ভিত হলেন।
বুলানের মা ওকে দুধ খাইয়েছেন, কোলে নিয়ে বসে আছেন ? কিন্তু সে তো…
অজিতবাবু আর ভাবতে পারলেন না। শুধু নিজেকে প্রশ্ন করলেন, সন্তানকে ছেড়ে মা কী কখনও থাকতে পারে ? থাকা কী সম্ভব ?

সুকুমার রায়

জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

'ব্যাকরণ না মানার' খোলা ময়দানে
'বকচ্ছপ', 'হাঁসজারু', 'হাতিমি'রা আনে
উদ্ভট পেটফাটা হাসি। ঠেলা সামলাও
সঙ্গে তার 'হুঁকোমুখো সেই হ্যাংলাও'
স্বয়ং হাজির হয়। সঙ্গে থাকে খাস
'হট্টমূলা' গাছ, নিচে 'কুমড়োপটাস'।
যা হবে তা হোক চুরি, 'গোঁফ চুরি' হলে,
ব্যাপারটা মারাত্মক যে জানে সে বলে।
'পাঁউরুটি তাতে যেন ঠুকোনা পেরেক'
দেখবে চললো ঠোকা, নেইতার ব্রেক।
যেখানেই যাবে যেও একটি লাইনে
নইলেই পড়ে যাবে, 'একুশে আইনে'।
এ সব শিখবে বলে মন যদি চায়
একশো বছর পড় সুকুমার রায়।

জীবন্ত দেবতা



শঙ্করনাথ ভট্টাচার্য

স্বামী বিবেকানন্দ। নামটা আমাদের সবার কাছেই প্রিয়। সবাই ভালবাসে এই নামটাকে। তিনিও ভালবাসতেন সবাইকে।

তিনি যে কত বড় সাহসী আর উদারচেতা মানুষ ছিলেন সে তো আমরা তাঁর জীবনী পড়েই জানতে পারি। মনে পড়ে—সেই ছোটবেলায় নৌকো করে বেড়াতে যাওয়া বন্ধুবান্ধব মিলে, তারপর মাঝিদের সঙ্গে তর্কাতর্কি, ঝগড়া, নদীতীরে গোরা সাহেবদের হঠাৎ আবির্ভাব। বালক নরেন্দ্রনাথের সাহসে বুক বেঁধে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো, তারপর মাঝিদের ভয়ে ভয়ে তীরে নৌকো ভেড়ানো। এমনি কত অজস্র ঘটনাই না ছড়িয়ে আছে। সে সব বই পড়ে জেনে আমরা অবাক হয়ে যাই যে সে মানুষটির এত ক্ষমতা এল কোথা থেকে।

আমরা সবাই জানি যে যুবক নরেন্দ্রনাথ মহাপুরুষ রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য হয়েছিলেন। এই দুই মহান পুরুষের যোগাযোগ সেদিন বাংলাদেশে জ্বল জ্বল করে উঠেছিল। সেদিনকার গর্বিত বাংলার সৌভাগ্যটা একবার কল্পনা করলে আনন্দে বুকটা ভরে ওঠে না কি?

সে যাইহোক—রামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের পরের কথা বলছি।

নরেন এখন স্বামী বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণদেবের স্বপ্নকে, আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে গঙ্গার ধারে তিনি বেলুর মঠ তৈরী করালেন।

স্বামীজী চাইলেন যে এই মঠে যে সব মানুষ কর্মী হিসেবে রয়েছে, বা আরও যারা আসবে তারা নিজেদের জন্যে কিছুই চাইবে না—তাদের সবাইকে তিনি গড়ে নেবেন। যে দেশ গরীব, অক্ষর-জ্ঞান যে দেশের মানুষের কম, যে দেশের মাটিতে তিনি জন্মেছেন যার বুকের দুধ খেয়ে তিনি বড় হয়েছেন, সেই দেশকে তিনি বড় করে তুলবেন। প্রাণ দিয়ে তার সেবা করে যতটা সম্ভব তাকে জগতের সামনে তুলে ধরে মহিমান্বিত করে তুলবেন। তাই ঠিক করলেন যে এই মঠে যারা থাকতে আসবে তাদের সবাইকে তিনি এই মাটি-মা'র সেবা করতে উৎসাহ দিয়ে তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুলবেন।

কিন্তু তখনকার ভারতবর্ষ—কি সংস্কারাচ্ছন্নই না ছিল। পুরাতন কতকগুলো সংস্কার আঁকড়ে ধরে সে কালের সমাজের কর্তারা দাঁড়িয়েছিলেন। ধর্মকে সামনে খাঁড়া রেখে তাঁরা যথেষ্ট অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। নিজেদের যা খুশী তাই করতেন ওই সব সমাজকর্তারা। তাঁরা জোর জবরদস্তি করে অন্যান্য মানুষদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে যা খুশী তাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিবেকানন্দ বুঝলেন যে এই অবস্থায় তাঁর স্বপ্নকে সফল করে তুলতে কি ভাবে কষ্ট পেতে হবে।

তাই তিনি এইসব দরিদ্র অজ্ঞ মানুষগুলোর মধ্যে নেমে পড়লেন। তাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন।

মঠের মাঠে অনেক সাঁওতাল কুলি কাজ করতে এসেছিল। তারা সর্বদাই সসঙ্কোচে থাকে—কি জানি বাবা। যদি কিছু ভুলত্রুটি হয়ে যায়। কেননা অন্য সব জায়গাতেই বিনা দোষে বিনা কারণে তারা যন্ত্রণা পেয়েছে, লাঞ্ছনা পেয়েছে। তাদের নানাভাবে নিপীড়ন করা হয়েছে। এখানে তাই তারা ভয়ে ভয়ে থাকে। এ তো আবার সাধু-সন্ন্যাসীদের ব্যাপার। সুতরাং শাস্তিটাও হয়ত এখানে বেশী পরিমাণেই হবে। হওয়া অস্বাভাবিক নয় এ অবস্থায়।

কিন্তু আশ্চর্য! একদিন হঠাৎ তারা বুঝতে পারল যে এই মঠের মাঠে সেখানে তারা কাজ করছে—সেখানে তাদের মধ্যে মাঠেরই এক সাধুজী হাজির, তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন, যেন স্বপ্নের মানুষ। তারা আরও লক্ষ্য করল যে এই গুরু-জীকে মঠের অন্য সবাই-ই শ্রদ্ধা করছে, তার কথা শুনছে। বোঝা গেল যে এই মানুষটিই এখনকার সবচেয়ে বড়। ইনিই তাহলে এই মঠের গুরুদেব। কিন্তু এ কেমন গুরুদেব! যিনি তাদের মতো কুলিকামিনদের সঙ্গে মেশেন? তাদের ঘরের মানুষের মত যার ব্যবহার? তারা বেশ একটু অবাক হল। ভয়ও পেল। কি জানি বাবা কি মতলব আছে। কিন্তু স্বামীজী এদের সব দুঃখ, সব ভয় ঘুচিয়ে দিলেন। তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে ওরা যা তিনিও তাই, একই মাটির মানুষ। দুজনেরই সমান শরীর একই অন্নে দুজনেই বেড়ে উঠেছেন।—সুতরাং সঙ্কোচের কোন প্রয়োজন নেই।

এমনি সময়—একদিন মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী কতকগুলো ফাইল নিয়ে স্বামীজির কাছে হাজির।

—কি ব্যাপার? মঠ সংক্রান্ত কিছু দরকারী কাগজপত্র তাঁকে দেখে দিতে হবে এখনি। খুবই জরুরী এসব।

বিবেকানন্দ কি করলেন?

ফাইলগুলো তাঁদের হাত থেকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলের মাঠের মধ্যে। বললেন, তোরা সব কিরে? হ্যাঁ, চিরকালই কি তোরা এমনি থাকবি? পুঁথিপত্তর, ফাইল নজির কি তোরা ছাড়তে পারবি না। কতকগুলো শুকনো কাগজ—বাস্তবে চোখ খুলে দেখ। এই যে মানুষগুলো কাজ করছে এরাই তো সত্যিকার ভগবান। এদের সেবা কর।

এদের কথা ভাব। তবেই দেখবি অন্য সব কাজ আপনিই হয়ে যাচ্ছে। ফাইলে সই করলেই যদি কাজ হয় তাহলে আর দুঃখ থাকতো না।

লজ্জায় অধোবদন সন্ন্যাসীরা ফাইল-পত্র কুড়িয়ে নিয়ে পালিয়ে বাঁচলেন।

আর কুলিকামিনগুলো? তারা বুঝতে পারলে—এই হল আসল ভগবান। জীবন্ত দেবতা।

মাতৃ বন্দনা

সুরজিৎ রায়

আসছে কে ওই এলোকেশী! আয় ছুটে সব যা দেখে,
ত্রিশূলে সে অসুর গাঁথে, সিংহ পিঠে পা রেখে।
হাতে যে তার ভীষণ কৃপাণ—
করবে ধরার পাপের বিধান;
দশহাতে তার অস্ত্র ভীষণ, ত্রিনয়নে ত্রিলোক দেখে।
একদিকে দেব-সেনাপতি, পাশেতে তার বীণাপাণি,
আর দিকেতে গণপতি, তার পাশেতে লক্ষ্মী রাণী,
এদের দেখে যতেক পাপী—
পাপকে স্মরি' উঠছে কাঁপি;
অধরে তার মিষ্ট হাসি, নির্দোষী পায় অভয় বাণী।
চন্দ্র, রবি, ইন্দ্র, পবন, সব দেবই তার স্তুতি করে,
ইচ্ছেতে তার ঘটে সবই, যা ঘটছে এই ত্রিলোক' পরে।
তিন নয়নে আগুন জ্বলে,
পাপীরে সে পায়ে দলে;
পুণ্যবানে দেয় সে অভয় অভয়মুদ্রা কোমল করে।
নয় তো সে নয় অন্য কেহ, আমাদেরই ঘরের মেয়ে,
মায়ের স্নেহ, মায়ের ক্ষমা, নামছে যে তার ত্রিচোখ বেয়ে।
বাপের বাড়ি আসছে মেয়ে,—
আসছে সাথে ছেলে মেয়ে।
আসছে উমা; মা মেনকা গুণছে প্রহর পথটি চেয়ে।



পুনর্জন্ম

ছন্দা বাগচী

রাত তখন দেড়টা হবে প্রায়। ফারাক্কা ব্রীজের ওপর ট্রেনটা উঠেছে। গুম্ গুম্… গুম্ গুম্ শব্দের সাথে সাথে ট্রেনটা যেন দুলে উঠল। তারপর এক সময় মনে হল কাত হয়ে যাচ্ছে, আর ওপরের বাঙ্ক থেকে সব শুদ্ধ ছিঁড়ে আমি হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছি। সমস্ত কম্পার্টমেন্টের যাত্রীরা সকলেই তখন প্রায় ঘুমিয়ে। আমি বেশ বুঝতে পারলাম সকলেই বোঝবার আগেই যাত্রীসহ বগিটা দুমড়ে—মুচড়ে যাচ্ছে। ভয়ে আতঙ্কে আমার গলা দিয়ে শেষ মুহূর্তে একটা আর্ত চিৎকার বেরিয়ে এল। আমি ধপ্ করে নিচে গড়িয়ে পড়লাম।

আমার সারা গা ঘামে সপ্ সপ্ করছে। বুকে আর মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। আমি চেয়ে দেখি সত্যিই বাঙ্ক থেকে পড়ে গেছি। আমার চিৎকারে অপূর্ব আর অনুপম ঘুম চোখে জেগে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।—"কি হল স্বপ্ন-টপ্ন দেখছিলে নাকি? অমন চিৎকার করে গড়িয়ে পড়লে কেন?" আমার তখন গলা শুকিয়ে কাঠ। ওদের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলাম। চোখে মুখে জল দিয়ে ফিরে এসে ফের নিজের সিটে শুয়ে পড়লাম। দেখি অপূর্ব-অনুপম পাশ ফিরে শুয়েছে।

আমার মত অপূর্বও উত্তরবঙ্গে ডাক্তারী পড়ছে। অনুপম দার্জিলিং কনভেন্টে পড়ে। বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় বাড়ী ফিরছিলাম। ট্রেনেই আমাদের সবেমাত্র বন্ধুত্ব হয়েছে। আমাদের সিট্ পর পর তিনটে। মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস আমার সিটটা নিচেয় ছিল। নাহলে এতক্ষণ হাড়গোড় ভেঙে…। আর উল্টো দিকের তিনজন, হয় কুম্ভকর্ণ না হয় ব্রীজের গুম্ গুম্ শব্দে আমার চিৎকার শুনতে পায় নি। না হলে কি লজ্জাই পেতাম।

বাকি রাতটুকু আর কিছুতেই ঘুমুতে পারলাম না। কেমন একটা আবছা তন্দ্রার মধ্যে মনটা ভারি হয়ে থাকল। ধীরে ধীরে চোখের সামনে অন্ধকার পাতলা হয়ে আলো ফুটতে লাগল। প্রতিদিনই পাহাড়ে সূর্যোদয় দেখি। কিন্তু ট্রেনে যেতে যেতে ভোর হতে দেখার কি যে আনন্দ। কি যে সে অভিজ্ঞতা! রাত্তির কুয়াশার পর্দা ভেদ করে উঁচু-নিচু বিচিত্র-বিকৃত স্বরগ্রামে হকারদের চিৎকার, যাত্রীদের ওঠা-নামার ব্যস্ততা, তারপর কোন এক স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেনটা ফোঁস্ ফোঁস্ নিঃশ্বাস ছেড়ে রাতভর ছুটে আসার ক্লান্তি দূর করে। এমনি ভাবেই দেখতে দেখতে কখন যেন পর্দাটা সরে গিয়ে একফালি হলুদে আলো লম্বা হয়ে প্লাটফরমে ছড়িয়ে পড়ল।

পিঠে একটা আলতো ছোঁয়া পেয়ে ফিরে তাকাই—গুড মর্নিং। আবার কি ভয় পেলে?" অপূর্ব বাঙ্ক থেকে নেমে এসেছে। আমিও হেসে সুপ্রভাত জানাই। অনুপম তখনও ওপরের বাঙ্কে ঘুমোচ্ছে। অপূর্ব বলল—"তোমাকে টায়ার্ড লাগছে। রাতে আর ঘুমোও নি বোধহয়? অমন চিৎকার করে গড়ালে কেন? কোন খারাপ স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছিলে? আমি বললাম—"স্বপ্ন কি সত্যি জানি না, কিন্তু যখনই ট্রেনে ব্রীজ ক্রস করি, কেমন- এক আতঙ্কে মনে হয় এক্ষুণি সবশুদ্ধ ভেঙে চুরমার হয়ে নদীতে পড়ে যাবো। তারপর…।

অপূর্ব একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করেই বলল—"ইট ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। কোন কারণে তোমার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছে।" আমি প্রায় ওর কথার প্রতিধ্বনি করি—"ইয়েস। ইট ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট। আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে। তেজপুর থেকে একটা ট্রেন কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। রাত তখন ন'টা-সাড়ে ন'টা হবে। ট্রেনটা ঝুম্‌ঝুম্ শব্দ করতে করতে একটা ব্রীজের ওপর উঠল। সেটা সেপ্টেম্বর মাস। খরস্রোতে ভয়াল পাহাড়ী নদী নিচে বয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে আকাশ বাতাস আর্তনাদে বিদীর্ণ করে পেছন থেকে চারখানা বগি ভেঙে পড়ল সেই নদীতে। মুহূর্তে সব আর্তনাদ বুদ্‌বুদের মত ভয়ঙ্কর নদীতে এলোপাথারী ধাক্কা খেতে খেতে তলিয়ে, গড়িয়ে ভেসে যেতে লাগল।

কলকাতার ব্যবসায়ী দ্বিজেন রায়ও আরও অনেক হতভাগ্যের সাথে ভেসে যাচ্ছিলেন। কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিখ্যাত ব্যায়ামবীর বিষ্টু ঘোষের ছাত্র দ্বিজেন রায় হাতের

মুঠোতে এ্যাটাচি কেস ভর্তি টাকা ধরে তখনও স্রোতের সাথে লড়ে যাচ্ছেন। জলের তলার কামরা থেকে কি ভাবে যে ব্যাগ সহ বেরিয়েছিলেন কে জানে ? কিছুদূর ভাসতেই আর একজন তার সামনে ভেসে আসে। তখন অজান্তেই দুজন দুজনের অবলম্বন হয়ে হাত ধরেন। ভাসতে ভাসতে দ্বিজেনবাবু ভদ্রলোককে বলেন—তাঁর বাড়ী মানিকতলার কো-অপারেটিভ হাউসিং এস্টেটে। দশ বছরের ছেলে সহ স্ত্রী, বুড়ো বাবা-মার কথা। ভদ্রলোকও বলেন—আমরা কেউ যদি প্রাণে বাঁচি বাড়ীতে খবর দেব। কথা বলতে বলতেই একটা বিশাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে ওঁদের ওপর। দুজনে ছিটকে যান। কিন্তু কি নিয়তি, ব্যাগটা এসে পড়ল সেই ভদ্রলোকের কাছে। ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে হাবুডুবু খেতে খেতে ভদ্রলোক মাথা তুলে দ্বিজেনবাবুর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ডাকেন। কিন্তু সব ছাপিয়ে কলকল শব্দে পাহাড়ী নদী নিষ্ঠুর হেসে ওঠে। ভদ্রলোক প্রায় অচৈতন্য ব্যাগটা ধরে ভাসতে ভাসতে নদীতে ঝুলে থাকা এক কাঁটা ঝোপ পাথরের সাথে জড়িয়ে যান। মৃত্যুর সাথে লড়ে কোন ভাবে সেই কাঁটা ঝোপের পাশে উঠে আসেন। তারপর সরকারের উদ্ধারকারী হেলিকপ্টার কিভাবে উদ্ধার করে তার জানা নেই। আর আশ্চর্য। সেই টাকার ব্যাগও খোয়া যায় নি। ভদ্রলোক দ্বিজেনবাবুর শেষ কথা রেখেছিলেন। পুলিশের সাহায্য নিয়ে বাড়ীতে এসে টাকা শুদ্ধ ব্যাগ তার স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের প্রথম ও শেষ সাক্ষাতের কথা বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

সেই থেকে আজ চোদ্দ বছর দ্বিজেনবাবুর বাড়ীর লোকের পথ চাওয়ার শেষ নেই। বুড়ো বাবা-মা হিন্দুদের নিয়ম মত বারো বছর প্রতীক্ষার পর ছেলে-বৌকে বিধবার বেশ পরতে দেন নি। একাদশীতে অবশ্যই মাছের মাথা পাতে দেন। দ্বিজেনবাবুর স্ত্রী সিঁদুর-আলতা পরে দ্বিজেনবাবুর ফটোর সামনে প্রণাম করেন, ধূপ দেন না। দ্বিজেনবাবুর দশ বছরের ছেলে টাবলু আজ চব্বিশ বছরে পা দিয়েছে। এর মধ্যেই সে পৃথিবীর অনেক কিছু নিষ্ঠুরতার সাথে পরিচিত হয়েছে। সে জানে, বাবা বেঁচে নেই। থাকতে পারে না। আগে আগে ভাবত বাবা ফিরে আসবে, ফিরে আসুক। এখন তা চায় না। কারণ যদি টাবলুর বাবা থাকত তবে যেখানেই থাক ফিরে আসত। বেঁচে থেকে উপচ্ছায়া ফিরে লাভ কি? সেই ছত্রিশ বছরের বাবা জলের তলায় হারিয়ে গেছে। সরকার এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। তাই দিয়ে টাবলুদের বাড়ী হয়েছে। বাবা ফিরে এলে তো··· ।

গল্প শুনতে শুনতে অপূর্ব একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে। অনুপমও ততক্ষণে এসে বসেছে পাশে।

নীরবতা ভেঙে সে-ই কথা বলে—জানো ওই ট্রেনে আমার বাবাও ছিলেন। আর ভাগ্য ভাল বলে···

—"বেঁচে গেছেন তো ?" আমি বলি—"হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তবে প্রায়ই তোমার

মত ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে কারো কারো নাম ধরে চেঁচিয়ে ওঠেন। মা বলেন ছোটবেলার মেমারী ফেল করেছেন। সেইসব কোন স্মৃতি।" অনুপম ওর বাবার কথা বলল। ট্রেনে চড়লেও নাকি নার্ভাস হয়ে পড়েন।

এক সময় গাড়ী হাওড়া এসে গেল। ওদের দুজনের সাথে আমিও দরজার দিকে এগোলাম। অনুপম চেঁচিয়ে ওঠে—"দাদা, ওই দ্যাখ ড্যাড আর মামি।" ওরা নামতে নামতে হাত নাড়ে—"হ্যালো ড্যাড···কাম হিয়ার।" তারপরই আমার হাতে টান মারে—"কাম্ এ্যাণ্ড মিট্ আওয়ার ড্যাড-মাম্।"

কিন্তু একি হল? আমার সমস্ত পায়ের তলার মাটি বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল। নিজের অজান্তে গলা দিয়ে বেরিয়ে এল—"বাবা···আমি টাবলু···।" আমি বেশ বুঝতে পারলাম চারজোড়া চোখ দারুণ চমকে হাঁ হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। আমি শুধু অনুপমের ড্যাডকে দেখছিলাম। অপূর্ব ঝাঁকি দিয়ে আমায় বলল—"কি হল তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?" অনুপমের বাবা এগিয়ে এলেন—"কাম অন্ মাই বয়! আমার সাথে গাড়ী আছে, তোমাকে পৌঁছে দেব। কোথায় তোমার বাড়ী?" মুহূর্তে আমি সামলে নিলাম।—"না—না, ঠিক আছে। আপনাকে দেখতে একদম আমার বাবার মত। আমার বাবা হারিয়ে গেছে কিনা তাই হঠাৎ দেখে···"

অনুপম বলে ওঠে—"হ্যাঁ ড্যাড। সেই তোমার মত তেজপুরের ট্রেন অ্যাক্সিডেণ্ট।" অনুপমের বয়স কম, তাই বেশী কথা বলছে। আমি অনেকক্ষণ থেকেই লক্ষ্য করছিলাম, অনুপমের মা আমার সাথে একটাও কথা বলেনি। অপূর্বও একদম চুপ হয়ে গেছে।" ঠিক এই সময় অপূর্বর বাবা আপন মনে আমার দিকে চেয়ে "তেজপুর··· তেজপুর···বিড়বিড় করতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্বর মা তাড়া লাগালেন যাবার জন্য। ওরা হাত নাড়তে নাড়তে চলে গেল। আমি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আবার বাবার পুনর্জন্ম দেখলাম। সেই না দেখা লোকটার জন্য বুকের তলা থেকে একটা কান্না দলা পাকিয়ে এসে গলা বন্ধ করে দিল।

উদ্ধত যুবরাজ

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়



অনেকদিন আগে এক রাজ্যে, রাজার একমাত্র ছেলে এক যুবরাজ ছিলেন। তিনি দেখতেও যেমন সুন্দর, বুদ্ধিও তেমনি আর তাঁর মনও ছিল খুব দয়ালু। কিন্তু তাঁর স্বভাবটা ছিল একটু উদ্ধত। নিজে খুব সুন্দর ছিলেন বলে তিনি চাইতেন যে সব কিছুই সুন্দর হোক; কুৎসিত কোন জিনিষ তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

একদিন তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে শিকার করতে বেরিয়ে রাস্তার ধারে বসে দুপুরের খাওয়া সারছিলেন। এমন সময় একটি বুড়ো লোক একটি বাজে ঘোড়ায় চেপে ঐখান দিয়ে যেতে যেতে ওদের কাছে এসে থামল। বুড়ো লোকটির পিঠে ছিল একটা কুঁজ, দেখত এক-চোখে আর তার ঘাড়টি ছিল বাঁকা। তার পরণে ছিল ছেঁড়া ময়লা জামাকাপড়। তার ঘোড়ার অবস্থাও তেমনি। ঘোড়াটি ছোট, পেট মোটা, লম্বা চুল, সামনের একটি পা আবার খোঁড়া—সব মিলিয়ে দেখতে অতি কদাকার।

লোকটিকে এবং ঘোড়াটিকে দেখে যুবরাজ ত কেঁপে উঠলেন। তিনি তাঁর বন্ধুদের বললেন—এদেরকে চোখের সামনে থেকে সরাও। এত ভয়াবহ ও কুৎসিত কোন কিছু আমি সহ্য করতে পারি না। বন্ধুরা তাড়াতাড়ি বুড়ো লোকটিকে ওখান থেকে সরিয়ে দিল।

বুড়ো লোকটিকে দেখে যে রকম মনে হচ্ছিল, আসলে কিন্তু সে ওরকম নয়। সে একজন বড় জাদুকর। এরকম সাজপোষাকে ও চেহারায় সে সব সময় থাকত না। কয়েকদিন পরে একদিন যুবরাজ যখন বনের মধ্যে একা যাচ্ছিলেন, তখন সেই এক-চক্ষু বুড়ো লোকটি আবার তার সামনে এসে হাজির। সে তার হাতের লাঠিটি দিয়ে তাকে স্পর্শ করে বলল—এইবার তুমি বুঝতে পারবে আমার মত বুড়ো, ছোট ঘোড়া হলে কেমন লাগে। যতদিন পর্যন্ত কোন রাজকন্যা তোমাকে তার 'সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু' বলে না ডাকবে, ততদিন তুমি ছোট কদাকার ঘোড়া হয়েই থাকবে। এই কথা বলতে বলতেই সুন্দর যুবরাজ একটি কুৎসিত ছোট ঘোড়া হয়ে গেল।

নিজের ওপরই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিনি ছোট ঘোড়া হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতে

লাগলেন। তিনি জানতেন যে তার বাবার প্রাসাদে ফিরে গিয়ে কোন লাভ নেই, কেননা সেখানে এখন কেউই তাঁকে চিনতে পারবেন না। দু-তিনদিন ধরে তিনি বনেই ঘুরে বেড়ালেন। একদিন তার সঙ্গে একটি চাষী ছেলের দেখা হল। সে বনে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করছিল। ছোট ঘোড়াটিকে ওখানে দেখে কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তার সঙ্গে কথা বলল। তারপর ছেলেটি যেখানেই যায় ঘোড়া তার সঙ্গে সঙ্গেই যেতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে ছেলেটি ঘোড়াকে নিয়ে বনের ধারেই তাদের খামার বাড়ীতে পৌঁছল। সে বাবাকে বলল—কাল ত আমাদের ঘোড়ার পা ভেঙ্গে গেছে; আজ তার বদলে আর একটি ঘোড়া এসেছে।

বাবা ঘোড়াটিকে আপাদ মস্তক ভাল করে দেখে বললে—তাতে কি বিশেষ সুবিধা হবে? দেখে ত মনে হচ্ছে না। যাই হোক, দু'একদিন দেখা যেতে পারে। এই বলে উনি ঘোড়াকে আস্তাবলে রেখে এলেন।

পরের দিন সকালে তিনি চাষের ক্ষেতে ঘোড়াকে নিয়ে গিয়ে লাঙ্গলের সঙ্গে বেঁধে চাষের কাজে লাগিয়ে দিলেন। ঘোড়া মোটামুটি ভালভাবেই লাঙ্গল টানতে পারল। চাষী তখন তার ছেলে হ্যান্‌স্‌কে বললেন—ঘোড়াটিকে দেখে যতটা বাজে মনে হয়েছিল, সে রকম ত নয়। তুমি ওকে ভাল করে খাবার-দাবার দিও যাতে আমরা ওকে দিয়ে ভাল করে কাজ করিয়ে নিতে পারি।

হ্যান্‌স্‌ ঘোড়াটিকে খুব পছন্দ করত; সে বাবার কথা শুনে ঘোড়াকে ভাল করে খাওয়াত, বুরুশ দিয়ে তার গা পরিষ্কার করে দিত এবং তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করত। ঘোড়াকেও অবশ্য বেশ খাটতে হত।

ক্ষেতে বীজ বোনার কাজ হয়ে গেলে চাষী একদিন হ্যান্‌স্‌কে বললেন—আমি চাই কাল তুমি ঘোড়ায় চড়ে সহরে গিয়ে ওর দু'পায়ে দুটি নাল পরিয়ে আন। কিন্তু আর বেশী নয়। আমি এবার ওটিকে বিক্রি করে দেব।

এই কথা শুনে হ্যান্‌স্‌ খুব দুঃখিত হল; কারণ ঘোড়াটিকে ওর খুব ভাল লেগেছিল। যাই হোক বাবার কথামত সে ঘোড়াটিকে সহরে নিয়ে গিয়ে ওর দু'পায়ে নাল পরিয়ে নিল। এমন সময় এক-চক্ষু একজন লোক এসে হ্যান্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করল—ঘোড়াটি বিক্রী করবে?

হ্যানস্‌ ঠাট্টা করে বলল—দু'শ ক্রোন (ডেনমার্কের মুদ্রা) লাগবে।

লোকটি বলল—এই ঘোড়ার পক্ষে খুব বেশী দাম। যাই হোক, তাই দেব।

হ্যান্‌স্‌ তাড়াতাড়ি বলল—না, না, আমি ঘোড়া বিক্রী করতে পারব না। আমি ত এর মালিক নয়; আমার বাবা এর মালিক।

—তাহলে তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা কর, যদি তিনি আমাকে ঘোড়াটি বিক্রী করেন।

হ্যান্‌সের অবশ্য সেরকম কোন ইচ্ছাই ছিল না। সে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী ফিরে গেল; কিন্তু বাবাকে বলল না যে একজন লোক দু'শ মুদ্রা দিয়ে ঘোড়াটি কিনতে চেয়েছে।

কয়েকদিন পরে হ্যান্‌স্‌কে ডেকে বাবা বললেন—ঘোড়াটিকে তুমি পরিষ্কার করে রাখ ; আজ ওকে বাজারে নিয়ে যাব।

বাবার কথা শুনে হ্যান্‌সের খুব মন খারাপ হয়ে গেল। সে যখন বুঝল যে বাবার মত বদলানো যাবে না, তখন সে বলল—আমি ঘোড়াটিকে বাজারে নিয়ে যাব।

বাবা বললেন—না, আমিই নিয়ে যাব।

হ্যান্‌স্‌ তখন বলল—ঠিক আছে। আপনি যদি ঘোড়াটিকে বিক্রী করে দেবেন বলে স্থির করে থাকেন, তাহলে আপনি তিনশ ক্রোন দাম চাইবেন।

বাবা বললেন—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ? আমি ভাল করেই জানি এর দাম কত হতে পারে। একশ ক্রোনই হবে না।

হ্যান্‌স্‌ তখন বাবাকে জানাল—বাজারে সেদিন একজন দু'শ মুদ্রা দিয়ে কিনবে বলেছিল।

বাবা রেগে তাকে একটি চড় মেরে বললেন—তুমি একটি আস্ত মূর্খ। তিনি তারপর ঘোড়ায় চড়ে বাজারে চলে গেলেন। হ্যান্‌স্‌ যে দামের কথা বলেছিল, সেটি তখন তাঁর মাথায় ঘুরছিল ; তাই কেউ দাম জিজ্ঞাসা করলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলছিলেন—তিনশ ক্রোন।

ক্রেতারা অবজ্ঞাভরে হেসে চলে যেতে যেতে বলছিল—এই বুড়ো ছোট ঘোড়ার দাম তিনশ ক্রোন। একশ ক্রোন এর দাম হবে না।

তিনি কিন্তু ঘোড়ার দাম কমাতে রাজী হলেন না। দিনের প্রায় শেষে এক-চক্ষু একজন লোক তাঁর কাছে এল। তিনি আর দরদস্তুর না করে তিনশ ক্রোন দিয়েই ঘোড়াটি কিনে নিয়ে গেলেন।

চাষী তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে গেলেন। ওই দামে ঘোড়াটি বিক্রী হওয়ায় তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন ; কিন্তু হ্যান্‌স্‌ মনের দুঃখে কেঁদেছিল।

পরদিন সকালে বাবা যথারীতি হ্যান্‌স্‌কে জলখাবারের জন্য ডাকলেন। কিন্তু কোন সাড়া পেলেন না। হ্যান্‌স্‌ চলে গেছে।

হ্যান্‌সের মা বললেন—হ্যান্‌স্‌ বোধহয় ঘোড়াটির খোঁজেই গেছে। এই ভেবে তাঁরা বিশেষ চিন্তিত হলেন না।

সত্যি সত্যিই হ্যান্‌স্‌ তার প্রিয় ঘোড়াটির খোঁজেই বেরিয়েছিল। সহরে গিয়ে সে খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারল যে যিনি ঘোড়াটি কিনেছেন তিনি বেশ কয়েক মাইল দূরে চলে গেছেন। লোকটি খুব ধনী, একজন মহৎ ব্যক্তি এবং সম্ভবতঃ তিনি রাজার প্রাসাদ থেকেই এসেছিলেন।

হ্যান্‌স্‌ এইসব শুনে সেই রাজপ্রাসাদের দিকেই রওনা হয়ে গেল। বেশ কয়েকদিন পরে সে রাজপ্রাসাদে গিয়ে পেঁছিল। সেখানে আস্তাবলে সে একটি চাকরীর চেষ্টা করল। রাজপ্রাসাদে দেখা-শোনা করার যিনি কর্তা, তিনি হ্যান্‌সের সব কথা শুনে তাকে কাজে

বহাল করে দিলেন। হ্যান্স্ তখন সব আস্তাবলগুলি ঘুরে দেখাল ; কিন্তু তার সেই ছোট ঘোড়াটিকে সে কোথাও দেখতে পেল না।

একদিন সকালে সে যখন নিজের কাজে যাচ্ছিল, তখন রাজপ্রাসাদের উঠানে একটি স্লেজগাড়ী দেখতে পেল। তার মুখ হঠাৎ হাসিতে উজ্বল হয়ে উঠল—ঐ গাড়ীতে যে ঘোড়া লাগান ছিল, সেটি ওর সেই প্রিয় ছোট ঘোড়া। সে ঘোড়াটিকে দেখতে পেয়ে এত খুশি হয়েছিল যে, যে কাজে সে যাচ্ছিল, সে কাজে না গিয়ে ঘোড়াটির কাছে গিয়ে তার গায়ে হাত বোলাতে লাগল। ঠিক সেই সময় রাজার ছোট মেয়ে দৌড়ে সেখানে এসে হাজির হল। ছোট ঘোড়াটিকে দেখে সে তার লাগামটি টেনে ধরল।

সে চেঁচিয়ে বলল—আমার এরকম একটি ছোট ঘোড়া চাই। আমি তাহলে স্লেজগাড়ীও চালাতে পারব আর ঘোড়ায়ও চড়তে পারব। কি বল, হ্যান্স্ ?

হ্যান্স্ বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে। আমি এই ঘোড়াটিকে ভালভাবেই জানি ; এর চেয়ে ভাল প্রাণী আর হয় না।

ছোট রাজকুমারী দৌড়ে রাজার কাছে গিয়ে আবদার করে বলল—বাবা, আমার জন্য ওই ছোট ঘোড়াটি কিনে দাও !

রাজা প্রতিবাদ করে বললেন—ওটা একটা বাজে দেখতে ছোট ঘোড়া। আমার আস্তাবলে ত অনেক ভাল ভাল ঘোড়া রয়েছে। তুমি বরং তাদের মধ্যে থেকে একটি বেছে নাও।

ছোট রাজকুমারী ওই ঘোড়াটিকেই পছন্দ করেছে, তাই সে বারবার বাবাকে বলতে লাগল—ওই ঘোড়াটিই আমি নেব। শেষ পর্যন্ত রাজা রাজী হলেন এবং ঘোড়াটি তারই হল।

ছোট রাজকুমারী হ্যান্স্‌কে বলল—তুমি কিন্তু ভাল করে এর দেখাশোনা করবে।

হ্যান্সের কাছে এর চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে ? সে ঘোড়াটিকে খুব যত্ন করত এবং যতই দিন যেতে লাগল ঘোড়াটি ক্রমেই বেশী সুন্দর দেখতে হল।

ছোট রাজকুমারী কখনও ঘোড়াটিকে স্লেজ গাড়ীতে লাগিয়ে চালাত, আবার কখনও নিজেই ঘোড়ায় চড়ে বেড়াত। সে ঘোড়াটিকে খুব ভালবাসত।

রাজার কোন ছেলে ছিল না—দুই মেয়ে। বড় মেয়েটি একদিন পুকুরে মাছ ধরছিল, এমন সময় তার মায়ের দেওয়া আংটিটি হাত থেকে খুলে পড়ে যায়। আংটিটি ছিল খুব দামী এবং ওটি হাতে থাকলে ভাগ্য ভাল হয়।

আংটিটি হারিয়ে যাওয়ায় রাজা এবং তাঁর বড় মেয়ে উভয়েই খুব দুঃখিত হলেন। রাজা হুকুম দিলেন—খুব ভাল করে খুঁজে আংটিটি বার করা হোক। কিন্তু কেউই আংটিটি খুঁজে বার করতে পারলেন না।

রাজা শেষকালে ঘোষণা করলেন—আংটিটি যে খুঁজে বার করতে পারবে, তার সঙ্গে বড় মেয়ের বিয়ে দেওয়া হবে এবং সে অর্ধেক রাজত্বও পাবে।

এই ঘোষণা শুনে ঐ দেশের এবং অন্যান্য দূর দেশেরও অনেক যুবরাজ, বীর যোদ্ধা এবং অভিজাত বংশের যুবকেরা এসে আংটিটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং এই খোঁজার কাজে কয়েকজন প্রাণও দিলেন ; কিন্তু আংটিটি খুঁজে পাওয়া গেল না।

এদিকে ছোট রাজকুমারী তার ঘোড়াটিকে খুবই ভালবাসতে লাগল। সে তার চার পায়ে সুন্দর সোনার নাল পরাবার ব্যবস্থা করল। সে তাকে প্রায়ই খুব আদর করত।

একদিন সকালে হ্যান্স্ যখন ছোট ঘোড়াটিকে জল খাওয়াচ্ছিল, তখন জলের মধ্যে সুন্দর একটি সোনালী মাছ দেখতে পেল। সে জলে লাফিয়ে পড়ে মাছটিকে ধরবার চেষ্টা করল ; কিন্তু মাছটি তার হাত থেকে ফস্কে বেরিয়ে গেল। কয়েকদিন পরে সে আবার ঘোড়াটিকে যখন জল খাওয়াচ্ছিল, তখন জলে মাছটাকে দেখতে পেয়ে ঘোড়াটি তার পায়ের খুর দিয়ে ঠেলে মাছটিকে ডাঙ্গায় তুলে দিল।

হ্যান্স্ তক্ষুণি মাছটিকে নিয়ে রাজবাড়ীর রান্নাঘরে চলে গেল। খবর পেয়ে সকলেই মাছটি দেখবার জন্য রান্নাঘরে এসে হাজির হল। মাছটিকে কাটা হলে দেখা গেল তার পেটে যুবরাণীর আংটিটি রয়েছে।

রাজা তখন তার বড় মেয়েকে বললেন—হ্যান্স্কে তুমি বিয়ে কর ; কারণ ওই তোমার আংটিটি উদ্ধার করেছে। যুবরাণী রাজী হল। হ্যান্স্ অবশ্য সোজাসুজি 'না' বলল না। সে বলল—আংটিটি উদ্ধার করার জন্য সম্মান অবশ্য আমার প্রাপ্য নয়। ছোট যুবরাণীর ঘোড়া তার সোনার নাল লাগান পা দিয়ে ঠেলে ওকে ডাঙ্গায় তুলে দিয়েছে।

ছোট যুবরাণী যখন সব শুনল তখন সে দৌড়ে আস্তাবলে গিয়ে তার ছোট ঘোড়াটির গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বলল—না, তুমি আমার দিদিকে বিয়ে করবে না। হ্যান্স্ করুক। তোমাকে আমি বরাবর আমার কাছে রাখব, কারণ তুমি আমার 'সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়াটি একটি তরুণ সুন্দর যুবরাজ হয়ে গেল।

যুবরাজ তাকে ধন্যবাদ দিয়ে আগের সব ঘটনার কথা জানাল—কি করে সে শাস্তি পেয়েছিল, এখন আবার কি করেই বা যুবরাজ হল। তখন তারা দুজনে রাজার কাছে গেল। ঐদিনই তাদের বিয়ে হল এবং হ্যান্সের সঙ্গে বড় যুবরাণীরও বিয়ে হল।

বিয়ের উৎসব হয়ে গেলে সুন্দর যুবরাজ বৌকে নিয়ে তার বাবার রাজ্যে চলে গেল। সেখানে রাজবাড়ীর লোকজনেরা যুবরাজকে ফিরে আসতে দেখে খুব খুশি হল। যুবরাজের আগের উদ্ধত ভাব চলে গেল। সে তার 'সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু'কে নিয়ে সুখে দিন কাটাতে লাগল। বড় যুবরাণীকে বিয়ে করে হ্যান্স্ও আনন্দের সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে লাগল, কারণ রাজা ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন।*

---

*ডেনমার্কের রূপকথা।

যশিডির ভূত

ফাল্গুনী সেন



কলকাতা থেকে ট্রেনে ছয়-সাত ঘণ্টার পথ যশিডি। সাঁওতাল পরগণার আবহাওয়ায় প্রকৃতির কোলে ছোট্ট একটি শহর। এক সময়ে ছুটি ছাটায় বাঙ্গালীরা এখানে আসতেন হাওয়া পরিবর্তনের জন্য।

সেবার আমাদের আত্মীয়দের বিরাট একটা দল একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে এই যশিডি বেড়াতে এসেছি। কাকা, কাকীমা, পিসে, পিসি, মাসী, মেসো, মামা, মামী গেঁড়ি ও গলির দলে বাড়ি একেবারে জমজমাট। আমাদের বাড়িটা একটা ছোট টিলার ওপর কিছু উঁচুতে, যেন একটা প্যালেস! বড় বড় ঘর, বারান্দা, ছাদ রান্না, ভাঁড়ার ঘর উঠোন, চাতাল, রোয়াক, বাথরুম! মাঠের এই বাড়িটার এক দিক থেকে আর একদিকে যেতে গেলে প্রায় একটা প্রাতঃভ্রমণ হয়ে যায়।

কিন্তু গোল বাঁধাল স্থানীয় লোকেরা। তারা বলল বাড়িটা নাকি ভূতের বাড়ি। রাত্তির বেলায় দোতলায় শুলে গুড়গুড় গুড়গুড় করে ভূতের ডাক শোনা যায়। ব্যস্, আর যায় কোথায়! কেউ আর দোতলায় শোবে না। সবাই নেমে এল নীচের তলায় পড়ি-মরি করে।

তখন ধুত্তোর বলে আমি একাই ঠিক করলুম দোতলায় শোব বলে এবং শুলুমও তাই। বেশ শুয়ে আছি, কিন্তু একটু রাত হতেই গুড়গুড় করে কিসের একটা শব্দ শুরু হ'ল। যেন কোন অশরীরী প্রেত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

রাত যতই বাড়তে লাগল বাড়তে লাগল আওয়াজও। ভীতু বলে আমার কোনও বদ্‌-নাম কেউ কখনও দেয় নি কিন্তু, সত্যি বলতে কি, আমার গা-টা যেন কেমন ছম্ ছম্ করতে লাগল। কোন রকমে দরজা জানালা বন্ধ করে বালিশ আঁকড়ে পড়ে রইলাম। ঘুম আর এল না চোখে।

সকাল বেলা সকলকে ব্যাপারটা খুলে বলতে আরও আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ফলে দিনের বেলাও কেউ আর ওপরে যেতে চায় না। যাই হোক কুয়োর ঠাণ্ডা জলে স্নান করে খাঁটি খাবার খেয়ে দুপুরে বিশ্রাম আর বিকেলে দল বেঁধে বেড়িয়ে দিনগুলো কেটে যেতে লাগল।

এমন সময় এক কাণ্ড! সেদিন রাত্তিরে শুরু হল লোড শেডিং। আমার এক পিসিমা চোখে ভালো দেখতে না পেয়ে বাতিদানটা উল্টে ফেললেন, আর পড়বি তো পড় একে-

বারে নিজের পায়ের ওপরে। সঙ্গে সঙ্গে ওরে বাপরে ভূতে মেরে ফেললে রে। পায়ের ওপর এসে পড়েছে রে। বলে তাঁর পরিত্রাহি চিৎকার। ভূত অবশ্য কেউ দেখতে পেল না, কিন্তু ভয় পেয়ে গেল সবাই। বাতিদানটা কি ভূতই ইচ্ছে করে উল্টে দিয়ে গেল তার পায়ের ওপর? কি মতলব করে?

তবু আরও কয়েকটা দিন এখানে থাকতেই হবে। কলকাতা থেকে আরও কেউ কেউ আসবেন ঠিক আছে, তাঁরা একসঙ্গে আসতে পারেন নি।

এই দলে ছিলেন আমাদের এক বন্ধু। তিনি কলকাতায় কোন একটা কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক, নিজেও গবেষণা করেন বিজ্ঞান নিয়ে। দেখতে দেখতে তিনিও এসে পড়লেন।

সমস্ত শুনে তিনি বললেন, "আচ্ছা, আজ আমিই না হয় একা দোতলায় শোব। দেখি ভূতের দেখা পাই কি না। ওদের সম্বন্ধে আমার প্রচন্ড কৌতূহল, কিন্তু কোন দিন ওরা কেউ দেখা দেয়নি। দেখি আজ সে সাধ মেটে কিনা।"

পিসিমা শুনে বললেন, "খবরদার নয়, খবরদার নয়। কী ডাকাত ছেলেরে বাবা!"

কিন্তু বন্ধু নাছোড়বান্দা। কারো কথা শুনলেন না তিনি। সে রাত্তিরটা সত্যিই একা একা কাটালেন দোতলার একটা ঘরে।

ভয়ে ভয়ে আমাদের রাত কাটল।

পরদিন সকালে দেখি তিনি হাসতে হাসতে নেমে আসছেন। না, শরীর তাঁর অক্ষতই আছে, ভূতে ঘাড় মটকায় নি।

"কি দেখলেন কাল রাতে?"—সবাই এক সঙ্গে প্রশ্ন করল।

"ভূতের দেখা না পেলেও তাকে কাল রাতে ঠিক ধরে ফেলেছি।" হাসতে হাসতে বললেন তিনি। "ভূত রয়েছে ঐ টিলার মধ্যে।"

"তার মানে?"

"মানে, আমাদের এই টিলাটা, যার ওপর এই বাড়ি, সারাদিন রোদে তেতে ফেঁপে ওঠে। অবশ্য চোখে দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু রাত্তিরে যখন ঠান্ডা পড়তে থাকে তখন আবার তা সংকুচিত হতে থাকে—অবশ্য সেটাও চোখে দেখে বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু ভূবিজ্ঞানীরা জানেন এরকম কান্ড খুবই স্বাভাবিক।

এই প্রসারণ আর সংকোচনের ফলেই একটা গুড়গুড় আওয়াজ কিন্তু আশ্চর্য নয়, এবং এখানে এখন রোজ রাত্তিরে তাই ঘটছে। কি ভূত বলব একে?—ব্রহ্মদৈত্য, শাঁখচুন্নী, গেছোভূত, মেছোভুত?—না কোনটাই নয়। বরঞ্চ নাম দেওয়া যায় "আওয়াজি ভুত বলে আবার সেই হাসি।

এই ঘটনা জানবার পর ঘাটশিলার বাকি কটা দিন বেশ নিশ্চিন্তেই কাটিয়ে এসেছিলাম এবং বলা বাহুল্য অনেকেই আবার দোতলার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম একটু আরামে থাকবার জন্য।



জব্দ

সবিতা গুহ মজুমদার

সুনেত্রা অবাক হয়ে দেখছেন খাতাটি। এমন বিচিত্র ভুল তো জয়দীপ করে না কখনও। পড়াশুনায় মোটামুটি ভালোই তাঁর ছেলে। এ যেন ইচ্ছাকৃত ভুল। বিপরীত শব্দ লিখতে বলা হয়েছে একটি প্রশ্নে। জয়দীপ শব্দগুলি লম্বা করে লিখে পাশাপাশি বিপরীত শব্দগুলি লিখেছে। এ ভাবে সে লিখেছে ঃ

উঁচু—চুঁউ।
নরম—মরণ।
রাত—তরা।
কালো—লোকা।
সুখ—খসু।

অন্য উত্তরগুলিও অধিকাংশই ভুল। কিন্তু ভুলের মধ্যেও কিছু কিছু আবার অবিশ্বাস্য রকম নির্ভুলও আছে। সুনেত্রার মনে প্রশ্ন জাগলো, যে ছেলে এত ভুল লিখেছে, সে কিছু কিছু এত নির্ভুল উত্তর লিখতে পারছে কি করে?

জয়দীপের পড়াশুনা সুনেত্রা নিজেই দেখেন। তবে, কিছুদিন যাবৎ একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেওয়ার ফলে নিজের পড়াশুনায় একটু ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।

ফলে ছেলের পড়ার জন্য বরাদ্দ সময়টুকুর মধ্যে একটু ঘাটতি হয়েছে। সাপ্তাহিক পরীক্ষায় সব বিষয়েই জয়দীপ খুব খারাপ নম্বর পেয়েছে। কি ব্যাপার। এত খারাপ ছেলে তো তাঁর নয়!

তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে জয়দীপ তার মাকে লক্ষ্য করছিল। সুনেত্রা দেখলেন, ছেলের মুখে লজ্জা বা দুঃখের চিহ্ন মাত্র নেই। বরং একটা চাপা উল্লাস যেন।

"এদিকে আয়।" সুনেত্রা বলেন।

জয়দীপ মায়ের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়।

"এটা কি? বিপরীত শব্দ তুই শিখিস সি আমার কাছে?"

"বিপরীত মানে উল্টো। সেটা এ রকমই হওয়া উচিত।" দৃঢ় স্বরে উত্তর দেয় জয়দীপ।

"আমি কি তোকে ভুল শিখিয়েছি?"

"আমার খাতায় আমার খুশী মত উত্তর দিয়েছি।"

মর্মাহত হন সুনেত্রা। কেন যে জয়দীপ এ রকম করছে, বুঝতে চেষ্টা করলেন।

খাতার পাতা উল্টে—আবার প্রশ্ন করেন, "এগুলো কি? প্রায় সবই ভুল। কিন্তু মাঝে মাঝে মাঝে আবার নির্ভুল উত্তর। যে এত ভুল লেখে, সে এই নির্ভুল উত্তরগুলো লেখে কি করে?"

"আহা! তা-ও জানো না! ওগুলো তো টুকেছি।"

জয়দীপের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে সুনেত্রার বুকটা কি ব্যথা করছে? শরীরটা যে কাঁপছে! গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথা কেমন যেন করছে। কিছুটা সময় লাগল নিজেকে আয়ত্তে আনতে।

"পরীক্ষার ঘরে কোনো দিদিমণি ছিলেন না?" গম্ভীর স্বর সুনেত্রার।

"থাকবেন না কেন? তিনি আসলেই লেখা বাঁ হাত দিয়ে ঢেকে দিই যাতে কিছু দেখতে না পান। তিনি সরে গেলেই পাশের ছেলেরটা দেখে টুকে দিই। খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়। মাথাটা নীচু রেখে চোখটা চারদিকে ঘোরাতে হয়। টুকতে টুকতেও লক্ষ্য রাখতে হয় দিদিমণি কোন দিকে আছেন।" জয়দীপ সবটাই অভিনয় করে দেখিয়ে দেয়।

সুনেত্রার চোখে অপার বিস্ময়। এর পরবর্তী ধাপ কি হবে?

"অর্পন, নিলয়, কুশল এরা তো সবাই টোকাটুকি করে। তাই তো ওদের বেশী পড়তে হয় না।"

"সবটাই তোমার অন্যায়।" কঠিন স্বরে সুনেত্রা বললেন।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন সুনেত্রা। জয়দীপের বাবা দেবপ্রসাদের ঘরে ফেরার সময় হয়েছে। তাঁকে সবকিছু জানাতে হবে। ছেলে চোখে জয়ের উল্লাস দেখছেন তিনি। সে জব্দ করেছে মাকে। সুনেত্রা নিজের দিকটা ত বিচার করে চলেন। কিছুদিন যাবৎ ছেলেকে বেশী সময় দিতে পারছেন না বলেই কি এমন হোল?

দেবপ্রসাদ অফিস থেকে ঘরে ফিরলেন। অন্যদিনের মত জয়দীপ সেদিন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো না। সুনেত্রা এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখ চিন্তাক্লিষ্ট।

"জয়ের কি শরীর খারাপ?" দেবপ্রসাদ প্রশ্ন করলেন।

"না।" সুনেত্রার উত্তর।

জয়কে ডাকলেন দেবপ্রসাদ। 'যাই বাবা' বলে ধীর পায়ে জয়দীপ আসে। একটু যেন অপরাধী ভাব।

"কি করছিলি?"

"ডায়েরী লিখছিলাম।"

"এটা পড়ার সময়। ডায়েরী পড়ার শেষে লিখবি। যা, এখন পড়াশুনা করে নে।"

দেবপ্রসাদের মনে হোলো কিছু একটা ঘটেছে বাড়ীতে। মা এবং ছেলে, দু'জনের মধ্যে কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে বারান্দায় বসলেন তিনি। একটু একটু করে সুনেত্রা সব জানালেন। ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। পরদিন স্কুলে গিয়ে খাতাটি দেখাবেন এবং কিভাবে ছেলেরা দিদিমণিদের ফাঁকি দিয়ে টোকাটুকি করে, সবই জানাবেন বললেন।

সব শুনে দেবপ্রসাদ বললেন, "স্কুলে নিশ্চয় জানাবে। তবে সেই সঙ্গে ছেলের মনে কোনো নতুন রেখাপাত হয়েছে কিনা, যার জন্য হয়ত আমরাই দায়ী, সেটাও দেখতে হবে।"

জয়দীপ শুয়ে পড়লে দেবপ্রসাদ তার পড়ার টেবিলে খাতাপত্র দেখতে লাগলেন। সবশেষে ডায়েরীটা খুললেন। পড়তে লাগলেন সেদিনের লেখাটা। স্তব্ধ হয়ে গেলেন পড়ে। এত অভিমান ছোট্ট বুকে। সুনেত্রাকে দেখালেন। নির্ভুল লেখা। এক জায়গায় লিখেছে, "মা আমাকে আগের মত আর ভালোবাসে না। কলেজের মেয়েরা মাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। তাদের জন্য মা কত পড়াশুনা করে। কত ভাবে তাদের কথা। আগে স্কুল থেকে বাড়ী ফিরলে আমাকে কত আদর করে ঘাম মুছিয়ে দিত। টিফিন খেয়েছি কিনা জিজ্ঞাসা করত। এখন বামুন পিসি টিফিস দিতে প্রায়ই ভুলে যায়। মা তো প্রায়ই আমার চেয়ে দেরীতে বাড়ী আসে। আমার কান্না পায়।"

পরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "আজ খুব জব্দ করেছি মাকে। সব উল্টো উত্তর লিখে স্কুলে দিদিমণির কাছে খুব বকুনি খেয়েছি অবশ্য। কিন্তু মায়ের মুখখানা যা হয়েছিল না আজ! বেশ হয়েছে। এবার মা শুধু আমার কথাই ভাববে। সেই থেকে তো কেবল ভাবছে আর ভাবছে। কিন্তু মা যেন না কাঁদে। তাহলে আমারও কান্না পাবে।"

বর্মা ফেরৎ শর্মা

বটকৃষ্ণ দে

বর্মা থেকে ফিরে এলো
বংকাবিহারী শর্মা,
শংকা হল, যায় যে কোথায় ?
—গেলো সে কোডারমা ।

খায় কী এখন ? বন্যা-খরায়
কোথায় কোলা ব্যাঙটা,
চিংড়ি মাছের মালাইকারি
মটন—মুরগী ঠ্যাংটা ?

খেতেই হল শাক পাতা ঘাস,
সরষে পটল ডালনা ।
বর্মা থেকে ফিরে এলেন
বংকা তো নয় ফেল্‌না ।

শর্মা ভাবে, কী যে করি
কোথা যে পাই চাকরী বাকরী,
রাতারাতি কবিই হল
লিখেই বই ছ' ফরমা ॥



তিন সাগরের তুফান

সলিল লাহিড়ী

॥ ১ ॥

গহণ চাটুজ্যে ছেলেকে নিয়ে দারুণ বিব্রত। মন্দার চট্টোপাধ্যায় গহণ চাটুজ্যের একমাত্র সন্তান। ছেলেকে নিয়ে কত স্বপ্ন-আশা গহণ চাটুজ্যের। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের সিনিয়র পাবলিক রিলেশন অফিসার এই গহণ চাটুজ্যে। ইণ্ডিয়াকে রিপ্রেসেণ্ট করেছিল ফুটবলে, তারি সুবাদে চাকরি। গহণ ভাল স্পোর্টসম্যান। খেলার জগতের মানুষরা গহণ চাটুজ্যে বলতে অজ্ঞান।

আর কিনা সেই গহণ চাটুজ্যের ছেলে মন্দার চাটুজ্যে জীবনে মাঠে গেল না, ফুটবল ছুঁল না, দৌড়-ঝাঁপ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই, এমন কি, ওয়ারলড কাপের দুরন্ত ফুটবল খেলা যখন টিভিতে দেখাল সেটাও দেখবার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। মন্দার শুধু দিন-রাত রাজ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই মুখে নিয়ে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী রাখে নিজেকে। স্কুলে যায়, বাড়ী আসে। ব্যাস্, তারপরই মাথা গুঁজে বই-এর মধ্যে ডুবে যায়।

কপাল চাপড়ায় গহণ চাটুজ্যে, বলে—এই ছেলে মাথা ভর্তি শুধু বিদ্যে নিয়ে করবে কি? আজকের যুগে বাঁচতে গেলে ডাকাবুকো হতে হবে, লড়াকু হতে হবে, স্পোর্টস-ম্যান হতে হবে। পুঁথির বিদ্যে সম্বল করে মানুষ কি টিকতে পারবে আজকের এই দুনিয়ায়?

মন্দারের মা, গহণ চাটুজ্যের স্ত্রী সুমনা মৃদু হেসে উত্তর দেয়—তোমার মত সবাই মাঠ দাপিয়ে পৃথিবী জয় করবে নাকি? মগজে বুদ্ধি থাকলেই আজকের জগতে টিকতে পারবে। গায়ের জোরের দিন শেষ হয়ে গেছে মনে রেখ।

—জানি, জানি, তোমার প্রশ্রয়েই ছেলেটা স্রেফ ঘরকুনো, মেনিমুখো হয়ে গেল। ভিড়-ভাট্টা দেখলে ভয় পায়, লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পায়, কেমন সব সময়েই ভীরু ভীরু ভাব। নাঃ, ছেলেটার কিস্সু হবে না।—হতাশার ভঙ্গী গহণ চাটুজ্যের গলায়।

—নাই বা হল এক নম্বর ফুটবলার, নাই বা হোল সেরা অ্যাথেলেট, মন্দার যেমনটি আছে তেমনটিই থাক। দেখো, বুদ্ধি যদি থাকে, এই বই-এর পোকা হয়ে যদি কিছু সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করে থাকে, তবে মন্দারও একদিন কেউকেটা হবে। ভুলছ কেন, সত্যি বুদ্ধি-মেধা যদি না থাকত, বছরের পর বছর তবে পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হচ্ছে কি করে?—মিষ্টি হেসে বলে সুমনা।

পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হওয়ার কথা শুনে কেমন যেন কুঁকড়ে যায় গহণ চাটুজ্যে। ওটাই গহণ চাটুজ্যের বড় দুর্বল জায়গা। গহণ চাটুজ্যে পরীক্ষায় বরাবরই লাষ্ট হয়ে, খেলোয়াড় বলে পাশ করে গেছে। তাই এই পড়ার ব্যাপারে ছেলে বা ছেলের মাকে কোনদিনই ঘাটায় না। তাই আজও রণে ভঙ্গ দিল।

॥ ২ ॥

ক্লাস এইটে পড়ে মন্দার। ঠান্ডা, শান্ত, গুড বয় ছেলে। পড়ার বই-এর সবকিছুই যে ওর মুখস্থ শুধু তাই নয়, দুনিয়ার সব খবরা খবর, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহু কিছুই মন্দারের কন্ঠস্থ। মন্দারকে এজন্য "ভিউ-পয়েন্ট" স্কুলের সব মাষ্টাররাই ভালবাসেন।

হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। মে মাসের শেষাশেষি। গরমের স্কুল-বন্ধের ছুটি হব-হব ভাব। এমনি সময়েই আশ্চর্য খবরটা এলো স্কুলের রেক্টরের কাছে।

খবরটা পেয়ে তো স্কুলের মাষ্টাররা অবাক। রেক্টর নোটিশ পাঠালেন ক্লাসে ক্লাসে, টিফিন টাইমে প্রেয়ার গ্রাউন্ডে সবাই যেন জমায়েত হয়। জরুরী ঘোষণা আছে।

টিফিন হতেই সেকেন্ডারীর, মানে ক্লাস সিক্স থেকে টেনের সব ছাত্রেরা জমায়েত হতে লাগল স্কুলের বিরাট প্রেয়ার-গ্রাউন্ডে। সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করছে, কি ব্যাপার বলতো রে! হঠাৎ রেক্টর এমন করে আমাদের ডাকলেন কেন? আমাদের অন্য টিচাররাও কিছু বলছে না, ব্যাপার কি? হেডমাষ্টারও চুপচাপ, কি হোল বলতো রে?

কিছু পরেই রেক্টর এলেন। প্রেয়ার-গাউন্ড সূচীস্তব্ধ নিস্তব্ধ হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে রেক্টর বললেন—বয়েস, তোমাদের আমি বারবার বলেছি, পড়াশুনার মুখ্য উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাশ নয়, সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা, তাকে কাজে ব্যবহার করা। কিন্তু

তোমাদের মধ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করাই তোমাদের একমাত্র প্রচেষ্টা, আর সেজন্যই কোনও রকমে পড়াগুলো মুখস্থ করো। তাতে তোমাদের জ্ঞান বিন্দুমাত্র বাড়ছে না।

ছাত্রদের মুখের দিকে তাকাল রেক্টর। কথাগুলো খুবই খাঁটি, বুঝতেই পারে ছাত্রেরা। রেক্টর আবার বলেন—অথচ পড়ার জগতের বাইরের জগতের খবর যদি রাখতে, তাকে যাচাই করতে, দেখতে উপকারই হোত তোমাদের। এমনতর যাচাই, নিজের জ্ঞানের যাচাই করার ফল কি হয় সেটাই শোন এবার। "ওয়ারলড এনভায়রনমেন্টাল প্রটোকেশন অরগেনাইজেশন" দুনিয়ার ছাত্রদের মধ্যে একটি রচনা কমপিটিশন আহ্বান করেন ছয় মাস আগে, "পরিবেশ সংরক্ষণে ছাত্রদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত"। এই খবর তোমরা সবাই সমস্ত বড় বড় পত্র-পত্রিকায় দেখেছিলে, মনে আছে?

—হ্যাঁ স্যার, দেখেছি।—একবাক্যে ছাত্রেরা চিৎকার করে উঠে।

—তোমরা সেই প্রতিযোগীতায় রচনা পাঠিয়েছিলে?—প্রশ্ন শুনে সবাই মাথা নীচু করে।

রেক্টর মুখ গম্ভীর করে সবার দিকে তাকান। তারপর বলেন—শোন তবে। কিছুক্ষণ আগে, নাইরোবী থেকে ওয়ারলড এনভায়রণমেটাল অরগেনাইজেশন যে টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছে সেটাই পড়ছি।

"ইওর পিউপিল মন্দার চট্টোপাধ্যায় ওন দি কমপিটিশন? হিজ পেপার, অ্যাডজাজড বেষ্ট পেপার। ওয়ান মানথ ইনটারন্যাশনাল ট্রিপ, ফেয়ার অ্যান্ড প্যাসেজ, অফারড হিম অ্যাজ এওয়ার্ড। টিকেট অ্যান্ড প্যাসেজ মানি ফলোজ।"

উল্লাসে ফেটে পড়ে স্কুল প্রাঙ্গণ। রেক্টর সবাইকে চুপ করতে বলেন।—দেখলে তো, মন্দার যা শিখেছে তার জ্ঞান থেকে রচনা লিখে পৃথিবী বেড়াবার সুযোগ পেয়ে গেল। দুনিয়ার সব ছাত্রদের মধ্যে সেরা ছাত্র হোল। মন্দারের এই বিজয় স্কুলেরও বিজয়। তাই আজ স্কুল ছুটি দিলাম।

—থ্রি চিয়ার্স ফর মন্দার, হিপ হিপ হুররে।—উচ্ছল চিৎকারে স্কুল মুখরিত হয়ে উঠে।

কিন্তু মন্দার, মন্দার কৈ? মন্দার লজ্জায় রাঙা হয়ে সব ছাত্রদের শেষে মাথা নীচু করে চুপটি করে লুকিয়ে থাকতে চায়, যেন কত অপরাধ করেছে, এমনি ভঙ্গী মন্দারের।

বাড়ীতে খবর যেতেই আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠে সুমনা। বিকেলে অফিস থেকে গহণ চাটুজ্যে বাড়ী ফিরেই খবরটা পেয়ে বলেন—নাঃ, ছোকরা এতদিনে একটা কাজের মত কাজ করেছে। মন্দার এবার তাহলে সত্যিই একলা বেরুচ্ছে মায়ের কোল ছেড়ে, দুনিয়া দেখতে। দেখো, এইবার সত্যিকার মানুষ হবে মন্দার।

কথাগুলো শুনে শুধুই হাসে সুমনা। মন্দার কিন্তু চুপচাপ, নির্বাক।

॥ ৩ ॥

গরমের ছুটির মুখেই ক্লাস এইটের ছোট্ট মন্দার চাটুজ্যে বেরিয়ে পড়ল পৃথিবী ভ্রমণে। ট্রিপটা দারুণ থ্রিলিং। ওকে প্লেনে প্রথমে যেতে হবে জিমবাবোয়ের রাজধানী নাইরোবী, "ওয়ারলড এনভায়রনমেণ্টল প্রটেকশনের" অফিসে। সেখানেই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্দারকে ওরা দেবে সার্টিফিকেট ও সোনার মেডেল। তিনদিনের প্রোগ্রাম ওখানে। যা দেখার ওরাই দেখাবে।

এরপর আবার প্লেনে উঠবে, পেঁছাবে নেদারল্যাণ্ডের রাজধানী আমষ্টারডাম। জায়গাটা নাকি দারুণ। সেখানে থাকবে তিনদিন। এভাবেই প্রথম সপ্তাহটা আকাশে আর নানান দেশের মাটিতে কাটবে। তারপর আমষ্টারডাম পোর্টে জাহাজে চড়বে, শুরু হবে জলপথের ভ্রমণপর্ব। ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বে-অফ-বিসকে ধরে অতলান্তিক সমুদ্র পেরিয়ে দিন ছয়েকের মাথায় এসে পড়বে জিব্রাল্টার পোর্টে। এখানে বিশ্রাম এক দিনের।

এরপর সি-অফ-জিব্রাল্টার থেকে ভূমধ্যসাগরের সমুদ্রপথ বেয়ে ছ'দিন পরে জাহাজ এসে থামবে পোর্ট সৈয়দে। এক দিন বিশ্রাম। তারপর পানামা খাল পার হয়ে, রেড-সী ধরে তিন দিনে এসে পেঁছাবে পোর্ট-এডেনে। এক দিন বিশ্রাম, এডেন দেখার জন্য। এরপর এডেন থেকে রওনা হবে বোম্বাই বন্দরের দিকে, আরবসাগরের বুক দিয়ে। ছয় দিনে এসে পেঁছাবে বোম্বাই-এ।

সমুদ্র অভিযান পর্ব এভাবেই চলবে চব্বিশ দিন। মোট ৩০ দিন এমনি করেই ঘুরবে মন্দার আকাশে-সমুদ্রে। দেখবে নানান দেশের অনেক কিছু।

ত্রিশ দিনের এমন ঠাসবুনুনি প্রোগ্রাম দেখে একটু ঘাবড়ে যায় সুমনা। মন্দারের গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে বলে—এত দৌড়-ঝাঁপ, এত খাটা-খাটুনি সহ্য হবে তো রে? জীবনে কখনও প্লেনে চাপিস নি, জাহাজে চড়িস নি, একলা একলা কোথাও যাস নি, পারবি একা একা এতদিন প্লেনে-জাহাজে কাটাতে?

—দেখছ তো, মজবুত শরীরের দরকার লাগে কিনা জীবনে? আমারও ভয় হচ্ছে, লিকলিকে চেহারা নিয়ে, বইকুনো মন্দারটা এই একত্রিশ দিন সফরের ধকল সহ্য করতে পারবে কিনা? কিরে পারবি?—গম্ভীরভাবে বলে গুহণ চাটুজ্যে।

মিষ্টি হাসে মন্দার। আস্তে, নীচু গলায় বলে—কিচ্ছু ভেবো না তোমরা। সব ঠিক ম্যানেজ করে নেব। প্লেনে, জাহাজে কিভাবে থাকলে শরীর খারাপ হয় না, সব পড়ে নিয়েছি। ওইসব দেশের ব্যাপারে পড়াশুনাও করে নিয়েছি।

মন্দার বেরিয়েই পড়ে পৃথিবী ভ্রমণে। বিশ্ব-পরিবেশ-সংস্থার স্কলারশিপে, ব্যবস্থাপনায়।

। ৪ ।

নাইরোবী অনুষ্ঠান দারুণ এনজয় করে মন্দার। মন্দারকে বলতে হয় ইংরেজীতেই। পরিবেশ সচেতনতার জন্য ওর চিন্তাধারা কি, এই বিষয়ে ওর বক্তব্য দারুণ প্রশংসিত হয়। বিশ্ব-পরিবেশ সংস্থার সবাই ওর বক্তব্য শুনে মন্তব্য করে তোমাদের দেশের ছোটরাও এত সজাগ হয়েছ পরিবেশ নিয়ে ? সত্যিই আনন্দের কথা।

অনুষ্ঠান শেষে সংস্থার সভাপতি কর্ণেল গ্রান্ট বললেন—ইয়ং ইন্ডিয়ান, বল কি দেখবে ? হাতে মাত্র দুদিন সময়। আফ্রিকার জংগলের রাজত্ব ওয়াকিং ন্যাশনাল পার্কে ঢুকবে, না, পৃথিবীর সেরা জলপ্রপাত ভিক্টোরিয়া ফলস দেখবে ?

—আফ্রিকায় এসে ভিক্টোরিয়া ফলস্ না দেখা মুর্খামী। তাছাড়া শুনেছি, ভিক্টোরিয়া ফলস্-এর কাছাকাছিও অনেক ছোট ছোট ন্যাশনাল পার্ক আছে। একসঙ্গে দুটোই তো দেখা যায়—বলে মন্দার।

—দেখা যায় বৈকি মাষ্টার। বেশ, চল তবে ভিক্টোরিয়া ফলস্ আর ভিক্টোরিয়া ন্যাশনাল পার্কে ও তারই সঙ্গে সাফারি পার্কে। কাল সকালে যাব। আমরা থাকব ভিক্টোরিয়া ফলস্ হোটেলে। রাত্রে ফলস্ দেখতে দারুণ লাগবে। পরের দিন ফিরব বিকেলে। প্রথমদিন দেখব ভিক্টোরিয়া ফলস্ অন্য দিন দেখব ন্যাশনাল পার্ক ও সাফারি পার্ক। টাইট প্রোগ্রাম, মনে রেখো মাষ্টার।

খুব ভোরে লোকাল প্লেনে ওরা চলে আসে 'স্প্রে-ভিউ' বিমানবন্দরে। ছোট্ট বিমানবন্দরটা ভিক্টোরিয়া ফলসের খুব কাছেই। তারপর লিমোসিন গাড়ী চেপে 'ভিক্টোরিয়া ফলস হোটেলে।'

হোটেল থেকে জলপ্রপাতের গর্জন শুনতে পায় মন্দার। দেখে, আকাশ ছোঁয়া জলপ্রপাতের জলবিন্দুর মধ্যে দিয়ে রামধনু দেখা যাচ্ছে আকাশে। মুগ্ধ হয়ে যায়।

ব্রেকফাষ্ট সেরেই মন্দার রওনা হয় কর্ণেল গ্রান্টের সঙ্গে "নাইফ-এজ-পয়েন্ট" দেখতে। নাইফ-এজ পয়েন্টে পেঁাছে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়।

—বাপরে! কত চওড়া হয়ে নেমে এসেছে নদী! তারপর মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচে। জলধারার গর্জনে মন্দারের কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না। জলপ্রপাতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জলবিন্দুতে গা-হাত মুখ সব ভিজে কেমন স্যাৎসাতে হয়ে গেছে মন্দারদের।—স্যার, এতবড় জলপ্রপাত হোতে পারে ভাবাই যায় না!

—ইয়েস, দারুণ বড় জলপ্রপাত। ১৭০০ মিটার চওড়া নদী হঠাৎ নেমে গেছে ১০৮ মিটার গভীরে। মাই বয়, রাত্রে তোমাকে প্ল্যানে ভিক্টোরিয়া ফলসের ছবিটা দেখিয়ে সব বুঝিয়ে দেব। তবে মনে রেখ, প্রকৃতিই এর স্রষ্টা। এর চারপাশের সুন্দর পরিবেশ প্রকৃতিই সৃষ্টি করেছেন। তাকে রক্ষা করাই কিন্তু আমাদের কাজ। তুমি এই বিষয়ে সজাগ হয়ে বন্ধুদের সজাগ করবে সেজন্যই এখানে তোমাকে এনেছি মন্দার।

—মনে থাকবে কথাটা স্যার।

—আরও মনে রেখ, এই জলধারা সমৃদ্ধ পরিবেশে বনজ প্রাণী আনন্দে নির্ভয়ে বাস করে। কাল সকালে বুলেট প্রুফ কাঁচ ঢাকা গাড়ীতে যাব ন্যাশনাল পার্কে ও সাফারি পার্কে। দেখবে সেখানে বড় কানওয়ালা আফ্রিকান হাতি, দু-খড়্গওয়ালা গণ্ডার, লম্বা



গলাওয়ালা জিরাফ, ডোরাকাটা জেব্রা, সিংহ, দারুণ দারুণ পাখী কেমন মিলেমিশে খুশীতে রয়েছে। এরাই এখানকার পরিবেশকে রক্ষা করছে। এটাও আমাদের দেখার কথা, সেই বনজ প্রাণীদেরও যেন আমরা মেরে না ফেলি। বুঝলে কথাটা ?

—হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। গাছ-পালা, বনজপ্রাণী, পাহাড়-জলপ্রপাত সব জড়িয়েই যে প্রকৃতির ভারসাম্য তাকে বাঁচিয়েই আমাদের এগুতে হবে। তবে কি করে, সেটাই ভাবনা, তাই না স্যার।

॥ ৫ ॥

মন্দার নাইরোবী থেকে এসেছে আমষ্টারডাম। নাইরোবীর তিন দিনের সফর দুরন্ত লেগেছে। কলকাতার চার দেওয়ালের জগৎ দেখা ছেলে সে। সেখানে সব চলে মানুষের হুকুমে, মানুষের নিয়মে। আর ভিক্টোরিয়া ফলসে, বনজ প্রাণীর আবাসস্থল সাফারি পার্কে মন্দার দেখল, মানুষ সেখানে অসহায়। সেখানে চলছে সব প্রকৃতির নিয়মে, নিখুঁতভাবে, ডিসিপ্লিনড ভাবে।

আমষ্টারডাম এয়ারপোর্টে বিশ্ব-পরিবেশ সংস্থার প্রতিনিধি মিষ্টার বারলেগ রিসিভ করল ক্ষুদে অতিথি মন্দার চাটুজ্যেকে। মন্দারকে নিয়ে উঠালো "হোটেল ডি-রুডি-লিউ"তে। গাইড হিসাবে মিষ্টার ন্যাচবারকে মন্দারের সঙ্গে রেখে দিল।

হোটেলটা আমষ্টারডাম শহরের ঠিক মাঝখানে। ঝকঝকে—তকতকে শহর। ছেলে-মেয়েরা যেমন সুন্দরী, তেমনি স্ফূর্তিবাজ। সবার মুখেই হাসি। বিশ্ব সংস্থার গেষ্ট বলে তো মন্দারের স্পেশাল খাতির।

ন্যাচবার ছোট্ট গাইড ম্যাপ দিল মন্দারকে। বলল—মাষ্টার, আমাদের এই দেশ নেদারল্যাণ্ড আনন্দের দেশ। এখানে ঝকঝকে ফুল পাবে, সুন্দর গান পাবে, ভাল পনির পাবে, বেড়াবার ভাল ভাল জায়গা পাবে। কিন্তু দুদিনে কতটুকুই বা দেখবে আমাদের এই দেশের ? তবুও ম্যাপেই প্রথমে দেশটাকে চিনে নাও মাষ্টার।

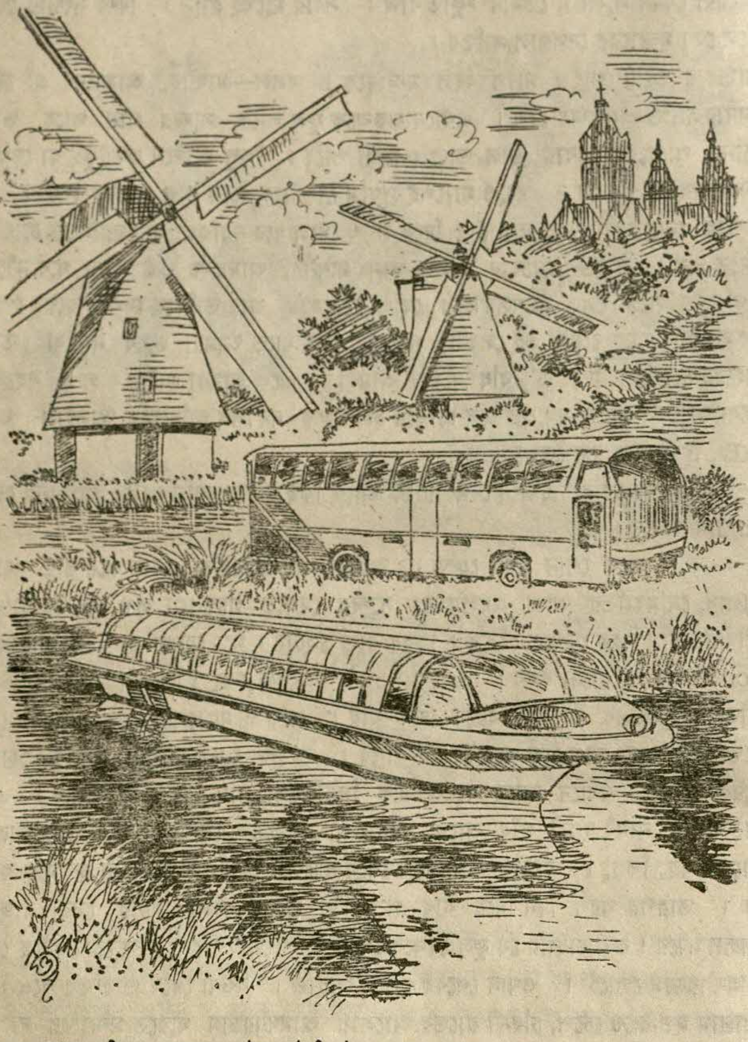
মন্দার নেদারল্যাণ্ডের ম্যাপটার দিকে চোখ মেলে ধরে সবকিছু মগজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে চায়। গাইড ন্যাচবার বলে—জান মাষ্টার, আমাদের এই শহর খুব নীচু। নর্থ-সীর সঙ্গে লেক উশেলমীরের যোগ রয়েছে। আর তাকিয়ে দেখ, শহরের পেটে কেমন করে ঢুকে রয়েছে এই লেক। সমুদ্রের জলে যাতে আমরা ডুবে না যাই তাই শহরের চারপাশ দিয়ে উঁচু বাঁধ দিয়েছি আমরা। একে আমরা ডাইক বলি। শহরের মধ্যে ক্যানেল কেটে, সমুদ্রের জল ঢুকিয়ে চলাচলের নদীপথ বানিয়েছি আমরা। যাই হোক, কি দেখবে বল তো ?

—মিষ্টার ন্যাচবার, এখানে দেখবার কি আছে কিছুই তো জানি না। আপনিই বরং প্রোগ্রাম বানান।

—ও-কে। তবে শোন ইয়ং ফ্রেণ্ড। আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত বিশ্রাম করে রাত নয়টা নাগাদ, মোমবাতির অল্প আলোঘেরা সুন্দর দেখতে গ্লাসঢাকা লঞ্চে চড়ে পুরোনো আমষ্টারডাম শহর দেখতে বেরুব। ফিরব রাত ১২টায়। মনে রেখো বন্ধু আমষ্টারডাম ৭০০ বছরের পুরোনো শহর। এখানে ১৬০টা ক্যানেল আর হাজারটা ব্রিজ আছে। শীতকালে এইসব ক্যানেল বরফে ঢেকে যায়। স্রেফ গরমকালেই, মানে এপ্রিল থেকে নভেম্বরই শুধু লঞ্চে চড়ে শহর দেখতে পাবে। তারপর কাল দিনমান ট্যুরিষ্ট কোচে ঘুরব শহব। এখানে আছে দুরন্ত এক মিউজিয়ম, নাম রিকস্ মিউজিয়ম। এই মিউজিয়মে নামী-দামী ছবি আছে, আছে নানান মডেল, নেদারল্যাণ্ড শহরের কারু-কার্যের বহু কিছু। তাছাড়া এখানেই দেখবে হীরেকে কেটে ছেঁটে কেমন ঝকমকে করা হয়। তারপর পরশু দিন নিয়ে যাব পৃথিবীর ফুলের কেনা বেচার সেরা বাজার আলস্মীরে। কত বাহারি যে ফুল দেখবে সেখানে। শেষে পরশু দুপুরে পেঁাছে দেব আমষ্টারডাম পোর্টে। ওখান থেকেই চড়বে জাহাজ। রওনা দেবে ভারতের পথে।

প্রোগ্রাম মত লঞ্চে চেপে, চাঁদনী রাতের আলোয় আমষ্টারডাম ঘুরতে মন্দারের দারুণ লাগল। পুরোনো দিনের বাড়ীগুলোও কেমন ঝকঝকে, চকচকে, মজবুত। লঞ্চের মধ্যেই ফটোগ্রাফার ছবি তুলে নিল যাত্রীদের। দু ঘণ্টা পরে যেই ডাঙ্গায় নামল মন্দার,

ফটোগ্রাফার মন্দারের ছবিটা দেখিয়ে বলল, কিনবে ? বিদেশে আমষ্টারডামের লঞ্চে বসা ছবি, মন্দার না কিনে পারে ? কিনতেই হোল মন্দারকে। পকেট মানিও কম পায় নি মন্দার। তাই থেকেই কিনল।



মন্দার পরের দিন সকাল নটায় ট্যুরিষ্ট কোচে শহর দেখতে বেরুল, সঙ্গে গাইড ন্যাচবার।

সবচেয়ে অবাক হোল মন্দার হীরে ছাঁটাই-এর ফ্যাক্টরীতে গিয়ে। "কোষ্টার ডায়মণ্ড

ইণ্ডাস্ট্রী" খুব খাতির করে বোঝাল মন্দারকে কেমন করে হীরে ছাঁটাই হয়। হীরের সামান্য রঙ ফেরে কেমন করে হীরের দাম কম বেশী হয়। মন্দার এই প্রথম জানল সাচ্চা হীরেকে ছাঁটাই-এর পর হীরের ৫৭টা ফেস দেখা যায়। এর জন্যই হীরের ঝকমকি কম বেশী হয়। এখানেই একটা হীরে দেখল মন্দার, যার দাম প্রায় কোটি টাকা।
এরপর রিকস মিউজিয়ামে এল। দামী দামী ছবি, দেশ বিদেশের পুতুল, নানান মডেল ষ্ট্যাচু, কারুশিল্প এসব এখানে দেখল মন্দার। নামী আর্টিসদের অমূল্য সব ছবি। প্রতি ঘরে রয়েছে গাইড, ছবি দেখাবার জন্য, ছবিকে পাহাড়া দেবার জন্য।

—মিষ্টার ন্যাচবার, তোমাদের এখানে ছবির মিউজিয়মেও এত পাহাড়াদার? আমাদের দেশেতো শুধু মেইন গেটেই পাহাড়াদার থাকে।—কিছুটা অবাক হয়েই বলে মন্দার।
—মাই ইয়ং ফ্রেণ্ড, এখানকার প্রতিটি ছবিই অমূল্য। এক একটার দাম খুব কম করেও হাজার ত্রিশ ডলার, আবার এক দুলাখ ডলার দামেরও ছবি আছে। তোমাদের ছবি বোধ হয় তত দামী নয়, কি বল?—হেসে বলে গাইড ন্যাচবার।
মনে মনে একঝলক হিসেব করে নেয় মন্দার। তার মানে কম করেও এক একটা ছবির দাম পাঁচ লাখ টাকা! এমনকি বারো-তেরো লাখ টাকা দামেরও ছবি আছে। অবাক বিস্ময়ে ন্যাচবারের দিকে তাকায় মন্দার। শেষে বলে—এই রিকস মিউজিয়ম দেখছি তোমাদের হীরে কাটাই-এর ফ্যাক্টরী কোষ্টারের চেয়েও মূল্যবান।
—তা বলতে পার।—হেসেই উত্তর দেয় ন্যাচবার।

এরপর টুকটাক কেনাকাটা করে, রাস্তায় লোকজন দেখে দ্বিতীয় দিনও কেটে যায় মন্দারের।
তৃতীয় দিনে অ্যালসমীর বাজারে যায় ট্যুরিষ্ট কোচে। ফুলের বাজার যে এমনটি হয় জানা ছিল না মন্দারের। নানান দেশে ফুল চালান যায় এখান থেকে। গাড়ীতে, এখান থেকেই এগিয়ে গিয়েই দেখতে পেল রটারর্ডামের শহর আর একটু এগুতেই পেল ডেলফ শহর। ডেলফ শহরের ব্লু পটারীর কাজ পৃথিবী খ্যাত। এসব দেখতে দেখতে মনটা কেমন করে উঠে মন্দারের।

ছয়দিন হয়ে গেল কলকাতা থেকে এসেছে মন্দার। সময় হু-হু করে কেটে যাচ্ছে। দম ফেলার সময় পায় নি। কিন্তু এতসব সুন্দর জিনিষ দেখতে দেখতে মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায় মন্দারের। সেতো অনেক কিছুই দেখছে। কিন্তু তার মাতো এসব কিছু দেখতে পেল না। বাবাও কত বলত, ঘরের বাইরে বেড়িয়ে দুনিয়াটা দেখ। সত্যিই, এমন যে সব অপূর্ব দেশ আছে, এমন যে অপূর্ব জিনিষ আছে, ভাবতেই পারে নি আগে। তার সঙ্গে যদি বাবা-মা থাকত কি ভালই না হোত। ভাবতে ভাবতে বাবা-মার জন্য চোখটা ছলছল করে উঠে মন্দারের।

॥ ৬ ॥

দুপুরবেলায় আমষ্টারডাম পোর্টে মন্দারকে নিয়ে এল গাইড ন্যাচবার। "তাই সান" জাহাজের ক্যাপ্টেন ডি. কোষ্টা স্বাগত জানাল মন্দারকে।—আরে এসো এসো ইয়ং ইন্ডিয়ান প্রাইড, তুমিইতো এনভায়রনমেন্টাল কমপিটিশনে ফার্স্ট হয়ে এই দেশ দেখার সুযোগ পেয়েছ ?

লজ্জায় মাথা নীচু করে মন্দার। গাইড ন্যাচবার বলে,—মাই ইয়ং ফ্রেন্ড, এবার বিদায় জানাচ্ছি। তোমার মত ব্রাইট ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল।

—বিদায় মিষ্টার ন্যাচবার। মিষ্টার বারলেগকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন। আপনারা না থাকলে এমন সুন্দর করে এদেশ দেখাই হোত না।

—থ্যাংক ইউ মাষ্টার। তবে বিদায়ের আগে একটা দুঃসংবাদ জানাই তোমাকে।

—দুঃসংবাদ! কি হয়েছে মিষ্টার ন্যাচবার ?

—কোষ্টার ডায়মন্ড ইন্ডাষ্ট্রীর শোরুম থেকে সবচেয়ে দামী ডায়মন্ড নেকলেসটা চুরী গেছে আজ দুপুরে।

—সে কি! কেমন করে! ওখানে তো দারুন সিকিউরিটি। চুরী করল কি করে ? চুরী করে বেরুলই বা কি করে! ওখান থেকে বেরুতে হলে সিকিউরিটি চেকিং দারুণ হয়, সেতো গতকালই আমি দেখেছি। তাহলে!

সেটাইতো আশ্চর্যের ব্যাপার। ভাগ্যিস গতকাল ওখানে গেছিলে। আজ যদি যেতে তবে আজকে এখান থেকে তোমার জাহাজে চড়া হোত না। আজ ঐ ডায়মন্ড ফ্যাক্টরীর সব ভিজিটারদের জবানবন্দী চলছে। সবাইকে দিনকয়েক আটকে থাকতে হবে আমষ্টারডামে ?

—কিন্তু বিদেশী যারা, তাদের কি হবে ? তাদের সব প্রোগ্রাম উলটে-পালটে যাবে না ?

—অবাক গলায় বলে মন্দার।

—কিন্তু মাষ্টার, উপায়ও তো নেই। যাচাই না করে তো ছাড়া যায় না। নেকলেসটার দাম নাকি কোটি টাকারও বেশী। পরখ না করে কারুর রেহাই নেই তাই। এনিওয়ে, হ্যাপি জার্নি মাই ইয়ং ফ্রেন্ড।—হ্যান্ডসেক করে গাইড ন্যাচবার জাহাজের সিঁড়ির মুখ থেকে বিদায় জানায় মাষ্টার মন্দার চ্যাটার্জীকে।

অন্যান্য যাত্রী নিয়ে কার্গো কাম প্যাসেঞ্জার ভেসাল "তাই সান" দুপুর আড়াইটে নাগাদ আমষ্টারডাম পোর্ট ছেড়ে রওনা দেয় জিব্রাল্টারের দিকে। আটলান্টিক সমুদ্রে যে এমন করে ভেসে বেড়াতে পারবে সে কি কখনও ভেবেছিল মন্দার ? আমষ্টারডাম পোর্ট ছেড়ে যতই গভীর সমুদ্রের দিকে যেতে লাগল "তাই সান" জাহাজ ততই বদলে যেতে লাগল সমুদ্রের রঙ। শেষে মাঝ সমুদ্রে যখন পড়ল "তাই সান" তখন নীলাকাশের রঙ ভেসে উঠেছে সমুদ্রে, সমুদ্রের জল হয়ে গেছে নীল। চারদিকে শুধু জল আর জল, মাথার উপর নীলাকাশ। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! মোহিত হয়ে দেখতে থাকে মন্দার।

॥ ৭ ॥

প্রথম দুদিন উত্তেজনায় কেটে গেল মন্দারের। জাহাজের চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যেতে লাগল বুঝতেই পারল না মন্দার। জাহাজের মেসিন ঘর থেকে সুইমিং পুল, সবই মনে হোল অপূর্ব। ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টা মন্দারকে ভালবেসে ফেললেন দুদিনের মধ্যেই। বুদ্ধিমান, ধীর-স্থির বিনীত এমন ছেলেকেই পছন্দ করে ডি-কোষ্টা। সবকিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়, এমন জ্ঞান-পিপাসু ছোট ছেলেদের ভারী পছন্দ ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টার।

—মাষ্টার মন্দার, তুমি জাহাজের কাজ কারবার যদি বুঝতে চাও তবে চীফ-ইঞ্জিনিয়ার বিষ্ণু উপাধ্যায়কে ধর, ও সব বুঝিয়ে দেবে। —এই বলে ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টা জাহাজের চীফ-ইঞ্জিনিয়ার উপধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয়।

জাহাজের চলাফেরা, দিক নির্ণয় পদ্ধতি, গতিনিয়ন্ত্রণের কলাকৌশল, অন্য জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ম, একে একে সবাই বুঝতে লাগল মন্দার। বুদ্ধিমান ছেলে, অল্প সময়েই সব বুঝে ফেলল। বিষ্ণু উপাধ্যায় মন্দারের এই জ্ঞানপিপাসা দেখে বল্লেন,—তুমিতো দারুণ ইনটেলিজেন্ট হে। তা বড় হয়ে কি হবে? ডাক্তার ইনজিনিয়র, ব্যারিষ্টার, আই. এ. এস, না আমাদের মত জাহাজেই চলে আসবে?

—জাহাজও খুব থ্রিলিং। তবে দিনের পর দিন সমুদ্রে থাকা? তাই বলতে পারছি না কিছু।

—এখন যা দেখছ, তাতে সত্যি কিছু থ্রিল নেই। সত্যিই থ্রিল হয় তখন যখন সমুদ্রে হঠাৎ ভয়ংকর ঝড় উঠে, বা, সমুদ্রের বুকে জাহাজের কল-কব্জা বিগড়ে যায়, বা গুণ্ডা বদমাসরা চড়াও হয় জাহাজে। তাছাড়া স্মাগলারদের জ্বালায়ও আমরা অস্থির হয়ে উঠি। ওরা জাহাজ উঠবেই, আর তখন আমাদের বেশ অসুবিধে-ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয়।

—স্মাগলাররা উঠলে আপনাদের ঝঞ্ঝাট কেন?

—বাঃ, স্মাগলাররা কি এসব বেআইনী কাজ একলা একলাই করে? জাহাজের কিছু লোক এদের সঙ্গে হাত না মিলালে ওরা স্মাগলিং কাজ করতে পারে কখনও?

—ওঃ। বড়ই মুস্কিলতো, আপনাদের স্যার।

—এসব মুস্কিল নিয়েই আমাদের জাহাজী জীবন। এখন দেখছ, সব সেট আপ করা, জাহাজ নিজের মনে চলেছে। আমরা গল্প করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি। কিন্তু কখন যে সমুদ্রে ফুঁসে উঠবে, কখন যে জাহাজ বিগড়াবে, কখন কোন দিক থেকে বিপত্তি আসবে কে জানে? এইসব চোখ কান খুলেই তবে জাহাজের কাজ। ধরনা, এই তুমি স্রেফ গল্প না করে, চারদিক এমনি এমনি না ঘুরে একটু সজাগ ভাবে চল, দেখবে, জাহাজের মধ্যে কত রহস্য লুকিয়ে। তাই বলছি মাষ্টার বড় হোলে চলে এস জাহাজে, জাহাজ থ্রিলারের খনি। ডাঙ্গায় থাকলে কি তা পাবে?

—কথাটা মনে থাকবে স্যার। বড় হই, তখন সঠিক ভাবব কি করব। তবে জাহাজ যে দারুণ তা বুঝতে পারছি।—হেসে বলে মন্দার। মন্দারের কথায় সস্নেহে ওর পিঠে হাত রাখেন জাহাজের চীফ-ইঞ্জিনিয়ার বিষ্ণু উপাধ্যায়।

ডি-কোস্টা, বিষ্ণু উপাধ্যায়, দুজনেই মন্দারের দারুণ বন্ধু হয়ে যায় অচিরেই। দুজনেই ভালবেসে ফেলে ছোট্ট মন্দার চাটুজ্জেকে।

॥ ৮ ॥

ছয়দিনের মাথায় জাহাজ তাই-সান এসে পেঁৗছেছে জিব্রাল্টার পোর্টে। একদিনের মধ্যে একঝলক জিব্রাল্টার শহরটা দেখে নিয়েছে মন্দার। ক্যাপ্টেন ডি-কোস্টা সাবধান করে দিয়েছেন, তাই যেটুকু বিষ্ণু উপাধ্যায় দেখিয়েছে তাই দেখেছে, একলা একলা ঘোরেনি কোথাও।

এবার জাহাজ চলেছে জিব্রাল্টার থেকে পোর্ট সৈয়দ, ছয় দিনের যাত্রা। জাহাজ ভেসে চলেছে ভূমধ্যসাগরের বুকে।

এই যাত্রার দ্বিতীয় দিন সন্ধেবেলায় ডি-কোস্টার ঘরে ডাক পড়ে চীফ ইনজিনিয়ার বিষ্ণু উপাধ্যায়ে। সেই সময়ে মাস্টার মন্দারও ছিল উপাধ্যায়ের ঘরে, গল্প করছিল।

ক্যাপ্টেনের ডাকে উপাধ্যায় বলে,—চল হে মাষ্টার, শুনে আসি হঠাৎ ক্যাপ্টেনের জরুরী তলব কেন? সবইতো চলছে ঠিকঠাক। তবে?

উপাধ্যায় আর মন্দার ডি-কোষ্টোর ক্যাপ্টেন-ডেকে ঢুকতেই ডি-কোষ্টো বলেন—মন্দারকেও সঙ্গে আনলে? গোপনীয় জরুরী কথা ছিল যে।

—বলুন না গোপনীয় কথা এর সামনেই, কোন ভয় নেই। মন্দার দারুণ ইনটেলিজেণ্ট আর সোবার ছেলে। গোপনীয় কথা ও গোপনেই রাখবে। কি বল হে, পারবে না?

স্মিতমুখে মাথা নেড়ে চুপ করে থাকে মন্দার।—ও-কে, শোন তবে উপাধ্যায়। ম্যাসেজ এসেছে, আমষ্টাডামের চুরী যাওয়া হীরের নেকলেশ নাকি এই জাহাজেই চলেছে পাচার হোয়ে। তাছাড়া জিব্রাল্টার থেকে বেশ কিছু সোনার বিস্কুটও উঠেছে, চলেছে বোম্বাই-এ। এই দুই জিনিষ, চোরাই নেকলেশ আর বে-আইনী সোনার বিস্কুটকে ধরতে না পারলে আমরা বেকায়দায় পড়ব। নজর রাখ উপাধ্যায়। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই অ্যাকশন নাও। না হলে কাষ্টমস আটকে দেবে আমাদের জাহাজকে যে কোনও সময়ে।

—স্যার, তেমন কিছু দেখলে আমিও কি আপনাদের জানাতে পারি?—দ্বিধান্বিত গলায় বলে মন্দার।

—সিওর। বাই অল মিনস্। তবে এমন ভাবে করবে যাতে কেউ তোমায় সন্দেহ না করে। তুমি যদি স্মাগলারদের চোখে ধরা পড়ে যাও, জীবনের ভয়ও থাকবে, মনে রেখ।

—আচ্ছা স্যার, মনে থাকবে কথাটা।—ক্যাপ্টেনের ঘরের মিটিং শেষ হয়।

মন্দার ফিরে যায় নিজের কেবিনে। মন্দারের জন্য ওয়েল-ফারনিসড কেবিন। একলাই কেবিনে থাকে মন্দার। মন্দার ঘরে ঢুকে ভাবতে বসে, তাই তো, কিভাবে খারাপ লোকগুলোকে চিনব ? স্মাগলাররা কেমন হয়, হীরে চোরদের চলাফেরা কেমন, কিছুই জানি না, তবে ? ভাবতে বসে মন্দার। তার বই-এর জ্ঞান যা আছে তা মনে মনে হাতড়ে ভাবতে বসে স্মাগলাররা কি করে, কিভাবে চোরাই জিনিষ পাচার করে দেয়।

রাতে ডাইনিং ডেকে মন্দার চোখ কান খুলে খেতে বসে। নানান দেশের নানান লোক ডাইনিং হলে এলো। সব লোকদের ভাষা বুঝতে পারছে না মন্দার। কিন্তু এটুকু বুঝছে তারা গল্প গুজবই করছে, কোনও বদমতলবী কথা ওরা বলছে না।

রাতের খাওয়ার পরে ডেকে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে রাত বাড়ছে। আকাশ ছেয়ে গেছে তারার মালায়। তাই-সান বেশ জোরেই চলেছে ভূমধ্যসাগর দিয়ে! ডলফিন্, তিমি মাঝে মাঝে দেখা গেছে এই ভূমধ্যসাগরের জলজ বুকে। জলের উপর তাদের খেলা অপরূপ।

ডেকের উপরে ষ্টুয়ার্টসরা ঘোরাফেরা করছে। যাত্রীরাও আসছে যাচ্ছে। নাঃ, দ্বিতীয় দিনের রাতেও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি মন্দারের। রাত আর একটু বাড়তেই নিজের কেবিনে ফেরে মন্দার। কেবিনের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

তৃতীয় দিনও কেটে যায় অনুত্তেজ ভাবে। মন্দার ভাবে, কৈ, সন্দেহজনক কিছু তো চোখে পড়ছে না। অনেকটা নিরাশা নিয়েই নিজের কেবিনে ফিরে যায়।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে মন্দার, মনে নেই। হঠাৎ অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। উঠে বসে। একি! এমন করে দুলছে কেন জাহাজ! সমুদ্র-পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগল নাকি! একি! দারুণ ভাবে দুলছে যে! উল্টে যাবে নাকি জাহাজটা!

কেবিনের দরজা খুলে বাইরে আসে মন্দার। বাইরে আসতেই চমকে যায়। বাপ্‌রে! সমুদ্র ফুলে-ফেঁপে জাহাজের ক্যাপ্টেন-ডেককেও জলের ঝাপটায় এলোমেলো করে ভাসিয়ে দিচ্ছে! সমুদ্র যেন ফুঁসছে সাপের ফণার মত।

ডেক প্রায় জনশূন্য। জাহাজের দুলুনিতে ডেকের উপরে উল্টে পড়ে মন্দার। সমুদ্র জলে শরীর ভিজে যায়। এত ভয়ংকর দুলছে জাহাজ যার ফলে যতবার উঠতে যাচ্ছে ততবারই ছিটকে পড়ছে ডেকের পাটাতনে। ভূমধ্যসাগরের পাগলা জলোচ্ছাস ভিজিয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে মন্দারকে।

মন্দার অসহায়ের মত ডেকের উপর পড়ে থাকে। হঠাৎ বলিষ্ঠ হাতের টানে উঠে দাঁড়ায়। দেখে বিষ্ণু উপাধ্যায়।—একি! কেবিন থেকে এই ঝড়ো পাগলা হাওয়ায় বাইরে আসে কেউ ? চলো, কেবিনে চল। মনে রেখো আলপস পর্বত থেকে মাঝে মাঝে এমনিই ঝোড়ো হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরের বুকে। এই সাগরের একদিকে জিব্রাল্টারের কাছে জলপথ হয়ে গেছে সরু, অন্য দিকে পোর্ট সৈয়দের মুখে পানামা খালের মুখও খুব সংকুচিত। ফলেই, সমুদ্রজল দুমুখে কিছু আটকে এমনি ভাবেই ঝড়ের দাপটে ফুলে উঠে। আর এই ভয়ংকর সমুদ্রকে আমরা দারুণ ভয়

করি ভীষণ সমীহ করি। আর সেইখানে তুমি বেরিয়েছ ডেকে? খবরদার, ঝড় না থামলে কেবিন থেকে আর বেরুবে না।

উদ্দাম সমুদ্র যখন শুরু হয় তখন প্রভাতী সূর্য উঠি উঠি করছে পুবের আকাশে। প্রভাতীবেলায় সমুদ্রঝঞ্ঝায় শুধু বিধ্বস্ত তাই-সানের যাত্রীরা। কিন্তু সমুদ্র এখন যেন কত নির্বিকার। রাতের দাপটের চিহ্ন বিন্দুমাত্র নেই সেখানে।

চতুর্থ দিন-রাত শ্রান্তিতেই কেটে যায়। ঝঞ্ঝার রেস কাটাতেই সেদিনটা চলে যায়।

পঞ্চম দিনের শুরু থেকেই আবার সব সহজ। তাই-সানের যাত্রীরা কেউ সুইমিং পুলে সাঁতার কাটছে, কেউ ডেক-চেয়ারে বসে সমুদ্রের মিঠে হাওয়া খাচ্ছে। মন্দার শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে ডেকের এপাশে ওপাশে। কখনও ডেকের সুইমিং পুলের দিকে, কখনও বা ডেকের ফোর-ক্যাসেল সাইডে। দিন পেরিয়ে রাত হয় এমনি করেই।

রাতের ডিনার শেষে ডেকের রেলিং-এ হেলান দিয়ে আকাশের তারার মালা দেখছে মন্দার। সমুদ্রের বুকেও তা প্রায় তেরো দিন হয়ে গেল। দেশ ছেড়ে এসেছে, উনিশ দিন। এতদিন মা-বাবাকে ছেড়ে থাকে নি মন্দার। এতদিন কেন, কোনদিনই তো মাকে ছেড়ে থাকে নি। দেশ দেখার আনন্দে মা-বাবার কথা বারবার ভুলতে চাইলেও পারছে কৈ? এতদূরে এসে, একলা থেকে, এই প্রথম সত্যি করে বুঝছে মন্দার, মা-বাবা তাকে কত ভালবাসে। তার জীবনের সবটা জুড়েই বাবা-মা। ভাবতে ভাবতে কেমন কান্না কান্না পায় মন্দারের। দুহাতে চোখের ভিজে আসা পাতা দুটো মুছে ফেলে, পাছে তার এই দুর্বলতা এখানে কেউ দেখে ফেলে।

হঠাৎ ফিসফিস কেমন শব্দ কানে আসে মন্দারের। অন্ধকারেও শব্দের অনুসরণে তাকায়। দেখে তিনজন লোক নীচু গলায়, সন্দেহজনকভাবে ফিসফিস করে কি যেন বলছে। তারপর দ্রুত একজন ডেকের গ্যাংওয়ে দিয়ে হ্যাচের গহ্বরের মধ্যে ঢুকে যায়।

জাহাজের পেটে এই হ্যাচই হচ্ছে মালপত্র রাখার জায়গা। এত রাতে ওখানে কি করছে লোকটা? পোর্টে এলে তবেই তো মালপত্র উঠা-নামা করে। অন্য সময়ে হ্যাচে তো কেউ যায় না। ঢোকার নিয়মও নেই, তবে?

আস্তে আস্তে ডেক ধরে হ্যাচের গ্যাংওয়ের কাছে এসে দাঁড়ায় মন্দার। এমনভাবে দাঁড়ায় রেলিং ধরে যাতে কেউ যেন তাকে সন্দেহ না করে। মিনিট পনেরোর মাথায় লোকটা উপরে উঠে আসে। মন্দার লক্ষ্য করে লোকটা জাহাজের একজন চার্জম্যান। মেসিনঘরে কাজ করার কথা চার্জম্যানের, তবে গুদামঘরে, হ্যাচে কি করছিল? ভাবতে ভাবতে নিজের কেবিনে ফিরে আসে মন্দার?

ভাবতে বসে। মেসিনঘরের লোক গুদামঘরে কেন গেল? ফিস্‌ফিস্‌ করে অন্য দুজন লোকের সঙ্গে কি কথা বলছিল? অন্য দুজন লোকই বা কারা? চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমে ঢলে পড়েছে খেয়ালই নেই।

মাঝরাতে ঠুক-ঠাক আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যায় মন্দারের। চকিতে উঠে বসে। রাতের সন্দেহ জনক লোকদের রহস্যময় চলাফেরার কথা মনে পড়ে। তবে কি ওরা কিছু করছে? কেবিনের দরজা খুলে দ্রুত বাইরে আসে। অজান্তেই চোখ চলে যায় একটু দূরে হ্যাচের মুখের গ্যাংওয়ের দিকে। তাই তো। আচ্ছা দু-তিনটে মূর্তি নড়াচড়া করছে সেখানে।

কি করবে এখন মন্দার? দৌড়ে ওখানে গেলে ফল ভাল হবে না। ওরা তো মুহূর্তে পালিয়ে যাবে। তারই সঙ্গে ও যে ঐসব লোকদের সন্দেহ করছে তাও ধরা পড়ে যাবে। কি করা উচিত, ভাবতে ভাবতে ঠিক করে নিজের কেবিনের মুখ থেকেই হ্যাচের সামনের মূর্তিগুলোকে নজর করবার চেষ্টা করবে। আবছা আলোয় মূর্তিগুলো খুব স্পষ্ট না হলেও এটুকু বুঝতে পারে, দুজন হচ্ছে জাহাজেরই লোক। ওরা হ্যাচের গহ্বর থেকে কি যেন উঠিয়ে এনে দিচ্ছে ডেকে দাড়ানো অন্য দুটো লোকের হাতে। ছোট ছোট প্যাকেট, তাই জিনিষগুলো কি দিচ্ছে বুঝতে পারছে না মন্দার। মিনিট পনেরো চল্ল এই পর্ব। তারপর ছায়াছবির মত চকিতেই ডেকের ডেকে এদিক ওদিকে চলে গেল ওরা। ততক্ষণে ঠুক্‌ঠাক শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে।

চিন্তিত মন্দার। হ্যাচের থেকে কি নিয়ে এল জাহাজী লোকদুটো? অন্য দুজন যে প্যাসেঞ্জার, বুঝতে অসুবিধে নেই। কিন্তু কি পাচারের মতলবে ওরা? ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টা যেসব সোনার বিস্কুটের কথা বলেছিলো সেগুলো, না, আমষ্টারডামের চুরী যাওয়া হীরের নেকলেসটাও আছে ওর মধ্যে? অথবা অন্য কিছু স্মাগলড্ হোয়ে যাচ্ছে? কিন্তু কি করা উচিত মন্দারের এখন? বিষ্ণু উপাধ্যায়কে সব জানাবে? বলবে গিয়ে ক্যাপ্টেনকে? না, এখন সবই তো আবছা। লোকগুলোর মুখ স্পষ্ট ধরা যায় নি। কি জিনিস নিয়ে গেল তাও বুঝতে পারেনি সে। এরকম অস্পষ্ট ধোঁয়াটে কথা বিষ্ণু উপাধ্যায়দের বললে ওরা হাসবে। নাঃ, আরও ভাল করে সব দেখতে চায়, জানতে চায় সে, তারপর ক্যাপ্টেনদের জানাবে সব। তবে এটা বুঝতে পারছে যা কিছু, দেখল তা সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়। অন্ধকারে, চুপিসারে যা ঘটল তা নিশ্চিত সন্দেহজনক ঘটনা।

জাহাজ তাই-সান্ ষষ্ঠদিনের দুপুর নাগাদ এসে ভিড়ল পোর্ট-সৈয়দে। একে একে নামা শুরু করল। মন্দার দুচোখ বিঁধিয়ে খুঁজে বেড়াল রাতের আবছা দেখা সেই দুই প্যাসেঞ্জারকে। নাঃ, কেউই নয় ওদের মত। তবে ওরা গেল কোথায়? জাহাজেই রয়ে গেল? দেখেও সব কিছু অদেখাই রয়ে গেল মন্দারের।

—কিহে মাষ্টার, কাদের খুঁজছ?

পিছন থেকে কথাটা আসতেই চকিতে ঘুরে দাড়ায় মন্দার।—স্যার, আপনি?

বিষ্ণু উপাধ্যায় মিষ্টি হেসে বলেন,—যাদের খুঁজছ তারা কি অত সহজে ধরা পড়ে? নাঃ বন্ধু, সব অত সহজ নয়। তবে মনে রেখ, তুমি যেমন ওদের খুঁজছ, ওরাও খুঁজছে তোমাকে?

—সেকি! চমকে উটে মন্দার।

—ইয়েস মাই ইয়ং ফ্রেন্ড। গত রাতে ওদেরকে যে কেউ নজর করেছিল তা ওরা নিশ্চয়ই জানে। শুধু জানে না, কে ওদের নজর করছিল। তাই সাবধানে পা ফেল মন্দার। মনে রেখ তোমার ঔৎসুক্যের জন্য বিপদ কিন্তু তোমার চারপাশে এগিয়ে আসছে।

কথাটা শুনে স্থানুর মত নিথর হয়ে যায় মন্দার। বিদেশে বেড়াতে এসে একি বিপদের মধ্যে পড়ল সে।

॥ ৯ ॥

একদিন পোর্ট সৈয়দে থামল তাই-সান্। যেটুকু দেখার পোর্ট সৈয়দে দেখেছে মন্দার। কিন্তু ওর মাথায় একটা কথাই বারবার ঘোরাফেরা করছে' "সাবধান, সাবধানে পা ফেল মন্দার। মনে রেখ, বিপদ তোমার চারপাশে এগিয়ে আসছে।" এই প্রথম শঙ্কা জড়িয়ে ধরতে থাকে মন্দারকে।

পোর্ট সৈয়দ থেকেই জাহাজ ঢুকল সুয়েজ খালে। ভূমধ্যসাগর আর রেডসি-র মধ্যে জলপথের সংযোগ ব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয়েছে এই সুয়েজ খাল দিয়েই। লকগেট খোলা বন্ধের মধ্যে কেমন করে দুই সমুদ্র জলতলের যে ফারাক তাকে কাটিয়ে জাহাজ ভূমধ্য-সাগর থেকে এসে পড়ল রেড-সিতে তা দেখার ব্যাপার, দারুণ ব্যাপার।

সুয়েজ খাল পার পার হোতে লাগল একদিন তারপর তিনদিনের মাথায় তাইসান এসে পেঁছাল পোর্ট-এডেনে। যাত্রীর নামা ওঠা এখানেই বেশী।

মন্দার আবার সজাগ হয়। তার সেই রাতের সন্দেহজনক যাত্রীরা যদি এখানে নামে? নাঃ, তাদের দেখা এখানেও পেল না সে। তাই-সান এবার রওনা হোল পোর্ট এডেন থেকে বোম্বাই-এর পথে। আরব সাগর পেরিয়ে তাই-সান গিয়ে পেঁছাবে দেশের মাটিতে, ভাবতেই আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠে মন্দার।

এরপর দিন তিনেক পার হয়ে গেছে। চতুর্থ দিন দুপুরে লাঞ্চের পর ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টা ডাকেন চীফ-ইনজিনিয়ার বিষ্ণু উপাধ্যায় আর মন্দারকে। জরুরী কথা, গোপনীয় বৈঠক।

উপাধ্যায়ের সঙ্গে মন্দার ক্যাপ্টেনের ডেকে পৌছাতেই কেবিনের দরজা বন্ধ করে দেয় ক্যাপ্টেন।—শোন উপাধ্যায়, বোম্বাই এসে পড়বে আর চার দিনের মধ্যে। চোরাই নেকলেস, স্মাগলড সোনার বিস্কুট এগুলো তো আমরা ধরতেই পারিনি, বরং তার উপর পোর্ট সৈয়দ থেকে আরও স্মাগলড হীরে উঠেছে জাহাজে।

—সেকি! জাহাজ তো তবে স্মাগলড্ জিনিষে ভর্তি হয়ে গেছে!—চমকে বলে মন্দার।

—ইয়েস তাই। আমার খবর, চারজন জাহাজের ক্রু, আর তিনজন প্যাসেঞ্জার

এই স্মাগলিং-এর সঙ্গে জড়িয়ে। মনে রেখ উপাধ্যায়, আমরা যদি এদের ট্রেস করতে না পারি, কাষ্টমসের লোকেরা আমাদের দুজনকেই সন্দেহ করবে বেশী।

—সে কি! আপনাদের সন্দেহ করবে কেন? আপনারা তো এসব খারাপ কাজের মধ্যে নেই।

—ছোট্ট বন্ধু, আমরা এসবের মধ্যে নেই তা আমরা জানি। কিন্তু ক্যাপ্টেন হিসেবে জাহাজের ভাল মন্দের সব দায়িত্ব আমার। আর উপাধ্যায় চীফ-ইঞ্জিনিয়র বলে ওর সর্বত্র গতি। তাই স্মাগলিং করার সুযোগ সবচেয়ে আমাদেরই বেশী। সেজন্যই স্মাগলারদের খোঁজবার দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হয়, নিজেদের সুনামকে রক্ষা করার জন্য, জাহাজের সুনামকে রক্ষা করার জন্য।

—জাহাজের সুনাম দুর্নাম আছে নাকি?

—বাঃ, নেই? একবার যদি বাজারে চালু হয়ে যায় তাই-সানে স্মাগলিং জিনিষ থাকে তাহলে প্রতি বন্দরে কাষ্টমসের লোকরা আমাদের তছনছ করে দেবে সার্চ করে। স্মাগলাররাও এই জাহাজে উঠবে, জানবে স্মাগলিং-এ সাহায্য করার লোক এই জাহাজে আছে। তখন এই জাহাজ দাগী হয়ে যাবে, বদনামী জাহাজ হয়ে যাবে।

—বুঝলে মাষ্টার, বোম্বাই পোর্টে সন্দেহজনক লোকদের আমাদের স্পট করিয়ে দিতেই হবে কাষ্টমসদের। না হলে চোরাই মাল, স্মাগলড মাল ধরা পড়লে সব দায়িত্ব আমাদের কাঁধেই আসবে। কেন দেখ নি, হাসিস স্মাগলড হয়ে যাচ্ছিল এয়ার-ইণ্ডিয়া প্লেনে। লাগেজ বুথে প্যাকেটে হাসিস পায় কাষ্টমসরা। ফলে প্লেনের পাইলট, কো-পাইলট, রেডিও অফিসার থেকে সব ক্রুরাই অ্যারেষ্টেড হয়।—বলে উপাধ্যায়।

—সে কি! প্যাসেঞ্জারদের দোষে আপনারাও বিপদে পড়তে পারেন?

—পারি বৈকি মাষ্টার। তাই তো এতো দুশ্চিন্তা আমাদের।—মন্দারের পিঠে হাত রেখে বলে উপাধ্যায়।

—স্যার, তাহলে কথাটা বলি। মনে হচ্ছে আগেই বলা উচিত ছিল।—মন্দার ক'দিন আগে মাঝরাতে হ্যাচের থেকে জিনিষ উঠাবার ঘটনাটা বলে।

সব শুনে ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টা বলেন—উপাধ্যায়, কালকে মন্দারকে মেসিনরুম থেকে আরম্ভ করে মাষ্ট-হাউস, হ্যাচ, সব ঘুরিয়ে দেখিও। ও যদি আমাদের ক্রুদের বা চার্জম্যানদের কাউকে সনাক্ত করতে পারে তবে কাজটা সহজ হয়।

—কিন্তু ক্যাপ্টেন, তাহলে মন্দার ফুললি এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছে স্মাগলারদের কাছে। সেক্ষেত্রে ওর বিপদ অনেক।

—উপাধ্যায়, মন্দার কি ওদের কাছে এক্সপোজড হয় নি ভাবছ? ওরা মন্দারকে পুরো নজরে রেখেছে। এমন কি আজকের এই মিটিং-এও মন্দার আছে, সে খবরও হয়ত ওদের কাছে আছে।

—তাহলে ক্যাপ্টেন ? মন্দারকে আমাদের কভার করা উচিত। তা না হলে ওর উপর হামলাও হতে পারে ? ওর জীবন বিপন্নও হোতে পারে ?
—পারে বৈকি। সেজন্য তোমার সঙ্গে ওকেও ডেকেছি এখানে। সেকেণ্ড অফিসার মিট্টল ওকে সব সময়ে কভার করবে, হয় নিজে বা কোনও বিশ্বাসী অ্যাসিসটেণ্ট দিয়ে। আর মন্দার, রাতে ডিনারের পরে সোজা কেবিনে ঢুকবে, একলা একলা বেরুবে না। শোন, এই নাও ছোট্ট ঘড়ির সাইজের ওয়াকি-টকি। প্রয়োজনে এই বাটন অন করে কথা বোল, আমি সব কথা শুনে যা করার করব ! ঘড়িটা হাতে পরে রাখবে সব সময়। তবে রাত্রে বাইরে কিছুতেই বেরুবে না।
—কিন্তু ক্যাপ্টেন আমার দরকার হলে ?
—নাঃ, রাত্রে কিছু দরকার হবে না তোমার। কোনও ভাবে আর দুটো রাত কাটিয়ে দাও। আর দুই দিন পরে তো বোম্বাইতে পেঁৗছিয়েই যাচ্ছ। তখন যত পার রাতে ঘুরো, কেউ নিষেধ করবে না। স্মাগলারদের নিয়ে যত চিন্তিত, তার চেয়েও বেশী তোমার জন্য চিন্তিত। ইউ আর স্পটেড, ইউ আর ইন ডেঞ্জার, ইন রিয়েল ডেঞ্জার।
কেমন অসহায় চেখে মন্দার তাকিয়ে থাকে ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টার দিকে। ক্যাপ্টেনের কথাগুলো বার বার কানের কাছে বাজতে থাকে,—ইউ আর স্পটেড, ইউ আর ইন ডেঞ্জার, ইন রিয়েল ডেঞ্জার।

।১০।

কিছুটা ভয়ে, কিছুটা ক্যাপ্টেনের হুকুমে, এরপর মন্দার চতুর্থ দিন সকালে প্রায় কেবিন থেকে বেরুলই না। কিন্তু মনটা দারুণ অস্থির হয়ে রইল। স্মাগলাররা জাহাজেই আছে, তাদের ক'জনকে দূর থেকে আবছা আবছা দেখেছে, কিন্তু ধরতে পারে নি। কিন্তু তাদের না ধরতে পারলে ক্যাপ্টেন, উপাধ্যায় সবার বিপদ হবে। ওরা তাকে এত ভালবাসে। অথচ ওদের জন্য কিছু করবে না সে, তা কি করে হয় ? ভাবনার সমুদ্রে ডুবে যায় মন্দার।
—মাষ্টার, দরজা খোল।—মন্দারের কেবিনের দরজায় উপাধ্যায়ের আঙ্গুলের টোকা পড়ে।
দরজা খুলে বাইরে আসে মন্দার।—চলো, মেসিনরুম, হ্যাচ সব ঘুরিয়ে আনি। দেখো, সেই রাতের বন্ধুদের দেখতে পাও কিনা।
উপাধ্যায়ের সঙ্গে মন্দার সব জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আসে হ্যাচে, গুদামঘরে, যেখানে মালপত্র থাকে। চারদিকের দেওয়াল প্যানেলিং করা। লক্ষ্য করল মন্দার, হ্যাচের প্যানেলড দেওয়ালটা ঠিক তার কেবিনের গা ঘেসেই। মাথায় শুধু দরজা, ডেক থেকে গ্যাংওয়ে দিয়ে নামবার পথ। সে পথ দিয়েই জাহাজের খোলের মধ্যে, হ্যাচে ঢুকেছে

মন্দার, উপাধ্যায়ের সঙ্গে। ফিসফিস করে বলে মন্দার—এখান থেকেই কি সব প্যাকেট যেন বাইরে নিচ্ছিল দুজন জাহাজের কর্মচারী।

—তার মানে লুকোবার জায়গা এখানেই আছে।

—তাই তো মনে হচ্ছে স্যার।

ঠক। হঠাৎ উপর থেকে শব্দ ভেসে আসে।—মন্দার, ফলো মি। মনে হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য করছে কেউ।—দৌড়ে উপরে উঠে আসে উপাধ্যায়। পিছনে মন্দার।

উপরে উঠতেই দেখতে পায় দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এক মনুষ্যমূর্তি।—স্যার, মনে হচ্ছে ওকেই ঐদিন দেখেছিলাম।

—রান্। দৌড়োও। ধরতে হবে ওকে।—উপাধ্যায় ছুটতে থাকে অপসৃয়মান মূর্তির দিকে। কিন্তু উপাধ্যায় আর মন্দারের শত চেষ্টাতেও ঐ মূর্তি ভোজবাজীর মত কোথায় যেন মিলিয়ে যায়।

—মন্দার, কেবিনে যাও। মনে হচ্ছে ওদের কাউকেই তুমি আর দেখতে পাবে না। তবে এটাও মনে রেখ, তুমি এখন ফুললি এক্সপোজড ওদের কাছে। খুব সাবধানে থেকো। আজ আর কালকের দিনটা সাবধানে থাকতে হবে তোমায়।

—ও-কে স্যার।—সাবধানেই থাকতে চায় মন্দার চতুর্থ রাতে। কেবিনে ফিরে আসে। কিন্তু রাতটা কাটতেই চায় না মন্দারের। সমস্ত রাতটায় ঠক্-ঠক্ শব্দ ভেসে আসে জাহাজের খোলের ভিতর থেকে। নিশ্চয়ই কিছু হচ্ছে সেখানে। কিন্তু বাইরে বেরুনো বারণ তার। কি আর করে মন্দার? অসহায় মন্দার সে রাতে না ঘুমিয়েই অস্থিরভাবে কেবিনে পাইচারী করতে করতে কাটিয়ে দেয়।

পঞ্চম দিন সকালেই সটান্ হাজির হয় উপাধ্যায়ের কাছে।—স্যার, আজ আর একবার জাহাজের মেশিনরুম, হ্যাচ ঘুরে দেখব।

—কেন? আবার কিছু হোল নাকি?

—না স্যার।—মন্দার গত রাতের শব্দের কথা বলতে চায় না। মনে মনে ঠিকই করে ফেলেছে, তার যাই হোক না কেন, আজকের রাতে বাইরে থেকে দেখবে এত শব্দ কোথা থেকে আসে শুধু রাত্রিবেলায়। মনে মনে বলে, বাবা ঠিকই বলত, মাঝে মাঝে ডাকাবুকো না হলে চলে না। ভীরুদের জন্যই শুধু বিপদ ওৎ পেতে থাকে। সাহসীদেরই ভাগ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

পঞ্চম দিনের ডিনার শেষে নিজের কেবিনে গিয়ে ঢোকে মন্দার। আজ সে প্রস্তুত। যা হয় হবে। তাই হাই পাওয়ার ছোট্ট টর্চ সেলটা হীপ পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। বাবার দেওয়া কাঞ্চননগরের দুফলা ছোট্ট ছুরিটা রাখে সাইড পকেটে। সাদাসিদে ভীরু ভীরু ছেলে মন্দার মনে মনে আওড়ায়, বাবা, আজকের রাতটায় তোমার মত ডাকাবুকো স্পোর্টিং করে দাও আমায়। প্লিজ, প্লি-জ বাবা। মা, আশীর্বাদ কর যেন আজকে কিছু একটা করতে পারি ক্যাপ্টেনদের জন্য।

। ১১ ।

জাহাজের বুকে রাত বাড়তে থাকে। ঘড়িতে একটা বেজে গেছে। দুটোও বেজে গেল। কিন্তু আজকের রাতটা বড় নিস্তব্ধ। গত রাতের মত সেই ঠুকঠুক শব্দ নেই। কি ব্যাপার? তবে কি গত রাতে যা শুনেছিল সবই তার কল্পনা?

ঠক্—ঠক্—ঠক্। হঠাৎ শব্দ ভেসে আসে। চকিতে উঠে দাঁড়ায় মন্দার। ঐ তো, ঐ তো সেই শব্দ। তার কেবিনের দেওয়ালের ওপাশ থেকে আসছে! মুহূর্তে দরজা খুলে বাইরে আসে। দ্রুত শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে থাকে।

হ্যাচের মাথার ডেকের দরজা খোলা। উঁকি দিয়ে নীচে তাকাতেই দেখে হ্যাচের দেওয়ালের সামনে কিছু আলো ঘোরাফেরা করছে। ওয়াল-প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে জনা কয়েক লোক কি যেন করছে। এত রাতে কি করে ওরা?

মন্দার গ্যাংওয়ে ধরে হ্যাচের খোলের মধ্যে নামতে থাকে। কিছুটা সিঁড়ি ধরে নীচে নামতেই সমস্ত ব্যাপারটা চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠে। নীচে, হ্যাচের দেওয়ালের প্যানেলগুলো খোলা। প্যানেলের ফোকরের মধ্যে থেকে বার করছে সোনার বিস্কুটের ছোট ছোট প্যাকেট। পাশেই জ্বলজ্বল করছে প্ল্যাষ্টিক প্যাকেটে হীরের সেই নেকলেসটা। ছোট ছোট প্ল্যাষ্টিকের প্যাকেটে বেশ কিছু হীরের চকমকি পাথরদানা। আরও অনেক ছোট ছোট প্যাকেটে আরও কি যেন ভরছে।

—বাপ রে! এতসব জিনিষ তোমরা স্মাগলড করছ!

—কে! হু ইজ দেয়ার!—চকিতে ঘুরে দাঁড়ায় পাঁচমূর্তি। স্পেশাল ইলেকট্রনিক টর্চের আলো জ্বলে উঠে মন্দারের মুখের উপর।

—ইউ ডেভিল, তুমি এখানেও ফলো করেছ। সব কিছু দেখে ফেলেছ আমাদের। নাঃ, তোমাকে আর ছেড়ে দেওয়া যায় না। ক্যাচ হিম, পাকড়ো।

—মিট্টল! তুমি! তুমি না আমাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাবে? ক্যাপ্টেন তোমাকে তো এই দায়িত্বই দিয়েছিল!—না ঘাবড়ে ঠাণ্ডা মাথায় উত্তর দেয় মন্দার।

—হেল ইউর ক্যাপ্টেন। ইউ ম্যান, ছোকরাকো পাকড়ো। ভাগনে না পায়—চিৎকার করে উঠে মিট্টল।

দুড়দাড় করে চারটে মূর্তি নীচ থেকে গ্যাংওয়ের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। মুহূর্তে ঘুরে দাড়ায় মন্দার। তড়তড় করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পড়ে। তারপর ছোটে নিজের কেবিনের দিকে।

কোনও রকমে কেবিনে ঢুকেই দরজা বন্ধ করতে যায়। কিন্তু তার আগেই দুম করে ধাক্কায় দরজা খুলে ফেলে ওরা। মিট্টল আর চারজন লোক মন্দারের কেবিনে ঢুকে পড়ে, বলিষ্ঠ কয়েকটা হাত চেপে ধরে মন্দারকে। তারপর চোখের পলকে রুমাল দিয়ে মন্দারের হাতদুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলে। একটু পরেই ভারিক্কী চেহারার আর একজন বয়স্ক মানুষ এবার কেবিনে ঢোকে।

আজই ছিল জাহাজের বুকে শেষ রাত। কাল সকালে ৮টা-৯টা নাগাদ তাই-সান্ ভিড়বে বোম্বাই পোর্টে। ৩০ দিনের বিদেশ সফর শেষে ফিরেছে মন্দার। বাবা-মা এতদিনে কলকাতা থেকে নিশ্চয়ই বোম্বাই পেঁছে গেছে তাকে রিসিভ করার জন্য। বাবা-মাকে দেখার জন্য সত্যই বড় চঞ্চল হয়েছে মন্দার। এরই মধ্যে স্মাগলারদের এই ঝঞ্ঝাট এঁকি বিপদের জালে জড়িয়ে ফেলল তাকে। বেঁচে-বত্তে ফিরতে পারবে তো সে? বাবা-মায়ের সঙ্গে আবার দেখা হবে তো তার?

—নাউ ফেণ্ড, তোমার সব অনুসন্ধিৎসার শেষ হোক এবার। আমি হচ্ছি 'বাবুভাই হীরকওয়ালা'। হীরের মার্চেণ্ট হিসেবে একডাকে আমাকে সবাই চেনে। আর ঐযে সেকেণ্ড অফিসর মিট্টল, অন্যান্যরা সবাই আমার এজেণ্ট। বুঝেছ? নানান জাহাজে এরকম এজেণ্ট আমার অনেকই আছে।

—ভেবো না বাবুভাই তুমি রেহাই পাবে? তুমি ধরা পড়বেই।—এত বিপদেও ঘাবড়ায় না মন্দার।

—হাঃ, হাঃ, বড় তেজ তোমার দেখছি। বাবুভাইকে ধরে এমন মানুষ জন্মায় নি, বুঝেছ ছোকরা। তবে তুমি বড্ড বেশী জেনে গেছো। তোমার মত বিচ্ছু ছেলেকে আর ছেড়ে রাখা যায় না। ইউ আর ডেঞ্জারাস্। করঞ্জাম্পা, নাউ টেক অ্যাকসন।

এবার রুমাল দিয়ে মন্দারের মুখটাও বেঁধে ফেলে ওরা। হাত-মুখ বাঁধা মন্দারকে নিয়ে যায় জাহাজের ফোর ক্যাসেলের নির্জন প্রান্তে। তারপর কোমরে দড়ি বেঁধে ধীরে ধীরে নামাতে থাকে আরব সাগরের জলে। ডেক থেকে হেঁসে বলে উঠে বাবুভাই হীরকওয়ালা,—আরবসাগরের ঠাণ্ডা জলে ভালই থাকবে ছোট্ট বন্ধু। আর মাঝ পথে হাঙ্গরের দেখাতো পাবেই। তারাই তোমার শেষ পরিচর্যাটুকু করবে। অন্তত একথা কেউ বলবে না, বাবুভাই ছোট্ট ছেলেকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলেছে। নো ঃ, নো ঃ, আই অ্যাম নট সাচ্ এ ক্রুয়েল। হাঃ, হাঃ, হাঃ—

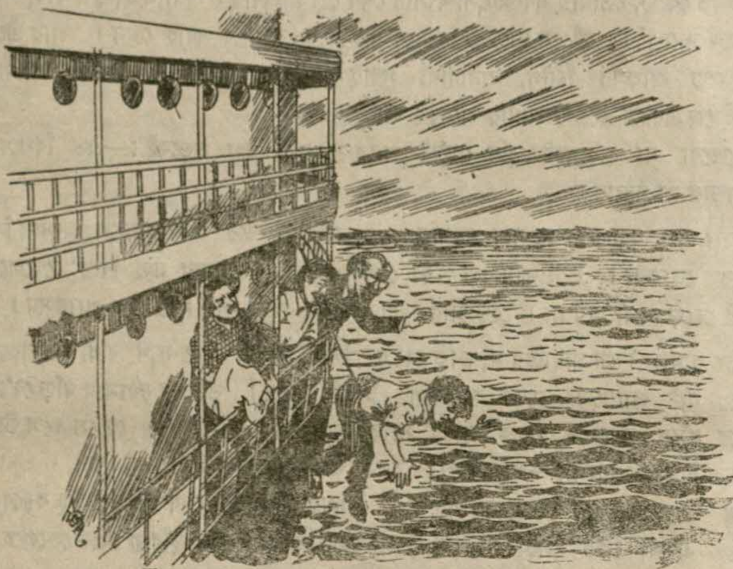
জাহাজ থেকে আরবসাগরের জলের মধ্যে আছড়ে পড়ে মন্দার। ঠাণ্ডা জলে শরীর কেঁপে উঠে তার। ১২ নটিক্যাল মাইল স্পীডে চলছে তাই-সান্। তারই সঙ্গে সাগরের জলের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে চলছে মন্দার। দড়ি দিয়ে শরীর বাঁধা তাই ভেসেও যেতে পারছে না। সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে, আরবসাগরের শীতল জলের কামড়ে ক্রমেই শরীর ক্ষতবিক্ষত, ক্লান্ত, নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত এই ঘটনা ঘটায় হতচকিত মন্দার।

একটু পরে স্বম্বিত ফেরে মন্দারের। দেখে, দূর থেকে ছোট্ট লঞ্চ আসছে তাই-সানের দিকে। তাইসানের ডেক থেকে কারা'যেন সিগনেলিং করছে। তবে কি এই লঞ্চেই স্মাগলড্ জিনিষ নিয়ে পালিয়ে যাবে বাবুভাইএর লোকেরা? সব জেনেও বাধা দিতে পারবে না সে? কিন্তু হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় সমুদ্র থেকে করবে কি সে?

হঠাৎ মনে পড়ে যায় কথাটা। তাইতো, কি বোকা আমি। হাসি ফোটে মন্দারের

মুখে। অনেক কষ্টে মুখের বাঁধন আলগা করে ফেলে। মুখ দিয়ে হাতে বাঁধা ওয়াকি-টাকির সুইচ অন করে। কোনওরকমে খবর পাঠায় ক্যাপ্টেনকে, ওয়েরলেস রুমে।

মুহূর্তে জাহাজের সমস্ত আলো জ্বলে উঠে ডেকে। আলোর বন্যায় ডেক প্লাবিত হয়ে যায়। সমুদ্রের বুক থেকেও শুনতে পায় মন্দার ডেকের উপরে ছোটাছুটি, দৌড়ঝাঁপ, চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ। তারপর সব স্তব্ধ হয়ে যায়।



ইতিমধ্যে উপাধ্যায় ছুটে আসে, ফোর-ক্যাসেলের বাইরের গ্যাং-ওয়ে ধরে দ্রুত নেমে আসে নীচে, সাগরের জলের কাছে। দুহাতে তুলে নেয় মন্দারকে সমুদ্রের বুক থেকে। সমস্ত বাঁধন খুলে দেয়। —ওঃ, মাই বয়, মাই সুইট মন্দার, তুমি ঠিক আছ? কষ্ট হয় নি তো? লাগেনিতো কোথাও?—আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় মন্দারকে বিষ্ণু উপাধ্যায়।

॥ ১২ ॥

জাহাজ ভিড়েছে বোম্বাই পোর্টে। বিরাট স্মাগলিং গ্যাং ধরা পড়েছে। রিপোর্টার ফটোগ্রাফারে ছেয়ে গেছে তাই-সান্ জাহাজ।

এদিকে ডাঙ্গায় গহণ চাটুজ্যে আর সুমনা অস্থির চোখে খুঁজতে থাকে মন্দারকে।

সব প্যাসেঞ্জারই তো একে একে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের ছোট্ট ছেলে মন্দার কৈ? জাহাজের ডেকেই বা এত ভীড় কিসের?

হঠাৎ নজর পড়ে গহণ চাটুজ্যের। মন্দারকে দেখতে পায়। বহু লোক ঘিরে ধরেছে মন্দারকে। কি ব্যপার! মন্দার কি কোন ঝামেলায় পড়ল! আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে গহণ চাটুজ্যে।

—স্যার, আপনাদের ক্যাপ্টেন ডাকছেন। জাহাজের একজন ক্রু এসে দাঁড়ায় গহণ চাটুজ্জের পাশে।

—কেন ভাই, কি হয়েছে? কি করেছে মন্দার?—সুমনার গলা ভয়ে কেমন হয়ে যায়।

—ডোণ্ট ওরি ম্যাডাম, প্লিজ কাম।—সিঁড়ি বেয়ে গহণ চাটুজ্জেদের উপরে নিয়ে আসে জাহাজের ক্রু।

ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টা এগিয়ে আসে। দুহাত বাড়িয়ে দেয় গহণ চাটুজ্জেদের দিকে।—ওয়েলকাম, ওয়েলকাম প্রাউড পেরেণ্টস। মন্দারের মত এমন ধীর-স্থির-বুদ্ধিমান—সাহসী ছেলে দেশের গৌরব। কোটি কোটি টাকার স্মাগলার কিং বাবুভাই হীরক-ওয়ালাকে হাতে-নাতে ধরিয়ে দিয়েছে মন্দার জীবন বিপন্ন করেও। তাই-সানু জাহাজ মন্দারের কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা ওর এই সাহসীকতার জন্য ওকে আলাদা ভাবে পুরস্কৃত করব।

—সেকি! মন্দার স্মাগলারদের ধরিয়ে দিয়েছে?

—ইয়েস স্যার। আমাদের এই ছোট্ট মন্দারই ধরেছে।

অবাক চোখে গহণ চাটুজ্যে তাকিয়ে থাকে তার ছেলের দিকে। তাদের সেই ভীরু ভীরু চাহনীর ছোট্ট ছেলে মন্দার কেমন যেন অনেক, অ-নে-ক বড় হয়ে গেছে তাদেরও থেকে। মন্দার এখন যেন কত উজ্জ্বল, কত দৃপ্ত।

—বাবা, দেখো, ঠিক ফিরে এসেছি তোমাদের কাছে। তোমাদের না দেখে ভীষণ কষ্ট হোত আমার।—মন্দারের দুচোখ জলে ভরে আসে।

—তোকে ছেড়ে আমাদেরও বড় কষ্ট হোত রে। আয় বাবা, বুকে আয়।—জল ঝরা চোখে সুমনা বুকে জড়িয়ে ধরে মন্দারকে।

—তুই যে এমন সাহসী, ডাকাবুকো বুঝতেই পারি নি। তুই দারুণ রে মন্দার।—গহণ চাটুজ্যে সস্নেহে, গর্বে ছেলেকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়। অপত্য স্নেহে মন্দারের দিকে তাকিয়ে থাকে ক্যাপ্টেন ডি-কোষ্টা আর বিষ্ণু উপাধ্যায়ও। রিপোর্টারদের অজস্র ক্যামেরায় এই আবেগঘন ছবি ধরা পড়ে যায়।

বোম্বাই পোর্টে আরবসাগরের প্রভাতী বেলা অপরূপ হয়ে উঠে এই মিলন দৃশ্য।

———



দাদামশায়ের উইল

মন্মথ রায়

[উষা, সন্ধ্যা, মায়া ও মুকুল চার বোন। এদের আর কেউ নেই। আছেন শুধু এক বুড়ো দাদামশাই। তিনি রোগশয্যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে উষা, সন্ধ্যা ও মায়া খুব উত্তেজিতভাবে আলাপ করছে।]

উষা। আমি স্পষ্ট বলে এলাম, আমি বিয়ে করব না—বি-এ পড়ব।

সন্ধ্যা। তুমি আজ বললে, আমি কবে বলেছি।

মায়া। আমি কুমারী সংঘের মেম্বার হয়েছি, মেম্বার হবার সময় প্রতিজ্ঞাই করতে হয়েছে আজীবন কুমারী থাকব।

সন্ধ্যা। আমি একেবারেই বুঝতে পারি না, দাদামশাই আমাদের বিয়ে দেবার জন্য ক্ষেপে উঠেছেন কেন!

উষা। বুড়ো মরতে বসেছে, কিন্তু জিদটি বজায় রেখেছেন আঠারো আনা।

মায়া। বলেন, তোরা বিয়ে না করলে বংশ রক্ষা হবে না। আমি কী বলেছি জানো? বলেছি, দাদামশাই কিছু ভেবো না, আমরা বংশ রোপণ করছি—দু'বেলা জল দেব—তোমার বাড়িটাই বংশবন হয়ে যাবে!

উষা। আমরা বিয়ে না করলে সব সম্পত্তি নাকি উইল করে যাবেন।

সন্ধ্যা। ও মা! তা জানো না, উইল যে একটা করেছেন?

মায়া। করেছেন! কবে?

সন্ধ্যা। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে দেখি বাড়িতে এটর্নি। সেইদিনই হয়েছে।

মায়া। না-না, সে আর কোনো কাজ! উইল-টুইল হয়নি, ও মিছে ভয় দেখানো, ও আমি বুঝি।

উষা। কী-ই বা উইল করবেন? সম্পত্তি তো আমাদের চার বোনকেই দিতে হবে। আর ও'র কে আছে?

সন্ধ্যা। না-না, মুকুল বলছিল তাকে নাকি বলেছেন···তোরা বিয়ে না করলে সব সম্পত্তি বিধবা-বিবাহ সমিতিকে দিয়ে যাব। কিছু বলা যায় না, খেয়ালে চলেন কি না?

উষা। কিন্তু এ ও'র অন্যায় খেয়াল। মেয়েদের যে বিয়ে করতেই হবে, তার কী মানে আছে!

মায়া। মেয়েদের দাদামশাই মানুষ বলেই মানেন না। বলেন, মেয়েরা স্বাধীন থাকবার অনুপযুক্ত।—কি একটা শ্লোক আউড়িয়ে বলেন, বাল্যে পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন থাকবে নারী—

উষা। আ-হা-হা! নইলে পৃথিবী রসাতলে যাবে, না?

সন্ধ্যা। পুরুষদের চেয়ে আমরা কোন অংশে কম নই। বিয়ে আমরা করব না।

মায়া। কখনো না। যদিও বা করতাম, দাদামশাই আমাদের এই যে অপমান—অসম্মান করেছেন এর প্রতিবাদ স্বরূপ আমরা বিয়ে করব না। আর আমি তো কুমারী সংঘের সভ্য!

উষা। দাঁড়াও, মুকুল আসুক। মুকুলেরও যদি এই প্রতিজ্ঞাই হয়, আমরা চারজনে একসঙ্গে গিয়ে দাদামশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে নতুন করে এ প্রতিজ্ঞা করব—আজই—এই রাত্রে। এই যে, মুকুলও এসেছে, শোন মুকুল—

[মুকুল এসে দাঁড়াল। তার হাতে চন্দনকাঠের একটা সুদৃশ্য বাক্স—লাল ফিতে দিয়ে চার ভাঁজে বাঁধা—বাঁধনটা বাক্সের ওপরের ডালার মাঝখানে এসে শেষ হয়েছে।]

মুকুল। তোমরা শোন—এই বাক্স দেখছ?

তিনজন। কী? ব্যাপার কী?

মুকুল। দাদামশাই এই বাক্স দিয়ে আমাদের পরীক্ষা করবেন।

সন্ধ্যা। পরীক্ষা মানে?

মুকুল। তোমরা তো চলে এলে—আমি বসেই রইলাম—আজ আমারও ছিল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা—দাদামশাই কি উইল করেছেন জানতেই হবে।

তিনজন। উইল করেছেন?

মুকুল। না। কিন্তু উইল করবেন কি করবেন না তা স্থির করে ফেলেছেন।

উষা। করবেন?

মায়া। না, করবেন না।

মুকুল। মুখে তা বললেন না। একটা কাগজে কী লিখলেন। কী লিখলেন আমায়

তা দেখালেন না। আমায় বসতে বলে লেখাটা নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। পাশের ঘরে গিয়ে জোরে খিল এ'টে দিলেন বুঝতে পারলাম—খানিকটা পর এই বাক্সটা হাতে করে ফিরলেন। এসেই বললেন, উইল করব কি করব না এবং করলে কি করব তার উত্তর রইল এই বাক্সে। আজ রাত্রেই এটর্নি আসবেন—তাঁর সম্মুখে আমি এই বাক্সটি খুলব। যাও—বাক্সটি খুব সাবধানে রেখে দাও—কিন্তু খবরদার তোমরা এটি খুলো না—যদি খোল, আমি বুঝতে পারব—সাবধান!

তিনজন। দেখি—বাক্সটি দেখি!

[বাক্সটি সকলে মিলে পরীক্ষা করতে লাগল।]

সন্ধ্যা। ব্যাপার কী?

উষা। বেশ একটু ভারি মনে হচ্ছে!

মুকুল। হ্যাঁ, যে কাগজটায় লিখেছেন, সেটি তো ছোট্ট একটু কাগজ। তার চেয়ে কিন্তু ভারী মনে হচ্ছে।

মায়া। কাগজটাতে কী লিখলেন? দেখতে পারলি না তুই?

মুকুল। না, আমায় দেখালেন না।

উষা। যদি দেখতে মানা—তবে আমাদের কাছে এ বাক্স দেওয়া কেন?

মুকুল। আমিও ঠিক ঐ প্রশ্নই করেছিলাম—তাতে তিনি কী বললেন জানো?

তিনজন। কী?

মুকুল। বললেন—এটা তোমাদের পরীক্ষা। মেয়েদের উপর কিছুতেই নির্ভর করা যায় না—তাদের বিশ্বাস করাও চলে না, তাই তাদের এক একটি স্বামী চাই। ...আমার কথা সত্য কি মিথ্যা—তার পরীক্ষা আমি আজই নিচ্ছি। এই বাক্স তোমাদের হাতে দিলাম...এর ভেতর লেখা রইল আমি উইল করব কিনা —করলে কী করব? এটর্নি আসছেন—তিনি না আসা পর্যন্ত এ বাক্স তোমরা খুলবে না। আশা করি এটুকু নির্ভর তোমাদের উপর করতে পারি। ...খুললে আমি কিন্তু বুঝতে পারব।

উষা। বুঝতে পারবেন না হাতী! ভারি তো একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা!

সন্ধ্যা। তালাচাবিও তো নেই!

মায়া। থাকতো যদি শীলমোহর, তাও বা বুঝতাম!

মুকুল। কি জানি! ব্যাপার কি বুঝছি না। [বাক্সটি ঝেঁকে দেখল] ...ভেতরে কাগজ ছাড়াও কী যেন রয়েছে!

উষা। দোর-জানালাগুলো সব বন্ধ করে দেতো!

[সকলে মিলে দোর জানালা সব বন্ধ করে দিল]—

উষা। ব্যাপারটি গুরুতর। উইল না করলে বিষয়টা আমরা চার বোনে পাব, কিন্তু যদি করেন—আমরা কিছু পেতেও পারি—নাও পেতে পারি।

সন্ধ্যা। আমরা বিয়ে না করলে বিধবা-বিবাহ সমিতিতে সব দিয়ে যাবেন ভয় দেখিয়েছেন। সে সমিতির লোকজন যাতায়াত শুরু করেছে তাও দেখেছি।

মায়া। এটর্নিও আসছেন—

মুকুল। কিন্তু তাঁর আসবার আগেই জানা দরকার উইল করবেন কিনা।

উষা। শুধু তাই নয়, করলে কী উইল করবেন?

মুকুল। এতে নাকি তা লেখা আছে।

সন্ধ্যা। কাজেই দেখতে হবে।

মুকুল। দেখলে উনি নাকি তা জানতে পারবেন।

উষা। হ্যাঁ, অন্তর্যামী কিনা! জানতে পারবেন।

মুকুল। যদি উইল না করার সিদ্ধান্ত লিখে থাকেন, ভালো কথা, কিন্তু যদি উইল করাই সাব্যস্ত করে থাকেন—এবং তাতে আমাদের ক্ষতির কারণ হয়—তবে আমরা এটর্নিকে ফোন করে জানাতে পারি—আজ আপনি আসবেন না—দাদামশায়ের শরীর ভালো নেই।

উষা। ঠিক।...তারপর দাদামশাইকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যাতে উইল না হয় তার চেষ্টা করা যেতে পারে।

মায়া। অবশ্য যদি জানা যায় যে, উইল করবেন না—তবে চুপচাপ থেকে যাব।

উষা। তাহলে খোলাই যাক?

সন্ধ্যা। খুব সাবধান! বাঁধনটা যেখানে যেমন গিঁট পড়েছে মেপে রাখ—ঠিক অমনি করে আবার বাঁধতে হবে—

মায়া। আমার তো এখন মনে হচ্ছে দাদামশাই আমাদের সঙ্গে নিছক তামাসা করেছেন। নইলে এ কখনো হতে পারে যে, ঘরের দোর জানালা বন্ধ করে একটা বাক্স খুলছি—যার চাবি নেই—শীলমোহর নেই—শুধু একটা ফিতের সোজা একটা বাঁধন...তিনি জানতে পারবেন! দাও—আমার কাছে দাও—[বাক্সটা নিয়ে গিঁটটা মাপতে লাগল] এদিকে দু' আঙুল...ওদিকে এক...না না, দেড় আঙুল—

সন্ধ্যা। না—না, দেড় আঙুলের চেয়ে একটু বেশি—দাঁড়া, কাগজ কেটে মাপ রাখছি—

[এমনি করে মহা সাবধানে বাক্স খোলার ব্যবস্থা হল।]

মায়া। হয়েছে। এইবার গিঁট খুলি—

তিনজন। [সাবধানে] খোলো!

মায়া। খুলেছি! ফিতেটা খুব সাবধানে রাখো—ধরো—[উষার হাতে দিল] এইবার—[বাক্স খুলল। খোলার সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ভেতর থেকে একটি চড়ুই পাখী উড়ে বেরিয়ে গেল—ওপরে গিয়ে উড়তে লাগল—মেয়েরা হতভম্ব হয়ে ওপরে তাকাল। পাখীটা শেষে স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে বাইরে উড়ে পালাল। মেয়েদের মুখে আর কথা নেই। ক্ষণকাল পর—]

সন্ধ্যা। বুড়োর পেটে এত।

উষা। দেখ দেখি কাগজটায় কী লেখা—

চারজনেই বাক্সে ভেতরকার কাগজটার উপর ঝুকে পড়ল।

মায়া। [পড়তে লাগল] চড়ুই পাখী, যদি তুমি আমার হাতে ফিরে আসো, বুঝব আমার নাতনিরা আর আর মেয়েদের মতো নয়—ওদের ওপর নির্ভর করা চলে—বিশ্বাসও করা যেতে পারে, বিয়ে না হলেও হয়ত ওদের চলবে। কিন্তু চড়ুই পাখী, যদি তুমি আর না ফেরো, তবে এই কথাই কি সত্য নয় যে, মেয়েরা একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়, বিশ্বাসযোগ্য নয়—দায়িত্বজ্ঞান ওদের একেবারেই নেই। এ হেন প্রাণী সংসারে একক থাকলে ধরাতল দু'দিনেই রসাতলে যাবে বুঝেই বিধাতা এই বিধান করেছেন যে, তারা স্বামীর অধীন থাকবে এবং এই জন্যেই আমি স্থির করেছি যে, আমার নাতনিরা বিয়ে করলে তাদের স্বামীরা আমার সম্পত্তি পাবেন—আর তারা যদি কুমারীই থাকে, তবে যে সব বিধবারা সধবা হবেন তাদের কল্যাণেই আমার সব সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যাব। এটর্নিকেও খবর দিয়েছি—বিধবা-বিবাহ সমিতিকেও ডেকে পাঠিয়েছি। কিন্তু সবই নির্ভর করছে—চড়ুই পাখী—তোমারই ওপর।

[চারজনেই একসঙ্গে স্কাইলাইটের দিকে তাকাল।]

কংকন কাহিনী

প্রদীপকুমার নাথ



অনেক অনেক দিন আগের কথা। ইন্দ্রনগরের রাজা ছিলেন দেববর্মন। দেববর্মনের ছিল তিন রাণী—রাজশ্রী, উর্বশ্রী ও জয়শ্রী। দেববর্মন একদিন তিন রাণীকে একটি করে হীরক কংকন উপহার দিলেন। কিন্তু কয়েকদিন ব্যবহার করার পরেই ছোটরাণী জয়শ্রীর কংকনটি ভেঙে গেল। রাণী সেটা রাজাকে সারানোর জন্য দিলেন।

যথারীতি রাজা এই মূল্যবান অলংকারটা সারাতে দেবার আগে মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন, কাকে সারাতে দেওয়া যায়। মন্ত্রী বললেন—যে রাজস্বর্নকার গোপীনাথকে না দিয়ে রাজ্যের শেষপ্রান্তে থাকে এক গরীব সৎ স্বর্ণকার রবিনাথ, তাকে দিয়ে করানোই ভাল।

রাজা তখন রবিনাথকে ডেকে সেই হীরক কংকন নতুন করে সারিয়ে দিতে বললেন। রবিনাথ এক সপ্তাহে সময় নিল।

এদিকে এখবর পেয়ে রাজস্বর্ণকার গোপীনাথের খুব ঈর্ষা হল। কিন্তু করার কিছুই নেই। তাই সে সুযোগ খুঁজতে লাগল।

রবিনাথের শারীরিক অসুস্থতার জন্য রবিনাথ এক সপ্তাহের জায়গায় পনেরদিন পরে রাণীর কংকন নিয়ে এল। রবিনাথের তৈরী কংকন দেখে রাজা মুগ্ধ হলেন। রাণীরও খুবই পছন্দ হল। স্বর্ণকার রাজার কাছে থেকে পুরস্কার পেল এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।

এখবর পেয়ে গোপীনাথের ঈর্ষা আরও বেড়ে গেল। সে আর থাকতে না পেরে রবিনাথকে অপদস্থ করার একটা বুদ্ধি বের করলো।

সে রাজার কাছে গিয়ে বলল, "রাজামশাই, রবিনাথ এক সপ্তাহের কাজ করতে কেন পনেরদিন সময় নিয়েছে জানেন? কংকনটি তৈরী করার পর ওই কংকন সাতদিন ধরে রবিনাথের বউ পরে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি।

রাজা রেগে তক্ষুনি রবিনাথকে ধরে আনার হুকুম দিলেন। আর মন্ত্রীকেও যাতা

বললেন। মন্ত্রীমশাই বললেন—আমার এখনো মনে হয় রবিনাথ সৎ ও নির্দোষ। গোপীনাথ ঈর্ষার বশে আপনাকে এইসব কথা বলেছে।

রাজা তখন রবিনাথের স্ত্রীকে রাজঅন্তঃপুরে ডেকে পাঠালেন। রবিনাথের স্ত্রীকে দেখে ছোটরাণী জয়শ্রী ও মহারাজা বিস্মিত হলেন। কারণ রবিনাথের স্ত্রী ছোটরাণী জয়শ্রীর চেয়ে অনেক মোটা। তাকে দেখে বোঝাই গেল যে জয়শ্রীদেবীর অলংকার তার হাতে উঠবে না।

ঈর্ষার বশে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে রাজা তখনই গোপীনাথকে চাবুক মেরে রাজস্বর্ণকার পদ থেকে বরাখাস্ত করে দিলেন এবং রবিনাথকে রাজস্বর্ণকার পদে বহাল করলেন। আর রবিনাথের বউকে শুধু শুধু হায়রানি করার জন্য একশো মুদ্রা বখশিষ দিলেন। রবিনাথের আর দরীদ্র রইলো না।

———

তোতনের ছবি

রতনতনু ঘাটী

আমি আঁকাবাঁকা নদী লিখলুম
তোতন আঁকল জল,
হঠাৎ কখন ঢেউ তুলে নদী
বইল ছলোচ্ছল।

আমিও একটা বাঘ লিখলুম
টাকডুম টাকডুম,
ডোরা আঁকা শেষ হলে তোতনের
লাফ দিল বাঘ, হুম।

আমি লিখলুম মস্ত আকাশ
মেঘেরা লাফায় ছোটে,
তোতন আঁকল নীল রঙ যেই
রামধনু ভেসে ওঠে।

লিখলুম আমি সাদা কাশফুল
দূরে কাঁসি ঢাক বাজে,
তোতনের আঁকা সাদা রঙে দেখি
হাসছে দুগ্গা মা যে।

রাঙাডুংরির সেই রাত



প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী

রাঙাডুংরির শেষ বিকেল নীলাঞ্জনকে এক অদ্ভুত ভালোলাগার নেশায় মাতিয়ে তুলল। জঙ্গল আর পাহাড়ে ঘেরা এই ছোট টিলার উপরের বাংলো থেকে যতদূর চোখ যায় শুধু বন আর বন। পাহাড়ের গায়ে নাম না জানা কত রকমের ফুলের মেলা। একটা পাহাড়ী নদী বাংলোর গায়ে পাহাড়ী রাস্তার নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে। বাতাসে মহুয়া ফুলের মাতাল করা গন্ধ। দিনের শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে অনামা পাখির নানান সুরে গাইতে গাইতে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

বন্ধু অমিতের বনে ঘেরা বাংলোর এই নির্জন মুহূর্ত পথের সমস্ত ক্লান্তি ভুলিয়ে দিল নীলাঞ্জনকে।

আজ দুপুরের গাড়িতে নীলঞ্জন প্রথম রাঙাডুংরিতে এল। অমিত পাশের নিকিয়াবুরুর জঙ্গলে নতুন রাস্তা তৈরীর কাজ নিয়ে এসেছে। তাই এই সুযোগে বন জঙ্গল দেখার আশায় হাতে একটু সময় পাওয়াতে হঠাৎই চলে এসেছে নীলাঞ্জন।

এক দেহাতি কিশোর, অমিতের ঘরের কাজকর্মে সাহায্য করে, সে-ই নীলাঞ্জনের আসার খবরটা সাইটে অমিতকে জানাতে গিয়েছে। এখনও ফেরেনি। নদীর ধারের পাহাড়ের ঢালু জমিতে পাতাহীন এক ধরনের বড় বড় গাছের অপূর্ব সুন্দর হলুদ রঙের রাশি রাশি ফুলের উপর অবাক নীলাঞ্জনের দৃষ্টি আটকে গেল। ফুলগুলো দেখতে অনেকটা সূর্যমুখী ফুলের মত। বইয়ের পাতায় নীলাঞ্জন এ ফুলের ছবি দেখেছে। গোল গোলি ফুল। এগুলো যে প্রকৃতিতে এত সুন্দর ভাবতে পারে নি সে।

'কি হে শিল্পী, প্রকৃতির রসে কি ডুবে গিয়েছ?' পেছন থেকে এসে উচ্ছল অমিত নীলাঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে। নীলাঞ্জনও খুশিতে বন্ধুকে বুকের কাছে টেনে নিল।

অমিত উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'উঃ, মনে হচ্ছে কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল। সত্যিই পরিচিত গণ্ডীর বাইরে দিন কাটালে তবেই একজন বুঝতে পারে সে কাকে কতটুকু ভালোবাসে।'

নীলাঞ্জন আর অমিত কোলকাতায় একই স্কুলে পড়াশোনা করেছে। স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে অমিত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল। নীলাঞ্জনের স্বপ্ন সে আর্টিস্ট হবে, তাই সে ভর্তি হল আর্ট কলেজে। দুজন জীবনের দুদিকে গেলেও তাদের মধ্যের সম্পর্কের কোন ছেদ পড়ে নি। তাই অমিত পড়াশোনা শেষ করে প্রথম চাকরী নিয়ে রাঙাভুংরিতে এসে বারবার চিঠিতে বন্ধুকে সেখানে আসবার জন্য লিখেছে।

গাছ-গাছালির পাতায় পাতায় সন্ধ্যে নামে। প্রথম বসন্তে পাহাড়ের বনে কোকিল ডাকছে।

পোশাক পাল্টে এসে অমিত নীলাঞ্জনকে বলল, 'চল আজ শিকারে যাওয়া যাক।'

শিকারের কথায় নীলাঞ্জন উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, সে কখনও শিকারে যায় নি।

অমিত হাসতে হাসতে বলে, 'এ শিকার শুধু সখের শিকার নয়। আজ শিকার না করলে আগামী দুদিন ডালভাত খেয়ে কাটাতে হবে।'

নীলাঞ্জন অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, আশেপাশে কোন দোকান-পাট নেই?'

'কোথায় থাকবে?' অমিতের ঠোঁটে কৌতুকের হাসি, 'তুমি তো আজ আসবার পথে সব নিজের চোখেই দেখেছো। ন' মাইল দূরের ঐ ছোট্ট স্টেশনটা না থাকলে আমরা পুরোপুরি জঙ্গলের বাসিন্দাই হয়ে যেতাম। ঐ স্টেশনের গায়ে সপ্তাহে একদিন হাট বসে। সেদিন সারা সপ্তাহের জিনিসপত্র কিনে রাখতে হয়।'

'তার মানে তোমার মত ভোজন প্রিয় ছেলেকেও নিরামিষাশী হতে হয়েছে।' নীলাঞ্জনের স্বরে যেন অবিশ্বাস।

'না তা ঠিক নয়,' অমিত বলল, 'হাটের দিন মাছ পাই, অন্যান্য দিনের জন্য মুরগী কিনে রাখি। আবার তেমন দরকার হলে কখন-সখনও সুযোগ বুঝে রাইফেল হাতে বনেও ঢুকে পড়ি। পাখ-পাখালি বা হরিণের মাংসে সেদিন জীভের স্বাদ বদলাই। আজ অবশ্য শুধু স্বাদ পাল্টানোর জন্যই শিকার নয়।'

'অত শত বুঝি না', নীলাঞ্জনের গলায় সমান আগ্রহ, 'এমন পূর্ণিমার রাতে পাহাড়ী গভীর অরণ্য দেখার সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়!'

বনের মাঝে গাছপালার পাতার আড়াল দিয়ে আকাশে পূর্ণিমার পূর্ণ চাঁদ নজরে পড়ে না। কিন্তু জ্যোৎস্নার ছটায় নির্জন সারা বনভূমি এক মোহময়ী রূপ নিয়েছে। অমিত কাঁধে রাইফেল চাপিয়ে নীলাঞ্জনকে পাশে বসিয়ে জীপের স্টিয়ারিং হাতে ধরে এক্সিলেটারে চাপ দিল।

পাহাড়ী পথে এঁকে বেঁকে জীপ যত এগোতে থাকল দুপাশের জঙ্গল তত গাঢ় হতে লাগল। মাথার উপরের আকাশকে পথের দুপাশের বড় বড় গাছের ডালপালা আড়াল করে রেখেছে। চলতে চলতে অজানা বনফুলের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। মাঝে কোথাও কোথাও বন এত গভীর হতে লাগল যে এই জ্যোৎস্না রাতেও সেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। আর সেই অন্ধকারে গাছের পাতায় পাতায় থোকা থোকা জোনাকী জ্বলছে।

দূরের বন থেকে গাছপালার মধ্যে দিয়ে এক গম্ভীর শব্দ ভেসে এল। অমিত হেসে নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সম্বরের ডাক।'

নীলাঞ্জনের চোখে মুখে কেবল বিস্ময়। তার মনে হল সে যেন স্বপ্ন দেখছে। চলতে চলতে কখনও রাত জাগা পাখিদের ডাক ভেসে আসতে লাগল। নিঃস্তব্ধ রাতে শুধু জীপের চাকায় পিষে যাওয়া পথের শুকনো পাতার মর্মর ধ্বনি।

এক সময় বন কিছুটা হাল্কা হয়ে এল। বিশাল বিশাল গাছের ডাল-পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না রাতের রুপালী আকাশ দেখা গেল। কিছুক্ষণ আগে দেখা বনের এ যেন অন্য রূপ! চাঁদের আলোয় বনের মাঝে অদ্ভুত আলো-আঁধারির খেলা! কাছেই কোথাও কুকুরের ডাক শোনা গেল। নীলাঞ্জন অবাক না হয়ে পারল না। এই গভীর পার্বত্য অরণ্যের গায়েও মানুষের বাস!

অমিত নীলাঞ্জনের ভুল ভাঙ্গে, 'কুকুর নয়, বার্কিং ডিয়ারের ডাক। কুকুরের ডাক ভেবে অনেকেই ভুল করে।'

একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাপিয়ে দূরের কোন পার্বত্য ঝর্ণার অবিশ্রান্ত জলপতনের শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে লাগল।

অমিত বলল, 'আমাদের গন্তব্যস্থল হিমটুডির ঐ ঝর্ণা। জঙ্গলের একমাত্র এই ঝর্ণায় দলে দলে হরিণেরা রাতের বেলায় জল খেতে আসে। সহজ ভাবে হরিণ শিকারের সুন্দর জায়গা।'

কিছুটা চলার পর অমিত যেন হঠাৎই গাড়ি থামিয়ে দিল। তারপর কিছু না বলে আঙুল তুলে হালকা জঙ্গলের ওপারে অল্প দূরের পাহাড়ী ঝর্ণার দিকে নীলাঞ্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাল।

পাশাপাশি দুটি অনুচ্চ পাহাড়ের গা বেয়ে অজস্র ধারায় নিচের দিকে জল গড়িয়ে পড়ছে। ওরা জীপ থেকে নেমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সেদিকে কিছুটা এগিয়ে গেল।

নিস্তব্ধ বনের মধ্যে পাহাড়ী ঝর্ণার একটানা কুলকুল ধ্বনিতে এক অদ্ভুত সুরের মূর্ছনা! বসন্তের রাতেও ঝর্ণার ধারের বাতাসে কেমন শীতলতার আবেশ। চাঁদের আলোয় পাহাড়ের নিচে শয়ে শয়ে তৃষ্ণার্ত হরিণকে জল খেতে দেখা গেল। প্রকৃতির সে এক মোহময়ী রূপ! মুগ্ধ নীলাঞ্জন মুহূর্তের জন্যও যেন সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে চাইছিল না।

'নাও এই সুযোগ', অমিত কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে নীলাঞ্জনের সামনে এগিয়ে ধরে বলল, 'ঝাঁকের মাঝে ফায়ার করলে একটা না একটা হরিণ ঘায়েল হবেই।'

বন্ধুর কথায় নীলাঞ্জন যেন বাস্তবে ফিরে এল। সে তার দিকে চোখ ফেরায়। অমিতের দু'চোখের ভাষায় এমন সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট না করার ইঙ্গিত।

নীলাঞ্জন অমিতের হাতের রাইফেলটা একহাতে শক্ত করে ধরে বলে ওঠে, 'না অমিত, প্রকৃতির এমন সুন্দর রূপকে তোমার এই রাইফেলের গুলিতে ধ্বংস করে দিও না।' গলায় তার কাতর আবেদন।

অবাক্ অমিত হাসতে হাসতে বলে, 'তুমি দেখছি সত্যিই পাগল। আজ শিকার না করলে কাল থেকে যে সাদা ভাত ফুটিয়ে খেতে হবে। নাও রাইফেল ধর, হ্যারি আপ্।' অমিতের স্বরে চাপা উত্তেজনা।

নিরুত্তর নীলাঞ্জনের মধ্যে কোন তাড়া দেখা গেল না। অমিতের হাতে ধরা রাইফেলের মাথাটা আগের মতই শক্ত হাতে চেপে ধরে থাকে। উঁচু ঢালু জমির শেষে পাহাড়ের নীচের সমতলে বড় বড় পাথরগুলোর গা ভাসিয়ে ঝর্ণার জল বয়ে চলেছে। চাঁদের আলোয় সেই জলকে মনে হচ্ছে কোন অদৃশ্য রসায়নাগারে যেন টনটন রুপো গলে তরলাকারে পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে শিশু হরিণ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে খেলা করছে।

'না, দেখছি তোমার দ্বারা হবে না', বিরক্ত অমিত বলল, 'রাইফেল ছাড়, আমিই ফায়ার করছি।' এক ঝটকায় সে নীলাঞ্জনের হাত থেকে রাইফেল ছাড়িয়ে নিল।

মুহূর্তে নির্জন বনভূমি কাঁপিয়ে অমিতের হাতের রাইফেল গর্জে উঠল।

নীলাঞ্জন শিউরে উঠে দু'হাতে নিজের দুচোখ চেপে ধরল।

গাছে গাছে ঘুমন্ত পাখিরা আর্তনাদ করে অন্ধকারে ডানা ঝাপটে একগাছের মাথা থেকে আর এক গাছের মাথায় ছুটোছুটি করতে লাগল। তৃষ্ণার্ত হরিণেরা আচমকা রাইফেলের গর্জনে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে লাগল।

ঝর্ণার ধারে একটা বড় হরিণ পড়ে দাপাদাপি করতে লাগল। রাইফেলের গুলিতে তার শরীর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গিয়েছে। এক শিশু হরিণ বিপদ ভুলে করুণ চোখে হাঁ করে মা-হরিণের ছটফটানো দেহটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, যেন ব্যাপারটা সে বোঝবার চেষ্টা করছিল।

পাহাড়ের ঢালু পথে অমিতকে নামতে দেখেই ভয় পেয়ে হরিণ শিশু ঊর্ধ্বশ্বাসে বনের মধ্যে ছুটে গেল।

বিজয় উল্লাসে অমিত হরিণটাকে টানতে টানতে জীপের কাছে এনে বিমূঢ় নীলাঞ্জনের উদ্দেশ্যে বলে, 'নীলাঞ্জন বি প্র্যাকটিক্যাল।'

বন্ধুর কথায় নীলাঞ্জন নীরব রইল।

জীপ এরপর বাংলোর দিকে চলতে শুরু করল। আসবার সময়ে নীলাঞ্জনের যে মুগ্ধ চোখ ছিল এখন কে যেন তাতে এক পোঁচ কালি ফেলে দিয়েছে। বনজুড়ে কেমন বিষণ্ণতার হাওয়া। গাছের পাতায় পাতায় চাঁদের আলো যেন বড় পাণ্ডুর। রাত জাগা পাখিদের কলকাকলি আর বার্কিং ডিয়ারের ডাক নীলাঞ্জনকে আর উল্লসিত করল না। তার চোখের সামনে কেবল ভাসতে লাগল উচ্ছল ঝর্ণার ধারে যন্ত্রণাকাতর মা-হরিণের ছটফটানী আর শিশু হরিণের অবাক চোখের করুণ সেই চাহনী।

শাস্তি

সুভাষ বন্দোপাধ্যায়



দুপুরে বাড়ী ফিরে খেতে বসেছি বড় বৌদি হাসতে হাসতে বললেন-গুণ্ডাগুলোর এবার সুমতি হয়েছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বৌদির দেকে তাকিয়ে থেকে বললাম-তার মানে ?

বৌদি বললেন—মানে ওরা এবার ঠিক করেছে গরমের ছুটিতে খেলা কম করে পড়াশুনো করবে।

ভাইপো ভাইঝিদের এরকম ইচ্ছা হয়েছে শুনে আমি বেশ খুশীই হলাম। সত্যি কথা বলতে কি ওদের দুষ্টুমী মাঝে মাঝেই এমন চরম অবস্থায় ওঠে যে সামলে দিতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। পড়াশুনো করলে যে ওরা অনায়াসেই ভাল ফল করতে পারে সেটা নিশ্চিত। কিন্তু ওখানেই যত গণ্ডগোল। পড়তে বসলেই ওদের জ্বর আসে। স্কুলের সময় হলেই পেট কামড়ায়, তাছাড়া অন্যান্য উপসর্গ তো আছেই।

বড়দা ইনজিয়ার মানুষ, সারাদিনে তার সময় নেই। মেজদা অ্যাকাউনটেণ্ট রাতদিন লক্ষ লক্ষ টাকার আসা-যাওয়ার হিসেবেই তিনি ব্যস্ত। এদিকে ঘরে যে ছটী গুণ্ডার দুষ্টুমির আখড়া খুলেছে তা তাদের খেয়ালই নেই। আর আমি বেচারা ডাক্তারির ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র, সারাদিন কলেজ আর হসপিটাল করে বাড়ী ফিরে কোথায় একটু বইপত্তর নিয়ে বসব তা নয় নালিশ শোনো-কাকু ও তিনটি কাপ ভেঙেছে, ও ঠাকমার আচার চুরি করতে গিয়ে বোয়েম ভেঙেছে। তারপর আবার এই সব অপরাধের বিচার করা। সে এক কঠিন সমস্যা।

মেজদার বড় পুত্র পাপুনের আবার মাথা ফুঁড়ে ফুঁড়ে কথা। সেদিন সকালে হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে বলল-কাকু দেখবে চল—বাবার যেমন কর্মফল দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটেছে। এখন এই সব অদ্ভুত কথাবার্তা আর দষ্টুমীর অন্ততঃ সাময়িক নিবৃত্তি হবে চিন্তা করে একটু স্বস্তি বোধ করলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই ওদের গরমের ছুটি শুরু হল। দেখলাম ওরা চিলের ঘরটাকে পড়ার ঘর বানিয়েছে। দুপুরবেলায় বই খাতা নিয়ে ওরা চারজনে সেখানে ঢুকে পরে আর সন্ধ্যের আগে নেমে বাড়ীর সামনের মাঠটায় ফুটবল খেলতে যায়।

একদিন পাপুনকে ডেকে শুধোলাম—কিরে, তোদের পড়াশোনা কেমন চলেছে ?

পাপ্নন মাথা নেড়ে বলল—খুব ভাল কাকু।
বললাম—আজকে দুপুরে দেখব কি পড়ছিস।
ও উত্তরে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।
সেদিন দুপুরে শুনি—আজ রবিবার সবার ছুটি ওদেরও পড়ার ছুটি।
পরের রবিবারেও সেই একই কথা। পর পর দুদিন একই কথা শুনে আমার সন্দেহ হল, তাছাড়া লক্ষ করলাম পড়াশোনার কথা বললেই সবাই সেটাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ বেড়ে গেল যখন শুনলাম—ওরা সব দুষ্টুমী ছেড়ে দিয়ে বড়দের মতন গম্ভীর হবার চেষ্টা করছে। ঠিক করলাম একদিন দুপুরে চিলের ঘরে উঁকি মেরে দেখতে হবে আসল ব্যাপারটা কি? ওরা সত্যিই পড়াশোনা করে না অন্য কিছু করে।
সুযোগ মতন একদিন দুপুরে চুপি চুপি ছাদে উঠে, চিলে কোঠার ঘরে উঁকি মারলাম। দেখি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। দরজায় কান পাতলাম—পড়াশোনার কোন শব্দ শুনতে পেলাম না। ঘরটার পাশ দিয়ে ঘুরে গিয়ে দেখি জানলার একটা পাল্লা আধ ভেজানো অবস্থায় রয়েছে। খুব সন্তর্পনে কোন শব্দ না করে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়ে জানলায় চোখ রাখলাম। দেখি ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। পাপুন, পিঙ্কু টুবাই ফুচাই আর গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে আসা দিদির দুই মেয়ে তুতুন মিতুন সবাই মিলে মেঝের গোল হয়ে বসে রাজ্যের পুরনো খবরের কাগজ জোগাড় করে তার ওপর ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া করে লিখছে—আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই। শাস্তি দেওয়া চলবে না। কাপ, ডিশ, আচারের বোয়েম ভাঙলে তার জন্য বকা চলবে না। স্কুলে যেতে না চাইলে জোর করে স্কুলে পাঠানো চলবে না। পরীক্ষায় ফেল করলে কানমলা চলবে না ইত্যাদি সব শ্লোগান।
সর্বনাশ! এসব ওদের মাথায় ঢুকলো কি করে! জানলার পাল্লাটা আর একটু ফাঁক করে চোখ রাখলাম ওদের ওপর। কয়েক মিনিট পরে দেখি ওরা কাগজ পত্রগুলো সব সরিয়ে রেখে একটু নড়ে চড়ে বসল।
দুষ্টুমির সম্রাট পাপুন উঠে দাঁড়িয়ে পাকা রাজনৈতিক নেতার মতন বলতে শুরু করল—এইগুলো কালকেই বাড়ীর সব জায়গায় এঁটে দিতে হবে। এটাই আমাদের প্রথম কাজ।
এতে কোন কাজ না হলে আমরা ধর্মঘট করব। পাপুনের কথার মাঝেই পিঙ্কু বলল, কিন্তু কাকু বোধহয় আমাদের সন্দেহ করছে। তার কথায় পাত্তা না দিয়ে পাপুন বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বলল—ওদেরকে মানতেই হবে। না মানলে আমরা লাগাতার আন্দোলন শুরু করব।
কি করে?—প্রশ্ন করল তুতুন।
পাপুন বলল—রান্না ঘরের দরজায় আমরা তালা লাগিয়ে দেব, তাহলেই বাড়ীতে রান্না বন্ধ হয়ে যাবে কেউ খেতে পাবে না। খিদে পেলেই তখন সবাই আমাদের দাবী মেনে নেবে।

ওদের এসব পাকা পাকা কথা শুনতে শুনতেই মেজাজ গরম হয়ে গেল। ভাবলাম ওদের একটু শাস্তি দেওয়া দরকার। জানালার পাশ থেকে সরে গিয়ে দরজাটা আস্তে করে ঠেললাম। শুনতে পেলাম ভিতরে ওরা কথা বলছে। দরজাটায় এবার বেশ জোরে ধাক্কা দিলাম। কিন্তু ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় দরজা খুলল না। তবে পাপুনের গলা শুনতে পেলাম—কেউ এসেছে মনে হচ্ছে। উত্তরে টুবাই বলল—যে আসে আসুক, আমাদের কাজ চলবে। পাপুন বলল-নিশ্চয় চলবে। বরঞ্চ চল আজই আমরা একটা মিছিল বার করি তাহলে সবাই বুঝতে পারবে—আমাদের আন্দোলন।

কয়েক মিনিট সব চুপচাপ। দরজাও বন্ধ। বুঝলাম ওরা মিছিল বার করার তোড়-জোড় করছে। অর্থাৎ ওরা এবার নীচে নামবে তাহলে নীচেতে সব কটাকে শাস্তি দেওয়া যাবে! আমি এক ছুটে নেমে এলাম। ঘরে বসে ডেভিডসনের একটা মোটা মেডিসিন বই পড়ার ছল করে অপেক্ষা করতে লাগলাম ক্ষুদেদের মিছিলের। মিনিট সাতেক পরেই দেখি ছ'জনা লাইন দিয়ে আমার ঘরের দিকে আসছে। আমি গম্ভীর হয়ে বসে রইলাম। কাছাকাছি আসতেই গম্ভীর গলায় হাঁক দিলাম—পাপুন এদিকে আয়। আমার ডাক শুনে বেশ জঙ্গী মেজাজে ছ'জনেই এসে ঢুকল আমার ঘরে। আমি হাত বাড়িয়ে পাপুন আর পিঙ্কুটার হাত দুটো ধরলাম।

হঠাৎ আমার নজর গেল ওদের হাতের পোষ্টারগুলোর দিকে। পরক্ষণেই আমার বেদম হাসি পেল। তবে সেটা ওদের জানতে দিয়ে বললাম—পড়াশোনা বাদ দিয়ে এসব কি হচ্ছে এ্যাঁ?

কেউ কোন উত্তর দিল না।

দেখি ওগুলো। আমি হাত বাড়ালাম।

টুবাই আর মিতুন কোন কথা না বলে পোষ্টারগুলো আমার দিকে এগিয়ে দিল। সেগুলোর ওপর ভাল করে চোখ বুলিয়ে বললাম—তোদের বুদ্ধি তো দেখছি বেশ পাকা, কিন্তু এসব করার আগে হাতের লেখাটা আর বানানগুলো একটু ভাল কর। নাহলে তোদের আন্দোলনের ভাষাই সে কেউ বুঝবে না। যা লিখেছিস তার তো অর্দ্ধেকেরও বেশী বানান ভুল। যা, এখুনি খাতা নিয়ে এসে এখানে বসে বসে এই কাগজে যে বানানগুলো ভুল লিখেছিস সেগুলো ঠিক করে লেখ ঠিক পঞ্চাশ বার। আপাততঃ এটাই তোদের শাস্তি।

এতক্ষণের জঙ্গী ক্ষুদেরা অতঃপর করুন মুখে খাতা আনতে বেরিয়ে গেল গুটি গুটি পায়ে। এবার আমি অনেকক্ষণ চেপে রাখা হাসি হেসে ফেললাম।



পাপুনের অসুখ

ধীরেন করগুপ্ত

হ্যালো, হ্যালো, মিস্ট্রেস্ শোভাদিকে একটু ডেকে দিন না। হাজারীবাগ থেকে ট্রাঙ্কল করছি।

সকাল ন'টায় ট্রাঙ্কল? সেই টালিগঞ্জের শোভা রায়। রিসিভার তুলে তো শোভাদির চক্ষুস্থির। হ্যালো, কে বলুন? আমি শোভা রায় বলছি।

আরে আমি গাঙ্গুলি বাগানের রমলা সেন। দেখুন দিদি, আমার উপর হয়তো খুব রাগ করেছেন, এখানে আসবার পর থেকে একটা চিঠিও দেবার সময় পাই নি। তাছাড়া বিদেশে সব যায়গা চিনিও না। পোষ্টকার্ডও যোগাড় করতে পারছিনে, তাই এই ট্রাঙ্ককল। শুনে খুব চিন্তিত হবেন আমার একমাত্র মেয়ে পাপুন, তার যে খুব অসুখ। আজ দশ-বারোদিন যাবৎ কিছুই খায় না। শরীরের ওজন একদম কমে গেছে। এত দুর্বল যে হাঁটা-চলা একদম করতে পারে না। ভাল ডাক্তার, ভাল ওষুধ, কিছুই এখানে পাওয়া যায় না। এই পাহাড়ী দেশ, প্রচণ্ড গরম। সব সময় ওকে কোলে কোলে রাখতে হয়। মা বলে সে কী চীৎকার। অচেনা জায়গা, কাউকেই চেনে না, মা-বাবা ছাড়া সে কাউকে ভরসাও পায় না। সব সময় যেন, তার একটা ভয়-ভয় ভাব। ওর বাবা তো সেদিন দুঃখ করে চোখ ছলছল করে বলেই দিল—যে ওকে বোধহয় ডাইনীতে ধরেছে। তিরিশ টাকা ভিজিট দিয়ে, এখানকার এক বড় ডাক্তার এনেছিলাম। তিনি কোন রোগ ধরতে পারলেন না। নতুন যায়গা বলে কিনা বুঝলাম না, এখানকার আবহাওয়াটা ওর একদম সহ্য হচ্ছে না। রক্ত পরীক্ষায় শুধু ক্রিমির জীবাণু পাওয়া গেছে। আমি তো শুধু ভগবানকে ডাকি, যে ওর উপর রাগ না করে আমাকে শাস্তি দাও। দু-একদিনের ভিতর দেশে ফিরে বড় ডাক্তার দেখাবার ইচ্ছা রাখি। খাওয়া দাওয়া পথ্য একদম করতে

চায় না। পাকা টমেটোর রসে, বিট গাজরের সুপ ভাল করে মিশিয়ে রোজ দুবার জোর করে ঝিনুক দিয়ে খাওয়াচ্ছি। তাও সে খেতে চায় না। সত্তর টাকা ভিজিট গুণে আজ আবার এক বড় নামডাকওয়ালা ডাক্তার এনেছি, পাহাড়ী অঞ্চলে তার খুউব নাম, এক কথায় ধন্বন্তরি, দিদি। যেমনি দেখতে, তেমনি তার গায়ের রঙ, তেমনি লাল টুকটুক মিক্সচার। মনে হয় এই ডাক্তারবাবুকে পাপনুসোনার খু-উ-ব পছন্দ হয়েছে। অন্য ডাক্তারবাবুর সাথে পাপনু কোন কথা বলে না, গোমড়া মুখে বসেও থাকে না, বড় বড় চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুধু ডাক্তারবাবুকে দেখে দেয়, আর বার বার গুনগুনিয়ে ওঠে। তারপর আমার কোলে মাথা এলিয়ে, ঘুমের ভাণ করে শুয়ে থাকে। যতো বলি, যাও একটু ঘরে বেড়াও, অন্তত ঘরের কাছাকাছি একটু হেঁটে বেড়াও। দিদি, কি বলবো! কোথাও আমাকে ছাড়া যেতে চায় না। মনে হয় হাঁটবার শক্তিটা এই কয় দিনে বেশ কমে গেছে। আশীর্বাদ করুন ও যেন ভালভাবে সেরে ওঠে। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, এই একটাই তো মেয়ে, বড় সাধ করে নাম রেখেছি "পাপনু"—সে কি আজকের কথা! সেরাই—কেল্লার, খরসোয়াল নদীর ঝর্ণার জলস্রোতের কাছে দু বছর আগে ঘণ্টা কয়েক ধরে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে ও আমার চোখের মণি, চোখে চোখেই রাখি। লাফ ঝাঁপ দিয়ে সব জিনিষপত্র নষ্ট করে দিত। ঘরে কিছু রাখবার উপায় ছিল না। এইমাত্র ডাক্তারবাবু বলে পাঠালেন, এক্সরে ভিন্ন কোন রোগই ডায়গোনেসিস করা সম্ভব নয়। তাই বৈষ্ণবপুরীর চেস্ট ক্লিনিক থেকে দেড়শো টাকায় এক প্লেট তুলেছি। সেখানে যেতেও কি কম কষ্ট? ওর হার্ট এত দুর্বল যে, যে কোন সময় হার্ট ফেল করতে পারে। পাহাড়ী দুর্গম অঞ্চল, বাস ট্যাক্সি, এমন কি রিক্সায় চড়তেও বিপদ। কি সর্বনাশ দিদি! এতখানি পথ হেঁটে পাপনুকে কোলে কোলে করে এনেছি, সে কি কম কষ্ট দিদি! ওর যে আবার হার্টের অসুখ। আজ আপনার কাছে থাকলে, পাপনুর জন্য কি এত চিন্তা করতাম? আপনার কথা বললে, পাপনু চারদিক তাকিয়ে দেখে, ভাবে এই বুঝি মাসীমা এলো। কাল ডাক্তারবাবু ভাল করে এক্সরে দেখে যে রিপোর্ট দিলেন—দেখে শুনে বিদেশের বাড়িতে চেঁচিয়ে কান্না ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। জানেন, পাপনুর পেটে ক্রিমি, হার্ট খারাপ, তাছাড়া আবার হাঁপানী। ডাক্তারবাবু বললেন, এসব হলো বড়লোকের অসুখ। ভাগ্যিস! পাপনুর বাবার রিটায়ারের সব টাকাটা এখন আমার হাতে। চিকিৎসার জন্য খরচ, ওসব আর ভাবছিনে। কালকেই ওকে নিয়ে সন্ধ্যে সাতটার নাগপুর মেলে বাড়ির পথে রওনা দেব। আমার মনের অবস্থাটা একটু ভাবুন তো। ইচ্ছে আছে পাপনুর জন্য ক্যালকাটা হসপিটালে একটা বেড নেবো। হাঁপানী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হামবার্গের কেয়ারে কিছুদিন রাখবো। মরিশাসের হাই কমিশনারের মেয়ে জিনঙক আর টুকুন, দুজনেই পাপনুর খুব প্রিয় খেলার সাথী। তাই ওদের বাবার দেওয়া সার্টিফিকেট ক্যালকাটা হসপিটালে ভর্তি হতে আর

কোন বাধা হবে না। সম্ভব হলে আগামী বুধবার বুবু ও রিঙ্কুকে নিয়ে একটিবার দেখা করবেন।

ট্রাঙ্ককলে সব শুনে তো শোভাদি অবাক! তবে কি তিনি ভুল শুনেছেন। এতদিন তো জানতো যে রমলা সেনের কোন মেয়ে নেই। শুধু দুটি ছেলে। ছোট ছেলে টুকাইয়ের সাথে শোভাদির মেয়ের বিয়ের কথা তো একরকম পাকা। রিটায়ার্ড ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের ছেলে টুকাই, তারপর নামকরা একটা মার্চেন্ট অফিসের স্থায়ী কেরাণীর চাকুরী, ও সদ্য নির্মিত নতুন তিনতলা বাড়িটার হবু মালিক। শোভাদি, ওরফে টালিগঞ্জের একটা ছোট্ট স্কুলের মিসট্রেস।

শ্রীমতী শোভা রায়। তার পুত্রবধূ বুবু ও মেয়ে রিঙ্কুকে সাথে নিয়ে পাপুনকে দেখতে রমলাদির বাড়ি তিলক নগরে গিয়ে হাজির। পাড়ায় ঢুকেই গৃহকর্তা অরুণবাবুর সাথে দেখা, সাদর অভ্যর্থনা আসুন, আসুন।

আগে বলুন পাপুনসোনা কেমন আছে। রমলাদির ট্রাঙ্ককলে ওর ভয়ানক অসুখ জেনে খুব চিন্তায় ছিলাম।

অরুণবাবু মুচকী হেসে স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, এখানে আসা অবধি প্রচন্ড শীতে, পাপুনসোনা মায়ের সাথে লেপের ভিতর শুয়ে থাকতেই ভালবাসে। তাছাড়া ডাক্তারের কথা মতন ওর মাথার লম্বা চুলগুলো কেটে বব্ করে দিয়েছি। কী আশ্চর্য! সেই থেকে পাপুন কত চটপটে, নড়েচড়ে বসতে চায়, ডাকলে দৌড়ে আসে।

রমলাদির সাথে কথা বলতে বলতে পাপুনসোনার মাথায়, আদর করে হাত বুলাতে গিয়ে তো শোভাদি অবাক। ভয়ে ভয়ে মারলো লাফ, পাপুনের মাথায় অপরিচিতের হাত পড়তেই ঘেউ ঘেউ ডাক। রমলাদি যতই বলেন, পাপুন, চুপ চুপ, এ যে তোমার মাসীমা, পাপুন ততোধিক জোরে জোরে ঘেউ ঘেউ করে। ছোটদের স্কুলের দিদিমণি এই শোভাদি। স্বভাবতই তার সহজাত, স্নেহপ্রবণ-মনে, পাপুনকে একটু আদর করতে যাওয়া কি অন্যায়? ভাবী কুটুমের বাড়ি শুধু হাতে যাওয়া উচিত হবে না। তাই কিছু কমলা, আঙ্গুর আর রমলাদির জন্য কয়েকটা মিষ্টি পানের খিলি হাতে অসহায় শোভাদি পাপুনের মাথার কাছে ঘেউ ঘেউ ডাকে ভীত, জড়সড়।

———

লড়াই

অনিলকুমার দলুই



বরেন প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়া তার অভ্যেস। অত সকালে বাড়িতে চা হয় না। অগত্যা তাকে যেতে হয় মোড়ের মাথায় কিশোরীর দোকানে। দোর খুলে ক' কদম গেছে মাথার ওপর কি যেন একটা পড়ল। হকচকিয়ে যায়। অনুমানে বোঝে, কি একটা ঠোক্কর মেরেছে। জ্বালা করছে। কি ব্যাপার সাত সকালে ? দাঁড়িয়ে হাত রাখে মাথায়। কিছু বোঝবার আগে আবার ঠোক্কর। সে মাথা ঘুরিয়ে দেখে, একটা শালিখ উড়ে আসছে তার দিকে। পাখিটা নেমে আসে মাথা বরাবর। সে হাত দিয়ে মাথা ঢাকে। বুঝতে দেরি হয় না, তার মাথা পাখির চাঁদমারি।

সে পা চালায় জোরসে। বার কতক পিছু ফিরে দেখে, না, পাখিটা তাদের ছাদে বসে আছে। শালিখ বেজায় নিরীহ গোবেচার পাখি। আসতে যেতে চোখে পড়ে পাঁচিলে, কার্নিশে অথবা উঠোনে বসে আছে কিংবা চরে বেড়াচ্ছে। পোকা মাকড় খুঁটে খায়, চংমং করে, লোকের ছায়া দেখলে ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়। ভীতু। তবে সে পাখি এমন ঠোকর মারে কেন ?

চা বিস্বাদ। সকালবেলা পাখির আক্রমণ কেন ? কিসের জন্যে ? না কি পাখিরা খেপে গেছে ? পশুপাখি হঠাৎ কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না। আক্রান্ত না হলে আঘাত হানে না। তাহলে পাখিটা কেন তাকে ঠোকর মারল অকারণে ?

বাড়ির কাছে ফিরে দেখে, দুটো পাখি বসে আছে কার্নিশে। চোখের পলকে একটা পাখি উড়ে আসে তার দিকে। সে মাথা নিচু করে ভয়ে। পাখিটা উড়ে যায়। এ কি উৎপাত। পাখির ভয়ে মাথায় হাত চাপা দিয়ে বাড়ি ঢুকে পড়ে।

মলয়াকে সামনে দেখে বলে—সকালে কি ঝঞ্ঝাটে পড়লুম বলো তো। পাখি মাথায় ঠোকর মারে কেন ?

—পাখি! কি পাখি?
—শালিক।
—ওমা, সে কি গো!
—হ্যাঁ, আসতে যেতে ঠোকর মারছে। ঐ দ্যাখো ছাদের কার্নিশে বসে আছে এক জোড়া।
মলয়া তাকায় চোখ তুলে। বলে—হয়েছে।
—কি?
—কাল বিকেলে চন্দন একটা শালিক ছানা ধরেছে, সেটার মা-বাপ বোধহয়। কাল থেকে পাখি দুটো ছানাটার কাছ ছাড়া হচ্ছে না।
বরেনের চোখে পড়ে, রান্নাঘরে কাঠের খাঁচায় একটা শালিক ছানা লাফালাফি করছে। মাঝে মাঝে ডেকে ওঠে, ধাড়ি দুটো সাড়া দেয়। বাচ্চার ডাক আরো বেড়ে যায়।
—বাচ্চাটা ছেড়ে দাও, ওরা কষ্ট পাচ্ছে।
—আমি ছাড়তে পারব না, চন্দন কেঁদে কেটে অনর্থ করবে।
পিছন থেকে হাসি বলে—বাবা, আমরা ওটা পুষব।
—ওর মা-বাবা কষ্ট পাচ্ছে, ছেড়ে দে। রথের মেলায় তোদের ভালো পাখি কিনে দোব। টিয়া চন্দনা—যা বলবি।
—না, বাবা, ওটা ছাড়ব না।
মলয়া বলে—থাক না, ছোট ছেলেরা ধরেছে।
বরেন আর কিছু বলে না। মলয়া ঠিক বলেছে, ছোটরা ধরেছে, সখ করে পুষতে চায়। চন্দন দশ বছরের ছেলে, হাসি পাঁচ বছরের মেয়ে। তার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। চড়ুই পাখি ঘরে ঢুকলে দরজা বন্ধ করে দিত। জানলায় জাল ছিল, চড়ুই লুকিয়ে পড়ত কড়ির ফাঁকে। ঝুলঝাড়া দিয়ে তাড়া দিত হরদম। ওরা উড়ত এদিক সেদিক, ঝট্‌পট্‌ করত প্রাণের দায়ে। শেষে দম মারা হয়ে পড়ে যেত মেঝেতে। সে ভরে রাখত খাঁচায়। চাল কড়াই জল দিত কিন্তু ওরা মরতে দেরি করত না। সেও ওদের কবর দিত বাগানে।
ঘুম থেকে উঠে চন্দন খাঁচা বার করে। ধাড়ি দুটো চক্রাকারে উড়ে উড়ে ডাকতে থাকে। চন্দন খাঁচা রাখে রান্নাঘরের টালির চালে। ধাড়ি দুটো বসে খাঁচায় ওপর। বাচ্চাটা ছট্‌পট্‌ করে, ছোট ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে বাশের শিক। একটা পাখি উড়ে যায়, একটু পরে ঠোঁটে করে নিয়ে এসে বাচ্চার ঠোঁটের মধ্যে চালান করে দেয়।
হাসি বলে—দ্যাখো বাবা, কেমন খাওয়াচ্ছে। খাঁচাটা টালির চালে রাখলে আমাদের ছাতু কিনতে হবে না।
একটা পাখি বার বার উড়ে যায় আর এটা সেটা নিয়ে এসে বাচ্চাকে খাওয়ায়। চন্দন-হাসি পড়তে বসে, চোখ পাখির দিকে। হাসি বলে—দাদা, একটা ধাড়ি পাখি ধরবি?

—ধাড়ি ধরা যাবে না।
—দ্যাখ আরো দুটো পাখি এসেছে।
অফিস যাবার আগে বরেন দেখে, ছাদের পাখির সংখ্যা আরো বেড়েছে। পাঁচটা পাখি ঘিরে আছে খাঁচা। চেঁচিয়ে চলেছে এক নাগাড়ে। একটু অন্যমনস্ক হয়েছে, একটা পাখি ঠোকর মারে মাথায়। সে দাঁড়ায়। চারটে পাখি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উড়ে আসে ঝটিতি। সে মাথার ওপর হাত নাড়তে থাকে সজোরে। একটা পাখি কাঠের ওপর বসে পড়ে। ঘাড় ফেরায় বরেন, ছোট ছোট চোখ জ্বল জ্বল করে। সজোরে ঠোকর মারে কাধের ওপর। সে বুঝতে পারে, আক্রমণ শুরু করেছে পক্ষিকুল।
সারাদিন অফিসের কাজের মধ্যে পাখির কথা ভুলে যায়। ফেরার পথে গলির মুখে দেখা পাশের বাড়ির পরেশের সঙ্গে। বলে—বরেনবাবু। পাখির উৎপাতে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়েছে।
—কি হয়েছে?
—বাড়ির বার হবার জো নেই। পাঁচ-সাতটা পাখি ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শালিখ যে এমন ফেরোসাস হয়, জানা ছিল না। আপনার ছেলে একটা ধরেছে, ওটা ছেড়ে দিন।
—ছোট ছেলে ধরেছে, ছাড়তে চাইছে না।
—আমার মেজ ছেলের মাথায় ঠোকর মেরে রক্ত বের করে দিয়েছে।
—দেখি কি করা যায়।
ব্যাপার গড়িয়েছে অনেক দূর। সন্ধে উৎরে গেছে, তবু বাড়ি ঢোকার আগে সে তাকায় চারধারে। কাধের ওপর যেন অনুভব করে পাখির অস্তিত্ব। হলদে ঠোঁট লালচে চোখ—সে চোখে আক্রমণের প্রতিভাস।
হাসি বলে—জানো বাবা, আজ বারোটা পাখি এরেছিল, গুণেছি। সে বলে—চন্দন কোথা?—চন্দন আসতে সে বলে—পাখি ছেড়ে দে।
—না। আমি পুষব।
পরেশবাবু বললেন, ওনার ছেলেকে এমন টুকারছে যে রক্ত বেরিয়ে গেছে।
হাসি বলে—স্কুল থেকে ফেরার সময় আমাকে তাড়া করেছিল। আমি শেলেট মাথায় দিয়ে পালিয়ে এসেছে। জানো বাবা, পাখিগুলো এত বোকা শেলেটের ওপর টক্ ঠক্ করে মারছিল।
চন্দন, কাল সকালে ওটা ছেড়ে দিবি।
মলুয়া বলে—দু-চারদিন অমন করে ওরা চলে যাবে। কষ্ট করে ধরেছে, থাক্ না।
—বুঝতে পারছ না, পাখিগুলো খেপে যাচ্ছে।
—সবতাতে তোমার বাড়াবাড়ি। ওদের বোধশক্তি আছে নাকি?

পরের দিন সকালে দরজা খোলার সাথে সাথে শুরু হয় পাখির আক্রমন। দশ-পনেরটা পাখি ঝাঁপিয়ে পড়ে বরেনের ওপর। খুদে খুদে পাখার ঝাপ্টা মারে মুখে চোখে। হাতে পিঠে গলায় লাগে নখের আঁচড়। চোখের নিচেটা জ্বালা জ্বালা করে—ঠোকর মেরেছে। ত্রস্তে পিছিয়ে এসে কোন রকমে দরজা বন্ধ করে।

ছাদের দিকে তাকায়—অসংখ্য শালিখ পাখি বসে আছে। এত শালিখ আছে শহরে? সাড়া নেই, শব্দ নেই, কিসের যেন নীরব প্রতীক্ষা। হিচ্ককের 'দ্য বার্ডস' ছবির দৃশ্য ভেসে ওঠে চোখের সামনে। সে ঘর ছেড়ে বার হবার সাহস পায় না।

হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে বরেণ সম্বিত ফিরে পায়। উঠানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে হাসি। তাকে ছেঁকে ধরেছে দশ বারোটা পাখি। মাথায় কাঁধে বসে ওরা উন্মত্তের মত ঠুকরে যাচ্ছে অবিরত। চারপাশে ওরা উঠছে। পাখসাট মারছে, চিৎকার করছে। হাসি চোখে হাত চাপা দিয়ে চেঁচাচ্ছে, নড়তে পারছে না।

মলয়ার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর তার কানে আসে—ওগো, মেয়েটাকে মেরে ফেলবে।

বরেন ছুটে উঠোনে নামে। পাখিরা তাকে ভয় পায় না। ওরা মরিয়া। সে হাসিকে জাপটে ধরে। হাসিকে ছেড়ে ওরা আক্রমণ করে তাকে। সারা অঙ্গে অনুভব করে ক্রুদ্ধ ঠোঁটের নির্মম আঘাত। হাসিকে টেনে আনে দালানে।

হাসির পিঠে লাল লাল দাগ। দু-চার জায়গা দিয়ে রক্ত ঝরে। পাখির দল আবার ফিরে গেছে কার্নিশে। জোড়া জোড়া চোখ তাদের ওপর নিবদ্ধ।

বরেন বলে—আর না।

মলয়া চন্দন কোন বাধা দেয় না। তাদের চোখে ভীতির ছায়া। বরেন রান্নাঘর থেকে খাঁচা বার করে। পাখিরা চিৎকার করে সমস্বরে। সে খুলে দেয় খাঁচার দরজা। বাচ্চাটা কাঁপা কাঁপা পাখা মেলে উড়ে যায় ওদের দলে। পাখিরা সকলে উড়াল দেয় আকাশে। ওদের কলতান মিলিয়ে যায় দূর থেকে দূরান্তরে।

দেশপ্রেমিক জলদস্যু

কুমার মিত্র



ঊনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকের কথা। আজকের আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সেদিনকার আমেরিকার কোথাও তেমন মিল ছিল না। সবেমাত্র অনেকগুলি রাজ্য আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তারা অনেকটাই স্বাধীন। মার্কিনী আধিপত্য তেমন শেকড় গেড়ে বসতে পারেনি সে সব রাজ্যে। এমনই একটি প্রদেশ হল লুইজিয়ানা। মাত্র দশ বছর আগে এটি আমেরিকার দখলে আসে। এখানকার লোকেরা তখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বদেশ ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বাসিন্দারা বেশির ভাগই ফরাসী আর স্প্যানিশদের বংশধর যারা সাধারণভাবে ক্রিয়োল নামে অভিহিত। এদের না ছিল ফ্রান্স বা স্পেনের প্রতি আনুগত্য, না নিজেদের আমেরিকাবাসী বলে ভাববার অভ্যাস। স্বতন্ত্র একটা জাত বললেই ঠিক হবে।

এহেন লুইজিয়ানা প্রদেশের গভর্ণর হয়ে এলেন উইলিয়ম ক্লেবোর্ন নামে একজন আমেরিকান। লুইজিয়ানায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আমেরিকার প্রতি এখানকার অধিবাসীদের বন্ধুভাবাপন্ন করে তোলার গুরু দায়িত্ব নিয়েই এলেন তিনি।

কিন্তু এসে অবিলম্বে বুঝতে পারলেন সবচেয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাথমিক কাজটি তাঁকে করতে হবে তা হল জলদস্যু জাঁ লাফিৎকে শায়েস্তা করা। জাঁলাফিৎ এক অভিজাত বংশের সন্তান, এক ফরাসী সামন্তের পুত্র। তাঁর চেহারা ও আচার-আচরণে জন্ম-আভিজাত্যের লক্ষণ এমনই পরিস্ফুট যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায় নেই। দীর্ঘ সুগঠিত শরীর, সুশ্রী চেহারা, নরম আর বিনয়পূর্ণ কথাবার্তায় সকলকে সে মুহূর্তে বশ করে। নিউ অর্লিন্স তখন লুইজিয়ানার উল্লেখযোগ্য শহর ও বন্দর। সেখানকার অভিজাত সমাজে জাঁলাফিতের কদরের শেষ নেই। নিউ অর্লিন্সের রয়াল স্ট্রীটের জমকালো বিপণিগুলোয় যেসব বহুমূল্য রেশন-ভেলভেট, রুপোর পাত্র, মণিরত্ন আর দুর্লভ সুপেয় ব্র্যাণ্ডি পাওয়া যায় সেগুলোর সরবরাহকারী যে খোদ

জাঁলাফিৎ সেকথা শহরের শিশুরা পর্যন্ত জানত। তবে শহরবাসীরা সব জেনেও চোখ বুজে থাকত। হুল্লোড়প্রিয় মানুষগুলো বিলাস-ব্যসনের উপকরণ পেয়েই খুশি। তার যোগান কিভাবে ঘটছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার তারা বোধ করত না। প্রশাসনকে জানানোর কর্তব্যপালন তো অনেক দূরের কথা। উল্টে তারা যেন লাফিতের কাছে খানিকটা কৃতজ্ঞ। ফলে লাফিৎ নিউ অর্লিন্সে খুবই জনপ্রিয়। সাধারণত এই সাগর-সন্ত্রাস দস্যুরা ডাঙায় নিষ্কণ্টক নয়, শত্রুপক্ষ থাকেই। মজার কথা, জাঁলাফিৎ তার ঘাঁটি এবং সন্নিহিত অঞ্চলে, বিশেষ করে নিউ অর্লিন্সে প্রায় সকলের সম্মানের পাত্র।

গভর্নর ক্লেবোর্ন এসব যত দেখেন শোনেন ততই তাঁর রাগের মাত্রা চড়তে থাকে। চরিত্রে মানুষটা খাঁটি ঔপনিবেশিক, দেহের প্রতিটি ইঙ্গিতে শাসকের দম্ভ। আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা তখনকার আমেরিকায় কোন নিরীহ লোককে দিয়ে গভর্নরের কাজ চলত না। যাই হোক, জাঁলাফিৎকে ধরবার প্রথম চেষ্টা হিসেবে ক্লেবোর্ন একটি নিরীহ পদ্ধতিই গ্রহণ করলেন।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর নিউ অর্লিন্সের রাস্তায় রাস্তায় একটি বিজ্ঞপ্তি সাঁটা দেখা গেল। তাতে ঘোষনা করা হয়েছে জাঁলাফিৎকে যে ধরিয়ে দেবে তাকে ৫০০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে সরকারের তরফ থেকে। বিজ্ঞপ্তির নিচে স্বয়ং গভর্নরের স্বাক্ষর।

মানুষ মাত্রেরই মিত্র এবং শত্রু থাকে। ক্লেবোর্ন ভেবেছিলেন মোটা অঙ্কের পুরস্কারের লোভে কেউ না কেউ টোপ গিলবে। পাঁচশো ডলারে কিন্তু কোন ফসলই ফলাল না। বরং বিজ্ঞপ্তির প্রচারের তিনদিন পরে এমন বিচিত্র একটি ঘটনা ঘটল তা গভর্নরের সম্মানের প্রতি একটা মর্মান্তিক পরিহাস ছাড়া কিছু নয়। গভর্নর নিজের চোখেই দেখলেন তাঁর দেওয়া বিজ্ঞপ্তির ওপর একটি নতুন বিজ্ঞপ্তি সাঁটা হয়েছে যাতে লেখা, "গভর্নর উইলিয়ম ক্লেবোর্নকে যে ব্যক্তি জাঁলাফিতের কর্মকেন্দ্র গ্র্যান্ড আইলে সমর্পণ করতে পারবে তাকে ১৫০০ ডলার উৎকোচ দেওয়া হবে।"

কান্ডটা যে জাঁলাফিতেরই তাতে সন্দেহ রইল না গভর্নরের। জলদস্যুর ঘৃণ্য দুঃসাহস ও ধৃষ্টতায় ক্লেবোর্ণ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কল্পনানেত্রে দেখতে পেলেন এই বিজ্ঞপ্তি পড়ে নিউ অর্লিন্সবাসীদের ঠোঁটগুলোয় কৌতুকের হাসি উপচে পড়ছে। স্বাভাবিক। তারা তো এরকমটাই চায়।

বিজ্ঞপ্তির মধ্যে যে গ্র্যান্ড আইলের কথা ছিল সেটাই ছিল জাঁলাফিতের মূল ঘাঁটি। বারাটারিয়া উপসাগরের মুখে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে ওই গ্র্যান্ড আইল। প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত স্থানটি জলদস্যুদের আস্তানা হিসেবে একেবারে আদর্শ। সামনেই অসীম সমুদ্রের বিস্তার যা আন্তর্জাতিক জলপথ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্পেনীয়, ব্রিটিশ আর আমেরিকান পণ্যবাহী জাহাজগুলোর নিয়মিত এখান দিয়ে আনাগোণা। লুণ্ঠনের ক্ষেত্রে লাফিতেরও কোন বাছ-বিচার নেই, মার্কিন জাহাজকেও ছেড়ে কথা

কয় না। গভীর দরিয়া থেকে অজস্র খাঁড়ি আর লেগুনের ভেতর দিয়ে ছোট ছোট নৌকাযোগে লুণ্ঠিত দ্রব্য গ্র্যান্ড আইলে আনাই তার পদ্ধতি। পদ্ধতিটায় চাতুর্য নেই, তার দরকারও নেই। সারা পথটাই খাঁড়ি আর হ্রদের এমন গোলকধাঁধা যে তার রহস্য উদ্ধার কেবল তুখোড় জলদস্যুরাই করতে পারে। গোটা গ্র্যান্ড আইল ঢেকে আছে বেত লতাপাতা এবং সাইপ্রেস গাছের দুর্ভেদ্য ঝোপে। এর মধ্যে লুঠের জিনিস গোপন রাখাও সহজ কাজ। তারপর সেসব সামগ্রী চড়া দামে কালোবাজরি করার স্বর্গরাজ্য নিউ অর্লিন্সে পাঠিয়ে দিতে কতক্ষণ।

জা লাফিৎ পণ্য দ্রব্য হিসেবে আফ্রিকার কালো মানুষদেরও রেহাই দিত না। মার্কিন সরকার তখন অফ্রিকা থেকে ক্রীতদাস আমদানি নিষিদ্ধ করেছে। ফলে বাগিচা অঞ্চলে শ্রমিক ঘাটতির সমস্যা প্রবল। লাফিৎ এ সুযোগ ছাড়ে কেন? স্পেনের বাণিজ্য তরীগুলোয় নিগ্রো দাসেরা কাজ করত। এরকম একটা জাহাজ কব্জা করতে পারলে মোটা মুনাফা। কালো একটি শরীরের দাম ছিল পাউন্ড প্রতি এক ডলার। সুতরাং একটা দশাসই নিগ্রোর দাম দেড়শো থেকে দুশো ডলার। এই অভিনব পশরার চাহিদা তখন আমেরিকায় প্রচুর।

বিশেষ করে এই মানুষপণ্যের ব্যবসার জন্য জা লাফিতের ওপর সৎ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গভর্নর ক্লেবোর্ণের ঘৃণার অন্ত ছিল। কিন্তু প্রশাসন তো শুধু একাকী গভর্নরকে দিয়ে গড়া নয়। তাঁর কর্মচারীদের মনস্তত্ত্ব যে আলাদা। হয়তো একজন উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারকে সদলবলে পাঠানো হল জা লাফিৎকে ধরতে। অফিসার লাফিতের বিলাস-বহুল আপ্যায়ণ আর বিপুল উপঢৌকনে তৃপ্ত হয়ে শূন্যহাতে ফিরে এলেন, আর এসে বললেন, 'জলদস্যু কোথায়, লাফিৎ তো পারফেক্ট জেন্টলম্যান। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। ওর গায়ে হাত তোলার কথা ভাবাই যায় না গভর্নর!

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এবং ভাল ভাল খানাপিনা খেয়ে আর খাইয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল লাফিতের। ক্লেবোর্ণের মত দক্ষ প্রশাসকও ওর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারছিলেন না। এমন সময় বিশেষ একটি ঘটনা ওর গতানুগতিক জীবনে কিছুটা পালা বদল ঘটাল।

আমেরিকার সঙ্গে ইংলন্ডের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। সালটা ১৮১২, যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষ। ইংরেজদের জয়ের সম্ভাবনা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। এই সময় একদিন ব্রিটিশ সম্রাটের যুদ্ধ জাহাজ 'সোফিয়া' নীল দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে এসে উপস্থিত গ্র্যান্ড আইলের তটরেখায়। নোঙর করল জাঁ লাফিতের ঘাঁটিতে। জাহাজের ক্যাপ্টেন লাফিৎকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'লাফিৎ, তুমি একজন পাইরেট হলেও তোমার সাহস এবং বীরত্বকে শ্রদ্ধার চোখে দেখি আমি। ইংরেজ সরকার তোমার সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চায়। আমরা নিউ অর্লিন্স বন্দর থেকে মার্কিন আধিপত্য উচ্ছেদ করতে ইচ্ছুক। আমাদের সম্রাটের পক্ষে তুমি যদি যোগ দাও তবে উচ্চ রাজকীয় সম্মান আর

সামরিক পদ পাবে। অন্যথায় তোমার এই ঘাঁটি কামান দেগে উড়িয়ে দেবার আদেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে। কোনটা চাও বল।'

লাফিৎ মৃদু হেসে নরম গলায় বলল, 'অধমের ওপর মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বরের অসীম দয়া। কিন্তু একটু ভেবে দেখতে সময় দিতে হবে। দলের লোকজনদের সঙ্গেও আলোচনা করা দরকার।'

ক্যাপ্টেন উদারভাবে হাসলেন, 'সে ঠিক কথা। তবে বেশি সময় তো দেওয়া যাবে না।' লাফিৎও সৌজন্যসূচক হাসি হাসল, 'বেশি সময় নেবোও না আমি।' ওর হাসিটা যে ক্রমশঃ বাঁকা হাসিতে পরিণত হল সেটা বোধহয় লক্ষ্যও করলেন না আত্মতুষ্ট ইংরেজ ক্যাপ্টেন।

লাফিৎ নিলও না বেশি সময়। ওর একটি গোপন পত্র নিয়ে একখানা দ্রুতগতি নৌকা কখন যে গভর্নর ক্লেবোর্ণের কুঠিতে বিশেষ সংবাদ পেঁছে দিতে ধেয়ে গেল 'সোফিয়ার'-র ক্যাপ্টেন তা টেরও পেলেন না। ক্যাপ্টেন মহোদয় যখন পা দোলাতে দোলাতে হাভানা চুরুটে সুখটান দিচ্ছেন ততক্ষণে গভর্নর ক্লেবোর্ণ লাফিতের দূতের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি পড়ে জানতে পেরে গিয়েছেন ইংরেজদের আক্রমণ পরিকল্পনার সমস্ত খুঁটিনাটি। চিঠিতে এটাও পরিষ্কার জানানো হয়েছে যে আমেরিকা আর ইংলণ্ডের বিবাদে লাফিৎ আমেরিকার পক্ষেই অস্ত্রধারণ করতে প্রস্তুত।

লাফিতের এই অপ্রত্যাশিত উদারতায় গভর্নর ক্লেবোর্ণের মুগ্ধ হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু ক্লেবোর্ণ মানুষটার চরিত্রের কাঠামো অন্য ধরণের। লাফিতের পত্রের যে উত্তর গভর্নরের কাছ থেকে প্রেরিত হল তা হল আগ্নেয়াস্ত্রসজ্জিত একটি নৌবহর। আইন অমান্যকারীর সাহায্য নিতে আদৌ প্রস্তুত নন তিনি। ক্লেবোর্ণের নৌসেনা লাফিতের ঘাঁটি তছনছ করে দিল আগুন এবং বুলেটে।

মেজর জেনারেল অ্যান্ড্রু জ্যাকসন তখন নিউ অরলিন্সের প্রতিরক্ষার ভারপ্রাপ্ত। সব ঘটনা শুনে তিনি গভর্নরকে বললেন, 'আইন ভঙ্গকারীদের সঙ্গে কোন রফা নয়। লাফিতের সঙ্গে সঙ্গত ব্যবহারই করেছেন আপনি।'

তা বলুন, এদিকে তখন অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের সময়ও ভাল যাচ্ছে না। নিউ অর্লিন্সের প্রতিরক্ষার সুবন্দোবস্ত তেমন করে উঠতে পারেন নি তিনি। প্রয়োজনীয় সমরোপকরণের অভাব, অভাব গোলন্দাজ সৈন্যের। সুগঠিত ইংরেজ নৌবহরের তুলনায় আমেরিকার নৌসেনা বড়ই দুর্বল। নিউ অর্লিন্সের পতন অনিবার্য। এদিকে খবর এসেছে দুর্ধর্ষ নৌ-সেনাপতি স্যার এডওয়ার্ড পাকেনহাম সুশিক্ষিত চোদ্দ হাজার সৈন্য নিয়ে লুইজিয়ানা দখল করতে বেরিয়ে পড়েছেন।

শিবিরে বসে জেনারেল জ্যাকসন ক্রোধে ক্ষোভে অসহায়তার যন্ত্রণায় মাটির পাইপ কামড়ে গুঁড়ো করার উপক্রম করছেন অথচ ইংরেজদের মোকাবেলা করার কোন উপায়

বের করতে পারছেন না, এমনি সময়ে একদিন প্রহরী খবর নিয়ে এল এই মুহূর্তেই একজন আগন্তুক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়, খুবই নাকি জরুরী দরকার।

দরকারটা কার? তার, না আমার?' জেনারেলের ভ্রূ কুঞ্চিত, স্পষ্টতই বিরক্ত তিনি।

প্রহরী সবিনয়ে জবাব দিল, 'লোকটা বলছে দরকার আপনার।'

'বলে দাও দেখা হবে না।' নিজের দুশ্চিন্তায় পাগল জেনারেল এই বলে ব্যাপারটার ওখানেই নিষ্পত্তি ঘটাবার তালে আছেন এমন সময় সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তিই শিবিরে ঢুকে পড়ল সামরিক আইনের তোয়াক্কা না করে। ছ' ফুটের ওপর লম্বা, ঋজু ইস্পাত-কঠোর শরীর, রোদপোড়া রঙ সত্ত্বেও সুন্দর আভিজাত্যমণ্ডিত মুখ। পরণে জলপাই রঙের পোষাক। মাথায় চামড়ার তৈরী কপাল ঢাকা টুপি। সব মিলিয়ে আগন্তুক বেশ আকর্ষণীয়। লোকটির ভাবভঙ্গিমা যে কোন ব্যারণ বা কাউণ্টের মত। মার্জিত অথচ উদ্ধত। একজন জেনারেলও তার চোখে যেন সাধারণ মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

নবাগতের ধৃষ্টতায় অবাক হয়ে জ্যাকসন শুধোলেন, 'তুমি জানো এভাবে বে-আইনী ঢুকে পড়ার জন্যে তোমাকে শাস্তি দেওয়া চলে?'

আগন্তুক মৃদু হেসে বলল, 'চলে। আর সেটা জানি না তাও নয়। তবে জরুরি অবস্থায় এতসব নিয়ম মানতে গেলে চলে না, কাজের ক্ষতি হয়। আপনি আমায় তাড়িয়েই দিচ্ছিলেন, নয় কি?'

উদ্যত ক্রোধ দমন করে জ্যাকসন বললেন, 'কাজটা কি তা বলো। তার আগে বলো তোমার পরিচয় কি?'

আগন্তুকের মুখে একটা রহস্যময় কৌতুকহাসি ফুটে উঠল, 'আমাকে আপনার চেনা উচিত ছিল মিঃ জ্যাকসন। গভর্নর ক্লেবোর্ণ আমারই মাথার দাম ঘোষণা করেছিলেন পাঁচশো ডলার।'

অ্যাণ্ড্রু জ্যাকসনের মুখে যুগপৎ মেঘ আর রোদের খেলা খেলে গেল, 'জাঁ লাফিৎ?'

আগন্তুক মাথা থেকে টুপি নামাল, 'সশরীরে।'

জ্যাকসনের পাইপে তার ঝকঝকে দাঁতের সারি চেপে বসল কঠিনভাবে, 'তুমি জানো এখান থেকে পালানোর উপায় নেই তোমার। গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে কয়েক সেকেণ্ড খরচ হবে না।'

জাঁ লাফিৎ অসহিষ্ণুভাবে কাঁধ ঝাঁকাল, 'আপনি মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন জেনারেল। স্বেচ্ছায় ধরা দেবার বাসনা নিয়ে আসি নি এখানে। আমেরিকার দুর্দিনে সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমার এখানে আসা। নৌযুদ্ধে আমার চেয়ে ভাল সাহায্য কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। আমেরিকান না হলেও এখন থেকে আমেরিকাই আমার স্বদেশ। আমার সব অস্ত্র-শস্ত্র, জাহাজ, লোকজন আমেরিকার সেবার জন্যে প্রস্তুত। এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আমার গ্রেপ্তারের কথা বলছিলেন, সেটা যে শর্তে সম্ভব হতে পারে সেটা আপনার জীবনদান। আমি বন্দী হতে পারি, কিন্তু আপনিও বেঁচে

থাকবেন না। কিন্তু দেশের সংকটকালে আমরা উভয়েই সুবিবেচনার পরিচয় দিলে ভাল হয় নাকি?'

জেনারেল দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গীতে বললেন, 'তোমার কোন শর্ত আছে?'

'না। আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ নিঃশর্ত। এই সেবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমা কিংবা সামরিক পদমর্যাদা কিছুই চাই না।'

'গভর্নর ক্লেবোর্ণ তোমার ঘাঁটির ক্ষতি করেছেন। এরপরও সাহায্য করতে চাও আমাদের?'

'গভর্নর কামান দেগে ঘাঁটি উড়িয়ে দিলেও তাই চাইতাম।'

জেনারেলের নীল ধূসর চোখের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নরম হয়ে এল, 'বেশ তাই হবে। তোমার সাহায্য নেবো আমরা।'

আমেরিকার চেয়ে তিনগুণ বেশি সৈন্য নিয়েও ইংরেজরা সেবার হেরেছিল। তার মূলে জাঁ লাফিৎ আর তার দলবলের কৃতিত্ব কতখানি সেটা আমেরিকার ইতিহাসে সসম্মানে লিখিত হয়েছে। লাফিৎ আর তার ভাই পিয়ের, দলের ডোমিনিক ইউ, গ্যাম্বী রেগে বেলুঁশ ইত্যাদিরা নৌযুদ্ধ এবং গোলন্দাজী যুদ্ধে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে আমেরিকার ভাগ্যের চাকা বেমালুম ঘুরিয়ে দিল। ইংরেজরা জাঁ লাফিৎকে দলে টানার জন্যে যে ঐশ্বর্য দিতে চেয়েছিল তাতে সে বাকি জীবনটা দাঙ্গাবাজি না করে কুবেরের মহিমায় কাটাতে পারত। কিন্তু লাফিৎ তাদের উৎকোচের হাতটাকে সবলে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি পামারস্টোনসহ ১৪০০ ইংরেজ নিহত হয়েছিল, অপর পক্ষে আমেরিকার মাত্র ১৩ জন। সামুদ্রিক লড়াইয়ে লাফিতের ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতাই এর কারণ।

বিনিময়ে লাফিৎ ও তার দলবল পেল গভর্নরের ক্ষমা এবং বিজয়োৎসবে পূর্ণ মর্যাদায় যোগদানের অধিকার। এমন কি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাডিসন রাষ্ট্রীয় কৃতজ্ঞতার পরিচয় হিসেবে লাফিৎ ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমাও প্রদর্শন করলেন।

এই ঘটনার পর লাফিতের ভাগ্যের ধারা বদলে যেতে পারত্য, সে ফিরে আসতে পারত ভদ্র নাগরিক জীবনে। কিন্তু বিধাতা যেভাবে তাকে গড়েছেন সে তো আসলে তাই। নীল দরিয়ার ডাক আর পণ্যবাহী জাহাজগুলির ইশারা অগ্রাহ্য করার সাধ্য কোথায় তার? আবার তার মাথার খুলি আঁকা পতাকা ওড়ানো ক্ষুদে ক্ষীপ্র জাহাজগুলো ভেসে গেল দূর সমুদ্রপানে, শুরু হল অবাধ লুঠতরাজ।

এদিকে তখন সাগর-সন্ত্রাস দস্যুদের নিশ্চিহ্ন করে সমুদ্রবাণিজ্য নিষ্কণ্টক করার জন্য স্পেন ইংলণ্ড এবং আমেরিকা সংঘবদ্ধ হয়েছে। বারাটারিয়া উপসাগরের গ্র্যাণ্ড আইল আক্রান্ত হল। প্রিয় বাসভূমি ত্যাগ করে লাফিৎ পালাল এবং উপনিবেশ স্থাপন করল গ্যালভেস্টন দ্বীপে। সেখানেও হামলা চালাল আমেরিকান জাহাজ 'লিংকস'। লাফিৎকে স্থান ত্যাগের আদেশ দেওয়া হল। লাফিৎ তা মেনে নিল, কারণ দেশদ্রোহী

সে হবে না কিছুতেই। তারপর নিজের হাতে গ্যালভেস্টন জ্বালিয়ে দিয়ে ভেসে পড়ল অকূল সাগরে।

পেছনে পড়ে রইল কিছু গল্প আর কিংবদন্তী যা জলদস্যুদের জড়িয়ে চিরকালই থাকে। গ্র্যাণ্ড আইলের বেত আর সাইপ্রেস ঝোপের গভীর নিম্নে যদি জমে থাকে বহু বর্ষ ধরে গড়ে তোলা রত্ন-সম্পদের ভাণ্ডার তো তা পাহারা দেবার জন্যে রইল কিছু সামুদ্রিক লিলিফুল এবং সিন্ধুশকুনের ঝাঁক। আর জাঁ লাফিতের কীর্তিগাথা প্রচারের ভার নিল সাগরের অশান্ত বাতাস এবং দুর্দম তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

গ্যালভেস্টন ত্যাগের পরবর্তীকালে লাফিতের গতিবিধি সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার চিরকালের মত গ্রাস করেছিল তাকে। কিন্তু আমেরিকাবাসীর স্মৃতিপটে আজো সে মুখর বৃত্তান্ত। কারণ এমন একটা কাজ এই আইনবিরোধী দুর্বৃত্ত করেছিল যা জলদস্যু পরিচয়ধারী পাষণ্ডরা সাধারণত করে না। সেটা হল তার দেশপ্রেম। নিউ অর্লিন্সের যাদুঘর লাফিৎকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে তার তরবারিটিকে স্মারক হিসেবে রক্ষা করে। এটি সে ব্যবহার করেছিল ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে।

জলদস্যুতার দীর্ঘ ইতিহাসে অনেক নামই নানা কারণে অমর হয়ে আছে। ফ্রান্সিস ড্রেক কিংবা ভাস্কো-ডা-গামার মত অনেক সমুদ্র-অভিযাত্রীই ছিলেন মূলত জলদস্যু। বিশ্বে তারা বিশ্রুত নামা। সে হিসেবে জাঁ লাফিৎ প্রসিদ্ধি পান নি। কিন্তু আমেরিকার ইতিহাসে তার স্বতন্ত্র একটা মর্যাদা আছে। দেশপ্রেমিক জলদস্যু হিসেবে সে প্রবাদ-পুরুষ। উঁচু দরের গ্রন্থেও বহুল আলোচিত।

স্বপ্ন দেখি

অমিতাভ কর্মকার

অনেক দূরের আকাশে ঐ নীল পরীদের দেশে
স্বপ্নে দেখি রাজকন্যা যায় সে ভেসে ভেসে।
ঘরের ভিতর আবছা আলো—অবাক্ চোখে দেখি
হাসছে পরী, নাচছে পরী, গাইছে পরী এ কি!
হঠাৎ আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি হ'ল শুরু,
আকাশ জুড়ে মেঘের আওয়াজ শুনছি গুরু গুরু।
যায় হারিয়ে রাজকুমারী হারায় পরীর রাশি
আকাশ জুড়ে ভাসছে দেখি মায়ের মুখের হাসি।

মিঃ আমব্রেলা

নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়



ছুটির ঘণ্টা পড়তেই আমি স্যুটকেশ-হাতে স্কুলের বাইরে এসে দেখলাম—রোজকার মতো মা দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার হাত ধরে মা বললেন—তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। দেখছ না আকাশে কেমন মেঘ করেছে। হুড়োহুড়িতে ছাতাটাও আনতে ভুলেছি আজ।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—গম্ভীর আর কালো তার মুখ। ঠাণ্ডা হাওয়া। কিছুক্ষণ পরেই বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টিতে ভিজতে আমার বেশ মজা লাগলেও মা সঙ্গে থাকতে তা আর সম্ভব হবে না। সর্বদাই ওঁর ভয়—কখন ঠাণ্ডা লেগে আমার অসুখ করে। বাস-স্ট্যাণ্ডে পেঁছিতে হলে রাস্তা পার হতে হবে। এখন তা সম্ভব নয়। একটা শেডের তলায় আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

—মাডাম, যদি কিছু মনে না করেন—আমার একটা কথা বলার ছিল।

মা আর আমি একইসঙ্গে ঘুরে তাকালাম। লম্বা এক ভদ্রলোক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। ধবধবে সাদা ট্রাউজার। আর হালকা নীল হাওয়াই সার্ট।

—আমাকে বলছেন? মা জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যা আপনাকেই। আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন। আমার বাড়ি কলকাতাতে নয়,—বনগাঁয়। একটা কাজে এই অঞ্চলে এসেছিলাম। হোটেলে ভাত-টাত খেয়ে দাম মেটাতে পকেটে হাত ঢুকিয়েছি। দেখি—কি সর্বনাশ, মানিব্যাগ উধাও! হোটেলওলা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। অপমানের একশেষ! শেষকালে হাতের ঘড়িটা খুলে দিয়ে আসতে হল। দাম মিটিয়ে ফেরত নিয়ে যাব এই শর্তে।

সার্টের পকেটে পেন গোঁজা আছে। অথচ কব্জিতে ঘড়ি নেই। সত্যিই বেমানান। লোকটি গড়গড় করে আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই মা বললেন —কিন্তু আপনার এসব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ কি?

—মাডাম, দয়া করে আমাকে বোঝার চেষ্টা করুন। এতো বড়ো শহরে আমার কেউ চেনা জানা নেই। এই মুহূর্তে আমার কাছে একটা আধলাও নেই। আপনি আমাকে

চল্লিশটা টাকা দিলে আমি হোটেলের ধার মিটিয়ে ঘড়িটা ফেরত নেব। কিছু জরুরী কেনাকাটা করব। তারপর শিয়ালদা থেকে সোজা বনগাঁয়ের লোকাল ধরব।

—চল্লিশ টাকা?—মা যেন আঁতকে উঠলেন।—অতো টাকাই আমার কাছে নেই! আর তাছাড়া আপনাকে আমি চিনি না—জানি না, শুধু শুধু টাকাই বা দিতে যাব কেন?

—শুধু শুধু কেন দেবেন মাডাম? আমি ভদ্রলোক। আমিই বা ওভাবে আপনার থেকে টাকা চাইব কেন? বিনিময়ে এই ছাতাটা আপনি নিয়ে যান।

লোকটির হাতে একটা ফোল্ডিং ছাতা আছে এতক্ষণ যেন তেমন করে নজরে পড়েনি। দেখে মনে হচ্ছে প্রায় নতুন ছাতা। বাঁটটা চকচক করছে।

—বৃষ্টি পড়ছে। অথচ আপনার হাতে তো দেখছি ছাতাও নেই। লোকটি বলল।—ছাতাটা নিয়ে নিন। চল্লিশ যদি নাই থাকে—ঠিক আছে তিরিশই দিন। বিপদের হাত থেকে তো আমি বাঁচি।

লোকটি যে মিথ্যে কথা বলছে না—এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। চোর-জোচ্চোর যারা হয় তারা এতো গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। আর তাছাড়া ছাতাটাও বেশ নতুন। এসব ছাতার দাম—সত্তর বা আশি টাকার কম নয়। তিরিশ টাকায় ওটা পেলে লাভই হবে। মা যে আমার মতোই ভাবছেন—সেটা বুঝলাম—যখন তিনি ব্যাগ খুলে তিনটে দশ টাকার নোট বের করলেন। লোকটিকে টাকাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আপনি অসুবিধেয় পড়েছেন বুঝতে পারছি। কিন্তু মাপ করবেন। এর বেশী এখন আমার কাছে নেই।

—ওতেই হবে। ধন্যবাদ। ছাতাটা মাকে দিয়ে—প্রায় ছোঁ মেরে টাকাটা নিয়ে লোকটি তাড়াতাড়ি ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল।

—একেবারে নতুন ছাতা—তাই না টুটুল? ওটাকে নাড়তে নাড়তে মা বললেন।

—ওটা তো আমার জন্যে, মা?

—দেখা যাক। আগে বাড়ি তো চলো। তোমার বাবাকে ছাতাটা দেখাই।

বৃষ্টি জোর না হলেও আগের মতোই পড়ছে। যারা হাঁটছে তাদের সকলের হাতেই এখন ছাতা। আমাদেরও আর কোনো ভয় নেই। নতুন কেনা এই ছাতার নীচে দুজনেই বেশ ধরে গেছি। রাস্তা পেরিয়ে আমরা এপাশের ফুটপাতে উঠলাম। আর তখনই দেখতে পেলাম আবার সেই লোকটিকে। একটা রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে—মনে হল—দরজার কাছে টাঙানো বোর্ডে নানান রকম লোভনীয় খাবারের নাম এবং দাম দুটোই পড়ছে।

—এই হোটেলটাতেই বোধহয় ওর ঘড়িটা বাঁধা রাখা আছে। মা বললেন।

—লোকটা দোকানের ভেতর ঢুকে গেছে। নজর করে আমি বললাম।

—তাই নাকি? এসো তো। ও কি করে দেখি। আমার হাত ধরে টেনে ফুটপাতের এক ধারে এমনভাবে দাঁড়ালেন যাতে বাইরে থেকে রেস্টুরেন্টের ভেতরটা দেখা যায়। ভেতরে বেশ ভীড়। ঢোকার মুখেই ছাতা রাখার স্ট্যান্ডে অনেক ছাতা ঝুলছে। বর্ষার

দিনে কেউ আর শুধু হাতে বেরোয় নি। লোকটি আমাদের না দেখতে পেলেও আমরা ওকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি। আমরা ভেবেছিলাম ও রেস্টুরেন্টের মালিকের সঙ্গে কথা বলে ভাতের দাম মিটিয়ে ঘড়িটা ফেরত নিয়ে চলে আসবে। কিন্তু ওর ভাবগতিক দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বরং বেশ সন্দেহই হচ্ছে। কেননা লোকটি নিশ্চয়ই বেয়ারাকে খাবারের অর্ডার দিয়েছিল। একটু পরেই দু-তিনটে ডিসে খাবার এলো। আর লোকটিও গোগ্রাসে সেসব গিলতে লাগল। ওর পেটে যেন রাক্ষসের খিদে। চটপট ডিস থেকে খাবার উড়ে যেতে লাগল।

অবাক হয়ে আমরা লোকটির খাওয়া দেখছি। মিনিট দশও লাগল না। তার আগেই খাওয়া শেষ করে, বিল মিটিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। আর বেরোবার মুখেই ও সেই কাণ্ডটা করল। যা দেখে আমরা নিজেদের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো অনেক ছাতা থেকে খুবই স্বাভাবিকভাবে, কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে, লোকটি একটি ছাতা চকিতে তুলে নিল। তারপর বেরিয়ে এলো ফুটপাতে। তারপর ভীড়ের মধ্যে ভীড় হয়ে আমরা যেদিকে দাঁড়িয়েছিলাম—তার উলটো দিকে হনহনিয়ে হাঁটতে লাগল।

—মা দেখলে ও কি করল?

—দেখেছি।

—তার মানে আমাদের যে ছাতাটা ও বিক্রি করেছে—সেটাও হয়তো ওর নিজের ছাতা নয়। চলো পুলিশকে বলে দিই। আমি মায়ের আঙুলে টান দিলাম।

—দাঁড়াও। ওসব করে কোনো লাভ নেই। আমাদের কথায় কি প্রমাণ আছে যে পুলিশ ওকে ধরবে।

—অদ্ভুত তো লোকটা, তাই না?

মা ঘাড় নাড়লেন। তারপর বাসষ্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মায়ের দৃষ্টি বরাবর আমিও তাকালাম। দেখতে পেলাম সেই লোটিকে। যার নাম হওয়া উচিত—মিঃ আমব্রেলা। উলটো দিকের রাস্তায় আর একজন পথচারীর সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ছাতাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সে কিসব বোঝাচ্ছিল। আমাদের মতো হয়তো ঐ পথচারীটিও মিঃ আমব্রেলার কথায় বিশ্বাস করে এইমাত্র চুরি-করা ঐ ছাতাটা কিছু টাকার বিনিময়ে কিনে নেবে।



ছাতা ও সূর্য

সুনির্মল চক্রবর্তী

ছাতা বলে সূর্যকে
আমি কত বড়,
মিছি মিছি তুমি কেন
রোদ দান কর।

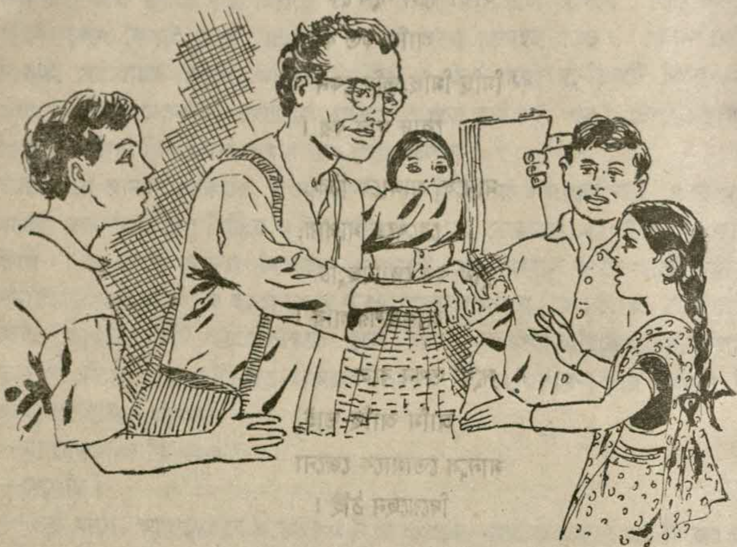
মানুষ আমাকে ঠিক
রেখেছে মাথায়,
তুমি কর ছোটাছুটি
আকাশের গায়।

সূর্য তখন বলে
আমি আছি তাই,
মানুষ তোমাকে জেনো
দিয়েছেন ঠাঁই।

আমি আছি কত ফুল
তাই ফোটে রোজ,
আকাশেতে না এলে যে
নেয় লোকে খোঁজ।

আমারইতো করুণায়
পৃথিবী যে জাগে,
না জেনে যে বলো কথা
তাই ব্যথা লাগে।





মাষ্টারমশাই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমি যখন ছোট স্কুলে পড়ি তখন একজন নতুন টিচার এলেন আমাদের ক্লাসে। তাঁর নাম ছিল অবনী ভট্টাচার্য। তিনি এক সময় কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। কলেজ ছেড়ে তিনি স্কুলে পড়াতে এসেছেন বলে অনেকে ঠাট্টা তামাসা করতেন। ছফুট লম্বা। পাতলা ধারালো চেহারা। এতখানি উঁচু নাক। গম্ভীর মুখ। তাঁকে দেখলে আমার ভীষণ ভয় করতো। অবনীবাবু আমাদের ইতিহাস পড়াতেন। ইংরেজি আর ইতিহাস এই ছিল তাঁর সাবজেক্ট।

আমাদের ক্লাসে চার পাঁচজনে খুব ভালো ছেলে ছিল। তারা সবাই ফাষ্ট বেঞ্চে বসত। ভালো ছেলে বলে খুব অহংকার ছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে কখনও পেছন দিকে তাকাতো না। আমরা যারা একটু কম নম্বর পেতুম তাদের ভীষণ ঘৃণা করত। আমার ভীষণ ভালো ছেলে হবার ইচ্ছে ছিল। আমাদের বাড়ির তখন এমন অবস্থা আমার বাবার আমার জন্যে গৃহশিক্ষক রাখার সঙ্গতি ছিল না। আর স্কুলে শিক্ষকরা যে ভাবে পড়াতেন তাতে যত চেষ্টাই করি ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হবার মতো নম্বর উঠত না। কোথায় একটা কিছু কায়দা ছিল। ওই ভালো ছেলেদের প্রত্যেকের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

আমি সারা দিন আর অনেক রাত পর্যন্ত খুব পড়তাম। পাগলের মতো চেষ্টা করতাম ভালো ছেলে হবার। এক থেকে তিনের মধ্যে থাকার? পরীক্ষার ফল বেরতো মার্কশিটটা হাতে নিয়ে আমাদের স্কুলকম্পাউণ্ডের বিশাল শিশুগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে নীরবে চোখের জল ফেলতুম। আমি তো ফাঁকি দিই না তবু আমার কেন হয় না।

সেবার অ্যানুয়েল পরীক্ষার পর আমরা কয়েকজন অবনী স্যারের বাড়ি গেলুম। অবনী স্যারের কেউ কোথাও ছিল না। তিনি একা একটা ঘরে থাকতেন। হকিন্স কুকারের রান্না করতেন। একতলার একটা ঘর। এ-দেয়াল থেকে ও-দেওয়াল মাদুর বিছানো। ঘর ভর্তি বই আর বই। একপাশে একটা বিছানা গোল করে পাকানো। একপাশে ছোট্ট একটি মা সরস্বতীর মূর্তি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তকতকে চারপাশ।

মাস্টারমশাই খাতা দেখছিলেন। আমাদের বসতে বললেন। পাশ থেকে ইতিহাস পরীক্ষার এক বাণ্ডিল খাতা টেনে নিয়ে একে একে ভালো ছেলেদের সব নম্বর বলে দিলেন। নব্বই, পঁচানব্বই। সব শেষে আমার খাতাটা খুলে বললেন খুব দুঃখের কথা তুমি মাত্র সাতাশ পেয়েছো।

ভালো ছেলেরা সবাই হাহা করে হেসে উঠল। সবাই একই সঙ্গে বলে উঠল, এ কি রে? ইতিহাসে ফেল। ইতিহাসে কেউ ফেল করে।

লজ্জায় অপমানে আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম। ভালো ছেলেরা একে একে ঘর ছেড়ে চলে গেল?

মাস্টার মশাই যেই বললেন, 'তুমি কাঁদছ।' আমার কান্না আরও বেড়ে গেল। কোনও রকমে বললুম, 'আমি তো সব প্রশ্নের উত্তর লিখেছি মাস্টার মশাই। 'লিখছ ঠিকই, তবে কি জানো। তুমি লিখতে জানো না। তোমাকে কেউ বলে দেন নি, কি লিখবে। কিভাবে লিখবে। এদিকে সরে এসো।
মাস্টার মশাই টেনে নিলেন। ফেল করেছি বলে ঘেন্না করলেন না। উপহাস করলেন না।
ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তরে তুমি যত পয়েণ্ট ঢোকাতে পারবে, ততই তুমি বেশি নম্বর পাবে। তোমার সমস্ত উত্তর হয়ে গেছে ফাঁকা। একটা কি দুটো পয়েণ্টস নিয়ে তুমি নাড়াচাড়া করেছ। তুমি তোমার পাঠ্যপুস্তকের বাইরে যেতে পারোনি। তাও আবার কি তুমি মুখস্থ করে উগরে দিয়েছ। কোনও উত্তরেই আলোচনা নেই। মুখস্থের যা দোষ। একটা বই পড়লে হবে না। বাইরের আরও পাঁচটা বই পড়তে হবে। যত পারো পয়েণ্ট সংগ্রহ করো। লেখো। বোঝো, বুঝে লেখ। মুখস্থ নয় বুঝতে পারলে?
'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আমি অন্য বই পাবো কোথায়?'
'হ্যাঁ, সে এক সমস্যা। আমাদের দেশে তো ভালো লাইব্রেরি নেই পাড়ায় পাড়ায়। ঠিক আছে। আমি তোমাকে বই দেবো। তুমি খাটতে রাজি আছ।'

'হ্যাঁ মাস্টারমশাই। আমি তো খাটি। আমার খুব ইচ্ছে করে ফার্স্ট সেকেণ্ড হতে।'

'ঠিক আছে। আমি তোমার ভার নিলুম। এটা হাফইয়ারলি ছিল। অ্যানুয়েলে তোমাকে আমি দাঁড় করাবোই। ওরা তোমাকে উপহাস করে গেল, আমার খুব খারাপ লেগেছে। পয়সাওলা ঘরের ছেলে সব। এক একটা বিষয়ের জন্যে এক একজন শিক্ষক। জানো তোমার মতো আমিও গরিব ঘরের ছেলে ছিলুম। দুবেলা জলখাবার জুটতো না। নাও চোখের জল মুছে ফেল। পৃথিবীটা কান্নার জায়গা নয়, লড়াইয়ের জায়গা, রোক চাই।'

শুধু ইতিহাস নয়। অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, সমস্ত বিষয়ে মাস্টরমশাই আমাকে তালিম দিতে শুরু করলেন। সে যে কি আনন্দ। আমার একটা জেদ চেপে গেল। মস্টারমশাই পড়তে বলতেন বুদ্ধি করে পড়বে। বোকার মতো খাটবে না। সব কিছুর একটা মেথড আছে। কিছুই শক্ত নয়। শক্ত ভাবলেই শক্ত।'

এক একদিন পড়তে রাত দুটো তিনটে বেজে যেত। আমরা একটা ভীষণ পুরনো বাড়িতে থাকতুম। মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়লেই হয়। পুরনো বাড়ি বলে ইলেকট্রিক ছিল না। হ্যারিকেন জ্বেলে পড়তুম। কাঁচে কালি পড়ে শেষটায় আলো আর দেখা যেত না। কিন্তু যত রাত বাড়তো ততই পড়া জমে উঠত।

মাস্টারমশাই বলতেন, 'যতই জ্ঞানের জগতে ঢুকবে দেখবে আর কিছু ভালো লাগছে না। মহাসমুদ্রের মতো। এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও।'

আমার বাবাও ছিলেন খুব পণ্ডিত মানুষ। সমস্ত বিষয়ের ছিল তাঁর অগাধ জ্ঞান। কিন্তু আমাকে তেমন পড়াবার সময় পেতেন না। সংসার চালাবার জন্যে উদয়স্ত খাটতে হত। ছেলে পড়িয়ে রাত প্রায় এগারোটার সময় বাড়ি ফিরতেন। রাত বারোটার সময় আমাকে নিয়ে বসতেন। একটা দুটো বেজে যেত।

ক্লাস নাইন থেকে টেনে ওঠার পরীক্ষায় আমি সেকেণ্ড বলুম। সত্যব্রত আমার চেয়ে দু নম্বর অঙ্ক বেশি পেয়ে ফাস্ট হয়ে গেল। মাস্টারমশাই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন তাঁর চোখে জল। মাস্টারমশাই বললেন তোমার বাবা অঙ্কে সুপণ্ডিত। তাঁকে বোলো জ্যামিতি এক্সট্রা আর অ্যালজ্যাবরায় আর একটু জোর দিতে। তাহলেই হয়ে যাবে।'

হঠাৎ মাস্টারমশায়ের একদিন জ্বর হল। প্রথমে অল্প, তারপর ধীরে ধীরে চারে উঠে গেল। সেই সময় আমি খুব সেবা করেছিলুম। আর কেউ তেমন ধারে কাছে ঘেঁষেনি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে যেত 'কেমন আছে মাস্টারমশাই?'

বাশ ওইতেই কর্তব্য শেষ। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। আমাকে বিছানার পাশে ডেকে বললেন, 'অভয়, আমার মন বলছে, দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাকে হয় তো যেতে হবে। তুমি আমার ছেলের মতো। তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে তুমি আমার মুখে

আগুনে দিও ; আর যেভাবে পারো আমার শ্রাদ্ধটা কোরো, তা না হলে আমার আত্মা মুক্তি পাবে না।'

আমি কেঁদে ফেললুম। জ্বরে মাস্টারমশাইয়ের গা পুড়ে যাচ্ছে। সারা শরীর কেমন যেন হলদেটে হয়ে গেছে। মাস্টারমশাই তাঁর দুর্বল ডান হাতটা আমার মাথায় রেখে বললেন, 'আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, জীবনে তুমি খুব বড় হবে। আমার যা কিছু রইল সব তোমার। আর হ্যাঁ আমার পুজোর আসনটা সারা জীবন খুব সাবধানে তোমার কাছে রাখবে। রোজ একটু করে বসবে। যখন মন খুব খারাপ হবে, হতাশ হবে তখন ওই আসনটায় বসবে। ওই আসনটা খুব একজন বড় সাধক আমাকে দিয়েছিলেন।'

সব চিকিৎসা ব্যর্থ করে, ঠিক তিন দিন পরে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। সব ফাঁকা হয়ে গেল। মন এত খরোপ যে পড়ায় মন বসে না। কিছুই ভাল লাগে না। কেমন কাঁদতে ইচ্ছে করে। শেষে সাহস করে একদিন নির্জন ঘরে আসনে বসলুম। অদ্ভুত একটা ব্যাপার হল। মন স্থির হয়ে গেল। পরিষ্কার শুনতে পেলুম মাস্টারমশাইয়ের গলা, 'অভয় থেমে থেকো না। পেছন ফিরে তাকিও না, এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও।'

তারপর কত দিন হয়ে গেল। মাস্টারমশাইকে আমি ভুলি নি। এখনও প্রতিদিন তাঁর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বলি, 'আমি থামি নি মাস্টারমশাই। পিছু ফিরে তাকাইনি।' ছবি থেকে তাঁর ডান হাতটি যেন বেরিয়ে আসে। বেরিয়ে এসে আমার মাথা স্পর্শ করে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাই তিনি বলছেন 'ঠিক হচ্ছে অভয়। আরও আরও এগিয়ে যাও। কোনও কিছুর শেষ নেই।'

খাপছাড়া কবিতা

অজিতকৃষ্ণ বসু

ধূর্জটীলাল

ধূর্জটিলাল নন্দ
মানুষটা নয় মন্দ
দোষ শুধু তার খুঁতখুঁতি, আর
সব কিছুতেই সন্দ।
পূর্ণ চাঁদের জোছ্‌না দেখে
রাগ করে সে বলল হেঁকে
"চাঁদের আলোয় পাচ্ছি কেন
সূয্যি মামার গন্ধ?"

চৌদ্দ

পিতৃসত্য রাখতে শ্রীরাম
চৌদ্দ বছর ছিলেন বনে,
পয়ারে তাই চৌদ্দ হরফ
কৃত্তিবাসের রামায়ণে।
দেশ-বিদেশের কবিরা সব
কৃত্তিবাসের কাণ্ড দেখে
ছন্দ গেঁথে হিসেব করে
চৌদ্দ লাইনে সনেট লেখে!

মহাভারতের কথা

তখনো দেন নি দেখা
ভারতে শ্রীগৌতম বুদ্ধ,
পাণ্ডবে কৌরবে
লেগেছিল ঘোর মহাযুদ্ধ।
ভাগ্যিস লেগেছিল,
তা না হলে কোনো ভাগ্যবান
মহাভারতের কথা
শুনত কি অমৃত-সমান?

রামায়ণ

নীতিকথা লেখা আছে,
এমন কোনো বইকেই
দেন নি আমল অযোধ্যার
মেজো রাণী কৈকেয়ী,
নিজের ছেলে ভরতকে
বসাতে রাজ-সিংহাসনে
চৌদ্দ বছর বাস করতে
শ্রীরামকে পাঠালেন বনে।
রামের যদি না হতো এই
চৌদ্দ বছর বনবাস,
রামায়ণ লিখে অমন
হতেন না তো কৃত্তিবাস।

দশ-মাহাত্ম্য

বলে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ
"যত মত তত পথ"।
দশানন তাই লঙ্কাপতি,
অযোধ্যাপতি দশরথ।
দশরথের ছেলের হাতেই
দশানন পড়েন মারা,
এ খবরটা সবাই জানে
রামায়ণ পড়েছে যারা।
দশাননকে বধতে রাম
করেছিলেন যাঁর পূজা,
তিনিও ছিলেন দশ-ভক্ত,
তাই তো ছিলেন দশভূজা।
দশাবতার স্তোত্র কবি
গীত গোবিন্দে গেছেন লিখে,
দশে মিলে কাজ করবার
বাণী ছড়াই দিকে দিকে।



ভবঘুরে

বকুল কানুনগো

রামসুন্দর পথে পথে খবরের কাগজ বিক্রি করে বেড়ায়। কেউ কেনে, কেউ কাগজের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে, খানিকক্ষণ কি পড়ে নিয়ে তারপর কোন কথা না বলে কাগজটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। রামসুন্দর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কিন্তু কাগজ তাকে বেচতেই হবে। ঘরে রুগ্না মা পথ চেয়ে বসে আছেন, সে গিয়ে কাগজ বিক্রির সামান্য কয়েকটা পয়সা তাঁর হাতে তুলে দিলে তবে রান্না হবে। কিন্তু সত্যি কি হবে? ও হয়তো কোন রকমে কিছু খেতে পাবে, কিন্তু মা? মা কিছু বলবেন না, কিন্তু ও জানে, তিনি না খেলেও মুখে বলবেন খেয়েছি তো।'

বাবা অনেক দিন মারা গেছেন, দুঃখিনী মা কি করে যে ওকে এতটা বড় করে তুলেছেন এখন একটু একটু বুঝতে শিখে সে অবাক হয়ে যায়।

ওদের বাড়ির কাছে সূর্যালয় হোটেল। কত লোক ওখানে কাজ করে, ওকি ওখানে একটা চাকরি পায় না? তা হলে হয়তো এ দুর্দশা থেকে কিছুটা রেহাই পেত, মাকেও কিছু ওষুধপত্র খাওয়াতে পারত, চিকিৎসা করতে পারত তাঁর।

একদিন সূর্যালয় হোটেলের পাশ দিয়ে সে যাচ্ছে, হঠাৎ ওপর থেকে হোটেলের মালিক ওকে ডেকে বললেন, 'এই ছোকরা, চাকরি করবি? আমাদের হোটেলে একজন ছোকরার দরকার। তিরিশ টাকা মাইনে দেব মাসে, আর খাওয়া দাওয়াও ফ্রী।'

রামসুন্দর যেন হাতে চাঁদ পেল। রোদ-বৃষ্টি জল-কাদার অনির্দিষ্ট আয় ছেড়ে একটা বাঁধা কাজ! তাছাড়া কাগজ বিক্রির দাম তো রোজ মিটিয়ে দিতে হয় আগে ভাগে, বিক্রি না হলে ফেরৎ নেয় না, সমস্ত টাকাটাই লোকসান।

ছুটতে ছুটতে সে মাকে সুখবরটা দিতে গেল। মা-ও শুনে খুব খুশি।

কিন্তু হোটেলের কাজে খাটনি যে এত বেশি তা তার ধারণা ছিল না। সেই ভোর হবার আগেই গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। দুপুরে কোনদিন এক আধঘণ্টা ছুটি, কাজের ভিড় থাকলে তাও নেই। মায়ের সঙ্গে সারাদিন দেখাই হয় না। অনেক রাতে যখন বাড়ি ফেরে, ছেলে মা তার জন্য জেগে জেগে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

রামসুন্দর মাস মাইনের টাকা হাতে পেয়ে ভাবে, টাকা তো পেলাম কিন্তু মার শরীর যেমন ভেঙ্গে পড়েছে তাতে তাঁকে একটু সেবাযত্ন করতে না পারলে তিনি কি বাঁচবেন? সাধ্যমত চিকিৎসার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু মার শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে।

সেদিন মাইনের দিন। কিন্তু রামসুন্দরের মনটা কেমন যেন ছটফট করছে মায়ের জন্য। কাজে মন বসছে না। মাইনের টাকাটা পেলে সে এখনই বাড়ি চলে যেত কিন্তু সে তো সেই রাত্তিরে পাওয়া যাবে।

মনটা থেকে থেকে উদাস হয়ে উঠছে, কি একটা অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করছে। শেষে সে আর থাকতে পারল না। সহকর্মীদের বলল, 'ভাই আমি বাড়ি চললাম। বাবুকে বল, কাল এসে টাকা নেব।'

সঙ্গীরা বলল, 'কর্তাকে বলে যাও, নইলে তিনি কুরুক্ষেত্র কাণ্ড করবেন।' কিন্তু কর্তা কোথায় গেছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

রামসুন্দর আর অপেক্ষা করল না। ছুটে চলে এল বাড়িতে। কিন্তু এ কি! মা কি এই অসময়ে ঘুমুচ্ছেন! তাকে দেখে অন্য দিনের মত বলছেন না তো—'খোকা এলি? এতক্ষণে সময় হল?'

রামসুন্দর জানত না, মা অনেকক্ষণ আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন।

রামসুন্দর আর হোটেলে ফিরল না, মাইনেও নিতে গেল না। সেই থেকে সে ভবঘুরে।



স্বপনপুরীর দেশে

সত্যেন্দ্র আচার্য



সে এক বিচিত্র দেশ। লোকে বলত স্বপনপুরী। এই দেশে এক রাজা ছিলেন। নাম ছিল ধর্মমন্ত। সুরূপা এক রাণী ছিলেন। তাঁর নাম সুজয়া। রাজ্য জুড়ে বিস্তর সুখ। প্রজাদের আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু রাজা-রাণীর মনে সুখ নেই। হায় রে, ছোট রাজকুমার শুভ্রমন্ত যদি বড় ভাই সুমন্তর মত হত ?

রাজার মনে দুঃখ দেখে মন্ত্রী মাথা নত করে, সেনাপতি খাপের মধ্যে খোলা তলোয়ার ঢুকিয়ে রাখে, সেপাই-এর দল হাঁটু গেড়ে বসে।

রাজা একদিন মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, মন্ত্রীবর ?

আজ্ঞা করুন মহারাজ।

আপনি রাজপুত্রদের বিদ্যা পরীক্ষার আয়োজন করুন।

রাজপুরোহিত রাজপঞ্জিকা খুলে দিন ঠিক করলেন। বসন্তপূর্ণিমা।

দেখতে দেখতে বসন্তপূর্ণিমা এসে গেল। আনন্দে মুখর হয়ে উঠল রাজপুরী। উৎসবে সাজানো হল রাজপ্রাসাদ। ময়ূরের দল পেখম তুলে নাচে। স্বপনপুরী নতুন সাজে সাজে।

রাজা তাকালেন দুই রাজপুত্রের দিকে। রাণীর মাথা নত। রাজা এবার তাকালেন সুমন্তর দিকে। প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলত, বিদ্যা বড়, না বুদ্ধি বড় ?

আজ্ঞে বিদ্যা মহারাজ। বড় ভাই সুমন্ত মাথা উঁচু করে জবাব দেয়।

রাজা এবার তাকালেন ছোট রাজকুমার শুভ্রমন্তর দিকে। মাথা নিচু করে দরবার থেকে বেরিয়ে যায় শুভ্রমন্ত।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ দরবার। রাজার মন আবার বিষাদে ভরে যায়। রাণী দুঃখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কোকিল থামিয়ে ফেলে গান।

তবু বড় রাজকুমার সুমন্তর গর্বে রাজার মন টলমল করে। ময়ূর আবার পেখম মেলে। লোকে বলে রাজার মনের অবস্থা নিয়েই স্বপনপুরী হাসে কাঁদে। রাজদরবারের সকলে পুলকিত চোখে তাকিয়ে থাকে সুমন্তর চোখে।

রাজা কি যেন চিন্তা করলেন। করে বললেন, এবারে প্রশ্ন করুন আপনারা।
সুবর্ণ পুরীর প্রধান পণ্ডিত প্রশ্নের জন্য তৈরী হন।
রাজা বলেন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তুমি পুরস্কৃত হবে।
প্রস্তুত মহারাজ। শান্ত চোখে তাকায় সুমন্ত। রাজা বলেন, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আর একটা পারিজাত ঘোড়া পাবে তুমি। দেশ ভ্রমণে বেরোবার অনুমতি পাবে। কিন্তু কৃতকার্য না হলে শাস্তি কি জানো?
মাথা নিচু করে সুমন্ত।
বনবাস। সাত বছরের নির্বাসন দণ্ড নিতে হবে তোমাকে।
প্রশ্ন করুন পণ্ডিতবর। শান্তকণ্ঠে সুমন্ত বলে। সুবর্ণপুরীর পণ্ডিতপ্রবর আচার্য দীপঙ্কর-এর দিকে তাকায়।
উজ্জ্বল চোখ তুলে দীপঙ্কর তাকান সুমন্তর চোখে। তাকিয়ে বলেন আচ্ছা বলত—"প্রত্যুৎপন্নমতি সর্বানাপদো রক্ষতি"—এর অর্থ কি?
পণ্ডিতপ্রবর, এর অর্থ হল—উপস্থিত বুদ্ধি সকলকে বিপদ থেকে রক্ষা করে।
সুমন্তর বিদ্যাপরীক্ষায় খুশী হলেন রাজা। দরবারের সকলেই। শুধু রাণী গোপনে চোখ মুছলেন।
সঙ্গে সঙ্গে আবার সোনালী রোদ্দুরে আকাশ ভরে যায়। রাজা বলেন, এই পারিজাত ঘোড়া আর স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে দেশ ভ্রমণ সেরে এসো। ফিরলেই রাজ্যাভিষেক। ঈশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবি করুন। তারপর মন্ত্রীকে ডেকে বলেন, মন্ত্রীবর, শুভ্রমন্তকে সাত বছরের জন্য বনবাসে দিন।
দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেল। ছোট রাজকুমার শুভ্রমন্ত বনের ফল খায়। দুহাত ভরে তৃষ্ণার জল পান করে ঝর্ণা থেকে। রাত্তিরে জ্যোৎস্না নামে ঝর্ণায়। সেই আলো-ছায়ায় তাকিয়ে তাকিয়ে এক সময় মনে পড়ে যায় বাড়ির কথা। ভাবে নিজের ভাগ্যের কথা, মা-এর কথা। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে শুভ্রমন্তর। ভীষণ কষ্ট হয় যেন এই নির্বাসন দণ্ডের জন্য, এই বনবাসের জন্য।
ওদিকে সুমন্তর আনন্দ আর ধরে না। আনন্দে যেন বিভোর হয়ে এ দেশ থেকে সে দেশ ঘুরে বেড়ায়।
সেই প্রতিদিনের মত সেদিনও শুভ্রমন্ত ঝর্ণার ধারে বসে বসে ভাবছে। হঠাৎ চমকে উঠল সে। কে? চারিদিকে তাকাল হকচকিয়ে। সে যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।
দেখতে দেখতে সেই শব্দ আরো কাছে এল। একেবারে তার চোখের সামনে এসে গেল ঘোড়াটা। তারপর হঠাৎ চোখাচোখি। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ছোট ভাই। ঘোড়া থেকে নামল সুমন্ত।
শুভ্রমন্ত বলে, তুমি এই বনের ভেতর?
তোকে দেখতে ভাই। সারা বন তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, সুমন্ত বলে।

চোখে জল এসে গেল শুভ্রমন্তর। কোন উপায়ে বলল, মা-কে বোলো, আমি ভাল আছি।
বলব। মাথা নিচু করে সুমন্ত বলে। বাবাকেও বলব, তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।
না দাদা। আমি বিদ্যাহীন। আমি করুণা চাই না। করুণা, লোভ, মনকে বড় ছোট করে।
ভর দুপুরের ঝলমলে রোদ অরণ্যের ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও ছায়া, কোথাও রোদ। যেন ছায়ার সঙ্গে রোদের খেলা চলছে। সুমন্ত বলল, চল, ওই ঝর্ণা থেকে আমার ঘোড়াটাকে জল খাইয়ে আনি।
সুন্দর পারিজাত ঘোড়া দেখে নিজের ভাগ্যের কথা আবার মনে পড়ল শুভ্রমন্তর। সে বনবাসে এসেছে নিঃস্ব হয়ে, শুধুমাত্র একটা খোঁড়া উট নিয়ে। আস্তাবলে অজস্র ঘোড়া, নানা জাতের, কিন্তু রাজার আদেশে শুধুমাত্র ওইটুকুই মিলেছে তার ভাগ্যে। উটটার পিঠে চেপে বনবাস দণ্ড মাথায় নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল রাজ্য থেকে।
কী ভাবছিস শুভ্রমন্ত? সুমন্ত ছোট ভাই-এর কাঁধের ওপর হাত রাখে। শুভ্রমন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, না, কিছু না, চলো।
ঘোড়াটা সঙ্গে নিয়ে ঝর্ণার দিকে এগোয় ওরা। সারি সারি সমীবৃক্ষ। হঠাৎ এক শাল্মলী বৃক্ষের নিচে একটা সিংহের হাড় চোখে পড়ল সুমন্তর। গর্বে লাফিয়ে ওঠে সুমন্ত। বলে, আমার ধর্ম-দেহ বিদ্যার কৃতিত্ব এবার তোকে দেখাব শুভ্রমন্ত।
হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকে শুভ্রমন্ত। সুমন্ত বলে, আমি চতুর্ভুজ বিদ্যা শিক্ষা করেছি। এই বিদ্যার প্রধান বিষয় ধর্মদেহ দান। আমি ওকে রক্ত মাংস দেব, চর্ম দেব, জীবন দেব।
কিন্তু দাদা, শুভ্রমন্ত যেন বাধা দেয়।
হ্যাঁ। যেন আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে সুমন্ত। ওর শরীরে প্রাণ সঞ্চার করব আমি। ভাই-এর দিকে তাকিয়ে বলে, অবিদ্যা নিয়ে তুমি বসে বসে দেখ শুভ্রমন্ত। ব্যাঙ্গ করে কথাগুলো বলে ছোট ভাই শুভ্রমন্তকে।
কিন্তু তোমার এই বিদ্যা যদি তোমার বিপদ ঘটায়? শুভ্রমন্ত বলে।
সুমন্ত বিদ্যাগর্বে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।
অবশেষে বিদ্যা বলে সেই হাড় একটা জীবন্ত সিংহে পরিণত হল। অবাক হয়ে দেখল শুভ্রমন্ত।
পরক্ষণেই সজীব সিংহটা কেমন হিংস্র হয়ে উঠল। আর চোখের নিমেষে সুমন্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর রক্ত মাংস ভক্ষণ করে ঝর্ণায় গিয়ে প্রাণভরে জল খেল। তারপর ভরপেটে ওপর দিকে একবার তাকিয়ে আরো গভীর বনের ভেতর চলে গেল।
পারিজাতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ভয়ে কাঁপতে থাকে শুভ্রমন্ত। তারপর চোখে হাত চাপা দিয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল শুভ্রমন্ত। বেলা গড়িয়ে আসে। সূর্য আস্তে আস্তে ডুবে যায়।

আজ দামামায় ঘা পড়েছে। রাজবাড়ি আবার আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে। আজ সুমন্ত ফিরবে। আজ সেই রাখী পূর্ণিমা। ঘরে ফেরার দিন। রাজপুরীতে আনন্দ আর ধরে না। সেনাপতির কোমরে নতুন তলোয়ার। সেনাদের হাতে নতুন পতাকা। প্রজারা সবাই হাসি খুশী। টিয়া বন্দনা নতুন সুরে মেতে ওঠে। রাজ্য জুড়ে আনন্দের বান ভেসেছে যেন।

দেখতে দেখতে বেলা বড় হয়। সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিমে দেখতে দেখতে। কিন্তু কই, পারিজাতের পিঠে চেপে কেউ আসছে না তো?

রাজার মন বিষাদে ভরে যায়। একি? এমন তো হবার কথা নয়? তবে কি কোন অঘটন ঘটেছে?

রাজা ছুটে এলেন বাইরে। কোকিল চুপ। রাজা দেখলেন, খোঁড়া উটের পিঠে চেপে শুভ্রমন্ত এগিয়ে আসছে। কে? কে তুমি?

খোঁড়া উটের পিঠের ওপর থেকে নেমে মাথা নিচু করে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে শুভ্রমন্ত। তারপর বলে, সুমন্ত নেই।

রাজার মন সন্দেহে ভরে ওঠে। রাজা কঠোর গলায় বলেন, রাজ্যের লোভে তুমি তাকে হত্যা করেছ। রাজা ডাক দেন, ঘাতক—

কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্ন আছে মহারাজ। শান্তকণ্ঠে শুভ্রমন্ত বলে।

কী তোমার প্রশ্ন?

বিদ্যা বড়, না বুদ্ধি বড় মহারাজ?

মুহূর্তে রাজা কেমন বিভ্রান্ত হন। পরক্ষণেই বলেন, বিদ্যা।

ঠিক। আমিও মানি মহারাজ। কিন্তু বুদ্ধিহীন বিদ্যা অপেক্ষা বিদ্যাহীন বুদ্ধি অনেক বড়। 'ধর্মদেহ দান' শিখেছিল সুমন্ত, কিন্তু তার পরিণাম শিক্ষা করেনি। তাছাড়া বিদ্যাগর্বে কখনো গর্বিত হতে নেই মহারাজ। বিদ্যার গুণ বড়াই নয়, বিনয়।

রাজা তাকিয়ে থাকেন।

শুভ্রমন্ত বলে, আমার বিদ্যাহীন বুদ্ধি সুমন্তকে বাঁচাতে চেয়েছিল, কিন্তু তার বুদ্ধিহীন বিদ্যা তার মৃত্যু ঘটিয়েছে। তাঁর বিদ্যা সম্পূর্ণ হয়নি মহারাজ। তাই ধর্মদেহ বিদ্যা বলে মৃত সিংহ জীবিত হয়ে তাকে ভক্ষণ করেছে।

ভীষণকায় কঠিন পুরুষ ঘাতক সামনে এগিয়ে আসে।

সকলে তাকিয়ে থাকে। রাণী কাঁদতে থাকেন। শুভ্রমন্ত বলে, চলো ঘাতক, আমাকে বদ্ধভূমিতে নিয়ে চলো।

শুভ্রমন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকেন রাজা।



বেলুন বেলুন

এখলাসউদ্দিন আহমদ

হঠাৎ করে যাতে হাত থেকে ফস্‌কে না যায়-এই ভয়ে সুতোটা ভালো করে আঙ্গুলে জড়িয়ে নিলো তুনু। তারপর বাঁ হাত দিয়ে ভালো করে কোলের উপর জাপটে ধরে রংয়ে ভেজা তুলিটাকে ডান হাত দিয়ে আলতো ভাবে ধরে কি যেন ভাবলো কিছুক্ষণ। তারপর সেই তুলি দিয়ে নাক কান চোখ ভ্রু আঁকার কাজ শেষ করে যেই না ঠোঁট দুটো আঁকা শেষ করেছে, অমনি কোলে জাপটে ধরা বেলুনটা হাঁফ ছাড়া ভাব নিয়ে বলে উঠলো, 'উফ্, বাঁচালে ভাই তুমি। কথা না বলতে পেরে তো পেটটা দুমফট্টাস হয়ে যাচ্ছিল আট্টু হলে।'

একটু দম নিয়ে বেলুনটা আবার বললো, 'আমি? আমি ভাই আসছি, অনেক—অনেক দূর থেকে। সেই—সেই অনেক গাছ, অনেক মাঠ-অনেক নদীনালা পাহাড়-বাড়ির ছাদ পেরিয়ে। মেঘেদের সাথে ভাসতে ভাসতে ভাসতে-একটু হাঁপিয়ে পড়ে, হেলতে দুলতে তোমাদের বাগানের গাছে যেই না গেলাম আটকে, অমনি কে যেন সুতলিটা না কানটা কি যেন একটা ধরে নিয়ে হাজির হলো তোমার কাছে। নাম? আমার নাম ভাই ঢ্যাপসা। তুমিই বলো, এটা একটা নাম হলো? কি বিচ্ছিরি, কি বিচ্ছিরি! তাই না? বিশ্বাস করো তুমি, এসব ঐ দুষ্টু ছেলেদেরই কাজ। বলি-নাম আর খুঁজে পেলি না তোরা? মুখ ছিলো না তো, তাই আর কিছু বলতে টলতে পারিনি। তাছাড়া শুধু নাম কেন, কথা না বলতে পেরে তো পেটটাই যাচ্ছিল ফেটে আর একটু হলে। তাই বলছিলাম, বাঁচালে তুমি।'

আচমকা এবং অনর্গল কথাগুলো বলতে থাকায় প্রথম দিকে তুনু কেমন যেন একটু থতমত খেলো। তারপর ফিক করে একটু হেসে বললো, 'পেট! তোমার সবটাই তো দেখি পেট। ফাটলে আর থাকলো কি-এ্যাঁ? আবার নামেরও কি ছিরি! ঢ্যাপসা! ঢ্যাপসা একটা নাম হলো?'

তুনুর কথা শুনে ঢ্যাপসার মুখটা কেমন যেন একটু ব্যাজার ব্যাজার। ছলছল চোখে বলে উঠলো, 'না হয় বুক পেটটাই একটু সমান সমান। তাই বলে তুমিও খোঁটা দিলে তুনু বুড়ি? এমন বিচ্ছিরি নাম কি আর আমারও পছন্দ! না কারোর হয়, তুমিই বলো।'

বলতে বলতে তুনু লক্ষ্য করলো, সদ্য এঁকে দেওয়া চোখ দুটো দিয়ে দুফোঁটা কালি গালের উপর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচের দিকে নামছে।

সঙ্গে সঙ্গে তুনু হাঁ হাঁ করে উঠলো, 'আরে করো কি, করো কি! চুপ করো, চুপ করো। এক্ষুণি নাক মুখ সব ধেবড়ে ধুবড়ে একাকার হয়ে যাবে!'

তারপর নিজের জামার খুঁট দিয়ে ঢ্যাপসা বেলুনটার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়া জলের ফোঁটা দুটো মুছে দিতে দিতে বললো, দুর! তুমি আচ্ছা বোকা তো! খোঁটা দেবো কেন? ও কথা তো তোমায় আমি এমনি বলছিলাম। আমার আম্মু বলে কি জানো? আম্মু বলে, কারো কোন খুঁত নিয়ে, কখনো কাউকে খোঁটা দিতে নেই। ঠাট্টা করতে নেই। মনে মনে তারা কষ্ট পায়। মিছামিছি কাউকে কষ্ট দিতে নেই। তা-তুমি কিছু মনে করো না ভাই। কেমন?'

একটু থেমে তুনু আবার বলতে শুরু করলো, 'আমার নাম ভাই তুলি। কেউ কেউ ডাকে তুনু। কেউ আবার, মানে আমার চাচা আমায় তুনতুবুড়ি বলেও ডাকে। তা তোমাকে ভাই আমি ঢাউস বলেই ডাকবো, কেমন? ঢ্যাপসা নামটা সত্যি সত্যি কিন্তু বিচ্ছিরি! ঢাউস, ঢাউস নামটা শুনে মনে হয়, বেশ বড়ো সড়ো, নাদুস নুদুস অথচ তেজী তেজী ভাব। সবাই কেমন অবাক অবাক চোখে তাকিয়ে থাকবে আর নিমেষেই হু-উ-স্-স্ উধাও! তাই না? আহা! আমি যদি পলক ফেলতেই অমন উড়াল দিতে পারতাম—হু-উ-উ-উ-স্!'

কথাগুলো শেষ করে তুনু পিটপিট করে তাকালো ঢাউসবেলুনটার দিকে, তার মনভাব বুঝে নেওয়ার জন্য।

তুনুর কথা শুনে মনে হলো ঢ্যাপসার মনটা বেশ খুশি খুশি। একটু হাসি হাসি মুখ করে তুনুর দিকে তাকিয়ে সে বললো, 'চলো না ভাই, একটু ছাদে বেড়িয়ে আসি। নতুন চোখ দুটো মেলে চারিদিকটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখি, কেমন দেখায় সব কিছু।'

'কেন, ছাদে কেন?'

তড়িঘড়ি, একটু নড়েচড়ে তুনু সোজা হয়ে বসলো। জুলজুল চোখে, সন্দেহের ভাব দিয়ে ঢ্যাপসার মুখের দিকে তাকালো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, 'না বাপু,

ছাদে গিয়ে টিয়ে কাজ নেই। ভরদুপুরে বেলা ছাদে গেলে মামনি বকা দেবে। তা ছাড়া……।'

কথাগুলো বলতে বলতে বেলুনে বাঁধা সুতোটা আরো একটু ভালো করে আঙুলে জড়িয়ে নিলো তুনু, কি যেন একটা কিছু ভেবে নিয়ে।

তুনুর আবভাবে পরিস্কার বোঝা গেলো, আসল কথাটা গোপন করে, ছাদে যাওয়ার ব্যাপারটা এড়িয়ে যাচ্ছে সে।

ঢ্যাপসা বললো, 'দুপুর কই, এখনতো বিকেল। তা ছাড়া, তুমি যা ভাবছো বাপু, তা না। তুমি ভাবছো, আমি ঢাউস বেলুনটা, ছাদে গিয়েই নিমেষে হুউস্ করে উড়াল দেবো। না, মোটেই তা নয়। ওরা জ্বালাতন করছিলো বলেই না উড়াল দিলাম। বিশ্বাস করো, ওরা কি দুষ্টু আর কি দুষ্টু! একবার এটা না ওটা, আর একবার ওটা না সেটা। ঘ্যানোর ঘ্যানোর, প্যানোর প্যানোর, কান্নাকাটি করতে করতে ছেলেটা রাস্তার মোড় থেকে সেই যে আমায় নিয়ে গেলো বাড়িতে বাবার হাত ধরে ধরে, তারপর থেকে আর শান্তি নেই! এক ঝাঁক দুষ্টুর হাতে পড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ! কাজ নেই কাম নেই-সুতো বেঁধে একবার হাওয়ায় ভাসানো একবার নিচের দিকে নামানো। বেঁধে শুধু লোফালুফি আর চট্কাচট্কি। কাঁহাতক আর ভালো লাগে তুমিই বলো! তাই সুযোগ পেয়েই না উড়াল দিলাম-হু উ-উ-স্। তারপর, এই ঘুরতে ঘুরতে ঘুরতে তোমার কাছে। তুমি খুব ভালো ভাই, খুব ভালো। আমায় তুমি নাক দিলে, কান দিলে। চোখ মুখ দিলে। কথা বলতে পারছি। দেখতে পাচ্ছি। কাঁদতে পারছি। তোমাকে কি কখনো ছেড়ে যেতে পারি? তুমিই বলো!'

ঢ্যাপসার কথা শুনে তুনুর মনটা কেমন যেন একটু নরম হলো। বললো, 'তা-ঠিক আছে চলো। তবে বেশীক্ষণ না কিন্তু। যাবো আর নামবো। দেরী হলে কিন্তু মামনি বকা দেবে, বলে দিলাম।'

ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে। একটু গপ্পোসপ্পো করবো। চোখ মেলে দেখবো আর নেমে আসবো। মোটেই দেরী করবো না, তুমি দেখে নিও।'

তুনু বললো, 'বেশ, তবে তাই হোক, চলো। কিন্তু, মনে থাকে যেন, বেশীক্ষণ না!'

ধীরে ধীরে ছাদে উঠে, কার্নিশের ধার ঘেঁষে দাঁড়ালো তারা। কারো মুখে কোন কথা নেই। দুজনেই চুপচাপ।

তুনু আনমনে সামনে আকাশের দিকে তাকিয়ে। কি ভাবছে কে জানে!

ঢ্যাপসাও একটু উপরের দিকে মাথা উঁচিয়ে, বাতাসে গা ভাসিয়ে সিরসির করে কাঁপছে আর সামনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চুপচাপ সে-ই বা কি ভাবছে কে জানে! দেখতে দেখতে অনেক সময় কেটে গেলো। বেলাও পড়লো খানিক।

প্রথমে কথা বললো ঢ্যাপসা, 'দেখেছো, আকাশের রংটা কি সুন্দর!'

তুনু বললো, 'হুঁ, মনে হচ্ছে, লাল আর হলুদ রং এক সাথে মেশামেশি করে কে যেন আকাশের ঐ কোনটায় ঢেলে দিয়েছে। আমার বইতে ঠিক এ রকম একটা ছবি আছে। এই ছবিটা আমি ঘুমিয়েও একদিন দেখেছি।'

'দেখেছো, বাতাসটাও কেমন যেন হিম হিম। গাটা শিরশির করছে।'

ধীরে, আরো গম্ভীর গলায় তুনু বললো, 'হ্যাঁ, কোথায় যেন বৃষ্টি হলো।'

ঢ্যাপসা তো অবাক। বললো, 'ওমা! তুমি কি করে বুঝলে, কোথায় বৃষ্টি হলো, কি হলো না?'

তুনু বললো, 'মা বলেছে। দেখছো না, বাতাসে কেমন মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

দুজনে আবার চুপচাপ। কোন কথা নেই তাদের। মনে হলো, একই সাথে কি যেন ভাবছে তারা।

অনেকক্ষণ পর তুনু বললো, 'আমার না, ঠিক এই সময় এখানে দাঁড়িয়ে দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে। মনে হয় মেঘেদের পিছুপিছু, বাতাসের হাত ধরে ভেসে-ভেসে-ভেসে, অনেক-অনেক দূরে উড়ে যাই। এলোমেলো ঘুরে বেড়াই। আচ্ছা, এই মেঘগুলো কি ঢাকায় যায়?'

মুখটা উপর দিকে তুলে বেলুনকে প্রশ্নটা করলো তুনু।

আমতা আমতা করে ঢাউস জবাব দিলো, 'ঢাকা! ঢাকাতো আমি চিনিনে, কোন দিন যাই-ই-ও নি সেখানে। কেন, সেখানে কে থাকে?'

কথা শুনে তো তুনু অবাক! গালে হাত দিয়ে বললো, 'ওমা, তুমি তাও জানো না দেখি! ঢাকায়তো আমার চাচা থাকে। আসে না, আসে না-আসে না। যেই-না মনে মনে ডাকলাম, অমনি দেখি কোত্থেকে যেন হুস করে সামনে এসে হাজির! আমরা তো সব অবাক। এলো কোত্থেকে? চাচা বলে, মনে মনে ডাকলে বলেই না সব কাজ ফেলে ঝুলে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে ঝুপ করে এসে নামলাম। আহা! আমিও যদি সেই রকম মেঘেদের সাথে সাথে, ভাসতে-ভাসতে-ভাসতে যেই না ঢাকার উপর দিয়ে যাওয়া-অমনি ঝুপ! একেবারে চাচার সামনে। চাচাতো অবাক! আরে, তুমি আবার কোত্থেকে? বলবো, কেমন, এবার আমি অবাক করে দিয়েছি তো! জলদি কাগজ কলম রাখো। চলো, গল্প বলবে চলো। তারপর গল্প-গল্প-আর গল্প! কি মজা হতো, তাই না? আচ্ছা, তোমার চাচা নেই?'

ঢ্যাপসা মাথা নাড়িয়ে বললো, 'কই, না তো! তবে একটা বুড়ো লোক ছিলো, আমার বুড়ো ভাই। ভীষণ ভালো মানুষ। তখন, যখন আমার চোখ ছিলো না, মুখ ছিলো না। দেখতে পেতাম না, কথা বলতে পারতাম না। তবু মনে হতো, মনে মনে আমি বুঝতাম এই লোকটা, এই লোকটাই আমায় ভীষণ ভালোবাসে। এই লোকটাই……।'

কথাগুলো শেষ হওয়ার আগেই, তুনু ঠিক বড়োদের মতো করে বললো, 'চোখে দেখোনি তো কি হয়েছে? ন, মন বলেছে তো? মামনি বলে, চোখের দেখা, মন যদি বলে ঠিক, তো ঠিক। যদি বলে-না, তো ভালো না। তা সে দেখতে যতো ভালেই হোক না কেন বাপু। গায়ে হাত রাখলেই তো আমি বুঝতে পারি, কে আমায় কতোটা ভালোবাসে। বুঝতে পারি চোখ না খুলেই। আচ্ছা, তোমার সেই বুড়ো ভাই কোথায় থাকে এখন?'

'তা তো জানি না। ঐ পাহাড়ের ও পাশেই হয়তো বা।'

তুনু হাতে জড়ানো সুতোয় একটু ঢিল দিয়ে বললো, 'দেখো তো, দেখতে পাও কি না।'

'নাহ্! ওমা পিছনে দেখি আরও একটা পাহাড়!'

'এবার'

'না ভাই, ওর পিছনেও দেখি পাহাড়।'

'এবার দেখোতো দেখি ঠিক করে।' সুতোয় আরো একটু ঢিল দিলো তুলি।

'না তো। কি জানি বাপু, মেঘেরা যেতে যেতে নিচু হয়ে যেখানটায় মিলিয়ে গেছে, সেখানেই হয়তো বা।'

তুনু আরো খানিকটা সুতো ছেড়ে দিতে দিতে কিছু একটা বলার আগেই ঢ্যাপসা হাঁ হাঁ করে উঠলো, 'আরে আরে, করো কি, করো কি! এক্ষনিতো হুস করে উড়াল দেবো তোমার হাত ফসকে। তখন আর আমায় ধরতেই পারবে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তেই উপর থেকে গমগমে গলায় মেঘেরা বলে উঠলো, 'এই, ভর সন্ধ্যায় ছাদে কেন, এ্যাঁ? যাও, জলদি নিচে নামো।'

কথাগুলো বলতে বলতেই টুপটাপ করে বড়ো বড়ো ফোঁটা ফেলে বৃষ্টি ঝরাতে শুরু করলো মেঘগুলো।

তুনু আপন মনেই গজগজ করে উঠলো, 'কোন মানে হয়!'

তড়িঘড়ি দুদ্দাড় বেগে, দরজায় পাল্লার, চৌকাঠে, সিঁড়ির দেয়ালে, এদিক ওদিক সেদিক ঠুল ঠক্কর খাইয়ে, ঢ্যাপসাকে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে একেবারে নিজের পড়ার ঘরে এসে হাজির হলো তুনু।

প্রথমে লক্ষ্যই করে নি। পরে চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে ফেললো সে।

'তুমি হাসলে কেন?' ঢ্যাপসা প্রশ্ন করলো।

কোন কথা না বলেই, ঢ্যাপসাকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড় করাতেই তার মুখ কাঁচুমাচু। নিজেকে নিজেই চিনতে পারছে না ঢ্যাপসা। সে কাঁই-মাঁই শুরু করে দিলো, 'ও তুনু আপু, এটা কি হলো? দোহাই তোমার, একটা কিছু বিহিত করো জলদি! এই থ্যাবড়া নাক নিয়ে এখন কাকে মুখ দেখাই। আহা, আমার অমন টিকোলো নাকটার কি দশা! ঐ হতচ্ছাড়া মেঘটাই যতো নষ্টের গোড়া!'

ব্যাপারটা হয়েছে কি, ছাদেই কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি ওর নাকের উপর পড়ায় এবং তারপর দৌড়াদৌড়ি ঘষাঘষিতে ভেজা নাকটা ধেবড়ে একেকবারে কিম্ভূতকিমাকার !
ঢ্যাপসার কান্নাকাটি দেখে তো তুনু হেসেই আকুল। বললো, 'আরে, আরে, ব্যস্ত হচ্ছো কেন, এ্যাঁ ? একটু ধৈর্য ধরো, সব ঠিক করে দিচ্ছি। এমন কাঁউমাঁউ করলে, চোখ দুটোও যাবে। তখন বুঝবে ঠ্যালা।' বলেই ঝটপট একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে থ্যাবড়ানো নাকটা মুছে দিলো। তার পরপরই তুলি দিয়ে সেখানে একটা সুন্দর টিকালো নাক মুহূর্তে এঁকে দিয়ে বললো, 'নাও, দেখো তো আগেরটার মত হয়েছে কিনা। বাবারে বাবা, আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে !'
আয়নায় নতুন নাক দেখে তো ঢ্যাপসা বেজায় খুশী। আনন্দে তুনুর মাথায় বার কয়েক ঢুকুস করে ঠুল দিয়ে আদর জানিয়ে দিলো।
তুনু বললো, 'ছাদে কার কথা যেন বলছিলে ? ও হ্যা, সেই সুন্দর বুড়োলোকটার কথা তাই না ? তুমি সেই লোকটার কথা বলো না একটু। ভালো লোকের কথা শুনতে আমার ভীষণ ভালো লাগে।'
'সত্যি ভাই, লোকটা কিন্তু ভীষণ ভালো। প্রথমে কি আর আমি এমন ছিলাম ? মোটেই না। চ্যাপটা আমসি হয়ে একটা ব্যাগের মধ্যে গাদাগাদি হয়ে ছিলাম পড়ে। উনিই না সেখান থেকে বের করে আমায় উড়ু উড়ু হালকা শরীর দিলেন। শুধু আমায় কেন, আমার মতো আরো অনেককেই। প্রতিদিন তিনি আমাদের কিসের সঙ্গে যেন বেঁধে সারা শহরময় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতেন। কোন কোন দিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমরা মনের আনন্দে বাতাসের দোলায় এর ওর গায়ে ঢোলে পড়তাম। তারপর দিনের শেষে, সন্ধ্যা নামতো। বাড়ি ফিরতেন তিনি কেবল আমাকে দিয়েই। বাকি সবাইকে দেখতাম সারাদিনে এর ওর তার হাত ধরে কোথায় যেন চলে যেতো। আমার খুব দুঃখ হতো, আমাকে কারো সাথে যেতে দিতেন না বলে। বুড়োভাই বলতেন, 'বুঝলি, তুই আমার পয়ার, লক্ষ্মী।' এই কথা বলে, প্রতিদিনই তিনি একটা নরম কাপড় দিয়ে আলতো করে আমার সারা শরীরটা মুছে দিতেন। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। চুমা দিতেন। এই ভাবে একদিন দু'দিন প্রতিদিনই ঐ একই ব্যাপার। দল বেঁধে সব যাই, ফিরি একা-একা !'
কথার মাঝেই তুনু বলে উঠলো, 'তা তো বুঝলাম। তা হলে, এখানে এলে কি করে তুমি ?'
'সেই কথাই তো বলছি।' ঢাউস আবার বলতে শুরু করলো, 'সেদিন হলো কি, সবাইকে ছেড়ে ছুড়ে-একটা ছেলে আমাকেই পছন্দ করে বসলো। বুড়োভাই তো কিছুতেই দেবে না। ছেলেটির বাবাও প্রথম নিতে চাইলেন না। বললেন, অত বড়টা নিয়ে কি হবে ? তার চেয়ে এটা নাও। ওটা নাও ! ছেলেটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমাকে তার চাই-ই চাই। এরপর ধমক ধমক, কান্নাকাটি। সব মিলিয়ে একটা

হৈ চৈ কাণ্ডকারখানা। রাস্তায় ভিড় জমে গেলো। কেউ বলে, ও যেটা চায় সেটাই দিন না। ছোটদের ইচ্ছের বাধসাধতে নেই! কেউ আবার বুড়ো ভাইকে ধমকই দিয়ে দিলে, বেচবে না যখন তখন বাইরে এনেছো কেন? আর বাইরেই যখন এনেছো তখন বেচবেই বা না কেন? কি আর করা! বাধ্য হয়েই আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, সেই ছিঁচকাঁদুনে ছেলেটার হাতে তুলে দিলেন আমায়। তারপর সেই দুষ্টু ছেলেদের কথা তো তোমাকে বলেইছি। ওদের হাত ফসকে ওখানে থেকে উড়াল দিয়েই না তোমাকে পেলাম।'

তারপর, একটু থেমে ঢাউস আবার বললো, 'তুমি সত্যি কথাই বলেছো ভাই, গায়ে হাত দিলেই বোঝা যায়, কাকে কে কতটা ভালোবাসে। সেই বুড়োলোকটার কথাই ধরো না কেন, মনে হচ্ছে তাঁর ভালোবাসা এখনো আমার সারা শরীরে শিরশির করে বিলি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর সেই ছেলেগুলো? গায়ে হাত দিলেই মনে হতো যেন তারা খামুচি দিচ্ছে। বাবারে বাবা!'

অনর্গল কথাগুলো বলে ঢাউস চুপ করলো।

তুনু বললো, 'মামনি আমার গায়ে হাত দিলে আমিও কিন্তু বুঝতে পারি।' তুনু আরো কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ ভিতর থেকে মার গলা পেয়ে থমকে গেলো। ভিতর দিকে কান পাতলো সে। আবার মামনির গলা পেলো, 'তুনুবুড়ি, একা একা কার সাথে এতো কথা বলছো? সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হাত মুখ ধুয়ে জলদি পড়তে বসো।'

ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকিয়ে তুনু বললো, 'চুপ, আর কোন কথা না। এই ঘরে একটু বসে থাকো, আমি হাতমুখ ধুয়ে পড়াশোনা করে নিই। তারপর গল্পোসল্পো করা যাবে।'

কথাটা বলে, যেই না হাতের সুতোটা ছেড়েছে, অমনি ঘরের মধ্যে হুড়ুম দাড়াম শব্দে কি যেন একটা কিছু ঘটে গেলো। তুনু দেখলো, কিসে যেন ধাক্কা খেয়ে বার পাঁচেক টাল খেয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে, হাঁউ মাঁউ করে তার কাঁধ বরাবর নেমে এলো ঢাউস।

ঢাউসকে দুহাতে জাপটে ধরে উপর দিকে তাকাতেই তুনু বুঝতে পারলো, ঘুরন্ত পাখার হাতলে ধাক্কা খেয়েই এই কাণ্ড!

তুনুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বোকা বোকা ভাব নিয়ে ঢাউস বললো, 'পেটটা ফেঁসে মরেই যাচ্ছিলাম আটু হলে, বাপ্‌স্। এ আর সহ্য হয় না ছাই।'

'হুঁ!'

গম্ভীর ভাবে গলা দিয়ে একটা শব্দ বের করে, তুনু চুপচাপ রইলো কিছুক্ষণ। বেশ বোঝা গেলো তুনু গম্ভীর ভাবে একটা কিছু ভাবছে। এবং তার কিছু পরপরই ঢাউসের নিচের দিকে বাঁধা সুতোর গিঁটটা আঙ্গুল দিয়ে খুলতে শুরু করলো সে।

আচমকা, ব্যাপারটায় প্রথমে ঢাউস একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেলো যেন। তারপর হাঁ হাঁ করে কিছু একটা বলে বাধা দেওয়ার আগেই ফ-অ-র-র-র-ফ্‌-অ্‌-অ্‌-ং! একেবারে গুটিয়ে সুটিয়ে আমসি হয়ে তুনুর পড়ার টেবিলে নেতিয়ে পড়লো।
সঙ্গে সঙ্গে তুনু নাক মুখ সিঁটকিয়ে বলে উঠলো, 'উহু! বিচ্ছিরি গন্ধ!'
তারপর সিঁটিয়ে যাওয়া ঢাউসকে, টেবিলের উপর রাখা বইগুলোর ফাঁকে গুঁজে রেখে বললো, 'চুপ করে বসে থাকো এখানে। হাতমুখ ধুয়ে পড়ে টড়ে, খেয়েদেয়ে নি, তারপর দেখবোখন কি করা যা, কেমন?
পড়াশুনা শেষ। খাওয়া দাওয়াও শেষ।
নেতিয়ে পড়া ঢাউস আর সুতোটা হাতে নিয়ে তুনু ভাইয়ার পড়ার টেবিলে হাজির। বললো, 'ভাইয়া, এটা একটু ফুলিয়ে দাও না।'
ভাইয়া আর আপু দুজনেই অবাক। একই সাথে দুজনেই বলে উঠলো, 'আর, গ্যাস বার করে দিল কে, এঁ্যা? বেশতো ছিলো ভেসে ভেসে, খুললে কেন?
তুনু বললো, 'ধ্যাৎ! শুদ্ধ পালাই পালাই ভাব। ভালো লাগে না আমার। তাই খুলে দিয়েছি।
ভাইয়া আর আপু অবাক অবাক ভাব নিয়ে, দুজন-দুজনের দিকে তাকিয়ে একই সাথে বলে উঠলো, 'অ!'
ফর-ররর-ফঁস! ফ-র-র-র-ফঁ-অ-স! ফঁস-স-স্‌স!
ভাইয়া ফোলাচ্ছে তো ফোলাচ্ছেই। এক দৃষ্টিতে তুনু তাকিয়ে আছে ভাইয়ার মুখের দিকে। মনে মনে ভয়, কি জানি বাপু, ফেঁসে না যায় আবার! ফুঁ দেওয়ার যা বহর!
ঢাউসের গোল মুখ আবার নতুন করে ফুটে উঠলো। ফুঁ-এর দাপটে তারও চোখে মুখে আতঙ্কের ছাপ। পেটটা ফেটে না গেলেই বাঁচি!
চোখ বড়ো বড়ো কর দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো তুনু। ঢাউসে চোখ মুখ একটু টান টান হতেই হৈ হৈ করে উঠলো সে 'আর না, আর না। এবার বেঁধে দাও ভালো করে।'
বেঁধে দিতেই ঢাউসকে বগলদাবা করে এক্কেবারে পড়ার ঘরে। পিটপিট করে তার দিকে তাকিয়ে তুনু বললো, 'কি খবর? এখন কেমন?'
ঢাউস বললো, 'ভালো। আর বাপু, উড়ি উড়ি ভাব নেই।'
'ঠিক বলেছো, এই গেলো—এই গেলো—ভাব নিয়ে কি আর বন্ধুত্ব করা যায়! এখন ধীরে সুস্থে, এক জায়গায় বসে গল্পসল্প করা যাবে। ফস্‌কে টসকে যাওয়ার
ঢাউস বললো, 'ঠিক বলেছো ভাই, ঠিক বলেছো।'

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে ঢাউসকে বগলদাবা করে সটান বাবা আর মামনির সামনে হাজির।

'মামনি।'
অন্যদিকে ফিরে কি যেন একটা কাজ করতে করতেই মা জবাব দিলো, 'বলো।'
'আমি আজ একা শোবো।'
'বাব, মা দুজনেই অবাক হয়ে তাকালো তুনুর দিকে।
কথা শুনে ভাইয়া আপুও হাজির সেখানে।

আশ্চর্য! সবাই অবাক। যে তুনুকে কয়েকমাস ধরে বকা-ঝকা করে বুঝিয়ে শুনিয়েও রাজি করানো গেলো না, সে কিনা আজ নিজে থেকেই একা শুতে যাচ্ছে! ব্যাপারখানা কি?

মা বললো, 'তোমার ভয় করবে না তো একা শুতে?

না করবে না। ভয় করবে কেন? আমার সাথে তো···'
কথাটা শেষ না করেই তুনু চুপ করে গেলো। বার দুই ঢোক গিলে একটু নড়েচড়ে দাঁড়ালো সে।
ইস্, আর একটু হলেই ঢাউসের কথা বলে ফেলেছিলো আর কি?
'তোমার সাথে কে? কি······?'

তড়িঘড়ি তুনু বললো, 'না কিছু না। ও আমি এমনি বলছিলাম। ভয় করবে কেন? মোটেই ভয় করবে না। আমি তো এখন বড় হয়েছি।'
বলতে বলতে ঢাউসের দিকে তাকালো আড়চোখে।
ঢাউসও চোখ মিটমিটিয়ে, ঠোঁট টিপে হাসলো তুনুর দিকে তাকিয়ে।
বাবা গাঁইগুঁই করলেও, মামনি বললো, 'ঠিক আছে, রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে ভয় পেলে আমাকে ডেকো। মাঝের দরজা খোলা থাকবে। কেমন?'
তুনু খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে সায় দিলো।
মামনির ইশারায় এক রাজ্যির অবাক অবাক ভাব নিয়ে ভাইয়া আর আপু তার বিছানা ঠিক করতে গেলো।
তারপর? তারপর আর কি?

অনেক রাত। চারিদিক সুনসান। এতক্ষণ কেউ কোন কথা বলে নি, কেউ যদি শুনে ফেলে এই ভয়ে দুজনেই অপেক্ষায় ছিলো, সবাই ঘুমিয়ে পড়ার।
'ঘুমুলে?' ফিসফিসিয়ে ঢাউস জিজ্ঞেস করলো।
'না, তুমি? তোমার ঘুম পেয়েছে বুঝি?' পাল্টা তুনু শুধালো।
ঢাউস বললো, 'ধ্যাৎ, ঘুম আমার মোটেই পায়নি। গল্প বলো তো, তোমার সেই চাচার গল্প।'
তুনু বললো, 'শুয়ে শুয়ে সেই থেকে তো চাচার কথাই ভাবছি। সেই কখন থেকেই

তো ডাকছি মনে মনে। দেখবে, কাল সকালেই দেখবে, হাজির বাতাসের হাত ধরে। বলবে ডাকলে বলেই না চলে এলাম। চলো-চলো, গল্পে বসে পড়ি। এসো হে ঢাউস, গল্পের ঝাঁপি একেবারে টইটুম্বুর। সত্যি চাচা এলে কি মজাই না হবে!

ঢাউস বললো, 'হ্যাঁ ভাই, ভীষণ মজা হবে।'

এরপর? এরপর আর কি? আর কোন সাড়াশব্দ নেই তাদের।

আরে! দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লো নাকি?

কি জানি বাপু, হবেও বা!

নাকি, সারারাত ধরে গল্পোসল্পো ফিসফিসিয়ে।

জানি না, হয়তো বা তাই।

এতো রাত্রে কেউ তো আর জেগে বসে নেই যে, কান পেতে শুনবে, ওদের ফিসফিসানি।

হয়তো গল্প হলেও হতে পারে সারাটা রাত ধরে।

কে আর শুনবে কান পেতে? সবাই তো তখন ঘুমিয়েই কাদা!



চলো যাই-"যুব আবাসে"

সমীর ঘোষ

হেডিং দেখে একটু খটকা লাগছে, তাই না! হঠাৎ যুব আবাস কেন? কোথারই বা যুব-আবাস!

হ্যাঁ, সেই কথাতেই আসছি, জানো তো অচেনার আনন্দ উপভোগ করা কিশোর ও যুব মনের এক বৈশিষ্ট, তাই ফাঁক পেলেই বেড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে ভীষণ। পরীক্ষার পর বা গ্রীষ্মছুটিতে অথবা পুজোর ছুটিতে বাড়ীতে আর থাকতে ইচ্ছে করে না, ইচ্ছে করে কোথাও না কোথাও গিয়ে কিছুদিন একঘেয়েমির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাই। চঞ্চল কিশোর ও যুব মনের এই সুদূরের পিয়াস মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার খুবই তৎপর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ বাদেও ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের যুব আবাস প্রকল্প তাই এখন ভীষণ জনপ্রিয় জনপ্রিয়তা যত বাড়ছে সরকার ততই তৎপর হয়ে উঠছে। একের পর এক তৈরী হচ্ছে যুব আবাস। পশ্চিমবঙ্গে এখন এরকম যুব আবাসের সংখ্যা ২৬ এবং রাজ্যের বাইরে—বিহারে নালন্দা জেলার রাজগীর আছে ১। যুব-আবাস স্থাপনের লক্ষ্য হল যুসমাজকে, দেশকে জানার

সুযোগ করে দিয়ে সাংস্কৃতিক চেতনা উন্নত করতে সহায়তা করা এবং তাদের সক্রিয় বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা। স্বল্প আয় ও যুবজীবনের চেতনাকে বিবেবেচনায় রেখে যুব আবাসে ছাত্র এবং যুবকদের স্বল্প ব্যায়ে থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্প ব্যয়ে ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করার ফলে যুব সমাজের মধ্যে যেমন ভ্রমণ উৎসাহ, দেশকে চেনার স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি যে এলাকাগুলিতে যুব আবাসগুলি অবস্থিত সেইসব জায়গার অর্থনীতিও আংশিকভাবে সচল হচ্ছে।

প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতীক কলকাতা মহানগরী। মহানগরীর বুকে ৭০ শয্যা বিশিষ্ট মৌলালির রাজ্য যুব কেন্দ্রের যুব আবাসটি আজ খুবই জনপ্রিয়। আর এছাড়া সারা ভারতের বৃহত্তম যুব আবাস এখন কলকাতায়। এশিয়ার বৃহত্তম এবং বিশ্বের অন্যতম ক্রীড়াকেন্দ্র স্লটলেকের যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের পরিপূরক হিসাবে ৯৭৪ শয্যা বিশিষ্ট নয়নাভিরাম যুব আবাসটিতে ৩০টি ডরমিটরী ঘর আছে যার প্রত্যেক-টিতে ৩০টি করে শয্যা দ্বিতল পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে। ১২টি ঘর আছে ৪ শয্যা বিশিষ্ট এবং ১৩টি ঘর আছে ২ শয্যা বিশিষ্ট। ঘরগুলি আবার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হবে। আধুনিক সরঞ্জাম এতে আছে। রাজ্য যুব আবাসে একই সঙ্গে ২১০ জন একত্রে বসে খেতে পারেন এমন দুটি খাবার ঘর বা ডাইনিং হল আছে।
রাজ্য সরকার প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ছাত্রছাত্রীদের অনুদান দেয়। অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ্য সরকারের যুব আবাস ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায়। কলকাতায় মফস্বল বাংলার ছাত্রছাত্রীরা দল বেঁধে আসতে চায়। কিন্তু আগে তা সম্ভব হত না। এখন সেই অভাব দূর হয়েছে। আরও ২৪টি যুব আবাস রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে এবং ওড়িষ্যার পুরিতে যুব আবাস স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবার সময় থাকতে জানিয়ে রাখি সংরক্ষণ (বুকিং) কোথায় কিভাবে করতে হয়। সমস্ত যুব আবাস বুকিং করা হয় "যুব কল্যাণ অধিকার, ৩২।১ বিনয়-বাদল—দীনেশ বাগ (দক্ষিণ), কলকাতা ৭০০০০১ থেকে। এখানে সহ-অধিকর্তার কাছে দরখাস্ত করতে হয়। যুব আবাসের সাধারণ শয্যার ভাড়া প্রতিদিন মাত্র ৫ টাকা। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আর ও কম, মাত্র ২ টাকা। যুব আবাসে যে বিশেষ ঘরগুলি (ভি, আই, পি, রুম) তার সাধারণ ভাড়া ১৫ টাকা প্রতিদিন। দার্জিলিং জেলায় যে যুব আবাসগুলি রয়েছে তার ভাড়া সামান্য বেশী। সাধারণ ঘর, যুবক যুবতীদের জন্য ১০ টাকা, বিশেষ ঘর ২০ টাকা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য ৫ টাকা প্রতিদিন। এবার কোথায় কোথায় যুব আবাস আছে এবং শয্যা সংখ্যা কত তা বন্ধনীতে দিয়ে দিচ্ছি—

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় গঙ্গাসাগরে (৫০), মেদিনীপুরের দীঘায় (৫০), বাঁকুড়ায় মুকুটমণিপুর (৩৩), বর্ধমানে মাইথন (২৪) এবং দুর্গাপুরে (২৪), বীরভূমে বোলপুর

(৮), ম্যাসাঞ্জোর (৩২) এবং বক্রেশ্বরে (৭০), মুর্শিদাবাদ জেলায় লালবাগে (৫০), বিহারের রাজগীরে (২২), জলপাইগুড়িতে বরদাবাড়ী (১৬), বক্সাদুয়ারে (১২) দার্জিলিং জেলায় সাইপত্রীভবন (২২), রম্ভিলা (৩০), কালিম্পং (২৫), শিলিগুড়ি (৩৫), ফালুট (১২), সানদাকফু (০৯), মানেভানজাং (০৯), টংলু (০৬), ঘুমডাংজাং (০৬), রিমবিক (০৬), রামাম (০৬), দৌহিল (০৬) এবং বাগোরাত (০৬)।

কোথায় কিভাবে যাবে সে সম্বন্ধে এবার কিছু বলি—গঙ্গাসাগরে যেতে গেলে প্রথমে কলকাতার এসপ্লানেড থেকে বাসে করে কাকদ্বীপ, দূরত্ব প্রায় ৯০ কিমি। সময় লাগে প্রায় সোয়া দু ঘণ্টা, তারপরে লঞ্চে নদী পার হয়ে কচুবেড়িয়া—কচুবেড়িয়া থেকে বাসে করে সাগরদ্বীপ—দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিমি।

এবার দীঘার কথায় আসি, খড়্গপুর রেলস্টেশন থেকে যুব আবাস প্রায় ৭০ কিমি। নিয়মিত বাস পাওয়া যায়। ভাড়া মাত্র ছ টাকা থেকে দশ টাকার মত লাগে। সময় লাগে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা। কলকাতা এসপ্লানেড বা গোলপার্ক থেকেও সরাসরি বাসে যেতে পারো তোমরা, সময় লাগে সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মত।

এইবার বলি মুকুটমণিপুরে কিভাবে যাবে—বাঁকুড়া থেকে প্রায় ৫২ কিমি। বাকুড়া থেকে নিয়মিত বাস পাওয়া যায়, সময় লাগে দেড় ঘণ্টার মত। প্রতি আধ ঘণ্টায় বাঁকুড়া গোরাবাড়ি বাস ছাড়ে। গোরাবাড়ির ঠিক আগের স্টপেজই বহু আকাঙ্ক্ষিত মুকুটমণিপুর।

এখন কি মাইথনে যাবে? তাহলে হাওড়া থেকে ট্রেনে করে আসানসোল, আসানসোল থেকে মাইথন মাত্র ২৬ কিমি। সময় লাগে ১ ঘণ্টা, বাস বা ট্যাক্সিতে যেতে পারো। আর বরাবর রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৯ কিমি, সময় লাগে মাত্র ২৫ মিনিট।

এবার তাহলে বীরভূম জেলায় যাই। প্রথমেই মনে পড়ে বোলপুর। বোলপুর রেলস্টেশন থেকে যুব আবাস মাত্র ৪ কিমি। রিক্সায় ভাড়া লাগে ২ টাকা মাত্র, সময় নেয় ১৫ মিনিট। বক্রেশ্বরে উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করতে ইচ্ছে করছে খুব তাই না? রামপুরহাট রেলস্টেশন থেকে যুব আবাসের দূরত্ব প্রায় ৬০ কিমি। স্টেশন থেকে ট্যাক্সি বা অটো ভাড়া পাওয়া যায়, সময় লাগে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট। যুব আবাস থেকে উষ্ণ প্রস্রবন মাত্র ৫ মিনিটের পথ।

ম্যাসাঞ্জোরেও নিশ্চয়ই যেতে ইচ্ছে করছে? তাহলে বোলপুর থেকে বাসে করে ম্যাসাঞ্জোয় বা সিউড়ি থেকেও যেতে পারো। নিয়মিত বাস ছাড়ে, দূরত্ব ১০৮ কিমি। কলকাতা থেকে রামপুরহাট অথবা সাঁইথিয়া রেলস্টেশনে নেমে বাসে করে সিউড়ি যাবে।

এবার চলো লালবাগে যাই। শিয়ালদা স্টেশন থেকে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে মুর্শিদাবাদ স্টেশনে নেমে পড়ো, ওখান থেকে রিক্সায় দেড় টাকা থেকে দু টাকা ভাড়া দিয়ে যুব আবাসে চলে যাও, সময় লাগে মাত্র মিনিট কুড়ি।

এখন পশ্চিমবাংলার বাইরে যাওয়া যাক। কোথায়? হ্যাঁ ঠিক ধরেছ, বিহারের নালন্দা জেলার রাজগীরে। হাওড়া থেকে দিল্লী এক্সপ্রেসে বক্তিয়ারপুর স্টেশনে, তারপরে আবার ট্রেন বা মিনিবাস, জীপ অথবা ট্যাক্সি করে রাজগীর যুব আবাসে, সময় লাগে দেড় থেকে দু ঘণ্টা, দূরত্ব ৪৭ কিমি।

এইবার চলো ঠাণ্ডার দেশে। কোথায় বল তো? হ্যাঁ—দার্জিলিং। প্রথমে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম। শিলিগুড়ি অথবা নিউজলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে রিক্সায় যেতে পারো, সময় লাগে মাত্র মিনিট পঁচিশ, ভাড়া ২ টাকা ৫০ পয়সা থেকে ৩ টাকা। এবার চলো কালিম্পং। কালিম্পং বাসস্ট্যাণ্ড থেকে জীপ বা ট্যাক্সি করে যুব আবাস যেতে হয়। রায়ভিলাতেও যেতে পারো—ম্যাল থেকে ৪ কিমি, লেবং-এর দিকে, তেনজিং রকের কাছে। আর সাইপত্রীভবনে যেতে গেলে দার্জিলিং রেল স্টেশনের দেড় কিমি আগে আভা আর্ট গ্যালারীর সামনে চলে এসো, স্নোভিউ হোটেলের ঠিক আগে।

সবসুদ্ধ ২৭টা যুব আবাসের মধ্যে তুমি কোন্‌টায় প্রথমে যাবে এখনি তা ঠিক করে নাও। এই পুজোর ছুটিতে বা পরীক্ষার পর বা আগামী গ্রীষ্মের ছুটিতে বেরিয়ে পড়ো, দেশ দেখার আনন্দে মনকে মাতিয়ে তোলো। পারলে সবক'টা যুব আবাসেই যেতে পারো, সময় তো অনেক। কি, তাই না?

সোনারপুরে সোনার বরণ

কৃষ্ণলাল মাইতি

সোনারপুরে সোনার বরণ
কন্যা নূপুর পায়
সোনা রোদে নাচছে কোণা
সোনার জরির গায়।
ঝম্‌ঝমাঝম আওয়াজ উঠে
সুরের লহর তুলে
কলাবতী কন্যা নাচে
কী বাহার তার চুলে।



হরি কোটাল

প্রলয় সেন

অনেক দিন বাদে হরিদাকে দেখলাম। মানে হরি কোটালকে। বলতে গেলে সেই কোন্ ছেলেবেলার পর। হরিদা রেলস্টেশনের কাছে বাজারের মুখে দাঁড়িয়েছিল, বড় কাঁচা নর্দমার গা ঘেঁষে। খরখরে এক মাথা চুল। শনের মত সাদা। আদুপ্র গা। ঢলঢলে চামড়ার নিচের বুকের খাঁচাখানা হাঁপড়ের মত ওঠানামা করছে। পরনে একটা কাদাটে ট্যানা। হাটুর মুড়ো দুটো ভাঙ্গা। ঘোলাটে দৃষ্টি। সামনের দিকে ঝুকে পড়া হেজেমজে যাওয়া তোবড়ানো দেহটাকে সামলাতেই অস্থির। হরিদার বাঁহাতে একটা শুকনো পেয়ারর ডাল। ডানহাতে মরচে-ধরা টিনের কৌটো। কাঁপা কাঁপা হাতটা সামনের দিকে অনির্দেশ্য প্রসারিত।

ঝাপসা গলায় খুনখুন করে কিছু একটা বলছিল হরিদা। সম্ভবত রামপ্রসাদের মালসী গাইছিল। একসময় ভারি মিটেল গলার ছিল হরিদার। কোমরের ঘুনসিতে শ্বেত বয়রা আর সর্পগন্দার মূল জাড়ানো দেখে চমকে উঠলাম। মনে পড়ে গেল, এক

সময় ওর সর্পভীতি ছিল মারাত্মক। যেটা ওর স্বভাবের বিপরীত। যৌবনে বিরাট দশাসই চেহারার মানুষ ছিল হরিদা। গায়ে অসুরের শক্তি, ছিল দুর্ধর্ষ লেঠেল। একাই বিশ পঁচিশজনকে রুখে দিতে পারত অনায়াসে। ভয়ডর কাকে বলে জানত না। সেই মানুষটা, বিয়ের পরপর বউকে শাপে কেটে মেরে ফেললে, সন্ধ্যের পর আর ঝুপড়ি ছেড়ে বেরুত না।

একসময় এ তল্লাটের পুরোণ বাসিন্দাদের সবাই এক ডাকে হরিকোটালকে চিনত। তখন এ দিকটা ছিল পাড়াগাঁ। পানাপুকুর, বাঁশঝাড়, ঝোপজঙ্গল, আমকাঁঠালের নিবিড়তায় এখানকার মধ্যদিন তখন নিশ্চুতি হয়ে পড়ত। রাস্তা বলতে ছিল বেশির ভাগই মেঠো পাকদণ্ডী, খোওয়াওঠা রাস্তা ছিল কুল্যে গোটা তিনেক। আর সে-সব রাস্তার মোড়ে দূরে দূরে মিউনিসিপ্যালিটির কাচের টোপরে ঢাকা কেরোসিনের ডিবের আলো সন্ধ্যা না হতেই ভুতুড়ে আলো ছড়াতো। শীতের দিনে দুপুরে কালকা সুন্দির ঝুপসি থেকে মা-শেয়াল ছানাপোনাদের নিয়ে গর্ত থেকে ফাঁকায় উঠে এসে রোদ পোহাত নিশ্চিন্তে। হনুমানের দৌরাত্ম্যে ঘুণ্টিপোষে শুকুতে দেওয়া আবার পাহারা দেবার জন্য ঠাকুমারা উঠোনে কঞ্চি হাতে বসে থাকত। সে-সময়, সেই শান্ত চিলেপলা জনবিরল আমাদের এ তল্লাটে হরিকোটাল ছিল সকলের বড় সহায়। মিত্তির বৌ'র বাচ্চা হবে। ডাক পড়ে হরির। উঠোনের কোণে আঁতুড় ঘর তৈরি করে দাও। ছেলের হাতঘড়ি। দক্ষিণের নাচাল জমিতে দাঁড়িয়ে থাকা এক ঠেঙে তালগাছে উঠে ডাঁটিশুদ্ধ তালপাতা নিয়ে হাজির হরিকোটাল। বাস্তুপুজোর আগের দিন না বলতেই বন বানাড় ঢুঁরে কাফলার ডাল কেটে আণ্ডিল করে নিয়ে এসে বাড়ি পৌঁছে দিত হরিদা। অন্নপ্রাশন, বিয়ে, পুজো-পার্বনে হরিকোটালকে ডাকতে হত না। কাক পক্ষীর মুখে শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসত। সকাল থেকে সন্ধ্যে দিনের পর দিন খাটত কোন কিছুর প্রত্যাশা না করেই। এমন কি কেউ মারা গেলে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে খাটিয়া তৈরি করা, সারা শ্রাদ্ধের সময় বৃষোৎসর্গের কাঠ বড় পুকুরের কোণায় পুঁতে দেওয়া-সব কাজ নিঃশব্দে সারত হরিদা।

হরিকোটালকে এ-তল্লাটে নিয়ে আসে চৌধুরীরা। চৌধুরীরাই ছিল একসময় এ-তল্লাটের বেশির ভাগ জমির মালিক। তাদের ভদ্রাসন ছিল মধ্যকলকাতায়। কাপড়ের ফলাও ব্যবসা। সেই চৌধুরীদের বিরাট একখণ্ড পাঁচিল ঘেরা জমি ছিল আমাদের বাড়ির উত্তরে। ভিতরে মস্ত ফলের বাগান, পুকুর ইত্যাদি। তারই ভিতর একটাছোট্ট মাট কোঠায় থাকত হরিদা! এখন জায়গাটার সেদিনের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। পুকুর বুজে ফলের বাগান সাফসুফে জায়গাটা হালফ্যাসানের বহুতল বাড়িতে জম-জমাট হয়ে আছে।

আমরা ছুটির দিন দল বেঁধে হরিদার ডেরায় ঢুঁ মারতাম। পুকুরে সাঁতার কাটতাম। বাগানের ফল পাকুড় পাড়তাম। ফুলের বাগানে দৌরাত্ম করতাম। তাতে

রাগ করত না হরিদা, বরং খুশীই হত। শুধু বলত ও দাদাবাবুরা, ডালটাল ভেঙো নি যেন।

বৈশাখ-জৈষ্ঠে টুকরি বোঝাই আম-জাম-আনারস-কাঠাল চলে যেত ঠ্যালাগাড়ি করে মধ্য কলকাতায়, চৌধুরীদের বাড়ি। বিপিন তা থেকে বেছে বেছে ভাল ভাল পাকা ফল বেশ কিছু সরিয়ে রাখত। তারপর বস্তা ভর্তি করে কাঁধে বয়ে বাড়ি বাড়ি বিলোত।

হঠাৎ-ই একদিন শহরতলির চেহারাটা গেল পাল্টে। যেন ভোজবাজি। যুদ্ধের পর স্বাধীনতা, দেশভাগ, ওপার বাংলা থেকে কাতারে কাতারে ছিন্নমূল মানুষের আগমন, —দেখতে এ-তল্লাটের জমি হয়ে উঠল সোনার চেয়েও দামী। সেই ডামাডোলের দিনে হরিকোটাল কবে যে এ-অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে কোথায় ছিটকে গেল, কে তার খোঁজ রাখে।

আজ কদিন হল দেখছি সেই হরিকোটাল বাজারের মুখে দাঁড়িয়ে, ঝাপসা গলায় ক'কাচ্ছে। অর্থাৎ ভিক্ষে করছে। যারা এ তল্লাটে নতুন তারা ওকে দেখে বিরক্ত হচ্ছে ; আর যারা পুরোণ তারাও চিনি অথচ ঠিক চিনতে পারছি না এমনি একটা ভাব করে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

সেদিন টিফিনের কিছু আগে অফিসারকে বলে ছুটি করিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে সাত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছি। রাণু আগেই বলে রেখেছিল। দিনটা আমাদের বিয়ের তারিখ। ঠিক ওই দিনে পনের বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়েছিল। ফেরার পথে গড়িয়াহাট থেকে দুটো সিনেমার টিকিট, একটা দামী তাঁত-সিল্ক শাড়ি আর ডজন দুই রজনী গন্ধার স্টিক নিয়ে ফিরছিলাম।

লেভেল ক্রসিংএর মুখে বাজারের সামনে পে'ীছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি, যথারীতি হরিকোটাল ভর দুপুরে জুনের ঘর রোদ মাথায় নিয়ে টলছে। হাতে সেই পাত্রটা। রোদে পোড়ে সারা শরীর বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। দেখে মায়া হল। কাছে ভিতে কাকপক্ষীটি নেই। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আমায় চিনতে পারছ হরিদা ? আমি পল্টু, হারান সেনের নাতি—'

খাকারি দিয়ে শ্লেষ্মাটানা গলা পরিষ্কার করে হরিকোটাল মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, চিনেছি। তুমি গোপাল কত্তার ছেলে, তাই না ?'

আমি উৎসাহিত বোধ করলাম, 'ঠিক ধরেছ। ছোটবেলায় কত গেছি তোমার বাগানে, ফল পেড়েছি, পুকুরে সাঁতার কেটেছি, তোমার দাওয়ায় বসে গ্রীষ্মের দুপুরে বাঘবন্দী খেলেছি—'

ছানিপড়া দুচোখের ধোঁয়া ধোঁয়া দৃষ্টি দিয়ে হরিকোটাল ভাল করে আমাকে ঠাহর করতে চাইল। আমি বললাম, 'কতদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা হরিদা। এতকাল কোথায় ছিলে ?'

আমার প্রশ্নে হরিকোটাল সাপে-কাটা রোগীর মত কেঁপে উঠল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে বুকের হাঁপরটা চুপসে গেল। কিছু বলতে পারল না।

আমার হাতে সময় নেই। বেলা দুটো। হাতে দুটো ম্যাটিনি শো'র টিকিট। বললাম, 'যা রোদ, খামোকা এখানে দাঁড়িয়ে রোদে পুড়ছ কেন হরিদা, ঘরে যাও—'

মুহূর্তে হরিকোটালের মুখের নদীনালাগুলো তিরতির করে কেঁপে উঠল। ডুকরে কেঁদে ওঠার মত করে বলল, 'ঘর আমার কোথায় ?'

আমি চটপট মানিব্যাগ খুলে একটা আধুলি বের করে ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'নাও, এইটা ধরো হরিদা—'

হরিকোটাল শুধোল, 'এটা কি ?'

আমি দায়সারা বললাম, 'কিছু না, এই একটা আধুলি—'

আমার কথা শেষ হতে না হতে হরিকোটাল একটা পলকা গাছের মত কেঁপে উঠল। তারপর আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আর্তনাদের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'না-না-না—'

আমি কিছু একটা চলতে গিয়েও থেমে গেলাম। ওর হঠাৎ পাল্টে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে আমার গলা থেকে স্বর বেরুচ্ছিল না। জোরে সামনের দিকে পা চালালাম। পেছন ফিরে হরিদাকে দেখব সে সাহস ছিল না। কেননা আমার হাত সজোরে সরিয়ে দিচ্ছিল, তখন হরিকোটাল কেমন যেন হয়ে উঠেছিল। সেটা ভয়ে, ঘৃণায়, ক্ষোভে না বেদনায়—ঠিক বলতে পারব না।

বন্ধু

শ্যামলকান্তি দাশ

রুমির কাকুর বন্ধু কত ?
হিসেব করে দেখি,
এখন যারা তার বয়সী
করছে লেখালিখি
সকলে তার বন্ধু ভীষণ,
বন্ধু বইয়ের পাতা
ঝর্ণা কলম এবং একটি
পদ্য লেখার খাতা।

বন্ধু বাগান, জ্যোৎস্না, হাওয়া
সবুজে-সাদা পাখি,
এদের সঙ্গে রুমির কাকুর
দারুণ মাখামাখি।
কিন্তু সবার চাইতে বড়ো
বন্ধু রুমির কাকুর
তোমরা তাকে সবাই চেনো
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মরণীয়দের চেন

শ্রীঅশোক কুমার ধর

৩২৩ পৃষ্ঠা ৩২৬ পৃষ্ঠা অবধি যে ছবিগুলি ছাপা হয়েছে সেগুলি আমাদের দেশের সর্বজনমান্য ব্যক্তিদের। শেষ দিকে ৪টি বিদেশীর ছবিও আছে। দেখ তো, তোমরা এঁদের ক'জনকে চেনো? না পারলে এবারে জবাব দেখে নাও। তারপর মাষ্টার-মশাইদের কাছে এঁদের পরিচয় জেনে নেবে।

৩২৩ পৃষ্ঠা প্রথম সারি—বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র
দ্বিতীয় সারি—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ
তৃতীয় সারি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

৩২৪ পৃষ্ঠা প্রথম সারি—শ্রীরামকৃষ্ণ, সুভাষচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বিতীয় সারি—জগদীশচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা
তৃতীয় সারি—কেশবচন্দ্র সেন, যতীন দাস

৩২৫ পৃষ্ঠা প্রথম সারি—মাইকেল মধুসূদন, চন্দ্রশেখর বেংকটরামন, প্যারিচরণ সরকার
দ্বিতীয় সারি—কৃষ্ণদাস পাল, মতিলাল শীল
তৃতীয় সারি—প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

৩২৬ পৃষ্ঠা প্রথম সারি—কার্ল মার্কস, লেনিন, ট্রটস্কি
দ্বিতীয় সারি—ষ্ট্যালিন, মানবেন্দ্রনাথ রায়, মহাত্মা গান্ধী

[ছবিগুলো বাঁদিক থেকে, উপর থেকে নীচে দেখবে]